পশ্চিমবঙ্গের - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ : তুলনামূলক পর্যালোচনা (১৯৭১ - ২০১৬)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে
পি. এইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. পার্থ প্রতিম বাসু

অধ্যাপক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা – ৭০০০৩২

গবেষক

স্বপন সরকার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা - ৭০০০৩২

২০২৩

পশ্চিমবঙ্গের - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ : তুলনামূলক পর্যালোচনা (১৯৭১ - ২০১৬)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে
পি. এইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. পার্থ প্রতিম বাসু

অধ্যাপক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা - ৭০০০৩২

গবেষক

স্বপন সরকার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা - ৭০০০৩২

২০২৩

Dedicated to my father

Late Santiram Sarkar

Certified that the thesis entitled

'পশ্চিমবঙ্গের - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: তুলনামূলক পর্যালোচনা (১৯৭১ - ২০১৬)' submitted by me for award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts in Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Professor (Dr.) Partha Pratim Basu, and that neither the thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

....	....
Supervisor	Candidate
Dated:	Dated:

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোয় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দলিত জাতির দুটির অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হল, পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনৈতিক নির্বাচনের লোকসভা, বিধানসভাস ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দলিত জাতি দু'টির অংশগ্রহণের ভূমিকা বেশ প্রাসঙ্গিক রাজ্যরাজনীতির পালাবদলের প্রেক্ষাপটে। আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় এবং প্রধান প্রধান বাংলার সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনগুলোতে নমঃশূদ্র জাতির ব্যাপক প্রভাব থাকে এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রভাব থাকে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার উপর সমীক্ষা করে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির যে সকল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটের তথ্য পেয়েছি, সেগুলি তাত্ত্বিক কাঠামোর ব্যবহার করে তুলে ধরেছি। তবে এই তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ রাখতে হয়েছে, সাক্ষাৎকারগণের দেওয়া তথ্যের সঠিক প্রয়োগের দিকে। গবেষকের নিজের মনগড়া কোন তথ্য তুলে ধরে সমীক্ষিত সাক্ষাৎকারগণের দেওয়া তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গের জেলা স্তরের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিভূমির উপরে নজর রেখে যাতে বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দলিত জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো তুলে ধরার লক্ষ্যেই আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের সব রাজ্যে দলিতদের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান ও অংশগ্রহণের ইতিহাস এক রকম নয়। রাজ্যস্তরে বিশেষত জেলাস্তরে এ বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং গবেষণার সংখ্যা তুলনাক্রমে কম। তাছাড়া দলিতদের মধ্যেও সর্বত্র বিভিন্ন উচ্চ-নীচ জাতিস্তর বিদ্যমান। এই কারণেই বিভিন্ন দলিত জাতির ভিন্ন অবস্থান ও ভিন্ন স্বার্থের কারণেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানেও দৃষ্টিভঙ্গীগত, আচরণগত পার্থক্য বিদ্যমান। উক্ত বিভেদ ও উন্নয়নের অসম বিকাশের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অবস্থানটাও বেশ সহজেই আমাদের চোখে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতেই জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক সংরক্ষণেও দলিতদের মধ্যে বিতর্ক, জাতিগত এবং

আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করতে পেরেছি এবং তা আমরা আমাদের গবেষণায় কমবেশি লিপিবদ্ধ করেছি। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র দলিতজাতি দু'টির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষত রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে উক্ত দলিতজাতি দু'টির সামাজিক অবস্থান, তাদের উচ্চ-নীচ্চ বিভেদ, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক মেরুকরণ ও পৃথক অবস্থানের যেসকল তারতম্য আমরা পেয়েছি সেগুলো আমাদের গবেষণা মূলক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় জাতি-ভিত্তিক ভেদাভেদের প্রেক্ষাপটটি কী, রাজনৈতিক নাকি হিন্দু সমাজের রীতি-নীতির ধর্মীয় বিধান, নাকি কর্মনিযুক্ততার উপর ভিত্তি করে প্রোথিত ও গ্রোথিত - এই আলোচনার লক্ষ্যে সেই সত্যের অনুসন্ধান করে সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছি। এছাড়াও তাঁদের জাতিগত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সমস্যা সমূহের একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা আমরা করেছি।

উপরিউক্ত জেলা তিনটির কিছু সংখ্যক ক্ষেত্র'সমীক্ষার ক্ষেত্র হল কলকাতা মহানগরের একান্ত সংলগ্ন, আবার বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষেত্র'সমীক্ষার ক্ষেত্র বেশ দূরে অবস্থান হওয়ার দরুন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের পক্ষে কতটা উন্নতি বা অবনতি হয়েছে, তা, অনুসন্ধান করে এবং জাতি দু'টির অংশগ্রহণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ আকারে লিপিবদ্ধ করেছি। এই তিনটি জেলায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্ররা দলিত জাতির মধ্যে সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এই সংখ্যাধিক্য হওয়ার কারণ হল, নমঃশূদ্ররা মূলত দেশ ভাগের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে নদীয়া ও অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় বসতি স্থাপন করেছে। বর্তমানে এঁদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও নদীয়াতে। আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মূলত পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসী ও কিছু সংখ্যক দেশভাগের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় বসতি স্থাপন করেছেন এবং বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতেই এঁদের সংখ্যাধিক্য। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংশ্লিষ্ট তুলনামূলক পর্যালোচনার উপর গবেষণামূলক কাজের সংখ্যা অতি নগণ্য । সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গবেষণাটি করা হয়েছে, কাজেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা ধারণা আমরা অর্জন করতে পেরেছি।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের এরকমই এক প্রত্যাশা থেকে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামের দুটি দলিত জাতির পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা করার প্রয়াস করেছি। কারণ হল, জেলাস্তর থেকে রাজ্যস্তরে এবং রাজ্যস্তরের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দলিতজাতি দু'টির

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের তথ্য ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাতে করে সর্বভারতীয় জাতিভিত্তিক রাজনীতিতে সমগ্র দলিত জাতির অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটা তথ্য ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করার যায় সেদিকেও কমবেশি লক্ষ রাখা হয়েছে। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কিত চর্চায় একাধিক তাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের নাম এলেও তাঁদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ হয়ে ওঠেনি। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কয়েকটি বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আমি, "আকাদেমি বানান অভিধান" (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫) অনুসরণ করেছি। বানান বৈচিত্র পরিহার করার জন্য 'আদমশুমারি', 'তপশিলি জাতি', 'সারণি' 'সংঘজননী', ইত্যাদি বানানগুলো ব্যবহার করা হয়েছে । অন্যান্য বানানের ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি যা আছে তার দায়ভার সম্পূর্ণ আমার।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট উপাধি অর্জনের জন্য প্রদত্ত করা হল। আমার এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির রূপায়ণের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে সহায়তাদানের জন্য আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. পার্থ প্রতিম বাসু মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই । তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যতীত গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রূপায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না।

আমার এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থাগার, সংস্থা, সংগ্রহশালা ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পেয়েছি সেগুলো হল – কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিধানসভার গ্রন্থাগার, লোকসভার গ্রন্থাগার, কল্যাণীর পঞ্চায়েত শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগার, কলকাতার আদমশুমারির গ্রন্থাগার, কলকালার কালচারাল রিচার্স সেন্টারের গ্রন্থাগার, ঠাকুরনগরের মতুয়া মহাসংঘের গ্রন্থাগার, নদীয়ার বেতাই এর গ্রন্থাগার, ঠাকুরনগরের ড. বি.আর. আম্বেদকর গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়ার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের গ্রন্থাগার, এবং সোনারপুরের পৌণ্ড্র মহাসংঘের গ্রন্থাগার। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশেষ ধন্যবাদ জানাই নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মীদের এবং সাধারণ পেশায় যুক্ত মোট ২০০ জনের কাছ থেকে আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের সময় সহযোগিতা করার জন্য ।

যাদপপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র, অধ্যাপক অনিন্দ জ্যোতি মজুমদার, অধ্যাপক শিবাশিস চ্যাটার্জী, অধ্যাপক

ইমন কল্যাণ লাহেড়ী সর্বদা আমাকে ও অনুপ্রাণিত করেছেন। বিশেষ করে প্রমাণ জানাই অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জীকে যিনি আমার জাতিভিত্তিক সমাজ ও রাজনীতিতে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন । তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এই গবেষণায় আমি এসেছি। প্রণাম জানাই অধ্যাপিকা কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

পি. আর. ঠাকুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সকল সহকর্মীদের যাঁরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক পবিত্র সাহা, অধ্যাপিকা লিপিকা সাহা, অধ্যাপক সুব্রত দাস, অধ্যাপক উৎপল সিংহ রায়, অধ্যাপক নিলাংশু আচার্য, অধ্যাপক নিলয় দাস এঁদের ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও আমার শিক্ষাবন্ধু কর্মী শ্রী সৌরভ চক্রবর্তী, স্বর্গীয় বিন্দাবন মণ্ডল, শ্রী দিব্যজ্যোতি মণ্ডল, বিকাশ চক্রবর্তী, সুব্রত দাস, সুমিত মণ্ডল, এঁনারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

সবিশেষ প্রণাম জানাই আমার মাতা সূর্যরাণী সরকারকে, তাঁর আমার সকল কাজের অনুপ্রেরনার উৎস, মায়ের কাছে আমি চিরঋনে আবদ্ধ। অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই দাদা সুশান্ত সরকার, মাত্রিতুল্য বৌদি অপর্ণা সরকার, দাদা মণীন্দ্রনাথ সরকার ও সুকুমার সরকারকে, এঁদের ভালবাসা, আমার কজে উৎসাহিত করেছেন । আমার ছোটো ভাই সঞ্জয় সরকার সবসময় আমার পাশে থেকে উৎসাহিত করেছে। সংসারের কাজকর্ম অবহেলা করে পি. আর. ঠাকুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাজের মধ্যে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য মাঝ্যে মধ্যেই বাড়ির বাইরে থাকা, অধিকাংশ সময় মৌনতা ও চিন্তামগ্ন স্বামিকে সহ্য করে আপন মনে আমাদের কন্যা তিস্তার দেখাশুনা সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেছে আমার স্ত্রী কাবেরী। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো তাকে ছোটো করা হয় বরং কাবেরীর সহযোগিতা ব্যতীত এই গবেষণা করা সম্ভত হত না। এই স্বীকারোক্তিই তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো।

....

স্বপন সরকার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,

কলকাতা ৭০০০৩২

সূচীপত্র

- **ভূমিকা** — ১-১৯
  - গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা — ২-৩
  - গবেষণার উদ্দেশ্য — ৩-৪
  - সাহিত্য পর্যালোচনা — ৪-১০
  - গবেষণার শূন্যতা — ১০
  - গবেষণার প্রশ্ন — ১০-১২
  - গবেষণার পদ্ধতি — ১২-১৩
  - পরিচ্ছেদ বিন্যাস — ১৩-১৭
  - নির্দেশিকা — ১৭-১৯
- **প্রথম পরিচ্ছেদ: ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা এবং জাতিভিত্তিক রাজনীতি ও দলিত শব্দের উৎপত্তি** — ২০-৭৯
  - ভূমিকা — ২০-২২
  - প্রাচীন যুগ — ২২-৪১
  - বংশানুক্রমিক জাতি-ভেদ — ৪১-৪৭
  - মধ্যযুগে ভারতের হিন্দু সমাজের গঠন কাঠামো — ৪৮-৫৮
  - ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের হিন্দু সমাজ — ৫৯-৬০
  - ভারতের রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উত্থান — ৬০-৬৭
  - দলিত শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস — ৬৭-৭০
  - মূল্যায়ন — ৭০-৭৩
  - নির্দেশিকা — ৭৩-৭৯
- **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে** — ৮০-১৫৭
  - ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার জাতি – বর্ণ ব্যবস্থা — ৮৬-৮৮
  - নমঃশূদ্র জাতির আর্থসামাজিক ইতিহাস — ৮৮-৯৩
  - ভারতের জাতিভিত্তিক রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির অংশগ্রহণের ইতিহাস — ৯৩-৯৫
  - প্রথম পর্যায় (১৮৭২ – ১৯৪৭) — ৯৬-১১২
  - দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৪৭ - ১৯৭১ সাল পর্যন্ত) — ১১২-১১৮
  - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস — ১১৮-১২৬
  - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ইতিহাস — ১২৬-১৩৩
  - স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে ১৯৪৭-২০১৬ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ — ১৩৩-১৪০
  - মুল্যায়ন — ১৪০-১৪৫

- নির্দেশিকা ১৪৫-১৫৭
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ: লোকসভা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণ ১৫৮-২৭৯
  - মূল্যায়ন ২৬৪-২৬৭
  - নির্দেশিকা ২৬৭-২৭৯
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ: লোকসভা ও বিধানসভায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভূমিকা ২৮০-৩৫৭
  - মূল্যায়ন ৩৪১-৩৪৭
  - নির্দেশিকা ৩৪৮-৩৫৭
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ: পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণ ৩৫৮-৪১৪
  - পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের প্রাথমিক পর্যায় ৩৬০-৩৭৭
  - উপরিউক্ত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত গুলোর আলোচনা থেকে পঞ্চায়েত সদস্যদের শ্রেণী ও শিক্ষা ৩৭৭-৩৮০
  - এবারে আমরা কাজের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র দলিত জাতি সহ নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী পুরুষের ক্ষমতায়ন, ১৯৯৮ ৩৮০-৩৮১
  - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির সদস্য/সদস্যাদের শ্রেণী ও শিক্ষা ৩৮২-৩৮৪
  - নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ত্রি-পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যাদের যোগ্যতার প্রশ্ন ৩৮৪-৩৮৮
  - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির নারী - পুরুষ প্রধান এবং উপপ্রধানদের দক্ষতার প্রশ্ন ৩৮৮-৩৯১
  - নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী পুরুষ পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের উচ্চস্তরে অংশগ্রহণ ৩৯১-৪০৫
  - মূল্যায়ন ৪০৫-৪০৯
  - নির্দেশিকা ৪০৯-৪১৪
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের ভূমিকা ৪১৫-৪৮৭
  - মূল্যায়ন ও তাৎপর্য ৪৭১-৪৭৮
  - নির্দেশিকা ৪৭৮-৪৮৭
- উপসংহার ৪৮৮-৫১৯
  - নির্দেশিকা ৫১৫-৫১৯
- গ্রন্থপঞ্জি ৫২০-৫৩৩

সারণি তালিকা

- সারণি ২.১: ১৯৫২ সালের লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জনপ্রতিনিধি
- সারণি ২.২: ১৯৫২ সালের বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জনপ্রতিনিধি
- সারণি ৩.১: ১৯৬১-২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের উপরিউক্ত চারটি দলিত জাতির জনসংখ্যা
- সারণি ৩.২: পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগদি এবং পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়ের ১৯৬১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ সালের স্বাক্ষরতার শতাংশ
- সারণি ৩.৩: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগদি এবং পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জাতির তুলনামূলক সাক্ষরতার হার (শতাংশ): ২০০১, ২০১১
- সারণি ৩.৪: পশ্চিমবঙ্গের উক্ত চারটি জাতি শতাংশ হিসাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, ২০১১
- সারণি ৩.৫: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১১. নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৪. জয়নগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৫. মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৮: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১২. নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৫. জয়নগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৬. মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১২. নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১২: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৫ জয়নগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৬ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২ নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ জয়নগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৬ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২ নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ জয়নগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৬ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

- সারণি ৩.২০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২ নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.২১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ জয়নগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.২২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৬ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.২৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২ নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.২৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ জয়নগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.২৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৬ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.২৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩ রাণাঘাট (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.২৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪ বনগাঁ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.২৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৯ জয়নগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.২৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ২০ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৩০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩ রাণাঘাট (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৩২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৯ জয়নগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৩৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ২০ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৩৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৬৭ নাকাশিপাড়া (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৩৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭২ হাঁসখালি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৩৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৫ রাণাঘাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৩৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৮ বাগদা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৩৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৩ রাজারহাট (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৩৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯০ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৪০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯১ গোসাবা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৪১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৩ হারোয়া (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৪২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৫ ক্যানিং (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৪৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৬ কুলতলি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৪৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ বারুইপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৪৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৯ সোনারপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৪৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৮ বিষ্ণুপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৪৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১১ মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৪৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১৩ কুলপি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৪৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১৪ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৫০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৬৭ নাকাশিপাড়া (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৫১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭২ হাঁসখালি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৫২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৫ রাণাঘাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৫৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৮ বাগদা (তপসিলি জাতি)

- সারণি ৩.৫৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৩ রাজারহাট (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৫৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯০ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৫৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯১ গোসাবা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৫৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৩ হারোয়া (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৫৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৫ ক্যানিং (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৫৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৬ কুলতলি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ বারুইপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৯ সোনারপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৮ বিষ্ণুপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১১ মগরাহাট (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১৩ কুলপি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১৪ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৪ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৯ হাসখালি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮০ রাণাঘাট পূর্ব (তপসিলি জাতি)
- সারণি ৩.৬৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৪ বাগদা (তপসিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯১ রাজারহাট (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৭ হারোয়া (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ সন্দেশখালি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৯ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০০ গোসাবা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০১ বাসন্তি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০২ কুলতলি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৫ ক্যানিং পশ্চিম (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৯ সোনারপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৭৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১০ বিষ্ণুপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৮০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২১ মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৮১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২২ মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৮২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৪ কুলপি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৮৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৪ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৮৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৯ হাঁসখালি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৮৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮০ রাণাঘাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৮৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৪ বাগদা (তপশিলি জাতি)

- সারণি ৩.৮৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯১ রাজারহাট (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৮৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৭ হারোয়া (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৮৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৪ সন্দেশখালি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৯ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০০ গোসাবা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০১ বাসন্তী (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০২ কুলতলি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৫ ক্যানিং (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৯ সোনারপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১০ বিষ্ণুপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২১ মগরাহাট (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২২ মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.৯৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৪ কুলপি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৪ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৯ হাঁসখালি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮০ রাণাঘাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৪ বাগদা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯১ রাজারহাট (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৭ হারোয়া (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ সন্দেশখালি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৯ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০০ গোসাবা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১০৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০১ বাসন্তী (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০২ কুলতলি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৫ ক্যানিং পশ্চিম (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৯ সোনারপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১০ বিষ্ণুপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২১ মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২২ মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৪ কুলপি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৮ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৯ রাণাঘাট উত্তর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১১৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯০ রাণাঘাট দক্ষিণ (তপশিলি জাতি)

- সারণি ৩.১২০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯২ কল্যাণী (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১২১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৩ হরিণঘাটা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১২২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৪ বাগদা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১২৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৫ বনগাঁ উত্তর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১২৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৬ বনগাঁ দক্ষিণ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১২৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৭ গাইঘাটা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১২৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ স্বরূপনগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১২৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২২ মিনাখাঁ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১২৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৬ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১২৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৭ গোসাবা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৮ বাসন্তী (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৯ কুলতলি (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৫ মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৬ জয়নগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৭ বারুইপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪১ মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪৬ বিষ্ণুপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৮ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৩৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৯ রাণাঘাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯০ রাণাঘাট দক্ষিণ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯২ কল্যাণী (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৩ হরিঘাটা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৪ বাগদা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৫ বনগাঁ উত্তর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৬ বনগাঁ দক্ষিণ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৭ গাইঘাটা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ স্বরূপনগর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২২ মিনাখাঁ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৪৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৬ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৫০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৭ গোসাবা (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৫১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৮ বাসন্তী (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৫২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৯ কুলতলি (তপশিলি জাতি)

- সারণি ৩.১৫৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৫ মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৫৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৬ জয়নর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৫৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৭ বারুইপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৫৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৫৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪১ মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৩.১৫৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪৬ বিষ্ণুপুর (তপশিলি জাতি)
- সারণি ৪.১: ১৯৭১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২: ১৯৭৭ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৩: ১৯৮০ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৪: ১৯৮৪ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৫: ১৯৮৯ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৬: ১৯৯১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৭: ১৯৯৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৮: ১৯৯৮ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৯: ১৯৯৯ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.১০: ২০০৪ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.১১: ২০০৯ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.১২: ২০১৪ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.১৩: ১৯৭১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

- সারণি ৪.১৪: ১৯৭১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.১৫: ১৯৭২ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.১৬: ১৯৭২ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.১৭: ১৯৭৭ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.১৮: ১৯৭৭ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.১৯: ১৯৮২ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২০: ১৯৮২ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২১: ১৯৮৭ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২২: ১৯৮৭ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২৩: ১৯৯১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২৪: ১৯৯১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২৫: ১৯৯৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২৬: ১৯৯৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২৭: ২০০১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২৮: ২০০১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.২৯: ২০০৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

- সারণি ৪.৩০: ২০০৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৩১: ২০১১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৩২: ২০১১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৩৩: ২০১৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৪.৩৪: ২০১৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম
- সারণি ৫.১: নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের নাম ও জাতি
- সারণি ৫.২: বেতাই ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত
- সারণি ৫.৩: বেতাই ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানের নামের তালিকা ও জাতি
- সারণি ৫.৪: বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৯৭৮, ১৯৯২ ও ২০১৩ সাল
- সারণি ৫.৫: ইছাপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের নাম ও জাতি
- সারণি ৫.৬: ইছাপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের নাম ও জাতি, এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি ১৯৯৩ সালের ৫ই জানুয়ারী উদ্বোধন হয়। কাজেই ১৯৭৮ সালের প্রধানের নাম ও জাতি উল্লেখ নেই
- সারণি ৫.৭: শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
- সারণি ৫.৮: চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
- সারণি ৫.৯: সোনারপুর - ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত
- সারণি ৫.১০: কালিকাপুর - ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত
- সারণি ৫.১১: মাতলা - ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত
- সারণি ৫.১২: ধণপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত
- সারণি ৫.১৩: বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
- সারণি ৫.১৪: ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে সাধারণ নারী-পুরুষ ও তপশিলি জাতি/উপজাতি নারী-পুরুষ সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত আসন বন্টনের অবস্থান
- সারণি ৫.১৫: ৩টি জেলার (উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়া) গ্রাম পঞ্চায়েতে নারী-পুরুষ সদস্য, ১৯৯৩*

- **সারণি ৫.১৬: ১৯৯৮** সালের নির্বাচনে পঞ্চায়েতের ৩টি স্তরে সাধারণ জাতি সহ দলিত নারী-পুরুষ প্রতিনিধিত্ব
- **সারণি ৫.১৭:** নদীয়া জেলাপরিষদে ২০১৩ সালের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত সদস্যদের নাম
- **সারণি ৫.১৮:** উত্তর ২৪ **পরগনা** জেলাপরিষদে ২০১৩ সালের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত সদস্যদের নাম
- **সারণি ৫.১৯:** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাপরিষদে ২০১৩ সালের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত সদস্যদের নাম
- **সারণি ৫.২০:** জয়ী রাজনৈতিক দলের আসন সংখ্যা ২০১৩
- **সারণি ৫.২১:** ৫ টি পঞ্চায়েত সমিতির গ্রাম পঞ্চায়েতের নারী – পুরুষ সদস্য এবং দলিত ও আদিবাসী নারীর সংখ্যা ২০১৩
- **সারণি ৫.২২:** ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নারী ও পুরুষের ত্রিস্তরে সংরক্ষণ চিত্র

শব্দ সংক্ষেপ

ABSCF (এ.বি.এস.এফ)	:	All Bengal Schedule Caste Fedaration
AITMC (এ.আই.টি.এম.সি)	:	All India Trinamool Congress
AISCF (এ.আই.এস.সি)	:	All Bengal Schedule Caste Fedaration
BBC (বি.বি.সি)	:	Biplabi Bangla Congress
B. CONG (বি.সি)	:	Bangla Congress
BJP (বি.জে.পি)	:	Bharatiya Janata Party
BLA (বি.এল.এ)	:	Bengal Legislative Assembly
BSCP (বি.এস.সি.পি)	:	Bengal Scheduled Caste Party
BSP (বি.এস.পি)	:	Bahujan Samaj Party
INC (আই.এন.সি)	:	Indian National Congress
INC (O) (আই.এন.সি (ও))	:	Indian National Congress (Organisation)
INC (R) (আই.এন.সি (র))	:	Indian National Congress (Ruling)
INC(I) (আই.এন.সি (আই))	:	Indian National Congress (Indra)
CPI (সি.পি.আই)	:	Communist Party India
CPI (M) (সি.পি.আই (এম))	:	Communist Party India (Marxist)
CRD (সি.আর.ডি)	:	Committee of Racial Discrimination
FB (এফ.বি)	:	Forward Block
HM (এইচ. এম)	:	Hindu Mahasabha
IND (স্বাধীন)	:	Independent
ISCP (আই.এস.সি.পি)	:	International Scheduled Caste Party
JS (জে.এস)	:	Jana Sangha
KMCP (কে.এম. সি.পি)	:	Krishak Mazdoor Caste Party
KPP (কে.পি.পি)	:	Krishak Praja Party
LD (এল.ডি)	:	Lok Dal

LF (এল.এফ)	:	Left Front
MFB (এম.এফ.বি)	:	Marxist Forward Block
ML (এম.এল)	:	All India Muslim League
MLA (এম.এল.এ)	:	Member of Legislative Assembly
MLC (এম.এল.সি)	:	Member of Legislative Council
PBBS (পি.বি.বি.এস)	:	Purba Bharat Bastuhara Samsad
PSP (আর.এস.পি)	:	Praja Socialist Party
PULF (পি.ইউ.এল.এফ)	:	Peoples' United Left Front
RCPI (আর.সি.পি.আই)	:	Revolutionary Communist Party of India
RSP (আর.এস.পি)	:	Revolutionary Socialist Party
SBBS (এস.বি.বি.এস)	:	Sara Bnga Bastuhara Samity
SC (এস.সি)	:	Scheduled Caste
SSP (এস.এস.পি)	:	Somyukta Socialist Party
ST (এস.টি)	:	Scheduled Tribe
UCRC (ইউ.সি.আর.সি)	:	United Central Refugee Council
SUCI (এস.ইউ.সি.আই)	:	Socialist Unity Centre of India
UF (ইউ.এফ)	:	United Front
ULF (ইউ .এল.এফ)	:	United Left Front
VHP (ভি. এইচ. পি)	:	Visha Hindu Parshad

পারিভাষিক শব্দাবলি

অন্ত্যজ	:	সামাজিক ভাবে ভারতীয় সমাজে জাতি যাদের অস্পৃশ্য, অধম সংকর, ইত্যাদি নামেও চিহ্নিত করা হয়।
আদমশুমারি	:	জনগণনা বা লোকগণনা।
জমিদার	:	জমির মালিক বা ভূস্বামী।
জাতিভিত্তিক রাজনীতি	:	জাতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মকান্ড।
জোতদার	:	কৃশিজমির মালিক বা সম্পন্ন স্বাধীন কৃষক।
তপশিলি জাতি	:	১৯৩৬ সালে The Government of India (Scheduled Caste) Order 1936 অনুযায়ী গৃহীত ও পরবর্তীকালে সংশোধিত বিভিন্ন আইন ও অধিনিয়ম অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কতগুলো জাতি যাদেরকে তপশিলি জাতি (তপশিলি জাতি/তপসিলি জাতি) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।
তপশিলি উপজাতি	:	আদিবাসী।
নমঃশূদ্র	:	বাংলার একটি তপশিলি জাতি (দলিত জাতি)।
চাঁড়াল	:	নমঃশূদ্র জাতিকে হীন জাতি হিসাবে ধরা হত।
চন্ডাল	:	নমঃশূদ্র জাতির প্রথম আদমশুমারিতে উল্লেখ করা হয়েছি।
নিম্নবর্ণীয়	:	ঔপনিবেশিক ভারত সরকার চিহ্নিত অবনমিত জাতি (Depressed Caste) যারা পরবর্তীকালে তপশিলি জাতি, হরিজন, দলিত জাতি নামে চিহ্নিত হয়েছে।
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	:	বাংলার একটি তপশিলি জাতি (দলিত জাতি)।
পৌণ্ড্র	:	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতিকেই বোঝাই।
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসঙ্ঘ	:	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সামাজিক আন্দোলনের একটি সংগঠন।
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন	:	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সাংস্কৃতি ও সামাজিক

পরিষদ		আন্দোলনের একটি সংগঠন।
পোদ	:	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতিকেই বোঝাই।
বর্গাদার	:	ভাগচাষি।
বাগদি	:	বাংলার একটি তপশিলি জাতি (দলিত জাতি)।
মালো	:	বাংলার একটি তপশিলি জাতি (দলিত জাতি)।
মূলনিবাসী	:	ভূমিপুত্র।
মতুয়া মহাসংঘ	:	নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলনের একটি সংগঠন।
সংঘাদিপতি	:	মতুয়া মহাসংঘের প্রধান ঠাকুর / সংঘজননী।
রাজবংশী	:	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সামাজিক আন্দোলনের একটি সংগঠন।
শুঁড়ি	:	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সামাজিক আন্দোলনের একটি সংগঠন।
কোণার	:	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সামাজিক আন্দোলনের একটি সংগঠন।
সত্যাগ্রহ	:	সত্য ও অধিকার রক্ষার দৃঢ় সংকল্প।
সাংস্কৃতিয়াজেশন	:	সংস্কার প্রক্রিয়া, তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়দের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের থেকে সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করার প্রক্রিয়া।

ভূমিকা

ভূমিকা

ভারতীয় সংবিধানের ৩২৬ নং ধারা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত আছে।[১] ধর্ম, ভাষা, জাতি, জন্মস্থান নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ নির্বাচনে ভোট দান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকারী। আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে বলা হয় জনগণের শাসন। জনগণ তো আর প্রত্যক্ষভাবে শাসন করে না, তাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা শাসন করেন। ভারতীয় গণতন্ত্রে সাংবিধানিক সংরক্ষণের ফলে দলিত জাতির জন্যে কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিত্ব করার জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। সংরক্ষিত আসন থেকে যেসকল জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাঁরা শাসন কার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন। সুতরাং দলিত ভোটদাতাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ভূমিকার বহিঃপ্রকাশ কতটা আছে, তা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। এ প্রশ্নকে সামনে রেখেই বিশেষ করে আমাদের গবেষণার বিষয় হিসাবে ধরা হয়েছে। আমাদের দেশের সাংবিধানিক আইনসভায় মতামত দেওয়ার অধিকারী হতে হলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যে দলিতজাতি তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করে, আইনসভায় নিজজাতির উন্নয়নের পক্ষে সওয়াল হতে পারেন, তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং এদেশে সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য রূপে চিহ্নিত মানুষের, আইনি-সাংবিধানিক ভাষায় তপশিলি জাতিভুক্ত হওয়ার থেকে ‘দলিত’ পরিচিতিতে সংগঠিত হওয়ার একটা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। এক্ষেত্রে তপসিলি জাতিকেই ১৯৭০-এর দশকে আম্বেদকরপন্থীরা মহারাষ্ট্রে দলিত প্যান্থার সাহিত্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সারা ভারতে দলিত নামে পরিচিতি পায়। ‘দলিত’ রূপে পরিচিতি, ‘দলিত’-দের সমস্যা ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের দাবি হিসাবে উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাতি-বর্ণ চেতনা ভারতীয় রাজনীতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে; তবে গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক পরিকাঠামোর অভ্যন্তরে সেই রাজনীতিতে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় - দলিত জাতিসমূহের ক্ষমতায়ন ও সম্মানের জন্যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার লড়াই। যেমন পশ্চিমবঙ্গে মতুয়া আন্দোলনের মর্যাদা ও আত্মশক্তিই নমঃশূদ্রদের সংগঠিত হওয়ার প্রেরণার মধ্য দিয়ে দলিত চেতনাজাত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে লোকসভা ও বিধানসভায় নিজ জাতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখতে কতটা অনুপ্রাণিত করে, সেটাও তুলে ধরা হয়েছে। আবার পৌণ্ড্র

মহাসংঘের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে যেমন শিক্ষাদীক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি আবার সামাজিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা রাজনৈতিক সচেতনতাও আমাদের গবেষণায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যেও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখতে কতটা অনুপ্রাণিত করে, সেটাও আমরা গবেষণায় আলোকপাত করেছি। ১৯৯০ এর দশকে 'বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দলিতদের দৈনন্দিন সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ যেমন উঠে এসেছে, তেমনি সাহিত্যে 'স্বাধীনতা, সমতা ও সৌভ্রাত্বে'র মানদণ্ডের বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির একাধিক লেখক তাঁদের নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বঞ্চনা, ঘৃণা ও অমর্যাদার কথাগুলি বিভিন্ন আত্মচরিতমূলক গ্রন্থে, উপন্যাসে, সাহিত্যে, আলোকপাত করেছেন,[২] যা আমাদের গবেষণা পত্রের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উক্ত দলিতজাতি দু'টি কি শুধু ভোটদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, নাকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারেন? আবার ভারতীয় রাজনীতিতে দলিত জাতির নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাংবিধানিক সংরক্ষণের পটভূমিতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক চেতনায়, দলিত জাতির দু'টির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াটা কি নিজ নিজ জাতির উন্নতির প্রেক্ষাপটে লোকসভা ও বিধানসভায় ভূমিকা রাখতে পেরেছে? ভারতীয় দলিতজাতির সকল জাতিরই রাজনৈতিক সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও কি নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সমসংখ্যক ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা রাখতে পেরেছে? এই প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার জন্যই, আমরা আমাদের গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের দু'টি দলিত জাতি – 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' ও 'নমঃশূদ্রর' রাজনৈতিক অংশগ্রহণের তুলনামূলক পর্যালোচনা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত) করা হয়েছে।

গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা

সারা ভারতেই সব ধরনের দলিতজাতির উপর ঐতিহাসিক দমন, পীড়ন ও শোষণের ইতিহাস যুগযুগ ধরে আবর্তিত হয়ে চলেছে। অতএব, দেশের যেকোন রাজ্যে বা অঞ্চলে সেই সর্বভারতীয় পরিস্থিতির কমবেশি প্রকাশ ঘটেছে তাই, এই সত্যকে বাদ দিয়ে, শুধুমাত্র কোনো বিশেষ অঞ্চলের দলিতদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে গবেষণা সম্ভব নয়। আমাদের গবেষণা সেই বৃহত্তর সর্বভারতীয়

আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই করা হয়েছে। কিন্তু, তথাপি নিবিড় গবেষণার স্বার্থে আমরা আমাদের গবেষণা মূলত পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেছি, নিবিড়ভাবে গবেষণা করে, তা আমরা বৃহৎতর ভারতীয় রাজনৈতিক আঙ্গিনায় গবেষণার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক জাতিগত রাজনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে। আর পশ্চিমবঙ্গ ধরেছি এই কারণে যে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই এদের অধিক সংখ্যক মানুষের বসবাস, আবার পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এদের বসবাস সর্বাধিক। এই কারণে উক্ত জেলা তিনটি ধরেছি এবং জেলা তিনটির কিছু সংখ্যক ক্ষেত্র'সমীক্ষার ক্ষেত্র হল কলকাতা মহানগরের একান্ত সংলগ্ন, আবার বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষেত্র'সমীক্ষার ক্ষেত্র বেশ দূরে অবস্থান হওয়ার দরুন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের পক্ষে কতটা উন্নতি বা অবনতি হয়েছে, তা, অনুসন্ধান করে এবং জাতি দু'টির অংশগ্রহণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ আকারে লিপিবদ্ধ করেছি। এই তিনটি জেলায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রর সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এই সংখ্যাধিক্য হওয়ার কারণ হল, নমঃশূদ্ররা মূলত দেশ ভাগের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে নদীয়া ও অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় বসতি স্থাপন করেছে। বর্তমানে এদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও নদীয়াতে। আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মূলত পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসী ও কিছু সংখ্যক দেশভাগের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় বসতি স্থাপন করেছে এবং বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতেই এদের সংখ্যাধিক্য। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংশ্লিষ্ট তুলনামূলক পর্যালোচনার উপর গবেষণামূলক কাজের সংখ্যা অতি নগণ্য। সেদিকে লক্ষ রেখেই গবেষণাটি করা হয়েছে, কাজেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা ধারনা আমরা অর্জন করতে পেরেছি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে দলিত জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও অবদমিত অবস্থান সর্বজনবিদিত। এ বিষয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সব রাজ্যে দলিতদের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান ও অংশগ্রহণের ইতিহাস এক রকম নয়। রাজ্যস্তরে বিশেষত জেলাস্তরে এ বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং গবেষণার সংখ্যা তুলনাক্রমে কম। তাছাড়া দলিতদের মধ্যেও সর্বত্র বিভিন্ন

উচ্চ-নীচ জাতিস্তর বিদ্যমান। এই কারণেই বিভিন্ন দলিত জাতির ভিন্ন অবস্থান ও ভিন্ন স্বার্থের কারণেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানেও দৃষ্টিভঙ্গীগত, আচরণগত পার্থক্য বিদ্যমান। উক্ত বিভেদ ও উন্নয়নের অসম বিকাশের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অবস্থানটাও বেশ সহজেই আমাদের চোখে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতেই জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক সংরক্ষণেও দলিতদের মধ্যে বিতর্ক, জাতিগত এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করতে পেরেছি এবং তা আমরা আমাদের গবেষণায় কমবেশি লিপিবদ্ধ করেছি। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র দলিতজাতি দু'টির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষত রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে উক্ত দলিত জাতি দু'টির সামাজিক অবস্থান, তাদের উচ্চ-নীচ্চ বিভেদ, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক মেরুকরণ ও পৃথক অবস্থানের যেসকল তারতম্য আমরা পেয়েছি, সেগুলো আমাদের গবেষণায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় জাতি-ভিত্তিক ভেদাভেদের প্রেক্ষাপটটি কি, রাজনৈতিক নাকি হিন্দু সমাজের রীতি-নীতির ধর্মীয় বিধান, নাকি কর্মনিযুক্ততার উপর ভিত্তি করে প্রোথিত ও গ্রোথিত - এই আলোচনার লক্ষ্যে সেই সত্যের অনুসন্ধান করে সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছি। এছাড়াও তাঁদের জাতিগত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সমস্যা সমূহের একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা আমরা করেছি।

সাহিত্য পর্যালোচনা

আমাদের গবেষণার বিষয়টির উপর এ পর্যন্ত প্রামাণ্য গবেষণা দুর্লভ। আলাদা-আলাদাভাবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ আছে। আরও কিছু গ্রন্থ আছে যেগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের অন্যান্য দলিতদের সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা নমঃশূদ্রদের নিয়েও কমবেশি আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকে নিয়ে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরাও নিজ নিজ জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন। আমাদের গবেষণায় সর্বভারতীয় স্তরের রাজনৈতিক অংশগ্রহনের উপর যাঁরা ক্ষেত্র'সমীক্ষা করেছেন এবং জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর কাজ করেছেন, সেই সমস্ত কাজের কয়েকটি গ্রন্থকেও পর্যালোচনা করা হবে। এবারে আমরা নিম্ন কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব।

'Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Protest and Identity in Colonial India The Namasudras of Bengal', 1872-1947, Second Edition* (With a new Postscript) Oxford University Press, London, 2011:[৩] অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের সময় সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় বার প্রকাশ করার সময় লেখক আরেকটি অধ্যায় সংযুক্ত করেন। এই গ্রন্থটি নমঃশূদ্র জাতির আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি সংক্রান্ত এবং এখানে মতুয়াদের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটেও আলোচনা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নমঃশূদ্র তথা মতুয়া সমর্থন পাওয়াটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উপরি উক্ত গ্রন্থ পর্যালোচনায় আমরা নমঃশূদ্র জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারলাম। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক আন্দোলনের পটভূমিও জানা গেল। কিন্তু এই গ্রন্থ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনার উল্লেখ আমরা পেলাম না।

ডঃ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, 'বঙ্গ মূলনিবাসী একটি জনগোষ্ঠী', বঙ্গ পাঠক প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫:[৪] এই পুস্তকে গবেষক দ্বাদশ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট করে নমঃশূদ্র জাতিকে বঙ্গের মূলনিবাসী ও বঙ্গ নামে অভিহিত করেছেন।

উপরি উক্ত পুস্তক পর্যালোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, বর্তমানে যাঁরা নমঃশূদ্র নামে পরিচিত তাঁদেরকেই তিনি বঙ্গজাতি বলে মনে করেন। এখন প্রশ্ন হল যে, জাতির নামের পরিবর্তনেই কি তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। এই গ্রন্থ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনার উল্লেখ আমরা পেলাম না। প্রসঙ্গক্রমে, আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে উক্ত পুস্তকটি আংশিক প্রয়োজন হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

Debi Chatterjee, '*Dalit rights/Human rights'*, Rawat Publications, New Delhi, 2011:[৫] গ্রন্থটিতে দলিতদের অধিকার ও মানবাধিকার সহ বিশ্বায়িত সমাজের প্রেক্ষাপটে ভারতের দলিত শিশু ও মহিলাদের শ্রম অধিকার নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।

Rajni Kothari (edited), 'Caste in Indian Politics', (First published by Orient Longman Pvt. Ltd. 1970) Orient Blackswan impression, New Delhi, 2010:[৬] গ্রন্থটিতে লেখকেরা ভারতের রাজনীতিতে

জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন। যেমন সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত হওয়ার কারণ নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে মাহারদের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করা হয়েছে। গুজরাটে ক্ষত্রিয়রা রাজনৈতিক স্বার্থেই কীভাবে সংঘবদ্ধ হল তারও উল্লেখ করা হয়েছে। আদিম নাদাররা কীভাবে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করল সে সম্পর্কিত আলোচিত হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে দুটি প্রভাবশালী জাতির দলাদলি এবং রাজস্থানের জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলাদলি ও বিহারের রাজনৈতিক সদস্য পদ লাভের ক্ষেত্রেও জাতি-ভিত্তিক মানদণ্ডের নিয়ামক নিয়ে গ্রন্থটি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Suhas Palshikar, K.C. Suri, Yogendra Yadav (edited), Party Competition in Indian States, “Electoral Politics in Post-Congress Polity” Oxford University Press, New Delhi, 2014:[৭] এই সম্পাদিত গ্রন্থটিতে লেখকেরা ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভা ও বহুসংখ্যক অঙ্গরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে কংগ্রেসের রাজনৈতিক পালাবদলের পরবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ভারতীয় জনতা দল ও আঞ্চলিক দলের নির্বাচনী ভূমিকা নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক নৈপুণ্যতা কীভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের নির্বাচনী স্থায়িত্ব শায়িত অবস্থা থেকে পছন্দের উন্নয়নেও উভয়সঙ্কট সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। এবং উত্তরপ্রদেশে জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক সমর্থনেও ভাটা পড়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ১৯৯৯-২০০৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের উত্থান ও পতনের কারণ নিয়েও আলোচনা করেছেন।

Rajni Kothari, ‘Politics in India’, (First published by Orient Longman Pvt. Ltd. 1972) Orient Blackswan impression, New Delhi, 2013:[৮] গ্রন্থটিতে গবেষক ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উন্নয়নের সূত্র হিসাবে তুলে ধরেছেন, হিন্দু সমাজের নিয়মনীতি এবং মুসলিমদের প্রভাব ও ব্রিটিশ প্রভাবের ফলে কিভাবে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা সমস্যা সৃষ্টি করেছিল; এছাড়াও আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই যে রাজনৈতিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ ও আমলাতন্ত্রকে সঠিক

গণতান্ত্রিক পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব; ভারতীয় রাজনৈতিক গণতন্ত্রে জোটসরকার গঠনের প্রেক্ষাপটে তথাকথিত ক্ষমতাসীন দলকে, জাতি-ভিত্তিক সমাজের শর্তাবলীকে ও রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশের এবং জাতীয় সংহতি, রাজনৈতিক অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশের উপর, লক্ষ রাখতে হয় বলে উল্লেখ করেছেন।

Ganapathi, Palanithurai, 'Dalit and Dalit Representative in Rural Local Governance Voices from the Field', Concept Publishing Company PVT., LTD. New Delhi, 2013:[৯] গ্রন্থটিতে লেখক প্রথমেই তামিলনাড়ুর জেলাস্তেরে শাসনতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ও জাতি পঞ্চায়েতে দলিতদের বৈষম্যমূলক অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দলিত জাতির ভূমির মালিকানা অধিকার ও দলিত মহিলারা কীভাবে বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং নির্বাচিত দলিত জনপ্রতিনিধিরা কীভাবে তাদের পঞ্চায়েতে অসুবিধার সম্মুখীন হন, সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক দলিত জাতির গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও যে সমস্ত দলিতজাতি ভূমির মালিকানা না পাওয়ার জন্যে যেধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হন, তা যে শালিসিসভায় তাদের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রতিবিধানের দাবি তোলাকেও তুলে ধরেছেন।

মহেন্দ্রনাথ করণ, 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ', ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল কর্তৃক পুনর্মূদ্রণ, তেঁতুলবেড়িয়া, কলকাতা, ২০০১:[১০] লেখক গ্রন্থটিকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই পুস্তকে লেখক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক পদমর্যাদার কথাই বারংবার উল্লেখ করে তাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির সমকক্ষ বলে প্রতিপন্ন করেছেন, যা বাস্তবে হিন্দু সমাজে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা যথেষ্ট কঠিন। যদিও বংশানুক্রমিক সামাজিক উচ্চ-নীচ জাতি বিচারের থেকেও এই সময় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং কাজের ক্ষেত্রে জাতের স্বীকৃতি ও অবস্থানকে অধিক সম্মান দেয়। এই গ্রন্থ থেকে নমঃশূদ্রদের সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনার উল্লেখ আমরা পেলাম না।

ধূর্জটি নস্কর, 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলতিলক', চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৯৬:[১১] এই গ্রন্থটিতে লেখক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিশিষ্ট রাজনৈতিক ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আলোচনা করেছেন।

নরেশচন্দ্র দাস, 'নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ', দীপালি বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৯৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ):[১২] গ্রন্থটিতে নমঃশূদ্র জাতির উৎপত্তির ইতিহাস, পদবী ও ধর্মীয় মনোভাব এবং সামাজিক শিক্ষামূলক ও রাজনৈতিক জাগরণ নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও, বর্তমানে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতির অবস্থান খানিকটা পর্যালোচিত হয়েছে।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, (যুগ্ম সম্পাদনা) 'জাতি, বর্ণ, বাঙালী সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮:[১৩] গ্রন্থটিতে বিভিন্ন গবেষক বাংলার জাতির উৎপত্তি ও তাদের আন্দোলন নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। বিশেষত, নমঃশূদ্র, রাজবংশী এবং অন্যান্য দলিতজাতির সমাজের জাতিভেদ নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর', বিশ্বাস পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯:[১৪] গ্রন্থটিতে আম্বেদকর ও বাংলার নমঃশূদ্র জাতির নেতা যোগেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ করেছেন লেখক। এছাড়াও বাংলার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটি নিয়েও লেখক আলোচনা করেছেন।

জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, 'মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুঃ কারা এবং কেন?' বঙ্গদর্শন প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫:[১৫] গ্রন্থটিতে সংবাদপত্রের ও ক্ষেত্র সমীক্ষার সহযোগিতায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ৭০-এর দশকে নিম্নজাতির উদ্বাস্তুদের অধিকার প্রদানে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কী কী ভূমিকা পালন করেছে, এই সম্পর্কে লেখক মতামত ব্যক্ত করেছেন।

রণজিত কুমার সিকদার, 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ', ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭:[১৬] উক্ত গ্রন্থটিতে লেখক বঙ্গদেশের তপসিলি নেতা তথা নমঃশূদ্র জাতির অন্যতম নেতা-র রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রণজিত কুমার সিকদার, 'বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা ডঃ আম্বেদকর', ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬:[১৭] লেখক আম্বেদকরের জীবনী ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে তুলে ধরেছেন। আবার এরই সাথে সাথে তিনি বঙ্গদেশের নমঃশূদ্র জাতির নেতাদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন।

প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, 'আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি', বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুর নগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৫:[১৮] গ্রন্থটিতে নমঃশূদ্র জাতির মতুয়া ধর্মীয় মতামত স্থাপনকারী বংশের পরম্পরা সম্পর্ক নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

নরোত্তম হালদার, 'গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ', চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০০:[১৯] বাংলার জাতি ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করার প্রসঙ্গে লেখক তপসিলি জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দিকও তুলে ধরেছেন।

নরোত্তম হালদার, 'গঙ্গারিডি ও অন্যান্য প্রবন্ধ', দক্ষিণায়ন, কলকাতা, ২০০৬:[২০] এই গ্রন্থে লেখক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির আর্থসামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দেবী চ্যাটার্জী, 'পতিত', ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০২:[২১] গ্রন্থটিতে ভারতের সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় মতাদর্শ এবং সমাজ সংস্কারকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র-মনীষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ , কলকাতা, ২০১৩:[২২] এই গ্রন্থে সম্পাদক দুইজন পৌণ্ড্র-মনীষার দুটি গ্রন্থে আলোচিত রাজেন্দ্রনাথ সরকার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয় এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার, এর আর্থসামাজিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র-মনীষা' (তৃতীয় খণ্ড), পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১৪:[২৩] এই গ্রন্থে সম্পাদক পাঁচজন পৌণ্ড্র-মনীষার ছয়টি গ্রন্থের ও 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব' পত্রিকার নির্বাচিত অংশের সংকলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ, বৃত্তিবিচার ও নবজাগরণ নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র-মনীষা' (চতুর্থ খণ্ড), পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১৫:[২৪] এই গ্রন্থে সম্পাদক দুইজন পৌণ্ড্র-মনীষার দুটি গ্রন্থ এবং 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' ও 'সমাজ-দর্শন' পত্রিকার, আর্থসামাজিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, 'মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ', ঊষা প্রেস, কলকাতা, ২০০২:[২৫] গ্রন্থটিতে দলিত আন্দোলন ও মতুয়া ধর্মান্দোলন এবং মতুয়াদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনা সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে।

মহানন্দ হালদার, 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত', শ্রী কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, সংঘাধিপতি মতুয়া মহাসংঘ কর্তৃক সর্ব্বসত্ত সংরক্ষিত ও প্রকাশিত, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১২:[২৬] গ্রন্থটিতে নমঃশূদ্র জাতির শিক্ষা অর্জন ও কর্মের পথ এবং দলিত জাতির মুক্তির নানান পথ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

গবেষণার শূন্যতা

উপরিউক্ত পুস্তকগুলি থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্যগুলি পেলাম তা থেকে আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় নি। আবার উক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে সবগুলিই গবেষণা প্রণীত পুস্তক নয়। এই গ্রন্থগুলির সবক্ষেত্রে মৌলিক উৎস, ক্ষেত্র'সমীক্ষা প্রভৃতি গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয় নি বলেও আমরা দেখতে পেয়েছি। বিশেষত নমঃশূদ্র এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ভূমিকার তুলনামূলক পর্যালোচনা উপরিউক্ত পুস্তকগুলির একটির মধ্যেও নেই। আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলায় এই দুটি দলিত জাতির সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং তাদের জাতিগত সমস্যা সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই গবেষণার ফলে বিশেষত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক ও নীতি নির্ধারকগণও উপকৃত হবেন। কাজেই জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমাদের গবেষণাটি নতুনত্বের দাবিদার।

গবেষণার প্রশ্ন

আমাদের গবেষণায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছিঃ

রাজনৈতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রর সংসদীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে কোনো জাতি কেন অংশগ্রহণে এগিয়ে বা পিছিয়ে তার তাৎপর্য কী? এক্ষেত্রে আমরা লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণে জাতি দুটির তুলনামূলক তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা কী? এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করা হয়েছে। এবং উক্ত দলিত জাতি দুটির কোনো জাতি সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কোনো জাতির সংখ্যা অধিক এবং কোন জাতির সংখ্যা কম করেছে, তার তুলনামূলক অবস্থানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। আবার সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা যে যে নির্বাচন গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি,

সেগুলো হল, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০২, ২০১১, ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে দুই চব্বিশ পরগনাও নদীয়ার সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রতে এবং লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪ সালের। উক্ত সাল গুলো ধরার বেশ তাৎপর্য আছে। যেমন ১৯৭১ সালটা ধরার প্রধান কারণ হল, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণেই তাদের বহুসংখ্যক মানুষকে বাংলাদেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে বাধ্য হয়ে বসবাস করতে হয়, কাজেই এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা প্রায় সমান হয়ে যায় উক্ত জেলা তিনটিতে। এবং পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যদিও ১৯৭৮-২০১৬ সাল পর্যন্ত ধরা হয়েছে, তা সত্ত্বেও পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র অধ্যুষিত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচনী ক্ষেত্রতে যেসকল নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ কী কী কারণে তাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অনুসন্ধান করে গবেষণা পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

একটি জাতি অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ কেন করল, অন্য জাতিটি কেন করল না, তার উত্তর অনুসন্ধান করাও হয়েছে? এই অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে আমরা নমঃশূদ্রদের ১৯৭১ সালে ও ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা এবং ১৯৭১ সালে ও ২০১৪ সালের লোকসভায় আর পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালে ও ১৯৯৩ ও ২০১৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণে অনেক কমবেশি প্রার্থীদের অংশগ্রহণ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। উক্ত তিনটি স্তরের নির্বাচনের ১৯৭১ এর দশকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্ররা নির্বাচনীতে অংশগ্রহণের সংখ্যাটা অনেক কম আমরা দেখতে পেয়েছি। ১৯৯০ এর দশকের নির্বাচন গুলোতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের প্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় সমান সমান। আবার ২০১০ এর দশকের নির্বাচন গুলোতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্রদের নির্বাচনী প্রতিনিধির সংখ্যা বেশি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। উক্ত প্রশ্নের কারণ ও তাৎপর্য আমরা ব্যাখ্যা করে গবেষণা পত্রে লিপিবদ্ধ করেছি।

রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নাকি নমঃশূদ্র জাতি অধিক ভূমিকা রেখেছে, তাঁদের নিজ নিজ জাতির জন্যে তারও একটা তুলনামূলক আলোচনা আমাদের গবেষণায় করা হয়েছে? এপ্রসঙ্গে আমরা দেখতে পেয়েছি দেশভাগের নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অনেকটা পিছিয়ে ছিল। এর কারণ হল নমঃশূদ্ররা মতুয়া আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক, শিক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকার এবং চেতনাবোধে পৌণ্ড্রদের থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিল।

দেশভাগের ফলে নমঃশূদ্ররা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিঠিয়ে বসবাস ও বহুসংখ্যক নমঃশূদ্র বর্তমানের বাংলাদেশে থাকার কারণে ১৯৫০ এর দশক থেকে ১৯৮০ এর দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রদের থেকে পিছিয়ে। আবার ১৯৯০ এর দশক থেকে ২০১০ এর দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রদের থেকে নমঃশূদ্ররা এগিয়ে যায়। আমরা আমাদের গবেষণা পত্রে এর কারণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লিপিবদ্ধ করেছি।

গবেষণার পদ্ধতি

আমাদের গবেষণা মূলত ক্ষেত্র'সমীক্ষার নমুনার ভিত্তিতে করা হয়েছে। নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনাও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাএই তিনটি জেলাতে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র পদ্ধতিতে ক্ষেত্র'সমীক্ষা করা হয়েছে। এই ভাবেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের গবেষণা পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষেত্র'সমীক্ষায় কিছুসংখ্যক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের পদ্ধতিও অনুসরণ করেছি। তবে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ, গবেষণার পদ্ধতির বিন্যাস এবং প্রাথমিক তথ্যের (primary source) বিশ্লেষণের প্রয়োজনে মাধ্যমিক উৎসের (secondary source) তথ্যও ব্যবহার করা করেছি। এই দুই দলিতজাতি সম্বন্ধে এবং তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত সরকারি এবং বেসরকারি দলিল ও দস্তাবেজ এবং সাময়িক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা, জাতিগত প্রচার পুস্তিকা, ওয়েস্টবেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার, রাজ্য আর্কাইভ, নির্বাচন পরিষদের বিবরণ, লোকসভা এবং রাজ্যসভার বিতর্কের বিবরণী, ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত দলিত জাতির উপরে বার্ষিক মূল্যায়ন রিপোর্ট, তথা মণ্ডল কমিশন প্রভৃতির রিপোর্ট তথ্যের সূত্র হিসাবে আমরা আমাদের গবেষণা পত্রে অধিক ব্যবহার করেছি।

আমাদের গবেষণায় যে সমস্ত স্তরের নির্বাচন গুলিকে ধরেছি, সে গুলি হল লোকসভা, বিধানসভা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। এক্ষেত্রে আমাদের গবেষণায় জেলা তিনটির অন্তর্গত পৌরসভাগুলিকে ক্ষেত্র'সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর কারণ হল, উক্ত দুটি দলিতজাতির মানুষ পৌরসভার তুলনায় গ্রামে অধিক সংখ্যায় বসবাস করেন। কিন্তু বিধানসভার বিধায়কদের ও লোকসভা সাংসদদের ক্ষেত্র'সমীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে উপরি উক্ত তিনটি জেলাই ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকর আছে, তবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের

প্রত্যেকটি স্তরের সামগ্রিক ক্ষেত্র’সমীক্ষা করা হয়নি। এক্ষেত্রে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষেত্র’সমীক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যাধিক্য সেখান থেকে কিছু সংখ্যক জেলা পরিষদের সদস্যকে এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামপঞ্চায়েত নমুনা হিসাবে বেছে নিয়ে ক্ষেত্র’সমীক্ষা করা হয়েছে।

সময় ধরা হয়েছে, মূলত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। উক্ত সময়টা ধরার মূল উদ্দেশ্য হল, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির জনসংখ্যার একটা সমতা রাখা। নমঃশূদ্ররা মূলত দেশ ভাগের পরে বাংলাদেশে ১৯৬৪ সালের জাতি দাঙ্গা এবং খাদ্য সংকটের ফলে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার ফলেও নমঃশূদ্র বাংলাদেশে থাকতে না পেরে তাঁরা দলে দলে ভারতে চলে এসে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা তে বসতি স্থাপন করেন। নমঃশূদ্র শরণার্থীদের একটা প্রবাদ ছিল ‘মুজিবরের দিয়ে ভোট ট্রেল টোপলা নিয়ে ওঠ’ (মানে শরণার্থী হয়ে ভারতে চলো)। যেহেতু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মূলত পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসী, ফলে আমাদের দেশে ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে ১৯৭১ সালের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের সংখ্যা নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ বেশি ছিল। প্রসঙ্গত ১৯৭১ সালের নির্বাচনের সময় উক্ত দুইজাতির মানুষের সংখ্যা প্রায় সমান হয়ে যায়। এই জন্যেই আমরা আমাদের গবেষণায় ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ধরেছি। আর পঞ্চায়েত স্তরে সময়সীমা ধরা হয়েছে ১৯৭৮ সালের পর থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত। এর কারণ ১৯৭৩ সালের নতুন পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার দরুন, এই সময়টা ধরা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ বিন্যাস

আমরা আমাদের গবেষণা পত্রকে আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। ভূমিকাতে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার শূন্যতা, বিশেষ করে গবেষণা প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, পদ্ধতি ও প্রতি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা এবং জাতিভিত্তিক রাজনীতি ও দলিত শব্দের

উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্য থেকে মূলত ধর্মশাস্ত্র থেকে নেওয়া আহৃত তথ্য ও প্রাচীন, মধ্যকালীন, ঔপনিবেশিক যুগের উপর লেখা পুস্তক-পুস্তিকা, নথিপত্র থেকে গবেষণার প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত বক্তব্যের উপর নির্ভর করে ভারতের জাতি-ভিত্তিক তথা জাতিভেদ সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বিতর্ক ও আদিস্থান সংক্রান্ত বিতর্ক এই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সর্বোপরি ভারতের হিন্দু সমাজের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন যুগে জাতিভেদ কাঠামো কী রূপ অবস্থায় ছিল তা নিয়ে আলোকপাত করাও হয়েছে। এছাড়াও ভারতের রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ও দলিত শব্দের উৎপত্তি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন সরকারি দলিল, দস্তাবেজ, এবং এর উপরে লেখা বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা ও বিভিন্ন সংবাদ পত্র থেকেও তত্ত্ব, তথ্য হিসাবে আমাদের এই পরিচ্ছেদে ব্যবহার করা হয়েছে।

নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আমাদের গবেষণা পত্রে আলোচনা করা হয়েছে। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থসাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে আমরা ভারতীয় ধর্মীয়শাস্ত্র এবং নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির উপর লেখা পুস্তক-পুস্তিকা ও তাঁদের জাতিগত পত্র-পত্রিকা এবং সরকারি দলিল দস্তাবেজ ব্যবহার করেছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা নমঃশূদ্রদের আর্থসামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এদের আদি বাসভূমি বর্তমানের বাংলাদেশের যেসকল অঞ্চলে বসবাস করতেন, সেই সকল অঞ্চলের সামাজিক এবং আর্থিক ইতিহাস নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। নমঃশূদ্র জাতির চণ্ডাল নাম মোচনের আন্দোলনের ও দেশ ভাগের ফলে তাদের উদ্বাস্তু হওয়ার ও নমঃশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও দেশ ভাগের আগে ও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাদের পরাধীন এবং স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। আর পৌণ্ড্রদের আর্থিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার সাথে তাদের সামাজিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা

হয়েছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মানসিংহের এবং প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনীতে বীরত্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও দেশ ভাগের ফলে তাঁদের কিছু সংখ্যক মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে। যদিও অধিকাংশ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আদি নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গে, কাজেই তাঁদের উদ্বাস্তু আন্দোলনের তেমন কোনো আলোচনা করা হয়নি। এছাড়াও দেশ ভাগের আগেও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁদের পরাধীন এবং স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা এক্ষেত্রে ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০১, ২০১১, ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে দুই চব্বিশ পরগনাও নদীয়ার সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রতে এবং লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪ সালের নির্বাচনগুলোতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করার সাথে সাথে উক্ত জাতিদুটির জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার ও পদবী নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও লোকসভার গঠন ও সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রতে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে দুই চব্বিশ পরগনার ও নদীয়ার নির্বাচনী ক্ষেত্রতে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নাম জাতি ও রাজনৈতিক দল, প্রাপ্তভোট ও ভোটের শতাংশ এবং নমঃশূদ্র না কি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়ে বা পিছিয়ে, তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে ভারত সরকারের নির্বাচন কমিশন থেকে প্রকাশিত দলিল, রিপোর্ট ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দলিল ও রিপোর্ট এবং ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারা থেকে উপযুক্ত প্রাপ্ত তথ্য নিয়েছি। এছাড়াও উক্ত জাতি দু'টির কিছু সংখ্যক মানুষের নিকট থেকে গবেষণার প্রয়োজনে প্রশ্নমালা করে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্যও নেওয়া হয়েছে, নমুনা হিসাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা ১৯৭১ - ২০১৬ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে দুই চব্বিশ পরগনার ও নদীয়ার লোকসভায় নির্বাচিত সাংসদদের লোকসভায় কীধরণের ভূমিকা রাখতে পেরেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় উক্ত জাতিদু'টির বিধায়কগণ কী কী ভূমিকা রেখেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও নমঃশূদ্র না কি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা লোকসভায় ও বিধানসভায় ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে দুই জাতির

মধ্যে কোন জাতি এগিয়ে বা পিছিয়ে তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত লোকসভার বিতর্ক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিধানসভার বিতর্ক এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা প্রকাশিত দলিল ও রিপোর্ট ও ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারা থেকে উপযুক্ত প্রাপ্ত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উক্ত জাতি দুটির উপর প্রাকাশিত রাজনৈতিক পুস্তক-পুস্তিকা, জাতিগত পত্রিকা, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংবাদ পত্র-পত্রিকা এবং কিছু সংখ্যক মানুষের নিকট থেকে গবেষণার প্রয়োজনে প্রশ্নমালা করে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্যও নেওয়া হয়েছে, নমুনা হিসাবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সময় সীমা ১৯৭৮-২০১৩ সাল পর্যন্ত ধরে এবং নদীয়া ও দুই চব্বিশ পরগনার উক্ত জাতি দুটির সংখ্যাধিক্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি ১৯৯২ সালের পর থেকে উক্ত জাতি দুটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও আমরা দেখতে পেয়েছি জেলাপরিষদের সভাধিপতি ও সহসভাপতির পদে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়ে আছে, এর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য আলোকপাতও করেছি। এই পরিচ্ছদে আমরা তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে ভারতের সংবিধানের পঞ্চায়েতি আইনের ধারাগুলি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর দ্বারা প্রাকাশিত দলিল ও পুস্তক-পুস্তিকা এবং গবেষকদের দ্বারা প্রকাশিত গবেষণা পত্র ও পুস্তক ও সংবাদ পত্র-পত্রিকা এবং কিছু সংখ্যক মানুষের নিকট থেকে গবেষণার প্রয়োজনে প্রশ্নমালা করে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্যও নেওয়া হয়েছে, নমুনা হিসাবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতার আগের ভারতের দলিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে পর্যালোচনা করতে হয়েছে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতানুসারে। এক্ষেত্রে আমরা দলিত আন্দোলনের ভূমিকায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও জাতীয় রাজনৈতিক দলের এবং বিভিন্ন সময়ে জাতীয় তথা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও দলিত রাজনৈতিক দলের হয়েও এদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তথ্য ও তত্ত্ব হিসাবে বহুসংখ্যক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন

গবেষকের পুস্তক-পুস্তিকা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারের পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত যুক্তি নেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, উপসংহারে আমরা ভারতের হিন্দুসমাজের জাতিভেদের প্রেক্ষাপট ও জাতিভিত্তিক রাজনীতি ও দলিত শব্দের তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা এবং নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট তথা ১৯৭১ - ২০১৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে, লোকসভায়, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায়, পঞ্চায়েতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ভূমিকা নিয়ে ও গবেষণার মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংযোজনীতে গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সমাজ, জনবিন্যাস, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ভূমিকা, রাজনৈতিক আন্দোলনের জাগরণকল্পে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, আন্দোলনে ব্যবহৃত চিঠিপত্রগুলিকে এখানে তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাথমিক ও সহযোগী সূত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে।

নির্দেশিকা

১) ভারতীয় সংবিধানের ৩২৬ নং ধারা।

২) আনন্দ বাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২৮.০২.২০০৮।

৩) Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Protest and Identity in Colonial India The Namasudras of Bengal, 1872-1947, Second Edition* (With a new Postscript) Oxford University Press, London, 2011.

৪) ডঃ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বঙ্গ মূলনিবাসী একটি জনগোষ্ঠী, বঙ্গ পাঠক প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

৫) Debi Chatterjee, *dalit rights/human rights*, Rawat Publications, New Delhi, 2011 .

৬) Rajni Kothari, (edited), Caste in Indian Politics, (First published by Orient Longman Pvt. Ltd. 1970) Orient Blackswan impression, New Delhi, 2010.

৭) Suhas Palshikar, Suri, K.C., Yadav, Yogendra (edited), Party Competition in Indian States, "Electoral Politics in Post-Congress Polity" Oxford University Press, New Delhi, 2014.

৮) Rajni Kothari, Politics in India, (First published by Orient Longman Pvt. Ltd. 1972) Orient Blackswan impression, New Delhi, 2013.

৯) Ganapathi Palanithurai, Dalit and Dalit Representative in Rural Local Governance Voices from the Field, Concept Publishing Company PVT., LTD. New Delhi, 2013.

১০) মহেন্দ্রনাথ করণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল কর্তৃক পুনর্মুদ্রণ, তেতুলবেড়িয়া, কলকাতা, ২০০১,

১১) ধূর্জটি নস্কর, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলতিলক, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৯৬।

১২) নরেশচন্দ্র দাস, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাঙ্গলাদেশ, দীপালি বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৯৭, (দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৩) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাসগুপ্ত, (সম্পাদিত) জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮।

১৪) জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর, বিশ্বাস পাবলিশার, কলকাতা, ১৯৯৯,

১৫) জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুঃ কারা এবং কেন ? বঙ্গদর্শন প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

১৬) রণজিত কুমার সিকদার, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭।

১৭) রণজিত কুমার সিকদার, বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা ডঃ আম্বেদকর, ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬।

১৮) প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুর নগর, উত্তর ২৪ পরগনা , পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৫।

১৯) নরোত্তম হালদার, গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০০।

২০) নরোত্তম হালদার, গঙ্গারিডি ও অন্যান্য প্রবন্ধ, দক্ষিণায়ন, কলকাতা, ২০০৬।

২১) দেবী চ্যাটার্জী, পতিত, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০২।

২২) সনৎকুমার নস্কর, (সম্পাদক), পৌণ্ড্র-মনীষা (দ্বিতীয় খণ্ড) পৌণ্ড্র মহাসঙঘ, কলকাতা, ২০১৩।

২৩) সনৎকুমার নস্কর, (সম্পাদক), পৌণ্ড্র-মনীষা (তৃতীয় খণ্ড) পৌণ্ড্র মহাসঙঘ, কলকাতা, ২০১৪।

২৪) সনৎকুমার নস্কর, (সম্পাদক), পৌণ্ড্র-মনীষা (৪র্থ খণ্ড) পৌণ্ড্র মহাসঙঘ, কলকাতা, ২০১৫।

২৫) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, ঊষা প্রেস, কলকাতা, ২০০২।

২৬) মহানন্দ হালদার, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত, শ্রী কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, সংঘাধিপতি মতুয়া মহাসংঘ কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ত সংরক্ষিত ও প্রকাশিত, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১২।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা এবং জাতিভিত্তিক রাজনীতি ও দলিত শব্দের উৎপত্তি

ভূমিকা

আমাদের দেশ হাজার হাজার বছর ধরে বহুমাত্রিক সংস্কৃতির শাসনে সমৃদ্ধ হয়েছে। বহুসংখ্যক ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় সমাজ, বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি দেশ। তাইতো বৈচিত্র্যপূর্ণ এই দেশে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে বহুধাবিভক্ত জাতি, ভাষা, ধর্ম ও বর্ণ ভিত্তিক আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছে, তা আগে কখনো সংগঠিত হয়েছে কিনা – সে বিষয়ে সংশয় আছে। আপাত দৃষ্টিতে এই আন্দোলনগুলি বিচ্ছিন্ন সংঘাত হিসাবে মনে করলে আমাদের বোধহয় ভুল হবে। কোনো একটি সুপরিকল্পিত শক্তি, মতাদর্শ এবং দেশীয় বেশকিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে আগ্রাসী রাজনৈতিক দলগুলি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তির পরোক্ষপ্রভাব ও ইন্দনের সহযোগিতায় - উপরিউক্ত আন্দোলনগুলিকে উৎসাহিত করছে, বলে মনে করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিশ্লেষণ এবং তথ্যানুসন্ধান করলে আমাদের দেশের আন্দোলনগুলির প্রেক্ষাপটের পশ্চাতেও উক্ত সুপরিকল্পিত শক্তির ভূমিকার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। আজকের দিনে সংবাদ মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, দলিত নির্যাতনের সংবাদ। এইসব ঘটনার পশ্চাৎপটে যে সমস্ত কারণগুলি বিদ্যমান বলে আমরা মনে করে থাকি, তা - হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে বিশ্বায়নের নামে পুঁজিবাদীরা এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে চলেছে। এই সমস্ত পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্দেশ্য হলো বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা।

আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় জাতি-ভিত্তিক উঁচু-নীচু ভেদাভেদের পশ্চাৎপটের কারণগুলি আজকের দিনে পরোক্ষভাবে বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী শক্তির সঙ্গে খানিকটা সংযুক্ত থাকলেও প্রকৃতভাবে উক্ত ভেদাভেদের শিকড় নিহিত আছে ভারতের হিন্দু ধর্মাচারনের (বিশেষত যাগযজ্ঞ পালনের রীতি–প্রকরণ)

মর্মমূলে। ভারতবর্ষের জাতি-ভিত্তিক ভেদাভেদের প্রেক্ষাপট পুরোপুরিভাবে ভারতের হিন্দু সমাজের রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিধান ও কর্মভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম ধরা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গের – পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণঃ তুলনামূলক পর্যালোচনা (১৯৭১-২০১৬)'। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতি দুটি ভারতীয় হিন্দু সমাজ কাঠামোয় সর্বনিম্ন জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। তাইতো উক্ত জাতি দুটির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে গবেষণা করতে হলে, প্রসঙ্গক্রমে এই গবেষণার স্বার্থে শুধুমাত্র **ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা এবং জাতিভিত্তিক রাজনীতি ও দলিত শব্দের উৎপত্তি** নিয়ে আলোচনার চেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

ভারতীয় সমাজের ভিত্তিভূমি অত্যন্ত জটিল। পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত সুপ্রাচীন মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, ভারতীয় সভ্যতা তাদের মধ্যে অন্যতম বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। তাইতো ইতিহাসবিদ Shyama Charan Dube মন্তব্য করেছেন, "Indian Society is old and it is extremely complex. According to a popular estimate it has covered a span of five thousand years since the period of its first known civilization. During this long period several waves of immigrants, representing different ethnic strains and linguistic families, have merged into its population to contribute to its diversity, richness and vitality."[১] এই মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক বৈদেশিক জাতি ও রাজশক্তির আক্রমণের ফলে জটিল এক বৈচিত্র্যময় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু কালক্রমে বৈচিত্র্যময় সমাজের পরিচিত পরিধির মধ্যে ভারতীয় সমাজ সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি। অতএব বৈচিত্র্যময় সমাজের অন্তর্গত সময়ের নিরিখে বহুসংখ্যক জাতি-উপজাতি, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত কারণে নানান সময়ে আচার-আচরণগত বৈষম্যের কারণে এবং জীবনধারণের নিমিত্তে পেশার ভিত্তিতে সমাজ বহুসংখ্যক জাতি-ভিত্তিক সামাজিক স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভারতীয় সমাজের আধিপত্য স্থাপনের পরম্পরায় এই সামাজিক স্তরবিন্যাস স্বাভাবিক ধারণা বলে মনে করলে, বোধহয় তেমন একটা ভুল হবে না। আবার সাধারণ মানুষের জীবনের দৈনন্দিন প্রবাহে রাজনীতির ক্ষেত্র ভূমিতে ভিন্ন ধরনের এক স্তরে জাতি-উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ আচার-আচরণগত কাঠামোই ক্ষমতার লড়াই-এর কাজে ব্যাপক হারেও চলেছে।

এই গবেষণার সুবিধার্থে, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা আলোচনার নিমিত্তে তিনটি যুগে ভাগ করে আলোচনা চেষ্টা করা হবে। আলোচ্য যুগগুলো হল, প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগ। যদিও যুগের নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, প্রাচীন যুগ মানেই হিন্দুযুগ, আবার মধ্যযুগ মানে মুসলমান যুগ এবং আধুনিকযুগকে ব্রিটিশযুগ (কিন্তু উক্ত নিয়ম অনুসারে ব্রিটিশযুগকে খ্রিষ্টীয়যুগ বলা উচিত বলেও অনেকে মনে করে থাকেন) বলে অভিহিত করেছেন। এই সমস্ত বিভাজনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমালোচনাও হয়ে থাকে। ফলত আমরা যুগ বিভাজনে সমালোচনার দিকে না গিয়ে, আলোচনার অগ্রসরের দিকে মনোনিবেশ করবো। কার্যত বলা যেতে পারে সর্বজনবিধিত যুগের নামকরণের ব্যবহারকেই আমরা ধরে নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে করবো, রামকৃষ্ণ দে-র, রাষ্ট্রভাবনাঃ মধ্যযুগের ভারত - এর একটি মন্তব্য “ভারতের ইতিহাসে প্রাচীন যুগকে সাধারণত দুটি পর্যায়ে (প্রথমটি প্রাচীন যুগ থেকে ৭১১ খ্রিঃ পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি ৭১২ খ্রিঃ থেকে ১২০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত) ভাগ করা হয়। অনুরূপভাবে মধ্যযুগকে আদি মধ্যযুগ (১২০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত) এবং অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০৯ খ্রিঃ থেকে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭৫৯ খ্রিঃ পর্যন্ত) এই দুভাবে ভাগ করা হয়। ১৭৫৭ খ্রিঃ থেকে ভারতের আধুনিক যুগের সূচনা হয় বলে দাবি করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটিশ যুগকে আধুনিকযুগ বলার পরিবর্তে ঔপনিবেশিক যুগ এবং ১৯৪৭ খ্রিঃ পরবর্তী স্বাধীনোত্তর ভারতকে উত্তর ঔপনিবেশিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ্ করা যায়।”[২] উক্ত মন্তব্য থেকে আমরা ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের একটা বিভাজন রেখার চিত্র পেলাম। ফলে জাতি-ভিত্তিক সমাজ নিয়ে আলোচনায় বেশ খানিকটা সূত্র পাওয়া যাবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্যের নিমিত্তে বারংবার ভারতীয় জাতি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, গবেষণার বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে বিশেষত্ব ভারতের হিন্দু সমাজের প্রেক্ষাপটের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। এবারে নিম্নে প্রাচীন যুগে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতি-ভিত্তিক কাঠামো কেমন ছিল, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া হবে।

প্রাচীন যুগ

প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা সনাক্ত করা বেশ কঠিন কাজ। ঐতিহাসিক তথ্য ও সূত্র থেকে আমরা যা জানতে পারি, প্রাচীনযুগের সূচনা পর্বে

লেখার ব্যবহার আবিষ্কার হয়নি, সুতরাং, এই সময়ের কোনও লিখিত নথি নেই। আমাদের দেশের যে জনশ্রুতির পরম্পরা বা ঐতিহ্য রয়েছে, তা থেকেও বেশ একটা তথ্য বা সূত্র পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে মৌখিক কথোপকথন সর্বদাই পরিবর্তনীয় রূপ গ্রহণ করে। এর ফলেই হয়তো ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে পথ তা গ্রহণ করাও বেশ জটিল বলে মনে করা যেতে পারে। প্রাচীন যুগের সামাজিক ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণের চেয়ে যদি অনুমানের উপর জোর দেওয়া হয়, তবে ইতিহাসের প্রকৃত সামাজিক চিত্র উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে এই সময়কার মানব সমাজের জীবনযাত্রার সামাজিকতার খুঁটিনাটি বহু সংখ্যক তথ্যই কালের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে যদি আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলে আমাদের বেশ একটা ভুল হতে পারে। অধ্যাপক ডি. ডি. কোসাম্বির মত এই সম্ভবনাকে সমর্থন করে। অধ্যাপক কোসাম্বির মতে, "..............acculturation in India was a Continuous process extending over the millennia, very difficult to date for that very reason."[৩] একথা প্রায় সর্বজন বিদিত যে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে ধারক ও বাহক করে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার জটিল থেকে জতিলতর ক্রমবিকাশের ধারাবাহিতা এখনও কমবেশি চলছে।

যাই হোক আমাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ভিন্নতার ইতিহাসের আধুনিক চর্চা শুরু কিন্তু আমরা করিনি। এটা শুরু করেছিলেন বিদেশীরা। এই মর্মে আমরা ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মার একটি মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, "The modern study of ancient Indian Social order owed its inception to the efforts of the East India Company, which could not govern and alien people without some knowledge of their institution."[৪] অর্থাৎ এই মন্তব্য থেকে একথাও বলা যেতে পারে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের ব্যবসা ও দক্ষভাবে ভারত শাসনের সুবিধার্থে ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ভেদাভেদের রূপরেখার কাঠামো সম্পর্কিত ইতিহাস রচনার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দৃষ্টিতে দেখা ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে দেশীয় ঐতিহাসিকেরা সব ক্ষেত্রে একমত হতে পারেননি। ইতিহাসবিদ রামশরণ শর্মা এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "But the attempt of the Indian scholars to present their early social institution in a form more palatable to the modern mind did not always concern itself to western writers. Thus Senath (1896) pointed

out that the castes are compared by the Hindus of English upbringing with the social distinction that exist among western social classes."[৫] অতএব উপরোক্ত মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রাচীন ভারতের সামাজিক ভেদাভেদের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য বিরাজমান। একথা স্বীকার করে নিয়েও প্রাচীন ভারতে ভেদাভেদের সামাজিক ব্যবস্থার রূপরেখা নিয়ে আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

অধ্যাপিকা রোমিলা থাপারের একটি মন্তব্য তুলে ধরে, আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। "It was once the tradition that the first king of India was Manu Svayambhu (the self-born Manu). Manu was born directly of the God Brahma, and was a hermaphrodite. From the female half of his body he borne two sons and three daughters, form whom descended a series of Manus. One of the, called Prithu, became the first consecrated king of the earth, and gave to the earth her name, Prithvi. He cleared the forests, cultivated the land, and other introduced cattle-breeding, commerce, and other activities associated with a settled life."[৬] উক্ত আলোচ্য অংশ থেকে আমরা একটা অনুমান করতে পারি যে, ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের সূচনা একটা দিক পৃথু মনুর সময় কাল থেকে শুরু বলে মনে করা হয়। তবে এই মনে করাটাও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য যাই থাক না কেন, ভারতীয় হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রে মনুর বংশ তালিকা পাওয়া যায় বলেও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার এই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন "The puranas trace the descent of Manu's progeny to the kings of the epic period-the royal heroes of the two epics, The Ramayana and the Mahabharata........ and then continue to chronicle the dynastics of the historical period (3102 BC. is the traditional date for the war described in the Mahabharata)."[৭] প্রসঙ্গক্রমে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাহলে কি পৃথু মনুর সময়কাল থেকেই ভারতের সামাজিক ইতিহাসের যুগের শুরু হয়েছিল - এমন একটা অনুমান করা যেতে পারে। আবার এই মন্তব্যের সাথে সাথে আমাদের অন্যান্যও মন্তব্যের দিকেও নজর রাখতে হবে, না হলে ভারতের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা

করাটা একপেশে হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে রোমিলা থাপারের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে, “Vedic literature (that associated with the Aryans in India) came in for intensive study, and it appeared to be proved that the beginning of India History was to be the coming of the ‘Aryan’, some time in the second millennium B.C.”[৮] উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে আর্যদের একটা মেলবন্ধনের সন্ধান পাওয়া যায়।

ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের শুরু নিয়ে নানা বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও আমরা ধরে নেব, দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকেই ভারতের সামাজিক ইতিহাসের সূচনা। এই ধরে নেওয়ার কারণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করব যে, যেহেতু বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ হল ‘ঋগ্বেদ’ সেহেতু ভারতের সামাজিক ইতিহাসের পটভূমির সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। আর আর্যদের ঋগ্বৈদিক ভারতবর্ষে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কাঠামো অস্তিত্ব নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য রয়েছে বলে আমরা ধরে নিতেই পারি। আবার মূলত ঋগ্বেদে বিভিন্ন উদ্ধৃতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা আমাদের নিকট বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ের সামাজিক স্তরবিন্যাসের বা জাতিভেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে যে বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হল, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত “পুরুষসূক্তে”র কথা যা, এই অধ্যায়ের পরের অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। তবে আমাদের উল্লেখ করতেই হয় যে, সামাজিক ইতিহাসের উক্ত সময় কাল ধরার মূল কারণ হল, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল রচিত হয়েছিল অনেক পরবর্তীকালে, সেই কারণেই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব ধরা হয়েছে। আবার দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ‘মনুস্মৃতি’ রচিত হয় বলে ঐতিহাসিকদের তথ্যপ্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। উল্লেখ্য স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে বিস্তারিতভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপর আলোচনা করা হয়েছে। আরও জানা যায় যে, স্মৃতিশাস্ত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ‘মনুস্মৃতি’তে ভারতের সামাজিক জীবনের কাঠামো সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য বিধৃত হয়েছে।

তবে আমাদের দেশের সভ্যতার সূচনার সুপ্রাচীন কালের স্বরূপ বর্তমান সময়ে ঐতিহাসিক তথা সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা এই যুগকে স্বচ্ছভাবে বিশ্লেষণ করা মোটেই সহজ কাজ নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সহযোগিতায় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে উক্ত যুগের মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব বলে আমরা

মনে করতে পারি। এক্ষেত্রে আমরা অধ্যাপিকা রোমিলা থাপারের আরেকটি মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, "But this carefully constructed picture of the post was again to be disturbed in the twentieth century. In 1921-22 archaeology revealed the existence of a pre-Aryan civilization in the north-west of India, the Indus valley civilization, with its two urban centre's at Mohenjodaro and Harappa. This discovery consigns the early part of traditional account very firmly to the realms of mythology. The Harappa culture dates from c.3000 B.C. to c.1500 so that physical coexistence of the Harappa culture with the family of Manus is difficult to imagine, since the cultural patterns of the two were totally different."[৯] এই প্রেক্ষাপটে আমরা একটা অনুমান করতে পারি যে, প্রাচীন ভারতের সমাজ ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় হরপ্পা সভ্যতার থেকেও। তবে অধ্যাপিকা থাপার এটাও উল্লেখ করেছেন, "There are thus two separate sources of information on the past; the historical. Which consists of the archaeological evidence and that derived from vadic literature, and the traditional, consisting of the stories in the paranas, the latter being composed at a later date than the vedic."[১০] উক্ত আলোচ্য অংশ থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে দুই ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা পুরাণ আগে না বেদ আগে রচনা হয়েছিল, সে বিতর্কে যাব না। তবে গবেষণার প্রয়োজনে ভারতীয় সমাজের গঠন সম্পর্কে আলোচনার দিকেই যাওয়া হবে ঐতিহাসিক সূত্র এবং পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যগত সূত্রের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে আমরা ঐতিহাসিক সূত্রের তথ্য অবলম্বন করে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করব।

ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য থেকে আমরা মোটামুটি ভাবে জানতে পারি যে, ভারতের সামাজিক ইতিহাসের প্রাচীনতম সভ্যতা ছিল হরপ্পা সভ্যতা যা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রায় দুই হাজার সাতশো পঞ্চাশ সালে এবং টিকে ছিল সহস্রাধিক বছর। ভারতের সিন্ধু নদের অববাহিকা ধরেই এই সুপ্রাচীন সভ্যতা ১৯২১-২২ খ্রিষ্ট্রাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সিন্ধু নদীর উপত্যাকায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে এক উন্নত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা

আবিস্কৃত হয়। সিন্ধু নদীর অববাহিকায় এই সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল বলে উক্ত সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। কিন্তু পরবর্তী কালে এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ সিন্ধু অববাহিকার বাইরেও প্রায় ২৫০ টি স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও জানা যায়, হরপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শন সবচেয়ে প্রাচীন তাৎপর্যপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাই এই উন্নত সভ্যতাকে হরপ্পাসভ্যতা নামকরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলি ছিল হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, কালবঞ্জন, লোথাল, রূপার, বনওয়ালী প্রভৃতি। সভ্যতার ধ্বংসাবাশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, এই সভ্যতার রূপকারেরা এক উন্নত আর্থ-সামাজিক জীবনযাপন অতিবাহিত করত। এক্ষেত্রে আমরা হরপ্পাসভ্যতার সামাজিক ভিত্তি কী ধরনের ছিল সে সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া হবে।

আলোচনার শুরুতেই আমরা অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবের মতামত তুলে ধরব। তাঁর মতে, “In the skeletal remains of the civilization there is evidence of the presence of Proto-Australoid, Mediterranean, Alpine, and Mongoloid racial elements, who no deubt contributed to its growth.......... There was considerable art activity and a variety of crafts flourished.”[১১] উক্ত সভ্যতায় জাতি-ভিত্তিক ব্যবস্থা কতটা বিরাজ করত, তা অনুধাবন করা বেশ শক্ত। কিন্তু আবার এমন কথাও বলা যেতে পারে যে, তখনকার দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার ব্যাপকতার কারণেই হয়তো হরপ্পা সভ্যতার সমাজে পেশাভিত্তিক বিভাজন থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল, একথা বললে হয়তো বেশ একটা ভুল বলা হবে না। প্রসঙ্গক্রমেই আমরা দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, “নগর-পরিকল্পনার ধ্বংসাবশেষ থেকে অনায়াসেই অনুমান হয়, উভয় নগরেই লোক বসতি অত্যন্ত ঘন ছিল। নগরবাসী বলতে পুরোহিত, সওদাগর, কারিগর এবং হয়তো বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ক্রীতদাসও। স্বভাবতই তারা প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য-উৎপাদানে অংশগ্রহণ করত না; বস্তুত খাদ্য-উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে বহু সংখ্যক মানুষ মুক্তি না পেলে অমন বড় নগর, উন্নত কারুশিল্প এবং সুবিস্তৃত বাণিজ্য সম্ভবই হতে পারে না।”[১২] যেহেতু উক্ত নগর দুটোই ঘনবসতি থাকার কারণে রাস্তা-ঘাট, জল নিকাশি ব্যবস্থা পরিষ্কার করার জন্যও তো লোকের প্রয়োজন ছিল। যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে থাকত, তাদের সঙ্গে পুরোহিতদের সামাজিক মেলামেশা হয়তো হতো না। ফলত তখন থেকেই ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামোতে ভেদাভেদের ইতিহাস গড়ে ওঠা

স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। আবার একথাও বলা যেতে পারে যে, হরপ্পা সভ্যতায় আবিষ্কৃত ছোটবড় ইমারতগুলি সামাজিক স্তরভেদের ইঙ্গিত সূচক। এই সভ্যতায় বড়বড় অট্টালিকাগুলিতে সামাজিক দিক থেকে উচ্চাসীন ব্যাক্তিরা এবং ধনী শ্রেণির লোকেরা বাস করতো এবং দুই কামরাযুক্ত ছোট বাড়িগুলিতে সাধারণ মানুষজন বসবাস করত।

উক্ত সভ্যতা সম্পর্কে দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি উপরোক্ত ঐতিহাসিকদের মতামত থেকে বেড়িয়ে এসে অন্যভাবে মতামত তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, "The arehacological record, by no means complete nor satisfactory is cities remained us of later. 'Hindu' iconography or customs, but it is obvious that the continuity was violently interrupted. Keith's remark, that town-dwelling proper in India was Post-Rg-Vedic, is essentially correct."[১৩] এই মন্তব্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, যথাযথ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও উক্ত সভ্যতায়, যে ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম চলত এবং তা বর্তমানে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গেও বেশ খানিকটা সাদৃশ্যমান, যা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে পুরোহিতদের সঙ্গে কৃষি উৎপাদক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা লোকেদের সামাজিক একটা পার্থক্য হয়তো ছিল। নগরসভ্যতা আক্রমণের ফলে বা প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংস যদি না হতো, তাহলে হয়তো প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সামাজিক ভেদাভেদ তথা সামাজিক কাঠামো তুলে ধরতে পারতেন বলে আশা করা যেতে পারে। আবার যদি লিখিত কোন প্রমাণ পাওয়া যেত তাহলে বলা যেতো যে, প্রাচীন সভ্যতার জাতি-ভিত্তিক সমাজ ছিল কিনা। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে ভারতীয় প্রকৃত নগর সভ্যতার সূচনা হয়েছিল ঋক্‌বেদের পরে।

সিন্ধু সভ্যতার উপরিউক্ত বর্ণনার পক্ষে অনেক ঐতিহাসিক একমত হতে পারেননি। যে সমস্ত ঐতিহাসিক উক্ত সভ্যতার বর্ণনাকে মেনে নেননি, তাঁদের যুক্তিগুলিকে ইতিহাসবিদ রামশরণ শর্মা তুলে ধরেছেন, এইভাবে "বেদ বিশেষজ্ঞ উইল হেলাম রাউ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ জর্জ এরডোসি বৈদিক বসতিকে হরপ্পা সংস্কৃতি বলে মনে করেন না। রাউ-এর মতে, 'সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের সাহিত্যে একটি কথাও বলা হয়নি - যেমন বলা হয়নি ইটের দেওয়াল, ইটের বাড়ি, সারিবদ্ধ ইট নির্মিত রাস্তা, শস্যাগার কিংবা সার্বজনীন স্নানাগার সম্পর্কে।"[১৪] নানা ধরনের মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও

বলা যেতে পারে যে, উক্ত সভ্যতায় পেশাভিত্তিক বিভাজন থাকাটা স্বাভাবিক বলে মনে করা যেতে পারে।

এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, উন্নতনগর ব্যবস্থা সম্পন্ন এই সভ্যতায় কি কোন ধর্মীয় দেব-দেবীর স্থান ছিল? এর সদুত্তরে বলা যেতে পারে, হয়তো প্রাথমিক অবস্থায় একটা ধর্মীয় চেতনা ও চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল বলে আশা করাই যেতে পারে। ইতিহাসবিদ দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি এই সভ্যতায় ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "Often, this means the use of religion in order to convince the working class that they must give up the by mysterious agencies. The harsher the exploitation, the great the need for repressive force, for men will not always starve in quiet without protest. Here again, superstation helps by powerful tab us. The instruments of force, namely weapons, cannot be hidden in the archacological record, while superstition reveal itself through images or special buildings for religious use."[১৫] উক্ত মন্তব্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, উৎপাদন, শোষণ, দৈনন্দিন জীবনযাপনের রসদের প্রয়োজনে হয়তো সভ্যতার শাসক তথা পুরোহিতরা অস্ত্র-শস্ত্র, ধর্মীয় ভীতি ও কুসংস্কারের মাধ্যমে উৎপাদক জাতিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বঞ্চনার শিকার করা হতো।

সিন্ধুসভ্যতায় ধর্ম বিশ্বাসের আরও প্রমাণ পাওয়ায় দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতে। তাঁর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল, "উপাস্য লিঙ্গ সাধারণত শিবলিঙ্গ বা শিব বলেই উল্লেখিত। অতএব ওই লিঙ্গ উপাসনাকে শৈব-সাধনার পরিচায়ক বলে গ্রহণ করবার উৎসাহ অকারণ নয়। এবং উৎসাহের পরিণাম হিসেবেই অনুমিত হয়েছে, শক্তি-সাধনার মতো শৈব-সাধনারও সূত্রপাত প্রাচীন প্রাক-বৈদিক, সিন্ধু যুগে এবং বেদোত্তর ভারতবর্ষীয় ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও শক্তি সাধনার মতোই ওই শৈব-সাধনার অবিচ্ছিন্ন প্রভাব টিকে থেকেছে।"[১৬] উক্ত মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, শিব আমাদের ভারতীয় সভ্যতার আদি অধিবাসীদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা, কাজেই প্রাচীন ভারতের সমাজের সকল মানুষই শিবের আরাধনা করতে পারতেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ফলে আবার এমন একটা কথা বলা যেতেই পারে যে, হয়তো সামাজিক উচ্চ - নিচ ভেদাবেদ তেমন একটা ছিল না। আবার এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামচরণ দুবে যুক্তি তুলে ধরেছেন এইভাবে, "The most

important aspect, from our point of view, is that the foundations of Indian civilization were laid during this phase and some of the elements of that period continue to this day. The worship of Shiva and the lingam, and the Mother Goddess can be traced to this period."[১৭] তবে আমরা বলতেই পারি যে, পৃথিবীতে যেসমস্ত সভ্যতায় ধর্ম বিশ্বাস ছিল, সেখানেই কম বেশি উৎপাদক জাতিকে শোষণ করা হত ধর্মের মাধ্যমেই। যেহেতু সিন্ধু সভ্যতায় শৈব অর্থাৎ শক্তির সাধনা করা হতো, সেহেতু ধর্মীয় শক্তির ভয় দেখিয়েও উৎপাদক জাতিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বৈষম্যের মধ্যে রাখার প্রবণতাও থাকাটাই স্বাভাবিক।

সিন্ধু সভ্যতায় নাগরিক জীবনে যে বৈচিত্র্যপূর্ণতা ছিল, তা আমরা বহু ঐতিহাসিকদের মতামত থেকে পেয়ে থাকি। তার দুই একটা উদাহরণ তুলে ধরব। ইতিহাসবিদ কোসাম্বীর মতে, "We now come to the basic question, how did the cultivators produce the surphes grain which was necessary to feed the city people, whether temple-slave, workman, craft man, trader or priest? Assuming that they were able to induce people by trade and religion to pant with the sarphes of careless,......"[১৮] এই মন্তব্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, আলোচ্য সভ্যতায় সামাজিক তথা অর্থনৈতিক ভেদাভেদের বিভাজন ছিল। যা হয়তো নির্ভর করে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর অধিকার আরোপ করার মধ্যে দিয়ে। ঐতিহাসিক কোসাম্বির আর একটি প্রশ্নবোধক উদ্ধৃতির অংশ আমরা তুলে ধরব, এইভাবে, "The cities rested upon trade, not fighting; but if the army or police were not very strong, what helped the trader maintain his unequal sharing of profit?"[১৯] এই উদ্বৃতি থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, সম্পত্তি রক্ষার্থে তাদের সমাজ ব্যবস্থায় গোষ্ঠী বিভাজন হয়তো ছিল, বা ধর্মের ভয় দেখিয়েও হয়তো, বা গোষ্ঠী বিভাজন করে রাখা হতো। এই সমস্ত কারণগুলির জন্যেই হয়তো নগরবাসীর মধ্যে ঐক্যের অভাবের ফলেই বাইরের শক্তির কাছে তারা পরাজিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মার সুচিন্তিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি অনুমানে পৌঁছেতে পারি, "The fight between the Aryans and their opponent mainly took the form of the destruction of the fortresses and walled settlements of the destruction of the

later. Both the Dasas and Dasyus were in possession of numerous fortified settlements, which are also associated with enemies of the Aryans in a general way. This naturally reminds us of the later discoveries of fortifications in the Harappa settlements, although so far we have not been able to get any clear archaeological evidence of mass scale confrontation between the Aryans and the Harappas. It seems that the nomadic Aryans coveted the wealth of their enemies accumulation in the settlements, for prossession of which there went on a regular warfare between them."[২০] উক্ত প্রশ্নবোধক যুক্তি থেকে আমরা বলতে পারি যে, নগরীতে সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। আর এই সম্পদ রক্ষার্থেই হয়তো নগরীতে প্রাচীর দেওয়ার প্রয়োজনও হয়েছিল। আধুনিক প্রত্যেকটি নগরীর শিল্পপতি তথা বণিক শ্রেণি তাদের কারখানা তথা বাসস্থানের চতুর্দিকে প্রাচীর দিয়ে থাকেন, যাতে করে শত্রু পক্ষের হাত থেকে প্রাথমিক ভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। ভারতে যতবার বিদেশী শক্তির আক্রমণ হয়েছে, তার বেশির ভাগ আক্রমণই ছিল সম্পদ দখলের জন্য, সেদিক থেকে বিচার করে সহজেই বলা যেতে পারে যে, আর্যরাও নগরীর ধন সম্পত্তির দখল করার জন্যেই নগরবাসীর দেওয়া প্রাচীর ধ্বংস করে প্রবেশ করেছিলেন। আবার একথাও বলা যেতে পারে যে, আর্যদের সঙ্গে নগরবাসীর সংঘর্ষ হওয়ার কারণ হয়তো ছিল সম্পদের দখলকে কেন্দ্র করে।

ঐতিহাসিকদের যুক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, নগর সভ্যতায় সম্পদের মালিকানা পাওয়ার জন্য উৎপাদকের উপর শাসকদের পেশীশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি । শাসকরা ধর্মীয় কুসংস্কারের মধ্য দিয়েই উৎপাদকদের হিংসা থেকে দূরে রাখতেন সাময়িকভাবে। ফলে শাসকদের কখনও প্রয়োজন হয়নি হয়তো যোদ্ধা বাহিনী গঠন করার। তাইতো কোশাম্বী উল্লেখ করেছেন, "The methods to have been regulated from the stant, presumably by the temple, without the stimulus of heavy completion or even the need to keep annals, records or contrasts over long periods of time."[২১] যোদ্ধা বাহিনী না থাকার ফলে আর্যদের আক্রমণ থেকে নগর সভ্যতাকে শাসকেরা রক্ষা করতে পারে নি। আবার এও বলা যেতে পারে যে, সামাজিক ভাবে তাদের মধ্যে কোনো ঐক্যবদ্ধ আদর্শ ছিল না। ফলে সভ্যতায় বিচ্ছিন্ন জাতিসত্ত্বা গড়ে ওঠায় দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়ে পড়েছিল।

এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, সিন্ধু সভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার করা যায়নি, ফলে সভ্যতার ধ্বংস সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা নানা ধরনের যুক্তি উত্থাপন করে থাকেন। যেমন একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, বন্যা, ভূমিকম্পের মতো অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই ধ্বংস হয়েছিল সিন্ধুসভ্যতা। আবার অন্য একদল ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, এই সভ্যতা বহির্জাতির আক্রমণেই ধ্বংস হয়েছিল। এই বহির্জাতির কাছে ছিল দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা, উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেই তারা সিন্ধুসভ্যতার মানবসমাজকে পরাজিত করেছিল। মতপার্থক্য যাই থাকুক না কেন, এক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত মতামতের প্রাধান্য দেওয়া হবে। আলোচ্য অংশে দার্শনিক দেবীপ্রসাদের যুক্তিটি তুলে ধরে বিষয়টা সম্পর্কে একটা মতামত দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। তাঁর যুক্তিতে, "খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে সিন্ধু উপত্যকায় যে ঘটনা ঘটেছিল তার সঙ্গে সমসাময়িক ইজিয়ানের ঘটনার তুলনা করা যায় উত্তর-পশ্চিম দেশ থেকে একের পর এক আর্যভাষা-ভাষীর ঢেউ এসে পড়ে। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে ঋগবেদে যারা নিজেদের আর্য আখ্যা দিয়েছে, তারা উপত্যকার দক্ষিণাংশে নগর ও সৌধবাসী এক সুসভ্য মানব দলের সংস্পর্শে আসে - এরা প্রধানতই ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করত। বিজেতা আর্যরা বৈদিক সংস্কৃতির দিক থেকে তুলনায় অনুন্নত ছিল; তারা হয় ঐ নগরগুলি ধ্বংস করেছিল আর নয়তো এগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে দিয়েছিল। ঋক্‌বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রকে বলা হয়েছে পুরোহা বা পুরন্দর-পুর ধ্বংসকারী। ইজিয়ান-এর প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার মতোই সিন্ধু উপত্যাকায় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাও আর্য আক্রমণের আঘাত সহ্য করতে পারেনি।"[২২] উক্ত মন্তব্য থেকে বলতে পারি যে, সিন্ধু সভ্যতার উন্নত মানব সমাজ যুদ্ধে পারদর্শী না থাকার দরুন বর্বর আর্য জাতির নিকট পরাজিত হয়। কাজেই সিন্ধু সভ্যতার সভ্য মানবসমাজের পরাজিত হওয়ার মধ্য দিয়েই এদেশে আর্যদের শাসন শোষণ শুরু হয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, আমাদের দেশে বহু বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ ঘটেছে। তাদের মধ্যে আর্যরা আমাদের দেশের আচার-আচরণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, এদেশের সমাজ-সংস্কৃতিকে নিজেদের মতন করে গড়ে তুলেছিল। এখন আমাদের মনে একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এই আর্য জাতি কারা? এদের পরিচয় বা কী? এই আর্যদের সম্পর্কে ইতিহাসবিদ কোসাম্বী মন্তব্য করেছেন, "The people who first used the Vedas as their sacred text, who first spoke the Sanskrit language and worshipped a

particular group of deities led by Indra, called themselves arya. The term persist throughout later Sanskrit and its derivative language, ultimately to be become just a respectful solution."[২৩] এই মন্তব্য থেকে আমরা এমন একটা কথা বলতে পারি যে, ভারতের সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ গুলি রচিত হয়েছে, তা আর্যদের দ্বারা লিখিত। তবে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই 'আর্য' কারা, তাদের আদি বাসস্থান বা কোথায় ছিল? এ নিয়েও নানান মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে জানা যায়, যে আর্যায়নের প্রসার ভারতীয় সভ্যতায় ঘটেছিলো প্রায় দুশো বছর ধরে এই ধরে নেওয়াও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। আর্যদের আদি বাসস্থান নিয়েও অনেক তথ্য আছে। আবার এও বলা যেতে পারে যে, আর্যগণ ভারতের বহিরাগত, নাকি ভারতেই তাদের আদি বাসস্থান, তবে এ বিষয়েও স্থির ও নিশ্চিত বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্তু নেই। আবার প্রত্নতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিক এবং বস্তুগত সাংস্কৃতিক জোরালো প্রমাণের ওপর নির্ভর করেই বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল পন্ডিতরাই মনে করেন যে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষীর মানুষদের একটা যাযাবর গোষ্ঠী ছিলেন আর্যগণ। তারা যে বাইরে থেকে ভারতে এসে হরপ্পা সভ্যতা ও পরে নতুন যে সভ্যতা তৈরি করেছিলেন এবং বৈদিক যুগেরও সূচনা আর্যরাই করেন। একথা আমরা এর আগেও বলেছি যে, আর্যরা ভারতের আদি অধিবাসী নন, এরা বাইরের দেশ থেকে ভারতে এসে 'সপ্তসিন্ধু' অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটান বলে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। সাধারণত খ্রিস্টঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ থেকে ৬০০ অব্দ সময়কাল বৈদিক যুগ নামে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পরিচিত। আর এই বৈদিক যুগের সূচনার মধ্য দিয়ে আর্যদের সামাজিক রীতি-নীতির ওপর নির্ভর করেই ভারতের হিন্দু সমাজের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় বলে আমরা ধরে নিতেই পারি।

আমরা প্রায় সকলেই কমবেশী জানি যে, ভারতীয় হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রাধান্য বিরাজমান। আর এই বর্ণাশ্রম কাঠামো থাকার জন্যেই হয়তো হিন্দু সমাজে নানা জাতির অবস্থান। সামাজিক পদমর্যাদার সিঁড়িতে কোন জাতি বা জাতের অবস্থান কোথায় বর্ণ সেটাই চিহ্নিত করে থাকে। এমতাবস্থায় আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সূত্রপাত ভারতীয় হিন্দু সমাজে কীভাবে হল? এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর পাওয়ার নিমিত্তে, ভারতীয় হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রের এবং সামাজিক রীতি-নীতির ইতিহাসের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে আমরা শিক্ষাবিদ রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা

স্মরণ করবো - "যে ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে আজ ভারতবর্ষ আকুল ঋক্‌বেদের আমলে কিন্তু জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়নি। তখন জাতি বলতে মাত্র দুটি শ্রেণি বোঝাত - আর্য বা অনার্য (বা দস্যু)। পরবর্তীকালে শূদ্রদের মত অনার্য জাতির লোকেরা সর্বত্র অসহায় অথবা ঘৃণ্য ছিল না বরং অনেক ক্ষেত্রে আর্য জাতির লোকেরা তাদের ভয় করে চলত। ইন্দ্রের নিকট আর্যবর্ণের করুণ প্রার্থনা ছিলঃ "হে ভগবান! নীচ বংশীয়দের ধন আমাদের প্রদান কর' (৩/৫৩/১৪)। এ ঋকের কাতরতা থেকে বোঝা যায় আর্যবর্ণের লোকরা অনার্য বা দস্যুদের যথেষ্ট সমীহ করে চলত।"[২৪] আলোচ্য অংশ থেকে বলা যেতে পারে যে, আর্য জাতির মানুষ পূজা-পার্বণ নিয়ে ব্যস্থ থাকার দরুন তাদের মধ্যে সৈন্যবাহিনী গঠন করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর অনার্য (দস্যুরা) সম্পদের পুনর্দখল করার জন্যেই হয়তো আর্য জাতির উপর আক্রমণ চালাতো। তবে এও কথা বলা যায় যে, অনার্যদের জীবনযাপনের মান ছিল আর্যদের থেকে বেশ খানিকটা কষ্টকর, ফলে তাদের মনে প্রানে পাপবোধও কম ছিল, কাজেই তারা পুরোহিত তথা শাসকের উপর আক্রমণ করত। আবার শাসকেরা পুরোহিতদের ব্যবহার করে অনার্য (দস্যুদের) মনে ধর্মীয় বিধান প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে, পরে অবশ্য অনার্যরা আর্যদের বিধানকেই মেনে চলতে বাধ্য হয়। আবার আমরা ঋগবেদে দেখতে পাই - অনার্য (দস্যুদেরকে) প্রতিহত করার জন্য হয়তো আর্যরা পেশী-শক্তি বাহিনীর গঠনের কথা ভাবে। পরবর্তীকালেই সেই পেশী-শক্তি বাহিনী ক্ষত্রিয় বর্ণতে পরিণত হয়। "ঋগ্বেদের কোথাও কোথাও ক্ষত্রিয় শব্দটি আছে, এখানে ক্ষত্রিয় অর্থে পৃথক কোন জাতি নয় বরং 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি বলবান অর্থে ব্যবহৃত।"[২৫] উক্ত উক্তি থেকে আমরা বলতে পারি যে, ঋগ্বেদের রচনার প্রথম দিকে যে সকল স্থানে ক্ষত্রিয় শব্দটা পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় বর্ণ হিসাবে ক্ষত্রিয় জাতির পরিচয় বহন করত না। কাজেই ঋক্‌বেদের ভাষ্যানুসারে সমাজের মানুষের মধ্যে যারা শক্তির অধিকারী বা বলবান হবেন তারাই ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিগণিত হবেন, যা কখনই বংশগত পরম্পরা অনুসারে হতো না।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, ঋগবেদের রচনার প্রথম পর্বে বর্ণাশ্রম কাঠামোর কড়াকড়ি তেমন একটা ছিল না। তবে ঋগবেদের রচনার শেষ পর্যায়ে বর্ণাশ্রম কাঠামোর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ভাষ্য অনুসারে বর্ণাশ্রম কাঠামো ছিল এই রূপ,

"যৎ পুরুষং ব্যদধঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন।
মুখং কিমস্য বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে।।১১

ব্রাহ্মণৌহস্য মুখমাসী দ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পড্যাঃ শূদ্রো অজায়ত।।১২

উক্ত বাক্যের চলিত বাংলায় অনুবাদ হল, "১১) পুরুষকে খন্ড খন্ড করা হয়েছিল? এর মুখ কী হল, দুই বাহু, দুই ঊরু, দু চরণ কী হল? ১২) এর মুখ ব্রাহ্মণ হল, দু বাহু রাজন্য হল, যা ঊরু ছিল তা বৈশ্য হল, দু চরণ হতে শূদ্র হল।"[২৬] ঋগ্বেদ সংহিতা থেকে আমরা জানতে পারলাম হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম কাঠামোর উৎপত্তি সম্পর্কে। তবে আমাদের একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, বাস্তবে কিন্তু চতুর্বর্ণের মধ্যে হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই সীমাবদ্ধতা না থাকার নানান কারণ আছে, যেমন সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ, আবার অন্যদিক আছে অর্থনৈতিক কারণ। তবে আমরা অর্থনৈতিক কারণ সম্পর্কে আলোচনার পরবর্তী অংশে করব। সামাজিক প্রেক্ষাপটে তথা শাস্ত্রীয় গ্রন্থে 'অস্পৃশ্য' নামে পঞ্চম বর্গের সন্ধান, আমরা পেয়ে থাকি। যদিও হিন্দুধর্মের আইন প্রণেতা মনু পঞ্চম বর্ণের হিন্দু সমাজে স্থান দেন নি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে, "বর্ণ ও আশ্রম। অবশ্য এই বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব বহু কাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বর্ণ চারটি- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি বর্ণ 'দ্বিজাতি' অর্থাৎ এদের দুবার জন্ম হয়, অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে একপ্রকার জন্ম হওয়ার পর দ্বিতীয় জন্ম উৎপাদক উপনয়ন বিধির মাধ্যমে, এই তিনটি বর্ণের পক্ষেই শাস্ত্র বিহিত। শূদ্ররা হল 'একজাতি' কারণ, এদের উপনয়ন রূপ দ্বিতীয় জন্ম নেই। উপরিউক্ত চারটি বর্ণ ছাড়া পঞ্চম কোন বর্ণ মনু স্বীকার করেন না।"[২৭] মনুসংহিতায় যতই উল্লেখ থাকুক না কেন পঞ্চম বর্ণের কোন অস্তিত্ব বা স্থান থাকবে না হিন্দু সমাজে কালের নিয়মে ও হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীল রীতি নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমেই বহু বর্ণ ও উপবর্ণের অস্তিত্ব আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। আবার এমন কথাও উল্লেখ করা যায় যে, ভারতের হিন্দু সমাজে যতবেশি দেব-দেবীর পূজো পার্বণ বেড়েছে, ততবেশি সমাজের বর্ণ ও জাতির উচু- নীচু ভেদাভেদ বেড়েই চলেছে।

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, ঋগ্বেদের 'পুরুষসূক্তে'র একটি বেশ বিতর্কিত মন্ত্র, আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে পুনরায় উল্লেখ কর হলো সেই সূক্তের -

"ব্রাহ্মণৌহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পড্যাঃ শূদ্রো অজায়ত।"[২৮]

বলে রাখা প্রয়োজন যে, -এই মন্ত্রটিকে অনেকেই ঋগবেদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত বলেন। অবশ্য যজুর্বেদের রাজসনেয়ী সংহিতাতেও (৩.১১)

মন্ত্রটির নিদর্শন পাওয়া যায়। যাইহোক উক্ত মন্ত্রটিরই অনুসরণে মনু লিখলেন - "লোকানাং তু বৃদ্ধ্যর্থ মুখ- বাহূরূপাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ।।(১/৩১)।।.......... ত্রিভুবনের প্রজাবৃদ্ধির জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজের মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করলেন, এখানে পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তিকে উপলক্ষ্য করে অনেকে মনে করতে পারেন,... মনু শূদ্রের হীনোৎপত্তির কথা বলেছেন এবং শূদ্র সম্বন্ধে তিনি অতি খারাপ মনোভাব পোষণ করতেন; এখানে চারবর্ণের উৎকর্ষ-অপকর্ষের প্রতি ইঙ্গিত থাকলেও, মন্ত্রকার ও মনুর প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল- এই চারটি উৎপত্তি স্থানের মাধ্যমে চারটি বর্ণের কর্তব্য ও কর্মের নির্দেশ দেওয়া। যেমন অধ্যাপনা প্রভৃতি কাজ ব্রাহ্মণের মুখ সাধ্য, তাই ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে; ক্ষত্রিয়ের কাজ বাহুসাধ্য যুদ্ধ; তাই সে ব্রহ্মার বাহু থেকে জাত; বৈশ্যের কাজ ঊরুর উপর নির্ভর, কারণ- পশুরক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন স্থানে গমন ঊরুর শক্তির উপর নির্ভর করে; তাই বলা হয়েছে ব্রহ্মার ঊরু থেকে উৎপন্ন। আর শূদ্রের কাজ পদকর্ম অর্থাৎ প্রভুর পদসেবা করা। তাই সে পদ থেকে জাত। শূদ্র- পক্ষে একটি বক্তব্য এই যে পায়ের উপরেই সমস্ত প্রাণী দাঁড়িয়ে থাকে; পা'ই সকলকে সচল করে রাখে। সমাজে বেদ পাঠ না হ'লে মানুষের প্রাণহানি হয় না; যা যুদ্ধ না করলে মঙ্গল ছাড়া ক্ষতি কিছু নেই; ব্যবসা-বাণিজ্যের দরকার ঠিকই সেজন্য বৈশ্যদের দরকার; কিন্তু শূদ্রদের জন্যে মনু যে সব কাজের বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন সেগুলির উপরই সমাজের প্রকৃত অস্তিত্ব নির্ভর করে। অতএব সমাজে মানুষের জীবন ও ধর্মকে স্থায়ী হ'তে হ'লে শূদ্র রূপ শক্ত পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রয়োজন।"[২৯] উক্ত আলোচ্য অংশে আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক নয় কী? ব্রহ্মার দেহ থেকে হিন্দু সমাজের মানুষের সৃষ্টি, এই যুক্তি কোনো বিজ্ঞান ভিত্তি আছে কী? শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় বিধানেই প্রামাণ্য রয়েছে। এছাড়াও পেশার দিক থেকেও মনুপ্রকল্পিত সমাজ অতীতে কার্যকর থাকলেও বর্তমান সমাজে মোটেও কার্যকর হয় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় দেশ রক্ষার কাজে অনেক শূদ্রদের নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। আবার কৃষিকাজে বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছে। শুধুমাত্র জুতো পালিশের কাজে উক্ত উচ্চ তিনটি জাতির মানুষ এখনও যুক্ত হননি; তবে জুতোর দোকানেও উচ্চ বর্ণের মানুষ যুক্ত আছেন কর্মী হিসাবে। অধ্যাপনা পেশার সঙ্গে সমাজের সব জাতের মানুষের সংযুক্ত হওয়ার প্রমাণ আছে। হিন্দু সমাজের কিছু নিচুজাতের মানুষেরা ব্রাহ্মণ ছাড়া পূজা-পার্বণ করলেও এখন

সমাজের বেশিরভাগ মানুষই ব্রাহ্মণ দিয়েই পূজা-পার্বণ করান। আজকের দিনে হয়তো এই টুকুই পার্থক্য পেশাগত দিক থেকে বিরাজমান।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, মনু কর্তৃক নির্দেশিত হিন্দু জীবনধারা, হিন্দু সামাজিক কাঠামোকে একটা বেশ রক্ষণশীল চরিত্র প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে, বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা হিন্দু পুনরুত্থানবাদের এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই বিবেচ্য বলেও আমরা মনে করতেই পারি। অতএব সৃষ্টি সম্পর্কে মনু বৈদিকশাস্ত্রে নির্দেশিত তত্ত্বকে আরও সংহত ও কর্মের রূপ প্রদান করেছেন। এই সম্পর্কে তাঁর নির্দেশকার কিছুর মর্মার্থ হলঃ

"87. But in order to protect this universe he, the most resplendent one, assigne separate (duties and occupations) to those who sprang from his mouth, arms things and feet,"

"সৃষ্টিকে রক্ষার জন্য মহানন্দময় প্রভু তাঁর মুখ, বাহু, ঊরু, এবং পদযুগল থেকে উত্থিত বিভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট কর্তব্যাদি নির্দিষ্ট করেছেন।"

88. To Brahmanas he assigned teaching and studying (the veda), salrificing for their own benfit and for others, giving and accepting (of alns)

"শিক্ষা প্রদান, অধ্যয়ন, যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান, অন্যের দ্বারা যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করানো, উপহার দেওয়া ও গ্রহণ করা – এই কর্মগুলিকে তিনি ব্রাহ্মণদের উপর অর্পণ করেছেন ।"

89. The kshatriya he commanded to protect the people, to bestow gifts to offer sacrifics, to study (the veda), and to abstain from attaching himself to sensual pleasure;

"জনগণকে রক্ষা করা, সম্পদ বিতরণ করে দেওয়া, যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করা, ইন্দ্রিয়গত সুখানুভূতিতে অনাকর্ষণ সংক্ষেপে এগুলি ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য।"

90. The vaisya to tend cattle, to bestow gifts, to offer sacrifices, to study (the veda), to trade, to lend money, and to cultivate land,

"পশুপালন, সম্পদ বিতরণ করে দেওয়া, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সুদী কারবার ও কৃষিকাজ এইগুলো হল বৈশ্যদের বৃত্তি ।"

91. One occupation only the lord prescribed to the Sudra, to serve meekly even these (other) three castes.

"ঈশ্বর শূদ্রদের জন্য একটাই কর্ম নির্দেশ করেছেন- তা হল কোনোরকম ক্ষোভ ব্যতিরেকে উপরোক্ত তিন জাতিকে সেবা করা ।"

92. Man is stated to be purer above the navel (then blow); hence the self-existent (svayambhu) has declared the purest (pait) of him (to be) his mouth.

"মানুষের নাভির উপরের অংশই পবিত্রতর বলে বিবেচ্য, তাই তাঁর মুখই ঈশ্বর কর্তৃক পবিত্রতম অংশ হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে।"

93. As the Brahmana sprang from (Brahmans) mouth, as he was the first-born, and as he possesses the veda, he is by right the lord of this whole creation.

"দিব্য পুরুষের শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ থেকে সৃষ্টি হওয়ার দরুন, তার প্রবীণতার দরুন এবং বেদকে রক্ষা করার দায়িত্বের দরুন ধর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণই হচ্ছে এই সমগ্র সৃষ্টির প্রভু।"

94. For the self-existent (svayambhu) having performed austerities, produced him first from his own mouth in order that the offerings might be conveyed to the goods and manes and that this universe might be preserved.

"স্বয়ম্ভু পুরুষ প্রায়শ্চিত্ত সাধনের পর তাঁর মুখ থেকে সর্ব প্রথম ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন- ঈশ্বরকে এবং অর্ঘ্য নিবেদনের উদ্দেশ্য এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষার উদ্দেশ্যে।"

102. In order to clearly settle his duties and those of the other (castes) according to the order, wise Manu sprung from the self- existent, composed these Institutes (of the sacred law).

"শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য জাতির কর্তব্য নির্ধারণের জন্য স্বয়ম্ভু পুরুষের পুত্র মনু এই বিধানগুলি নির্দেশ করে গেছেন।"

107. In this (work) the sacred law has been fuuly stated as well as the good and bad qualities of (human) actions and immemorial rule of conduct (to be followed) by all the four castes (varna).

"এই বিধানগুলিতে সমগ্র ধর্ম, মানবিক কাজকর্মের ভালো-মন্দ এবং চারটি জাতির মানুষের চিরন্তন আচার-আচরণ সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।"

108. "The rule of conduct is transcendent law, whether it be taught in the revealed texts or in the sacred tradition; hence a twice born man who possesses regard for him self, should be always careful to (follow) it."

"শাস্ত্র সকল এবং শাস্ত্রীয় ও ঐতিহ্যে নির্দেশিত এই আচরণ বিধিগুলি হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম, তাই আত্ম-সচেতন (আত্মিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষী) একজন দ্বিজের কর্তব্য এই বিধিগুলিকে কঠোরভাবে প্রতিপালন করা।"[৩০]

উপরিউক্ত হিন্দু সমাজের জাতি ব্যবস্থার কাঠামোর বর্ণনা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে মনু ধর্মীয় বিধানের মাধ্যমেই হয়তো সমাজের শোষণ ও উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিধান দিয়েছিলেন। তার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, মনুকল্পিত হিন্দুসমাজের জাতিব্যবস্থা - পরবর্তী সময়ে উৎপাদনের উপর ও উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মানের এবং কর্মের পবিত্রতা-অপবিত্রতার উপর ভিত্তি করে বহুসংখ্যক জাতিতে বিভক্ত হয়েছে। যার ধারাবাহিকতার প্রবণতা সমসাময়িক সময়েও কম বেশী আমরা দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করব ডি. ডি. কোসাম্বির মন্তব্যটি, তাঁর মতে, "A far more powerful secondary purpose appeared namely repression of the inner struggle of now classes. The vaisya (setter, husbandman) and sudra (helots) are to be exploited for the advantage of the rulling warrior caste, the ksatriya with the Brahmin priest's help."[৩১] প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, উৎপাদন কাঠামোর ভিন্নতার দরুন ভারতীয় হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ কাঠামো থেকে বহু সংখ্যক জাতি-উপজাতি বিভক্ত হয়ে পড়ে। নতুন নতুন উৎপাদক জাতি-উপজাতি গুলির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে নিরসন করার জন্য ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের সাহায্য নিয়ে বৈশ্য ও শূদ্রদের শোষণ করে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই ধরে নেওয়া থেকে বলা যেতে পারে যে, বাহু শক্তির সাথে সাথে শোষকজাতি ধর্মীয়বিধানের ভয় দেখিয়ে উৎপাদক জাতি-উপজাতিকে শোষণ করত। হয়তো এর ফলেই সমাজে ব্রাহ্মণের সামাজিক স্থান আরো উচ্চস্থানে বিরাজিত হয় বলে আমরা মনে করতেই পারি। আর এই মনে করার যুক্তির প্রামাণ্য হিসাবে আমরা ডি. ডি. কোসাম্বির নিম্নোক্ত মন্তব্যটি তুলে ধরব, তাঁর মতে, "A step towards Caste-Class specialization had been taken by the 19th century,

to the extent of assigning a particular (king, priest, soldier, farmer) profession- which was not obligatory – to each of the seven constituent clens. This provides an excellent parallel to the origin of Indian Brahmins."[৩২] বলা যেতেই পারে যে, আধুনিক যুগের বহুকাল পূর্বেই ভারতীয় হিন্দু সমাজে পেশাভিত্তিক জাতের উৎপত্তি হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণ জাতির স্থান যে সমাজের উচ্চস্থানেই বিরাজমান হয়েছিল এবং বর্তমানেও উক্ত ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। কাজেই আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণ জাতি রাজন্য শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দুর্বল জাতিকে শোষণ করার মধ্য দিয়েই নিজেদের ধর্মীয় রীতি-নীতিকে হাতিয়ার করে হিন্দু সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করেন।

ডি. ডি. কোসাম্বির একটা মন্তব্য থেকে আমরা অতি সহজেই অনুমান করতে পারি যে, উৎপাদনের মালিকানা ধরে রাখার জন্য রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণ জাতি কালের নিয়মেই নিজেদের স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে মানিয়ে নিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। কোশাম্বীর মতে, "The class adapted itself to various changes in the means and specially the relations of production, a good many of which can be discerned only through their ideological frame work. Under the circumstances, the formation of the caste deserve some attention; the successive changes it under went must be considered in their proper setting."[৩৩] এই মন্তব্য থেকে আবার এমন একটা কথাও বলা যেতে পারে যে, কোন জাতি কোন জাতে জন্মগ্রহণ করবে, তা - সুনির্দিষ্ট হয়, তার পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের দ্বারা বলে ধর্মীয়শাস্ত্রের মতাদর্শের উপর ভিত্তি করেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মনে করেন। তাঁদের মতানুসারে সুকর্মের অধিকারী উচ্চ জাতে যথা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতে জন্মগ্রহণ করে, আর দুষ্কর্মের অধিকারীরা নিচু জাতে যথা বৈশ্য বা শূদ্র জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। কাজেই যে জাতিভেদ কাঠামোর ভিত্তিতেই হিন্দু সমাজের মানুষেরা উচ্চ-নীচ ভাগেই বিভক্ত হয়ে পড়েন। আবার আমাদের ধর্মীয় শাস্ত্রে এই জন্মগত জাত পরিবর্তনেরও কোনো বিধান সম্ভবত নেই বললেই চলে। পেশা পরিবর্তন বা উন্নততর সামাজিক অবস্থান গ্রহণের চেষ্টাও হিন্দু শাস্ত্রে অনুমোদনীয় নয় বলে আমরা সকলেই কম-বেশি জানি। এককথায় সামাজিক অগ্রগতির ধ্যান-ধারণা বা হিন্দুদর্শন, হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তেমন উল্লেখ নেই বললেই চলে। নিচুজাতের মানুষ

উঁচু জাতের সমাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যেটা প্রথম বাধা হল জাতিভেদ প্রথা – যা, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতির উপরেই নির্ভর করে পরিবারের কুলমর্যাদা, অর্থাৎ বংশের উচ্চ-নীচ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়। আর এই অধিকার যে পরবর্তীসময়ে হিন্দুদের মধ্যে একটা দৃঢ়মূল ধারণা এনে ছিল, জাতিভেদ কাঠামোর ভিত্তিভূমি যা বংশানুক্রমিক, যার ফলেই হয়তো একটা নির্দিষ্ট অবস্থান নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং তার জন্মগত জাত আর পরিবর্তনীয় নয়। আবার অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, পরিবারের কুলমর্যাদা নির্ভর করত উৎপাদকের পেশার উপর, কিন্তু পরবর্তীকালে তা ধর্মীয়রীতির মাধ্যমে সামাজিকতা রক্ষার নাম করে, শোষক শ্রেনী দুর্বলজাতিকে শোষণ করার নিয়মে পরিণত করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা ডি. ডি. কোসাম্বীর মন্তব্য তুলে ধরব, তাঁর মতে, "Later when the unit of common holding become the joint family, which still survices in many part of Indian, the significance of gotra changed corresponding to mean, household' as well as clam. It was the form of property which gave its unity and name to the human group holding it in common."[৩৮] আবার এ কথা বলা যেতে পারে যে, সম্পত্তির যৌথ মালিকানা থেকে বংশ বা কুল ও গোত্র হিন্দু সমাজে পাকাপাকিভাবে কাঠামোগত দিকে চলে যায়। যার ধারাবাহিকতার নিদর্শন এখনও ভারতীয় সমাজে বিরাজমান।

বংশানুক্রমিক জাতি-ভেদ

ভারতীয় হিন্দু সমাজে বংশানুক্রমিক জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি, উৎপাদনের যৌথ মালিকানা নির্ভর কুল ও বংশ থেকেই। যার প্রচলন থেকে বেরিয়ে আসা সমসাময়িক সময়েও সম্ভব হয়নি বললেই চলে। হিন্দু সমাজজীবনের চরিত্রটা বেশ জটিল আকার ধারণ করল যখন থেকে পেশার ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ বংশের পরিচয় পাকাপাকি ভাবে কার্যকর হল। এমনকী চারজাতের মানুষদের পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে, সেই সন্তানের নামকরণের মধ্য দিয়েও তার জন্মগত প্রতিফলন ঘটে থাকে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা মনুর দুইটি বিধানের উল্লেখ করব।

31. "Let (the first part of) a Brahmana's name (denote something) auspicious, a kshatriya's be connected with power, and a vaishya's with wealth, but a sudra's (express something) contemptible."
32. (The second part of) a Brahmana's (name) shall be (a word) imphying happiness, of a kshatriya's (a word) imphying protection, of a vaisya's (term) expressive of thriving, and of a sudra's (an expression) denoting service."[৩৫]

উপরিউক্ত মনুর দুইটি বিধান থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, শুধু জন্মগত কারণেই হিন্দু সমাজে শূদ্র জাতির পেশা – শুধুমাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির সেবাকরার জন্যেই নির্দেশিত হয়েছে। শূদ্রজাতির সঙ্গে উচ্চ তিনটিজাতের মেলামেশার ক্ষেত্রেও মনু কঠোর বিধান দিয়েছেন, যার ফলে হিন্দুসমাজে কঠোর বংশগত জাতিপ্রথা তথা স্পর্শ-অস্পর্শ জাতির পরিবাহকতার তৈরি হয়। উক্ত বিষয়টিকে আরো পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য মনুর তিনটি বিধান নিম্নে তুলে ধরা যেতে পারে।

15. Twice- born men who, in their folly, wed wives of the low (sudra) caste, soon degrade their families and their children to the state of sudra's.
16. According to Atri and to (Goutama) the son of Utathya he who weds a Sudra woman becomes an outcaste according to saunaka on the birth of a son and according to Bhrigu he who has (male) off spring from a (sudra female, alone).
17. A Brahmana who takes a sudra wife to his bed, will (after death) sink into hell; if he begets a child by her, he will lose the rank of a Brahmana.[৩৬]

উপরিউক্ত বিধান গুলির উদ্দেশ্যেই ছিল বিবাহাদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে যাতে কোনোরূপ রক্তের সংমিশ্রণ যাতে করে না ঘটে। মনুর বর্ণিত উচ্চজাতের মানুষদের জাতিগত পবিত্রতা যাতে রক্ষিত হয়, তার জন্যেই হয়তো উক্ত বিধানগুলি প্রবর্তিত করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় হিন্দু সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা ভাঙতে হলে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন বলে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর মনে করতেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা Annihilation of Caste বইতে। মনু যে হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথাকে বেশ কিছু কঠোর নিয়মের মধ্যে বন্দী করে রাখার বিধান দিয়েছিলেন যা

আজকের দিনেও ভারতের হিন্দুসমাজে কম বেশী বিবাহের ক্ষেত্রে কঠোর ভাবে অনুসরণ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

উক্ত বিধানগুলির সঙ্গে সংগতি রেখেই মনু হিন্দুসমাজে অপরাধমূলক কাজ কর্মের জন্য যে ধরনের শাস্তির বিধান রেখেছেন, সেক্ষেত্রেও একই অপরাধের জন্য জাতিভেদের বিভাগ অনুযায়ী অপরাধের শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। অতএব উচুজাতের মানুষের জন্য একই অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, নীচু জাতের মানুষের জন্য সেই অপরাধের শাস্তির পরিমাণ অনেক কঠোর করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্নে মনুর আরও দুটি বিধানের উল্লেখ করে পার্থক্যটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করব।

268. A Brahmana shall be fined fifty (panas) to defaming a Kshatriya; in (the case of) a Vaisya the fine shall be twenty five (panas); in (the case of) a Sudra the fine shall be twelve (panas).

267. A Kshatriya, having defamed a Brahmana, shall be fined one hundred; a Vaisya hundred and fifty or two hundred; a Sudra shall be suffer corporal punishment.[৩৭]

উপরি উক্ত ২৬৮ নং নির্দেশে বলা হয়েছে কোনো ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় সঙ্গে মানহানিকর ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে জরিমানা হবে ৫০ পানাস। এইরূপ ব্যবহার বৈশ্যর সঙ্গে করলে ২৫ পানাস আর শূদ্রর সঙ্গে করলে ১২ পানাস। অথাৎ শূদ্রদের জন্য হিন্দুসমাজে উচ্চ তিনজাতির থেকে সর্বনিম্ন জরিমানা দিতেন ব্রাহ্মণেরা। আবার ২৬৭ নং নির্দেশ অনুসারে বর্ণের উচু-নিচু অবস্থানের উপর নির্ভর করত ব্রাহ্মণের সঙ্গে মানহানিকর ব্যবহার করার জন্য, এক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কে জরিমানা দিতে হতো ১০০ পানাস আর বৈশ্য দিতে হতো ১৫০-২০০ পানাস, আর শূদ্রের জরিমানা হতো দৈহিক শাস্তি। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, হিন্দুসমাজে শূদ্রদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করতেন উচ্চ তিনবর্ণের মানুষেরা। আর শূদ্ররা তা মেনে নিতে বাধ্য থাকত হিন্দু সামাজিক কাঠামোর রীতি- নীতির কারণেই।

এছাড়াও শূদ্রের ক্ষেত্রে উঁচু জাতের মানুষের বিরুদ্ধে কুবাক্য প্রয়োগ করলে কী ভয়ংকর শাস্তির বিধান করা হয়েছিল, সেগুলিও আমরা নিম্নে মনুর বিধান অনুসারেই উল্লেখ করব।

270. A once – born man (a Sudra), who insults a twice born man with gross invective shall have his tongue cut out; for he is of low orgin.
271. If he mentions the names and castes (gati) of the (twice – born) with contumely an iron nail, ten fingers long, shall be thrust red – hot into his mouth.
272. If he arrogantly teaches Brahmanas their duty, the king shall cause hot oil to be poured into his mouth and into his ears.[৩৮]

উপরি উক্ত ২৭০, ২৭১, ২৭২ নির্দেশগুলিতে দেখা গেল যে, ভয়ংকর শাস্তি দেওয়া হত হিন্দুসমাজের কঠোর নীতিরীতিকেও হিন্দুসমাজের ধর্মীয় বিধানের মাধ্যমে। অনেকসময় দেখা গেছে যে, রাজশক্তিকে হাতিয়ার করে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির বিধান দিয়ে তা কার্যকর করানোর নিমিত্তে হিন্দুরাজশক্তির ভয় কায়েম করতেন।

আবার ভারতীয় হিন্দুসমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলেই এই জাতিবিভাগ বা জাতিভেদ, তৎকালীন সমাজের উচুজাতি ও নিচুজাতিরই ভেদাভেদ প্রকট করেছিল, বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। বস্তুতপক্ষে শোষক ও শোষিতের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা হিন্দুসমাজের জাতিভেদের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়াটা আমাদের কাছে কঠিন। এই সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই ছিলেন শাসকজাতি এবং বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল উৎপাদক জাতি, তবে শূদ্রদের কোনো মালিকানা না থাকার দরুন সমাজের সর্বনিম্ন স্থানে তাদের অবস্থান ছিল।[৩৯] কাজেই ভারতের হিন্দুসমাজের শ্রমবিভাজনের নিয়ম অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য ও কঠোরতর কর্মগুলি শূদ্রদের সম্পন্ন করতেই হতো বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। তাইতো আর্থিক দিক থেকেও শূদ্ররা হয়ে পড়ে অনগ্রসর, ফলে হিন্দুসমাজে কোন দিক থেকেই তাদের সামাজিক সম্মান পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ভারতীয় সভ্যতা কৃষিনির্ভরশীল সভ্যতা, তা সর্বজনবিদিত। আর এই কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই সমাজের শোষকজাতি উৎপাদনের মালিকানার অধিকারে উৎপাদক জাতিকে শোষণ করেই চলেছে। প্রসঙ্গক্রমে, আমরা উল্লেখ করব - বৈদিক যুগের শেষপর্বে এবং বৈদিকযুগের ঠিক পরবর্তীকালে কৃষিকার্যের উৎপাদনে সম্প্রসারণের সঙ্গে তথাকথিত বাজারী অর্থনীতির সূত্রপাতের ফলে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা প্রবলভাবে সামাজিক প্রাধান্য

পেয়ে থাকেন, এবং অন্যদিকে সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে নিযুক্ত শূদ্রজাতি হীনতর সামাজিক অবস্থানে পরিগণিত হয়ে পড়েন। এই সময় সমাজের প্রধান উৎপাদকজাতি ছিলেন বৈশ্য ও শূদ্র জাতি। আবার তথাকথিত দাসদের এই শূদ্রদের মধ্যেও ধরা যেতে পারে উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে। বৈশ্যজাতি কৃষিজীবি এবং শূদ্রদের ভূমিকা ছিল কৃষিশ্রমিকের। এর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দৈহিক শ্রমে নিয়োজিত করা হতো[৪০] যা সমাজের দৃষ্টিতে হীনতর হিসাবেই পরিগণিত হতো। শূদ্রদের দিয়ে কৃষিশ্রমিকের যাবতীয় দৈহিকশ্রমের কাজগুলো সম্পাদন করা হতো অথচ তাদের পারিশ্রমিক অতি নগণ্য হারে দেওয়া হতো বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তখনকার দিনে কৃষিকাজের জন্য কলের লাঙ্গল তথা আধুনিক পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব ছিলনা, কাজেই শূদ্রদের দৈহিক সক্ষমতার উপরেই নির্ভর ফসলের ফলন। অনেক সময় শূদ্রদের দিয়ে জোর করে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজের দৈহিক শ্রমের কাজগুলো করে নেওয়াও হতো, যা বর্তমানেও কম বেশি দেখা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা একটা অনুমান করতেই পারি যে, ভারতীয় হিন্দুসমাজের রীতি-নীতি নির্ধারণ করা উক্ত বিধানগুলি তৎকালীন শাসকজাতির আদর্শগত ব্যবহারের প্রতিফলন করে। ফলত শাসকজাতি বিশেষ করে শূদ্রদের উপর শাসন শোষণ নির্যাতনের আদর্শগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মণবাদী শাস্ত্রকারগণ। মনুর রীতিনীতি তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী বিধানের ফলেই কায়িক শ্রমজীবী শূদ্রজাতিকেই দমন-পীড়ন এবং অধঃপতিত করে রাখবার ব্যবস্থার কথাই বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে শাসকজাতি তথা ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয় নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখবার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল মনুবাদী শাস্ত্রীয়বিধান। আবার মনুও বশিষ্ঠদের বিধানের মাধ্যমে শাসকটজাতির স্বার্থ ও ভাবাদর্শেরই প্রতিফলন ঘটানো।[৪১] কাজেই আমরা বুঝতে পারি যে, বৈদিকোত্তর যুগেও ঋষি এবং শাস্ত্রকারীরাও তদানীন্তন হিন্দুসমাজের শাসকজাতির স্বার্থরক্ষাকারী হিসাবে তাঁদের বিধান কঠোরভাবে সমাজে প্রচলন করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে আমাদের আরও উল্লেখ করতে হয় যে, হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা মূলত উৎপাদন শক্তির অগ্রগতির ফলে সৃষ্ট জাতি বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থারই অপর একটি পরিচয় বলেও ধরে নেওয়া যেতেই পারে। আমরা ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্র থেকে জানতে পারি যে, বৈদিকসমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজে পুরুষই ছিল উৎপাদক তথা শিকারী ও যোদ্ধা এবং সম্পত্তির মালিক, এটা অবশ্য শারীরিকশক্তির কারণেও অনেকটা বাস্তবায়িত হয়েছিল। আবার এই ভাবেও বলা যেতে পারে যে, হয়তোবা দৈহিক

সামর্থ্য বা জৈবিক কারণে নারীরা ছিল গৃহকর্ত্রী, ঘর সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ভারপ্রাপ্ত হয়ে পড়েন। সমাজের অগ্রগতির ফলে নারী-পুরুষের ভেদাভেদেও বেশ পার্থক্য গড়ে ওঠে। এর কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, পূর্বের গোষ্ঠীগত সাধারণ জমির খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ার কারণে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ঘটে – যা থেকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য তৈরী হয়েছিল।[৪২] এক্ষেত্রে শূদ্ররা একদিকে, ভূমিদাস হিসাবে জমিতে কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়ে পড়েন, অন্যদিকে, জমির মালিকানার অধিকারী পুরুষ হওয়ার ফলে, নারীর উপর পুরুষেরও অধিপত্যও বেশ বৃদ্ধি পায়। নারী পুরুষের পার্থক্যের প্রেক্ষাপটে আমরা অধ্যাপিকা কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি তুলে ধরব। তাঁর মতে, "ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই নারীর অবনমন শুরু হয়। নারীর গর্ভজাত সন্তানের পরিচয় হয় পিতার পরিচয়ে। অর্থাৎ নারীর গর্ভধারণের ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয় পিতৃতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। নারী বাঁধা পড়ে যায় পিতৃতন্ত্রের নিগড়ে। ধীরে ধীরে পরিবারে ও সমাজে পুরুষের একাধিপত্য এবং নারীর আনুগত্যই হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ নিয়মে। পুরুষের হাতে চলে আসে পরিবারের সার্বভৌম ক্ষমতা, আর নারী হয়ে পড়ে পুরুষের অধীন। পুরুষের স্থান হয় ঘরে-বাইরে সর্বত্র, আর পুরুষের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে পিতৃতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখার কারণে নারীর স্থান হয় গৃহের অভ্যন্তরে অবৈতনিক দাসীর সমপর্যায়ে। পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি সর্বত্র পুরুষ হয় ক্ষমতাবান, আর নারীকে আত্মদান করতে হয় পুরুষের সেবায়। এই হলো নারী-পুরুষ বৈষম্যের মূল সূত্র।"[৪৩]

ভারতীয় হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ভাবে জানার জন্য আমরা অধ্যাপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, "ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী সব নারীর আর্থসামাজিক অবস্থানই হল তথাকথিত শূদ্র, পাপী এবং পশুর সাথে একাসনে। তথাপি এবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রাচীনকাল থেকে আজপর্যন্ত সাধারণভাবে পাহাড়ে, বনাঞ্চলে, সমুদ্রপোকূলে এবং গ্রামের এক প্রান্তে বসবাসকারী (অন্তেবাসী) তথাকথিত শূদ্র, অস্পৃশ্য অন্ত্যজ, ব্রাত্য বা দলিত নারীরা উচ্চবর্ণের নারীদের থেকে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। স্বাধীনোত্তর ভারতেও সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (শূদ্র) নিম্নবর্ণের নারীদের অপেক্ষা উচ্চবর্ণের নারীরা অনেক বেশি সুবিধাভোগী।"[৪৪] উক্ত বক্তব্য থেকে আমরা একটা ধারণা করতে পারলাম যে, হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থান ছিল ভয়ঙ্কর অবহেলিত। আবার এই নারীদের মধ্যে

শূদ্রনারীদের অবস্থান ছিল আরো ভয়ঙ্কর। ফলে চতুর্বর্ণের মানদণ্ড নারীর ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এথেকেই আমরা বলতে পারি যে, শূদ্র নারী-পুরুষ সমভাবেই উঁচু জাতির দ্বারা শোষিত ও অবহেলিত হত।

ভারতীয় সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে কৃষির প্রসার ঘটলেও এবং খাদ্য উৎপাদন সমাজের সুখ বৃদ্ধি করলেও, ভূমি কর্ষণ সন্মানজনক কর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয় না। আবার এই কৃষিকাজ জনিত ভূমিকর্ষণকে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী উচ্চ বর্ণের জন্য এই কাজ নিষিদ্ধ ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা মনুর একটা বিধান উল্লেখ করব। তাঁর বিধানটি হল এইরূপ,

84. "(Some) declare that agriculture is something excellent (but) that means of subsistence is blamed by the virtous (but) that wooden (implement) with iron point injures the earth and (the beings) living in the earth."[৪৫] উৎপাদনশীল শ্রম সম্পর্কে সম্ভবত এটাই ছিল তদানীন্তন শাসকজাতির মনোভাব। জাতি-ভিত্তিক সমাজে কায়িকশ্রম এবং উৎপাদনশীলশ্রম কোনো যুগেই মর্যাদা পায়নি। বৈদিক যুগের শেষপর্ব থেকে সমাজে উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী জাতি - এই পরস্পর স্বার্থবিরোধী জাতির সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই উৎপাদনশীলশ্রম ও কায়িক শ্রম এবং শ্রমের উপর নির্ভরশীল শ্রমজীবী জাতির প্রতি শাসকজাতির অবজ্ঞা ও ঘৃণা শুরু হয় বলেও আমরা ধরে নিতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমরা কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, "ধর্ম শাস্ত্রের যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কায়েমী স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রেও ক্রমশ গড়ে ওঠা নগরে, বন্দরে ও বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিকের জোগানকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে চতুর্বর্ণ প্রথাকে বিভিন্ন পুরুষানুক্রমে বর্ণগত পেশার সাথে জড়িয়ে ফেলে শূদ্রের দাসত্ব ও দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করার পাকা বন্দোবস্ত হয়।"৪৬ এই মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, উপরিউক্ত বন্দোবস্ত সমসাময়িক সময়েও কম বেশি দেখা যায়।

আমরা আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, বহু বহিরাগত জাতি শক্তি ভারতে আক্রমণ ও শাসন করেছে। তাসত্ত্বেও মনুপ্রকল্পিত ভারতীয় হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথার পুরোপুরিভাবে অবলুপ্ত ঘটেনি । এবারে আমরা ভারতের হিন্দুসমাজে মধ্যযুগীয় জাতিব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব।

মধ্যযুগে ভারতের হিন্দু সমাজের গঠন কাঠামো

মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কতকগুলি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, আর এই রাষ্ট্রগুলিতে রাজতন্ত্র ছিল প্রধান রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক তথ্য ও সূত্র থেকে জানা যায় যে, রাজতন্ত্র ছিল মূলতঃ বংশানুক্রমিক। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক রচনায় নির্বাচিত রাজতন্ত্রের কথাও উল্লেখ আছে।[৪৭] তবে রাজতন্ত্র নিয়ে মতপার্থক্য যাই থাক না কেন, সেই প্রসঙ্গ পরিহার করে হিন্দু সমাজের জাতি-ভেদ কাঠামো নিয়ে আলোচনা, মনোনিবেশ করব।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে ভারতের হিন্দু সমাজের উদ্বৃত্ত উৎপাদন-এবং তার সঙ্গে শ্রমবিভাজন, উঁচু-নিচু জাতিতে ভেদাভেদের অনুসারে - চার বর্ণের বা জাতির মধ্যে শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সময়ও সর্বাপেক্ষা নিচুজাতের কাজ বা শাসক জাতির দৃষ্টিতে ‘হীনতর’ কাজ যাদের দেওয়া হল - তখনকার সামাজিক আইন প্রণেতারা তাঁদের ‘অস্পৃশ্য’ বলে অভিহিত করেন। সাধারণভাবে শূদ্রজাতির মানুষেরা সমাজের নিচুস্তরের কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও শূদ্র জাতিকে ‘অস্পৃশ্য’ আখ্যা দেওয়া হয়নি। আবার শ্রম-বিভাজনের বিকাশের ফলে শূদ্রদের একাংশকে অবশেষে ‘অস্পৃশ্য’ স্তরে টেনে নামানো হলো। সামাজিক শ্রম-বিভাজন ক্রমবর্ধমান এই ‘হীনতর’ অথচ অতি প্রয়োজনীয় কায়িক শ্রমে নিযুক্ত মানুষেরা সমাজের দৃষ্টিতে ‘অস্পৃশ্য’ জাতি হিসাবে পরিগণিত হল এবং হিন্দুজাতি বিভাগ যেহেতু বংশগত, সেই ভাবেই সমাজের ও ধর্মের শাস্ত্রপ্রণেতাদের নির্দেশ মতো এই ‘অস্পৃশ্য’ জাতির মানুষেরাও হলো বংশগত।[৪৮] কাজেই জাতিবিভাগে এদের উচুজাতিতে উত্তরণের কোনো সুযোগ আর শাস্ত্রসম্মত রইল না বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে, আমরা অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি তুলে ধরব, তাঁর মতে, “মনুসংহিতায় শূদ্রদের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র আঁকা হয়েছে তার মধ্যে অনেক স্থানেই শূদ্রদের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁদের অবস্থানকে অনেকখানিই হেয় প্রতিপন্ন করা হলেও সমাজে শূদ্রদের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা তাঁদের সামগ্রিক বৃত্তি সমূহের নির্দেশের মাধ্যমেই স্বীকৃত হয়েছে। মনু - প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও শূদ্রের করণীয় কর্মের যে দীর্ঘ তালিকা তিনি দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায় - সমাজের প্রধান মনুষ্য জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের চেয়ে শূদ্রের দায়িত্ব ছিল অনেক বেশী।”[৪৯] এই মন্তব্য থেকে একথাও বলা যেতে পারে যে, শাসক জাতি নিজেদের প্রয়োজনেই সমাজে শূদ্রদের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক শূদ্রকে জলচল শূদ্রজাতি হিসাবে

স্বীকৃতি দেন। আর বহু সংখ্যক শূদ্রদের 'অস্পৃশ্য' শূদ্র জাতি হিসাবে স্বীকৃত দেন। রামশরণ শর্মা উল্লেখ করেছেন, "ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ শূদ্রদের দুটি ভাগে ভাগ করেছেন – সৎশূদ্র এবং মিশ্রজাতি। মিশ্রজাতিকে পতিত ও অধম বলা হয়েছে। এরা সম্ভবত অস্পৃশ্যভাগের প্রতিনিধিত্ব করে।"[৫০]

আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম এবং পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তীয় সময়ে ভারতের সমাজে, চিন্তার জগতে বিশেষ আলোড়ন পরিলক্ষিত হয়। অনেক ঐতিহাসিক তথা সমাজবিজ্ঞানীরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে এই সময়টা সমগ্র জগতের ভাবগত দিক থেকে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, এই সময়ে গ্রিসে প্রাচীন দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটে প্রখ্যাত হিব্রুআধ্যাত্মিক পুরুষদের, চীনের কনফুসিয়াস এবং সম্ভবত পারস্যের জরাথুস্ট্রের আবির্ভাব ঘটে এই সময়ের মধ্যেই।[৫১] আর ভারতের এই সময়কার কথা খুব সুন্দর ভাবে উল্লেখ করেছেন লেখক সুকোমল সেন। তাঁর মতে, "বেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ঔপনিবেশিক ঋষিদের এবং অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধবাদী এবং বেদকে প্রত্যাখ্যানকারী ধর্মগুরু ও প্রচারকদের অভ্যুদয় ঘটে। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সকল মতবাদ হিসাবে জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটে।"[৫২] এই মন্তব্য থেকে বলা যেতেই পারে যে পূর্বতন বংশগত সংগঠন ভেঙ্গে সংগঠিত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং উৎপাদন শক্তি অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের একাংশের জীবন মানের যে অপেক্ষাকৃত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং অপরদিকে বৃহত্তর জনগণের জীবনে যে দুঃখ ও দুর্দশার তীব্রতা সৃষ্টি হয়, তা ভারতের সমাজ জীবনে নতুন নতুন মৌলিক চিন্তাধারার বস্তুগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আবার আমরা ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মার মন্তব্য থেকে জানতে পারি যে, "আদিমধ্যযুগ ছিল জাতি বিস্তার এবং খণ্ড বিচ্ছিন্নতার যুগ। প্রচলিত বর্ণ অনেকগুলি জাতির জন্ম দিয়েছে এবং প্রচুর নতুন উপজাতি এবং জাতি তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাংলার তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, দশম শতাব্দীতে বৃহৎ-চত্তিবন্নমা বা ছত্রিশটি বর্ণের বাসভূমি নামে একটি গ্রাম ছিল। বর্তমান বিহারে এই ধরনের নামের কতগুলি গ্রাম আছে। এগুলির সূত্রপাত সম্ভবত মধ্যযুগে।"[৫৩]

আদিমধ্যযুগে জাতের শ্রেণীভেদ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেলেও সমাজে বেশ কিছু সংখ্যক শূদ্রজাতির অস্পৃশ্য পরিচয় বহন করতে হয়। তবে এই সময় শূদ্রের মধ্যে বহুসংখ্যক জাতিতে বিভাজন হয়ে পড়লেও সমাজের আমূল পরিবর্তন তেমন হয়নি, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের ক্ষমতা মোটামুটি ঠিকই রাখা হয়। বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সমাজে প্রচলন ঘটলেও জাতিভেদ প্রথা কি অবলুপ্ত হয়েছিল, সেটাই

আমাদের সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। আমরা সকলেই প্রায় কমবেশি জানি যে, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মূলত আগ্রহ বৌদ্ধধর্মের সামাজিক আবেদনকে কেন্দ্র করেই। হিন্দু সমাজের কঠোর জাতিভেদের এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বিকল্প হিসাবে একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাবাদী ধর্মমত হিসাবেই সাধারণভাবে পরিচিত।[৫৪] সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়িত জাতিগুলির প্রতি সহানুভূতিমূলক এবং জাতিভেদের বিভেদ উৎপীড়নের একটা সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবেও বৌদ্ধধর্ম বিবেচিত হয় বলে মনে করা যেতেই পারে।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে জাত এবং শ্রেণী এই উভয়প্রকার সামাজিক বিভাজনেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। জাত অর্থে মানুষের জন্মসূত্রে সামাজিক কাঠামোর অবস্থান এবং শ্রেণি অর্থে উৎপাদনের উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও অবস্থানকে এখানে বোঝানো হয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি। জাতি বিভাজনের ক্ষেত্রে বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পণ্ডিতদের একাধিক মতবাদ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে T. W. Rhys Davids উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, "বুদ্ধ সংঘের মধ্যে জাতিভেদ, জন্ম, পেশা ইত্যাদির বিচার তো করতেনই না, উপরন্ত সঙ্ঘের বাইরেও তিনি এই জাতিভেদের ভেদাভেদের বিরুদ্ধে একটা যুক্তিসংগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য প্রচার করেছেন।"[৫৫] বলা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে রিস ডেভিডসও বলেন যে, বুদ্ধ জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন।

আবার বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের আরেকজন সুপণ্ডিত Dr. Hermann Oldenbarg William Hoey মতামত পোষণ করেন যে, সংঘের ক্ষেত্রে বুদ্ধ জাতিভেদ মানতেন না। "বুদ্ধের সঙ্গে জাতের ভেদাভেদ ছিল না। যেই বুদ্ধের শিষ্য হবে তাকেই জাত ত্যাগ করতে হবে।"[৫৬] Oldenbarg বুদ্ধের শিক্ষা থেকে একটি উদাহরণ দিয়েছেন, বুদ্ধ বলেছেন, "হে শিষ্যবৃন্দ, যেমন মহা-নদীগুলি, সেইগুলি যত বেশি সংখ্যাই হোক না কেন, যেমন গঙ্গা-যমুনা, অচিরাবতী, সুরভু, মহা যখন তারা সাগরে পৌঁছায়; তখন তারা তাদের পূর্ব নাম এবং উৎস হারিয়ে ফেলে এবং শুধু একটা নামই বহন করে "মহাসমুদ্র"। বিজ্ঞ আমার শিষ্যবৃন্দ, ঠিক অনুরূপভাবেই এই চার জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যখন তারা পরম ন্যায়পরায়ণ কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ ও নিয়ম অনুযায়ী তাদের গৃহত্যাগ করে গৃহহীন হয়, তখন তারা পূর্বতন পৈতৃক নাম হারিয়ে ফেলে এবং মাত্র একটি অভিজ্ঞতাই বহন করে "শাক্যবংশের পুত্র অনুসরণকারী সন্ন্যাসী।"[৫৭] বুদ্ধের মুখনিঃসৃত আরও নানা বাক্যের উদাহরণ দিয়ে ওল্ডেনবার্গ দেখিয়েছেন সংঘের সদস্যদের ক্ষেত্রে বুদ্ধ জাতের অন্তরায় স্বীকার করেন না। ওল্ডেনবার্গ

এই ভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন যে, যে মানুষ সংসার ত্যাগী এবং পার্থিব ভোগ সুখে যার আগ্রহ নেই তার কাছে জাতিভেদের ও কোন মূল্য নেই। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদের তেমন কোনো কঠোর ছিলনা বললেই চলে। ওল্ডেনবার্গ এই কথা বলতে ভুলে যাননি যে, "বুদ্ধ জাতিভেদ প্রথা বিলোপের কোনো কথা বলেননি বা সংঘের বাইরে যে বিশাল জনগণ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথার কঠোর বিধি শিথিল করবার পক্ষেও কোনো কথা বলেননি।"[৫৮] উক্ত মন্তব্য থেকে বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধও ভারতের হিন্দুসমাজের জাতিভেদ ভাঙবার বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য বাদের সঙ্গে সংঘাতে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না । কাজেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের ভিত্তি বেশ শক্তভূমির উপর নির্মিত।

ওল্ডেনবার্গ আরো একটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন, এইভাবে, "....এটা দেখা যায় বাস্তবে বুদ্ধের চারিদিকে ঘিরে থাকা শিষ্যদের গঠনে এবং বিশেষ করে প্রথম দিকের মতগুলির গঠনে সাম্যের তত্ত্বের সঙ্গে খুব সংগতি ছিল না; যদিও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যই পরিপূর্ণভাবে মেনে নেওয়া হয়নি, তথাপি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মে অতীতের উত্তরাধিকার হিসাবে অভিজাততন্ত্রের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি।"[৫৯] উপরিউক্ত উদাহরণ গুলি থেকে আমরা একটা অনুমান করতে পারি যে, ভারতীয় হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার কাঠামোই ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর নিয়মের বাইরে বের করে আনার ক্ষমতা বা সাহস দেখানো বেশ কঠিন সমাজসংস্কারের কাজ। বলে তবে, পরবর্তী সময়ে ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের প্রভাব ভারতীয় সমাজে পড়লেও হিন্দুসমাজের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা, তাদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। কিন্তু হিন্দুসমাজের ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে ভারতের বর্ণবাদী সমাজের কড়াকড়ি কিছুটা কমে যায় বলে সামাজিক ঐতিহাসিকদের তথ্য থেকে আমরা পেয়ে থাকি। তবে হিন্দুসমাজ থেকে যেসকল হিন্দুরা ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে গেলেও হিন্দু বর্ণবাদী ও জাতিগত উচু-নীচু ভেদাভেদের নিরিখে তারা ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে স্থান পেতেন বলে অনেক সামাজিক ঐতিহাসিক তুলে ধরেছেন।

আবার এমন একটা কথা বলতে পারি যে, বৌদ্ধধর্ম হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করেছে মুখ্যত একটি সামাজিক আন্দোলন হিসাবে নয়। ফলে ঐ সমাজের জাতিভেদ প্রথা অস্পৃশ্যতা বা ক্রীতদাসত্বের অবসানের জন্য বুদ্ধ কোনো সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অস্বীকার করলেও ব্রাহ্মণ্যবাদের ফলাফল- চতুর্বর্ণ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা তিনি বৌদ্ধ সংঘের বাইরে প্রায় মেনেই নিয়েছিলেন।[৬০] মনে করা হয়, তাঁর কাছে এগুলি ছিল অপরিবর্তনীয় বাস্তব।

আর এর ফলে হয়তো ঐ যুগের শাসকজাতির পক্ষেও এই ধর্ম গ্রহণের কোনো বাধা ছিল না। সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হিসাবেও পরিগণিত হলো ভারতীয় সমাজে। কাজেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও আতিশয্যের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ হিসাবে ভারতের সামাজিক-ধর্মীয় ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম তার কালের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।[৬১]

প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে, হিন্দুধর্মের চরম গোঁড়ামি, ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য, জাতি-ভেদ প্রথা অস্পৃশ্যতার নিদারুণ অত্যাচার ও অবিচারের বিকল্প হিসাবে বৌদ্ধ সংঘগুলিতে যে সাম্যের একটা আবহাওয়া বুদ্ধ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, বোধহয় ভারতের জনগণের এক বিশাল অংশের কাছে তাই ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রধান আবেদন।[৬২] তাই, হয়তো, আধুনিককালে ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর এবং তাঁর অনুগামীরা যখন হিন্দুসমাজের জাতি-ভেদ প্রথার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তখন হয়তো তাঁরা বৌদ্ধধর্মের এই সামাজিক দিকটার দিকেই মূলত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বলা যেতে পারে যে, আম্বেদকর বা তাঁর অনুগামীরা এটা অনুধাবন করতে পারেনি যে বৌদ্ধধর্ম আপাতদৃষ্টিতে সাম্য ও মুক্তির কথা বললেও হিন্দুধর্মে গভীরভাবে পোষিত জাতি-ভেদ ও অস্পৃশ্যতার ভিত্তিভূমিকে অবসানের কোনো দাবি বুদ্ধ উত্থাপন করেন নি। বুদ্ধ এমনকী বুদ্ধ নারীদের সম্পর্কে তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেননি, বরং বুদ্ধ কতৃক তা সমর্থিতই হয়েছিল।[৬৩] উক্ত উক্তি থেকে আমারা বলতে পারি যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেও ভারতের হিন্দু সমাজের বর্ণ কাঠামোকে যথাযথ ভাবে চূর্ণ করার তেমন কোনো মতামত গড়ে তুলতে পারেনি। যাইহোক ভারতের সামাজিক ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের স্থান উক্ত বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচ্য বলেই ধরা যেতে পারে।

ভারতীয় সমাজে ইসলাম ধর্ম আগমনের ফলে হিন্দুসমাজের প্রেক্ষাপটের কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কিনা সেই সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের বলে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের হিন্দুধর্মের কাঠামোর কঠোরতা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে মধ্যযুগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেব-দেবী পূজার কঠোর আচার-আচরণের ভিত্তিতে গোঁড়া হিন্দুরা সামাজিক গোড়ামীর পথকে সুদৃঢ় করেছিল ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু রাজাদের সম্মিলিত শক্তি যখন তুর্কি আক্রমণ কারীদের নিকট পরাস্ত হলো, তখন থেকে ভারতে উত্তরপ্রান্তে হিন্দুধর্মের কঠোর বিকাশের পথে আঘাত পড়ে

বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আবার দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে তুর্কিদের বিজয়ের ফলেই যে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং মুসলিম ধর্ম ও চিন্তা ভারতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে, তা সহজে অনুমান করা যায়।[৬৪]

হিন্দুধর্ম বিশ্বাস ও সমাজনীতির কাঠামো থেকে ভিন্নতর এক ধর্ম, বিশ্বাসও সমাজনীতি - ইসলামের মধ্য দিয়ে ভারতে আবির্ভূত হল। কাজেই এটা ছিল একটা সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি। ফলে শুধু রাজনৈতিক নয়, ভারতের ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনে এর প্রভাব ছিল সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী। এই সম্পর্কে আমরা এবার সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব। বলা হয় যে, অষ্টম শতাব্দীর সূচনায় (৭১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে) উত্তর দিক থেকে আরব আক্রমণকারীর ভারত অভিযান চালিয়ে সিন্ধু দেশ জয় করে সেখানে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তারপর একাদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ভারত বারে বারে তুর্কি বংশোদ্ভূত মুসলমান শাসকদের আগ্রাসন ও আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত অভিযান করেন তাঁরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার নামে। তারপর ১২১১ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সময় থেকেই দিল্লিতে সুলতানশাহীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[৬৫] কাজেই হিন্দুধর্ম প্রধানত জনসাধারণের ধর্ম ছিল। এখন তার পাশাপাশি ভিন্নতর বিশ্বাস ও সামাজিক রীতি-নীতি নিয়ে আরেকটি অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন নির্দেশ ও নিয়মকানুনে আবদ্ধ ধর্ম ভারতীয় সমাজে স্থান গ্রহণ করল এবং উত্তর ভারতে সেই বহিরাগত ধর্ম অর্থাৎ ইসলামই হলো রাজধর্ম। ফলে ধর্মবিশ্বাস ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটা নতুন পরিস্থিতি তৈরি হল ভারতীয় সমাজে।

দিল্লির সুলতান শাহীর আমলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ধর্মে পরিণত করা হয়। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এই নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়। তার মধ্যে একটি অংশ বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়, আর অন্যেরা নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবার আশায় দীক্ষিত হয় - কেননা একমাত্র মুসলিম ধর্মাবলম্বীর পক্ষেই সম্ভব ছিল তখন সরকারের উচ্চ পদ পাওয়া। এছাড়া তৃতীয় একটা অংশ এই পথ অবলম্বন করেছিল অ-মুসলমানদের উপর মাথাপিছু কর ধার্য করা (মাথাই) বা জিজিয়া এড়িয়ে যাওয়ার উপায় হিসাবে। চতুর্থ উঁচু-নীচু জাতিভেদ গ্রস্ত হিন্দু সমাজের নীচু বর্ণের অনেক মানুষ ধর্মান্তরকরণ মেনে নেন হয়তো হিন্দুসমাজে তাদের সামাজিক অবস্থানের অসুবিধা গুলি থেকে মুক্তি পাবার আশায়।[৬৬] এর ফলেই হয়তো ভারতে মুসলিম ধর্মাবলীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে- যেমন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের পরিস্থিতিতে বহুসংখ্যক প্রাক্তন বৌদ্ধ এই নতুন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করার পরিণামে মুসলমানরাই পরিণত

হলেন জনসংখ্যার সংখ্যা গরিষ্ট অংশ। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত সম্পর্কে, আর তরফদার মন্তব্য করেছেন, এইভাবে "মুসলিম শাসনকালে শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে আনুকূল্য পাওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াও ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণপ্রথার বিপরীতে ইসলাম ধর্মের উদারনীতির প্রতি একটা স্বাভাবিক সামাজিক আকর্ষণ ছিল। সুতরাং একই সাথে নিম্নশ্রেনীর বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় সামাজিক সাম্যের আদর্শের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক পার্থিব লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ইসলামধর্মে ধর্মান্তর অনিবার্য করে তুলেছিল।"[৬৭]

তবে একথাও বলা যেতে পারে যে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য এখানে ভারতে মুসলিমধর্ম আগাগোড়া দুটি প্রধান ধর্মের একটি হয়েই থেকেছে। মুসলমানদের দ্বারা বিজিত অন্যান্য দেশের মতো ভারতে ঐ ধর্ম একমাত্র ধর্ম হয়েই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, হিন্দু ধর্মালম্বীদের ব্যাপক সংখ্যাধিক্যই বরং বজায় থেকেছে, ফলে মনে করা যেতে পারে যে, মুসলমান শাসনকালেও ভারতের হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথার ব্যাপক অবসান হয়নি। যদিও দিল্লির সুলতানশাহীর শেষ দিকে মুসলমানরা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই শাসক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন, তবুও জাতিভেদপ্রথা অস্পৃশ্যতার কোনোরূপ অবনমন ঘটাতে অক্ষমই হয়েছেন মুসলমান শাসকরা। D. D. Kosambi লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, "This did not prevent, the Muslims who had settled upon the land from steadity becoming, in their own way, as superstitions as and more bigoted then the Hindus- due to the idiocy of village life."[৬৮]
ভারতীয় সভ্যতায় হিন্দু ও মুসলমান - এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অবস্থানের ফলে এদের মধ্যে সময়ে সময়ে পারস্পারিক সংঘর্ষ সংঘটিত হলেও মুসলমান প্রশাসকদের দ্বারা হিন্দুদের উপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি আক্রমণ – এর ঘটনা ঘটে। একই দেশের মাটিতে দীর্ঘ কয়েক শত বছরের সহ অবস্থানের ফলে দুটি সম্প্রদায়ের উপর পারস্পারিক প্রভাব বিস্তার এবং ধর্মবিশ্বাস ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সংমিশ্রণও ঘটে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমরা D. D. Kosambi,র একটি মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, "The Hindu Temples had begun to attract some Muslim also, and were hence fourth systematically broken up the autocrat."[৬৯] এই মন্তব্য থেকে এটাও বলা যেতে পারে যে, শাসক

সম্প্রদায় তার শাসন- শোষণ কার্যকর করার জন্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ তথা জাতিভেদ প্রথা টিকিয়ে রাখার নানা কৌশল অবলম্বন করেন ।

রক্ষণশীল ইসলামকে ভারতীয় জাতিভেদ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং ব্যাপকভাবে একে গ্রহণীয় করে নেওয়ার ব্যাপারে একটা প্রচেষ্টা শুরু হয় মোগল শাসক সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে। আমাদের বলে রাখা প্রয়োজন যে, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবরের আক্রমণের মধ্য দিয়েই মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা হয় এবং আনুমানিকভাবে এর সমাপ্তি ঘটে ১৮৫৮ সালে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুরশাহকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক নির্বাসনের মধ্য দিয়ে।[৭০] মোগল সম্রাট আকবর ইসলামকে সর্বজন গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে একটা ধর্ম সংস্কারের প্রচেষ্টা করেন। শৈশবকালে কাবুলে আকবর শিয়া মতবাদ এবং পারসীয় কবিদের অতীন্দ্রিয়বাদী তত্ত্বের প্রভাবে আসেন। অবশ্য ভারতের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার পর “তাঁর রাজসভায় ধর্মগুরু ও প্রচারকরা সকলেই ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। আকবর নিজেও সুন্নী তীর্থস্থান আজমীর এবং সিক্রি প্রদর্শন করেন। তাঁর সুন্নী কর্তাব্যক্তিদের হাতে শিয়াদের নিগ্রহের সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন বলে জানা যায়।”[৭১] ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই নিগ্রহ ব্যাপক হিংস্ররূপ ধারণ করে। আবার আকবর এক রাজপুত রমণীকে বিবাহ করেন এবং মান সিং ও টোডরমলকে রাজসভায় আসীন করেন। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি আবুল ফজল এবং তাঁর পুত্র ফাইজার দ্বারা ধর্মীয় বিষয়ে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে পড়েন বলে মনে করা যেতে পারে। ফতেপুর সিক্রীতে আকবরের পরিচালনায় যে ধর্ম আলোচনা সভাগুলি অনুষ্ঠিত হতো, সেখানে ‘সুন্নি’ উলেমা, ‘সুফি’ শেখ, হিন্দু পন্ডিত, পারসী, জরাথুস্ট্রপন্থী, জৈন এবং গোয়া থেকে আগত ক্যাথলিক ধর্ম গুরুরাও আমন্ত্রিত হতেন এবং এই ধর্ম আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এই ধর্ম আলোচনা সভাগুলিতে স্বভাবতই সুন্নি উলেমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিলনা।[৭২] উপরিউক্ত ধর্মীয় আলোচনা সভা থেকেই আমরা দেখতে পেলাম যে, ইসলাম ধর্মের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে আকবরের ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে বিরূপতারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যাই হোক এই সময় “আবুল ফজল আকবর নামার মধ্যে নানা অ-মুসলিম ধর্মগুলি সম্বন্ধে এবং একই সঙ্গে ‘ধর্মবিরোধী’ মতবাদ গুলি সম্বন্ধেও একটা আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন। এই ‘ধর্মবিরোধী’ মতবাদগুলি ঐ সময়ে সামন্ততন্ত্রের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরোধিতায় তাত্ত্বিক রূপ হিসেবেই উপস্থিত হয়েছিল।”[৭৩] কাজেই আমরা বলতে পারি - শাসক আকবরের সময়কালে ভারতীয় হিন্দুসমাজে জাতিভেদপ্রথার রক্ষণশীলতার উপরও একটা আঘাত আসে।

আবার হিন্দু ধর্মের প্রতি আকবরের আগ্রহের আরও প্রমাণ পাওয়া যায় অথর্ববেদ, রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদের জন্য তাঁর নির্দেশের মধ্য দিয়ে। আকবরের প্রবল বিরোধি গোঁড়াপন্থী সুন্নী ঐতিহাসিক আব্দুল-কাদির-বদাউনের বিবরণীতে আকবর গোহত্যা এবং বিশেষ কয়েকটি দিনে মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ বিবরণীতে আরো উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি কিছু কিছু অ-মুসলিম ধর্মীয় উৎসবও পালন করতেন। এই সময় আকবর পরিচিত হন "হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে এবং সেই পারসি জৈন ও খ্রিস্টধর্মের সঙ্গেও। আকবর তাঁর দরবারে কিছু কিছু হিন্দু ও ফরাসি নিয়ম-কানুন প্রচলন করার প্রচেষ্টা করেন। এর ফলে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে আকবর রক্ষণশীল মোল্লাতন্ত্র কর্তৃক এক সাংঘাতিক ধরনের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। এই অভ্যুত্থানের কেন্দ্র ছিল বাংলা ও পাঞ্জাব।"[৭৪] বলা যেতে পারে এই সময় রক্ষণশীল মুসলিম তথা হিন্দুরাও আকবর - এর বিরোধিতা করেন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, আকবর যেকোনো ধরনের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তা বন্ধের জন্য জবরদস্তির পক্ষপাতী ছিলেন না। মুসলমানদের নামাজ পাঠের বিরোধিতা করলেও বলপ্রয়োগ করে তা বন্ধ করার বিরোধী ছিলেন না আকবর। কিন্তু আকবরের এই ধর্মীয় আচরণের নীতিকে রক্ষণশীলরা আকবরের ইসলাম বিরোধিতা বলে প্রচার করবার চেষ্টা করে। "এমনকী ১৬০১ সালে পুত্র সেলিম যখন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন আকবর ইসলাম-বিরোধী এবং এমনকী নামাজ বন্ধ করার আদেশও দিয়েছেন ইত্যাদি প্রচার করে মুসলিম জনগণকে আকবরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে।"[৭৫] প্রসঙ্গক্রমে আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, "আকবর হিন্দুদের কিছু কিছু ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিলেও হিন্দুদের মূর্তি পূজার প্রবল বিরোধী ছিলেন এবং সতীদাহ প্রথার সমালোচক ছিলেন। অথচ আকবরই আবার হিন্দুদের ওপর আরোপিত তীর্থকর (১৫৬৩) ও জিজিয়া (১৫৬৪) প্রত্যাহার করেন এবং এমনকী বৃন্দাবনের কোনো কোনো হিন্দু মন্দিরের জন্য অর্থ সাহায্যও ঘোষণা করেছিলেন- যদিও কোনো দিনই তিনি এ- সমস্ত মন্দির দর্শনে যাননি।"[৭৬] বলা যেতে পারে যে সম্রাটের দায়িত্ব একটা সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করা, সমস্ত ধর্মের মর্মবাণী অনুধাবন করার মাধ্যমেই যে ভারতীয় সমাজ থেকে গোঁড়ামি তোলা যাবে বলে হয়তো তিনি মনে করতেন। তাইতো, তিনি হিন্দু মন্দিরের জন্য অর্থদানের সঙ্গে সঙ্গে আজমীর দরগার জন্যও তিনি অর্থ প্রদান করতেন বলে জানা যায়। আসলে এধরনের ধর্মীয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আকবরের প্রচেষ্টা

ছিল হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিভিন্ন অংশকে দিয়ে ভারতে একটা মিশ্র ও সংহত শাসক শ্রেণী তৈরি করে দেশ শাসন করা।

অধ্যাপক ইরফান হাবীব আকবরের এই যুক্তিবাদী ও সহনশীল এবং প্রকৃত অর্থে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, “আকবরের আমলেই ভারতে দেখা গেছে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতের অতীত ইতিহাসের এক পুনর্জাগরনের ধারা। শুধু রামায়ণ, মহাভারতেই নয়, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের অন্যান্য রচনা-লীলাবতী, জ্যোতিষ ইত্যাদির কয়েকটা ভাষায় অনুবাদ এবং সরকারীভাবে রাজসভায় তা পাঠ-এর ব্যবস্থা করা, এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। আর এই ধারাকেই অক্ষুন্ন রেখে আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরীর শেষ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন ভারতের ধর্মীয় চিন্তা, সংস্কার, প্রথা, নিয়ম-কানুন ও সংস্কৃতির এক মননশীল রচনা।”[৭৭] আকবরের এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপট থেকে বলা যেতে পারে যে, হয়তো এইসময় হিন্দু সমাজের জাতিভেদপ্রথার কড়াকড়িটাও বেশ একটা ছিল না। কাজেই বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম শাসনকালের ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু কিছু উদারবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হলেও, একদিকে হিন্দু এবং অপরদিকে মুসলমানরা সাধারণভাবে তাঁদের ধর্মীয় গোঁড়ামিতেই আচ্ছন্ন হয়ে রইল। হিন্দুসমাজ যেমন ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও জাতি-ভেদ প্রথার দ্বারা প্রবলভাবে আচ্ছন্ন রইল, তেমনি মুসলিমসমাজ শাসন ক্ষমতার সুযোগে তাদের ধর্মীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টাই করে চলছিল। ইতিমধ্যে শঙ্করাচার্যের বেদান্তভাষ্য একদিকে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথাকে আরও দৃঢ় মূল এবং সম্প্রসারিত করে তুলেছে এবং হিন্দু নারী সমাজকে আরও রক্ষণশীলতায় আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। নারীদের সম্পর্কে শঙ্করাচার্য-এর মতামত চরম রক্ষণশীলতারই পক্ষে। নারীদের স্থান গৃহে এবং গৃহকর্মে- এই চিন্তাধারা ছিল তাঁর।[৭৮] তিনি আরও একটা মন্তব্য করেছেন নারীদের নিয়ে। গৃহকর্ম শিক্ষাই নারীদের কর্তব্য এবং নারীদের বেদপাঠ নিষিদ্ধ।[৭৯] হিন্দু রক্ষণশীলতার ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্যের প্রভাব এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহসূত্র এবং মনুসংহিতার পর যেদর্শন বা চিন্তা-ভাবনা হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা ও জাতিভেদপ্রথাকে তীব্রতর করে তোলে, তা হচ্ছে শঙ্করাচার্যের ধর্মীয় ও সামাজিক মতবাদসমূহ।

উক্ত বিষয় সম্পর্কে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করব না। আবার, ভাবনার বিষয় এই যে মানুষের মুক্তি, জাতিভেদ প্রথা, নারীদের সম্পর্কে মনোভাব, নানান খাদ্য নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমেই শংকরের ভাষ্য - যা উপনিষদ, ভগবত গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের মধ্যে বিধিত - সহস্রাধিক বছর ধরে হিন্দু সমাজে দারুণভাবে

প্রভাবিত করে এসেছে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের একটা চরম রক্ষণশীলতার কাঠামোয় আবদ্ধ করে রেখেছে। কালক্রমে শ্রমবিভাজন সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদপ্রথা তীব্রতর হয় এবং চতুর্বর্ণের প্রতিটি বর্ণের মধ্যে আবার বহুসংখ্যক অভ্যন্তরীণ বিভাজনের সৃষ্টি হয়। কাজেই প্রতি জাতের (Caste) মধ্যে বিভিন্ন উপজাতের (Sub-Caste) উৎপত্তি ঘটে বলে মনে করা হয়।[৮০]

আবার আমরা বলতে পারি জার্মান পন্ডিত ওল্ডেনবার্গ পেশাভিত্তিক জন্মগতভাবে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির উল্লেখ করে জাতিগত শুদ্ধতা এবং অপবিত্রতার ভীতির উল্লেখও করেছেন। এই জাতিভেদ কাঠামো কঠোর ও কঠিন হয়ে গড়ে উঠবার মূলে উক্ত শুদ্ধতার ধারণা এবং অপবিত্রতার ভীতিও সক্রিয় থেকেছে। সুতরাং এক জাতের নর-নারীর সঙ্গে অপর জাতের নর-নারীর বিবাহের ফলে জাতগত শুদ্ধতা বিনষ্ট হয় বা অপবিত্রতার সৃষ্টি হয় - "এই বিশ্বাস জাত-কাঠামোকে অত্যন্ত দৃঢ় করে তুলেছে।"[৮১] উক্ত জাতিগত শুদ্ধতার ধারণার সঙ্গে খাদ্যের অপবিত্রতার ধারণাও প্রচলিত করা হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শঙ্করাচার্য্য ও আকবরের ধর্মীয় আচরণ পালনের নীতির উল্লেখ করা হল। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী, তিনি বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব খন্ডন করেছিলেন এবং নাস্তিকদর্শন খন্ডন করার পাশাপাশি হিন্দুধর্ম পুনুরুত্থানের জন্য তিনি ভারতের চারটে প্রান্তে চারটে মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। হিন্দুধর্মের একজন বলিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন। আবার আকবরের শাসন কালে আকবর সর্বধর্মসমন্বয়ের এক আন্তরিক প্রয়াস করেছিলেন। পরমত ও ধর্মসহিষ্ণুতা তিনি বেশ উজ্জ্বল হয়ে আছেন। প্রায়শই সুফীসাধকদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন। দীন-ই-ইলাহী প্রচার করেছিলেন।

উচ্চবর্ণের মানুষ কর্তৃক নিম্নবর্ণের মানুষের দ্বারা রান্না করা খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এমন একটা বিশ্বাস সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, খাদ্যের মধ্য দিয়ে বা নিম্নবর্ণের মানুষের দ্বারা খাদ্য স্পর্শের কারণে ক্ষতিকারক কোনো কিছু সেই খাদ্যের দ্বারা বাহিত হয়। কোনো কোনো পণ্ডিত এটাকে "একরকম 'টোটেম' বিশ্বাস বা আদি যুগের বিশ্বাস বলে চিহ্নিত করেছেন।"[৮২] ফলে আমরা বলতে পারি যে, হিন্দু সমাজের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের এবং 'নীচুজাত' ও 'অস্পৃশ্য'দের উপর সামাজিক অত্যাচার দৃঢ়করণ করা হয় এবং তারপর জাতি-ভিত্তিক গোত্র ও নানা ধরনের রীতিনীতির মধ্য দিয়ে সমাজে ব্যাপক বিভাজন ও কুসংস্কার প্রচলিত হয়।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের হিন্দু সমাজ

পশ্চিমি আধুনিকতায় বিশ্বাসী ব্রিটিশ শাসকেরাও ব্যবহারিক কারণ থেকে মনুস্মৃতির শিক্ষা মেনেই ভারতের শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন। বৈদিক ধর্মগ্রন্থ গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালন আইনের মর্যাদা দিয়ে তাঁরা ভারতের আইনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে সেগুলোকে ব্যবহার করতে থাকেন। ব্রিটিশরাও কিন্তু বিনা বিচারেই সেই সময় উক্ত ধর্মগ্রন্থগুলোর রীতিনীতি মেনেই ভারতীয় হিন্দু সমাজজীবনে আইন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত যে, ভারতীয় হিন্দুদের বিচার করার সময় জুরীরা মনুস্মৃতির ব্যাখ্যা শুনেই সেই সমস্ত রীতিনীতি ব্যবহার করতেন। "ব্রিটিশ ভারতে মনুস্মৃতি এক জটিল আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থায় একাংশ ছিল 'সাধারণ আইন' আর একাংশ ছিল 'ব্যক্তিগত আইন'। ব্যক্তিগত আইন ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রয়োগ হত"।[৮৩] ব্যক্তিগত আইনের অধীনে হিন্দু সমাজের মানুষদের বিচারের মধ্যে রেখেছিলেন। তাদের বিচার ব্যবস্থায় হিন্দু জাতির বিভিন্ন স্তরের মানুষের উক্ত ব্যক্তিগত আইনের দ্বারাই ব্রিটিশ শাসকেরা শাস্তির বিধান দিতেন। পরম্পরা অনুসারে হিন্দুদের বিচার-ব্যবস্থা ছিল মনুস্মৃতি কর্তৃক ব্রাহ্মণ্যবাদী বিচার ব্যবস্থা। অর্থাৎ প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসকেরা এই পথেই জাতি-বর্ণ ভেদাভেদকে মান্যতা দিয়েই চলতেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মনুস্মৃতির রীতিনীতিই হিন্দুদের শাসনের আইন যা ব্রিটিশরা এদেশে এসে শুধুমাত্র মনুস্মৃতির বিধান মেনেই চললেন। মনুস্মৃতি ছাড়াও হিন্দু সমাজে আরও কিছু রীতিনীতি ছিল, সেগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁরা হিন্দুদের স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভারতের সমাজে জাতিভেদ কাঠামো কখনও স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে ওঠেনি, জাতিভেদ প্রথা গড়ে ওঠেছিল হিন্দুধর্মীয় বিধানের গোঁড়ামির ও উৎপাদনের মালিকানা পাওয়ার নিমিত্তে। তাইতো বলা যেতে পারে মানুষ সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় জাতিভেদ কাঠামো তৈরি করেন। কাজেই দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মধ্য দিয়েই জাতিভেদ কাঠামো ধীরে ধীরে ভারতীয় হিন্দুসমাজে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ম্যাস্ক ওয়েবারের একটি মন্তব্য তুলে ধরেছেন। এই ভাবে, "হিন্দুধর্মে আত্মার পুনর্জন্ম এবং কর্মফলের মতবাদের কারণে হিন্দু জনমানসে জাতিপ্রথার বৈধতা স্বীকৃত হয়েছিল। কর্মফল এবং আত্মার পুনর্জন্মের উপর স্বাভাবিক অবস্থার ফলেই হিন্দুরা তাদের জন্মসূত্রে অর্পিত সামাজিক অবস্থানকে মেনে নিয়েছিল এবং সে কারণেই জাতিপ্রথা ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বলে ওয়েবার বিশ্বাস করতেন"।[৮৪]

ঐতিহ্যগত পরম্পরায় চলে আসা ভারতের হিন্দু সমাজের বিশেষ কতকগুলি বিধানকে মান্য করেই যে ব্রিটিশ শাসকেরা অপরাপর সমস্যাগুলিকে সমাধান করতেন। বলে রাখা প্রয়োজন যে, ঐতিহ্যগত পরম্পরা বিধানগুলি যা জাতি-বর্ণের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে যে সমস্যাদি তৈরি হত সেগুলি সরকারি আইনের বাইরে রাখতেন।[৮৫] অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকেরাও যে ব্রাহ্মণ্যবাদী মনুস্মৃতি বিধানকে প্রধান্য দিয়ে চলতেন এই সময় তা আমরা স্বীকার করে নিতেই পারি। ব্রিটিশ শাসনের সময়ও নিম্নবর্ণের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় থাকার কারণেই যে উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে সামাজিক অধিকারের মামলায় আদালত কর্তৃক পরাজিত হত, তা কিন্তু না, এক্ষেত্রে শুধু অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দায়ী নয়, এর সঙ্গে দায়ী ছিল নিম্নবর্ণের মানুষের শিক্ষার অধিকার নাথাকার কারণও। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের মানুষের তেমন কোনো শিক্ষার সুযোগ ছিলনা। নিরক্ষরতার কারণেও বেশিরভাগ সময় নিম্নবর্ণের মানুষ ব্রিটিশদের নিকট নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলোর দাবি জানাতে পারতেন না।[৮৬] আবার দেখা যায় যে, ব্রিটিশদের কাজের সুবিধার জন্যে যখন নিম্নর্ণের মানুষের জন্য ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেন। তখন থেকেই নিম্নবর্ণের কিছু সংখ্যক মানুষ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসেন। পরবর্তী সময় এদের মধ্যে থেকে অল্প সংখ্যক মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বজাতির হয়ে দাবি জানাতে সক্ষম হয়েছে। তবে কোনো সমাজেই দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক কুসংস্কার ও অত্যাচার চলতে পারে না। ভারতীয় হিন্দু সমাজের কাঠামোতেও তার প্রতিফলন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনের সময় ইংরেজি শিক্ষার আলোকে সামাজিক বিভাজন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয়। জাতিগত ভেদাভেদ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ভারতে যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা - কিন্তু অতি সরল পথে চলতে পারেনি, তা আমরা দেখতে পাই তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিবরণ থেকে। এবারে আমারা 'ভারতের রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উত্থান' সম্পর্কে আলোচনা করব।

ভারতের রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উত্থান

ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তির প্রভাব ও অস্তিত্ব ব্যাপকহারে লক্ষ করা যাচ্ছে। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির সূচনা সাম্প্রতিক সময়ের নয়, এর সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্বে এসে। মূলত বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয়

হিন্দু সমাজের বৈষম্যমূলক ভিত্তিভূমির প্রেক্ষাপটে এর উদ্ভব ঘটেছিল বলে আমরা মনে করতে পারি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জির মন্তব্যটি তুলে ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা করা যেতে পারে। অধ্যাপিকার মতে, “ভারতীয় সমাজের প্রধান ধারাটি মূলগতভাবে অসাম্য- ভিত্তিক। উপর উপর কিছু পরিবর্তন আইনের মাধ্যমে সাধিত হওয়া সত্ত্বেও বর্ণাশ্রম ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্তর বিভাজনটির কোনো বদল ঘটেনি।”[৮৭] লেখিকার যুক্তিতে সমর্থন করে একথা বলা যেতে পারে যে, আজও দেশে দলিত নির্যাতন ধারাবাহিক ভাবেই চলেছে। এর প্রমাণ আমরা পাই দৈনন্দিন সংবাদ পত্র-পত্রিকা তথা বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমগুলির মাধ্যমে। আজকের দিনেও ভারতের জাতিভিত্তিক রাজনীতি বহুলাংশ বিভক্ত হয়েছে। এই বিভক্ত হওয়ার পশ্চাৎপটের যে কারণ দায়ী এক্ষেত্রে রাহুল সাংকৃত্যায়নের মন্তব্যটি তুলে ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে মনে করা যায়। তাঁর মতে, “বিগত হাজার বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বোঝা যাইবে যে ভারতবাসী বিদেশীর দ্বারা পদদলিত হইবার প্রধান কারণ জাতিভেদ। জাতিভেদ কেবল মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেই বিভক্ত করে না - একই সাথে সকলের মনে উচ্চ নিচের মনোভাব সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণ মনে করে আমি শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হীন। ক্ষত্রিয় মনে করে আমি উচ্চ আর কাহার নীচ। কাহার মনে করে আমি উচ্চ, চামার নীচ। চামার মনে করে আমি উচ্চ, মেথর নীচ। মেথরও নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কাহাকেও সম্ভবত নীচ মনে করিয়া থাকিবে। ভারতবর্ষে হাজার হাজার জাতি এবং সকলের মধ্যেই এই মনোভাব।”[৮৮] উক্ত মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, ভারতের জাতিভিত্তিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটের ভিত্তিভূমি তৈরি করতে উচ্চ-নীচ মনোভাব অনেকটা দায়ী। রাজনীতির প্রেক্ষাপট সবসময়ই বিতর্কের আঁধারে জড়িত, একথা সর্বজন বিদিত। আর সেই রাজনীতির জগতে যদি ভারতীয় সমাজের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির ভাবাবেগ সংযোজিত থাকে, তাহলে সেই রাজনীতির আলোচ্য ক্ষেত্রটা কতটা জটিলতায় পরিপূর্ণ হতে পারে, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা অতি দূরূহ। আমাদের দেশের রাজনৈতিক জগৎ বহুলাংশে বিতর্কের, তার প্রমাণ আমরা মাঝেমধ্যেই পেয়েছি ও পেয়ে থাকি। এই বিতর্ক শুধু তর্কের জগতে সীমাবদ্ধ থাকলে হয়তো আজকের দিনে এসে আমাদের ভাষা ভিত্তিক, জাতি ভিত্তিক, বর্ণ ভিত্তিক রাষ্ট্রের বা রাজ্যের দাবির সম্মুখীন হতে হত না।

ভারতীয় সংবিধানের ৩২৬ নং ধারা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃতি হয়েছে। ধর্ম, ভাষা, জাতি, জন্মস্থান

নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী। তাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার গঠন করে এবং সরকার জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। অর্থাৎ চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে, জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।[৮৯] ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর সাংবিধানিক রীতি নীতি অনুসারে ভারতে কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু দলিতজাতিকে রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করতে আন্দোলনের পথেও নামতে হয়েছিল। এই আন্দোলনে নামার কারণ আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব। তবে এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ইংরেজরা আমাদের শাসন করেছিল। ফলত দীর্ঘদিনের শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিকার হিসাবে ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের নিকট রাজনৈতিক অধিকার দাবি করেন। এই মর্মে ব্রিটিশ সরকার প্রথম অবস্থায় রাজনৈতিক অধিকার দিতে না চাইলেও পরবর্তী সময়ে জনগণের চাপে পরে এবং নিজেদের শাসন কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে তাঁরা বৈষম্যমূলক রাজনৈতিক অধিকার ভারতীয়দের দেয়। আর এই বৈষম্যমূলক রাজনীতির জন্যেই যে পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিভিত্তিক রাজনীতির উদ্ভব হয়েছে তা আমরা এই আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করব।

ভারতের জাতিভিত্তিক রাজনীতির উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে ডঃ সুভাষ সি. কাশ্যপ-এর বর্ণনাটি তুলে ধরা যেতে পারে। তাঁর বর্ণনা হলো, এই রূপ, "এ. ও. হিউম নামে জনৈক ইংরেজের সভাপতিত্বে ১৮০৫ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের যাত্রা শুরু হয়। "...কিন্তু বাস্তবে ১৮৮৫ সালের ২৮-৩০শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভা থেকে আইন পরিষদের সংস্কার ও প্রসারের দাবি তোলা হয়।"[৯০] অর্থাৎ এই বর্ণনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, কংগ্রেসকে ভিত্তিভূমি করে ভারতীয়রা বিভিন্ন ধরনের অধিকার অর্জন করার জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে দাবি দাওয়া পেশ করতে শুরু করে। যেহেতু ইংরেজরা ভেদনীতির দ্বারা ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করতো, সেহেতু তারা কংগ্রেসের দাবি দাওয়াকে গুরুত্ব দিত না। এক্ষেত্রে বিপান চন্দ্রের উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে। তাঁর মতে, "সাম্প্রদায়িক দাবিগুলোকে ও জনগণের ওপর তাঁদের কাজ রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করা হত। যেমন কংগ্রেস যেখানে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত কোনো দাবিই ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে মানাতে পারেনি সেখানে ১৯০৬ সালে মুসলমানদের

দাবি ভাইসরয়ের কাছে পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি মেনে নেওয়া হয়েছিল।”[৯১] এই মন্তব্যের প্রমাণ আমরা পাই ১৯০৬-১৯০৮ সালের মিন্টো মরলে সংস্কারে সূত্র থেকে। যার পূর্ণাঙ্গ ফলশ্রুতি ঘটে ১৯০৯ সালে ভারতের কাউন্সিল আইনের হাত ধরে, যা ভারতের রাজনীতিতে দীর্ঘায়িত প্রভাব বিস্তার করেছে। এ সম্পর্কে ডঃ সুভাষ সি. কাশ্যপ মন্তব্য করেন, “মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের মতো ঘৃণ্য ব্যবস্থা চালু করা হয়।”[৯২] এই সময় যদিও ভারতের রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির তেমন কোনো ব্যাপক উদ্ভব না ঘটলেও মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের ও নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকার পাওয়ার ফলেই যে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির ভিত্তি স্থাপনের অক্সিজেন পেয়েছিল অন্ত্যজরা, একথা বলা যেতেই পারে।

জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির প্রসার আমরা লক্ষ করতে পারি যখন “১৯১৯ সালের আইনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিধিসমূহের ফলে ১৯০৯ সালের আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ভারতের ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় একস্তর পরিষদের এর পরিবর্তে দ্বিস্তর আইনসভা চালু করা হয়, - কাউন্সিল অফ স্টেট (উচ্চকক্ষ) এবং আইন পরিষদ (নিম্নকক্ষ) দ্বিস্তর পরিষদীয় ব্যবস্থাকে এই ভাবে ভাগ করা হয়। মনোনীত সদস্য নিয়োগের কিছু ক্ষমতা থাকলেও প্রতিটি পরিষদে নির্বাচিতদের সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করা হয়।”[৯৩] ফলে এই সময় বিভিন্ন প্রদেশে থেকে কিছু সংখ্যক নিম্নজাতির তথা অন্ত্যজ জাতির ব্যক্তিগণ মনোনীত তথা নির্বাচিত হয়ে আইন সভায় যোগদান করার সুযোগ পান। তার কারণ হলো, এই সময়ের পূর্বে ভোটদানের যোগ্যতা বিভিন্ন ধরনের ছিল এবং সম্প্রদায়গত সম্পর্ক, জাতিগত, বাসস্থান ও সম্পত্তির উপর ভোটদাতার যোগ্যতা নির্ভর করত। কিন্তু ১৯১৯ সালের আইনে অন্ত্যজদের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন চেমসফোর্ড। আর এই ঘোষণার সুযোগ নিয়েই অন্ত্যজ জাতির ব্যক্তিগণ ব্রিটিশ সরকারের কাছে রাজনৈতিক সুযোগ পাওয়ার আশায় ১৯১৯ সালের ২৭ শে জানুয়ারি ভোটাধিকার সম্পর্কে সাউথবরো কমিটিতে আম্বেদকর (১৮৯১ – ১৯৫৬) অন্ত্যজদের হয়ে সাক্ষ্য দেন, আর এই সাক্ষ্য দানের মাধ্যমেই যে পরবর্তীকালে ভারতের রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির প্রসার ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে কিন্তু অন্ত্যজরা ১৯০৯ সালের মুসলিমদের ভোটাধিকার সম্পর্কিত অধিকারকে হাতিয়ার করেই আন্দোলনের পথে নেমেছিলেন, একথা বললে ভুল হবেন না। এসময় কিন্তু দলিত নেতা আম্বেদকরের বিশ্বাস ছিল জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার সামাজিক ও

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের দাবী অনুযায়ী আইন প্রণয়ণ করতে পিছু পা হবেন না। আবার তিনি বিশ্বাস করতেন না যে, ব্রিটিশ সরকার এই ধরনের আইন করতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর আশা ছিল সরকার কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে যা অবদমিত জাতির জন্য এক অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।[৯৪] এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, যদিও ব্রিটিশ সরকার এই নির্বাচিত সরকারের অস্তিত্বের কথা আইনে পরিণত করার কথা ঘোষণা করেছিল, তা সত্ত্বেও ভারতের সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হতো গভর্নর জেনারেলের সম্মতি অনুসারে। গভর্নররা সর্বক্ষেত্রে প্রভুত্ব করতেন এবং আর্থিক ক্ষমতার অভাবে মন্ত্রীরা কার্যকরভাবে কোনও নীতি রূপায়িত করতে পারতেন না। মন্ত্রীরা যৌথভাবে পরিষদের কাছে দায়ী থাকতেন না বরং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ভাবে গভর্নরের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হতেন।

উপরিউক্ত ঘোষণা থেকে যদিও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কিছু দাবি আদায় করতে পেরেছিল। কিন্তু এই সময় অস্পৃশ্যদের অবস্থা ছিল হীনতম। এ সম্পর্কে ডঃ আম্বেদকর মন্তব্য করেছেন তাঁর মতে, "অস্পৃশ্যরা এমনকী নাগরিক নয়। নাগরিকত্ব হল একগুচ্ছ অধিকার। যেমন (ক) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, (খ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা, (গ) আইনের চোখে সমতা, (ঘ) নৈতিক চেতনার স্বাধীনতা, (ঙ) অভিব্যক্তি ও বাক্যের স্বাধীনতা, (চ) সমবেত হওয়ার অধিকার, (ছ) দেশের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা, (জ) সরকারের অধীনে যে কোন চাকুরী বা বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার, (ঝ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অন্ততপক্ষে তত্ত্বগতভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় প্রজাদের এই অধিকার গুলি ক্রমে ক্রমে স্বীকার করেছে । প্রতিনিধিত্বের অধিকার ও সরকারের অধীনে কোনো চাকুরী বা বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার নাগরিকত্বের পক্ষে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কিন্তু অস্পৃশ্যদের অস্পৃশ্যতার দরুন এই অধিকারগুলি তাঁদের নাগালের অনেক বাইরে রেখে দেয়।"[৯৫] এই মন্তব্য থেকে একথা বলা যেতেই পারে যে, অস্পৃশ্যরা এ সময় নিজেদের অধিকার অর্জন করার লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ব্রিটিশ সরকারের কাছে অস্পৃশ্যরা নিজেদের দুঃখের কারণগুলি বর্ণনা করার নিমিত্তেই এই রূপ প্রস্তুতি তাঁরা নেওয়ার জন্য সচেতন ছিল।

এই সময় ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর (১৮৭৯ – ১৯৪৮) প্রবেশ, তিনি অস্পৃশ্যদের কংগ্রেসী রাজনীতির পথে হাঁটার জন্য প্রস্তাব দেন। তার কারণ হলো অস্পৃশ্যরা যে সামাজিকভাবে ভারতের হিন্দু সমাজের কাছে অবহেলিত তা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। এই মর্মে

আম্বেদকর মন্তব্য করেন, “গান্ধীর মতো নেতা যেখানে অস্পৃশ্যদের মুক্তির জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে পদক্ষেপ নেননি সেখানে অন্যান্য হিন্দু কংগ্রেসরা কতটা কী করবে, তা আশঙ্কার কারণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।”[৯৬] এই মর্মে এ কথা বলা যেতেই পারে যে আম্বেদকর গান্ধীর পথে না গিয়ে তিনি অস্পৃশ্যদের মুক্তির জন্য, অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য সচেতন হওয়ার প্রয়োজনেই কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যের পথে গিয়েছিলেন। এর ফল স্বরূপ ভারতের রাজনীতি দ্রুত পরিবর্তন হয়। “বম্বের গভর্নর ডঃ আম্বেদকরকে বম্বের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মনোনিত করেন ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ সালে।”[৯৭] এর ফলে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আশায় আন্দোলনে নেতৃত্বের শীর্ষস্থানে চলে আসেন। অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য আম্বেদকর জাতীয় কংগ্রেস তথা ব্রিটিশ সরকারের কাছে বারবার যুক্তি দেখান। এই সময় কংগ্রেসের কাছ থেকে তেমন কোন সাড়া না পেয়ে ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন ভারতে এলে কমিশনের সামনে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত দাবি দাওয়া পেশ করেন। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ভলিউম-২ আম্বেদকর তুলে ধরেন এই ভাবে। “এটা পরিষ্কার যে ভোট দানের বয়সও বেশকিছু বাধ্যবাধকতা কমিয়ে অস্পৃশ্য বর্ণের ভোটদাতার অনুপাত কিছুটা বাড়িয়ে দেবে। অস্পৃশ্য বর্ণের নিজস্ব প্রতিনিধি সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ভোটদান ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হয়ে আসার কোনও আশাই নেই, যতক্ষণ না এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে অস্পৃশ্য বর্ণের উন্নতি, যা তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আদায় করা যেতে পারে, তাঁদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করবে, যখন অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সাহায্য এবং তাঁদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করবে।”[৯৮] সাইমন কমিশনের এই রিপোর্ট থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে ব্রিটিশ সরকার অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার দিতে রাজী আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই কমিশন অস্পৃশ্যদের জন্য যে, আসন সংরক্ষিত করেছিল তা পুনরায় বৃদ্ধি করা যাবে বলেও ঘোষণা করেছিল।

এই মর্মে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের আশায় পরবর্তী সময়ে ১৯৩০ সালের গোড়াতে লন্ডনে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে আরও জোড়ালো যুক্তি দেখান। ১৯৩০ – ৩২ সালের বৈঠকে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য নানাবিধ কর্মপন্থার মাধ্যমে দাবিদাওয়া পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী মন্তব্য করেছেন,

"তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের প্রত্যেকটিতেই তিনি অবদমিত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি উত্থাপন করেন।"[৯৯] এক্ষেত্রে আম্বেদকর ১৯০৯ সালের ভারতের কাউন্সিল আইন এর প্রসঙ্গ তুলে নিজের যুক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ঘোষণা করেন। কিন্তু গান্ধীর বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। তার কারণ হলো গান্ধী এই দাবিকে কেন্দ্র করে অনশন শুরু করলে সে সময় গান্ধীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য আম্বেদকরের কাছে জাতীয় কংগ্রেসের অনেক নেতা আসেন এবং তাঁরা আম্বেদকরকে অনুরোধ করেন পৃথক নির্বাচনী দাবি থেকে সরে আসার জন্য।[১০০] এই মর্মে আম্বেদকর তাঁর আন্দোলনের ধারা থেকে সরে এসে ব্রিটিশ সরকার তথা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাছ থেকে অস্পৃশ্যদের জন্য রাজনৈতিক তথা অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি আদায় করেন। অবশেষে বিভিন্ন তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়েও গান্ধী পৃথক নির্বাচন সম্পর্কে যে যুক্তি দেন সেটা আম্বেদকর মেনে নিয়ে পুনাচুক্তি স্বাক্ষর করেন। পুনাচুক্তি স্বাক্ষর দ্বারা আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা সহ অন্যান্য অধিকারগুলি আইনমাফিক আদায় করতে সচেষ্ট হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পুনাচুক্তির পর গান্ধী অস্পৃশ্যদের সমস্যাবলীর দিকে পূর্বের তুলনায় অনেকটা দৃঢ়তার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেন।[১০১] মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে পুনাচুক্তির পর থেকেই ভারতের রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির চরম বিকাশ ঘটে, যা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা অস্পৃশ্যরা জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনৈতিক আসন সংরক্ষণ পায়। যার ফলে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে অস্পৃশ্যরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল।[১০২] ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করার লক্ষ্যে, "তিনি নিজের সহযোগীদের নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন।"[১০৩] এই নির্বাচনে জয়লাভ করার নিমিত্তে আম্বেদকর সর্বশক্তি নিয়ে উদ্যোগী হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময় 'ডেমোক্রেটিক স্বরাজ পার্টির' ব্রাহ্মণ নেতা এল. বি. ভোপতকর এবং শ্রী কেলকরের সাথে আম্বেদকর নির্বাচনের সমঝোতা করেন। যদিও দলের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল তা সত্ত্বেও নির্বাচনে তাঁর দলের প্রার্থী ১৭ জনের মধ্যে ১৫ জন জয়ী হলেন।[১০৪] আমরা পরের অধ্যায়ে ভারতের জাতিভিত্তিক রাজনীতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে গঠিত রাজনৈতিক দল সম্পর্কে

আলোচনা করব। এবারে আমরা ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে দলিত শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করব।

দলিত শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস

আমাদের দেশ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করলেও গণতান্ত্রিক সংবিধান কার্যকর হতে তিন বছরের বেশি সময় লেগে যায়। সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে আম্বেদকরের বড় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদের সদস্য ও খসড়া কমিটির সভাপতির ভূমিকায় থেকে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো তৈরি করতে থাকেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়।[১০৫] এই সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরে ১৫(১) ও ২৯(২) নং ধারার সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে ঘোষিত হয়, সামাজিকভাবে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া জাতির নাগরিকদের উন্নতি করার জন্য রাজ্যকর্তৃক কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। কাজেই ২৯(২) ও ৩০(২) নং ধারানুসারে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ভাষা এগুলির কোনো একটি কারণের জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাউকে প্রবেশাধিকার নিশেধ করতে পারবে না।[১০৬] আবার সংবিধানে লিখিত আছে যে, কোন নাগরিককে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, নারী-পুরুষ কোনো কারণের জন্য সরকারি কর্মে অযোগ্য বিবেচিত হবে না, ১৬(১) ও ১৬(২) ধারানুসারে।[১০৭] সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানে একদিকে দেশের সমস্ত স্তরের মানুষের জন্য সমান অধিকার প্রদান করা হয়, অপরদিকে পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য বিশেষ সাহায্যের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়। সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকারের পাশাপাশি থাকে শিক্ষায় ও চাকরির ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি/ তপশিলি উপজাতির জন্য ৪৬ নং ধারা অনুসারে সংরক্ষণের অধিকার।[১০৮]

৩৩০(২) নং ধারা অনুসারে তপসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আইন সভায় সংরক্ষণের সুবাদে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পটভূমিতে অস্পৃশ্য জাতির মানুষদের রাজনৈতিক চেতনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।[১০৯] উপরিউক্ত সংরক্ষণের মাধ্যমেই, সীমিত সংখ্যায় হলেও, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, আর্থিকভাবে সচ্ছ্বল, নিম্ন জাতিভুক্ত কিছু মানুষ তাঁদের সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সচেতনার পরিচয় রেখেছে। সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য হিসাবে চিহ্নিত মানুষের সংবিধানের আইনি ভাষায় তপশিলি জাতিভুক্ত

হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ‘দলিত’ নামে পরিচিত হওয়ারও একটা ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস সম্পর্কে এবারে আলোচনা করা যাক।

বর্তমানে ভারতে জাতিভিত্তিক রাজনীতি যে বহুমাত্রিকতায় ছড়িয়ে পড়েছে তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা গঠিত রাজনৈতিক দল আর নিম্নবর্ণের হিন্দুদের রাজনৈতিক দল বহুদিন আগে থেকেই ভারতবর্ষে বিরাজমান। সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর রাজনৈতিক দল তথা রাজনৈতিক আন্দোলনকে আমরা পরিলক্ষিত করতে পারছি। স্বাধীনতার পরে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিতে বিভক্ত হয়েছে। ১৯৭০ সালের পরে আবার তপশিলি জাতিকে দলিত ও তপশিলি উপজাতিকে আদিবাসী বলেও পরিগণিত করা হয়। যদিও এক্ষেত্রে ‘দলিত’ কথাটি ব্যবহার করা সংবিধান বহির্ভূত। তা সত্ত্বেও তপশিলি জাতি ‘দলিত’ নামেই বেশি পরিচিত এদেশে। ভারতীয় সমাজে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে হয়েছে। দলিতদের বিভিন্ন নামে পরিচিত হওয়া সম্পর্কে, ২৮.০২.২০০৮ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত, ‘দলিত’ শব্দে আপত্তি কেন? প্রতিবেদনটি এক্ষেত্রে তুলে ধরা যথোপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। প্রতিবেদনটির মূল বক্তব্য হল যে, “প্রাচীন শাস্ত্রে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষদের বলা হত অস্পৃশ্য, শূদ্র। পরবর্তীকালে তাদের বলা হয়েছে ‘হরিজন’ এরপর তাদেরই বলা হয়েছে ‘ব্যাকওয়ার্ড’ বা ‘অনগ্রসর’। অবশেষে এই শ্রেণীর মানুষদের সংবিধানে বলা হয়েছে ‘শিডিউল্ড’ বা ‘তপশিলি’। কালের বিবর্তনে বিশেষণের রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু এর কোনও শব্দই সম্মানজনক অর্থবোধক নয়। তাছাড়া তপসিলি, আদিবাসী বা তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায় ছাড়াও আরও বেশ কিছু সম্প্রদায় আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে পশ্চাৎপদ। তাদের কোন নামে অভিহিত করা হবে? অবহেলিত, অনুন্নত, বঞ্চিত, নিপীড়িত বা শোষিত, এর কোন অভিধা কি সম্মানজনক হবে? বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর লেখায় ‘ডিপ্রেস্ড ক্লাসেস’ প্রয়োগ করেছেন। অন্যান্য চিন্তাবিদগণ ‘অপ্রেসড’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই দুটি ইংরাজী বিশেষণের যথোপযুক্ত সর্বভারতীয় ভাষা ‘দলিত’ ভিন্ন আর কি হতে পারে? মহাত্মা গুরুচাঁদ ঠাকুর ‘দলিত পতিত’ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। মান্যবর কাশীরামজি ‘দলিত শোষিত সমাজ সংঘর্ষ সমিতি’ গঠন করে গণমুখী আন্দোলন করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের দলিত প্যান্থার আন্দোলনের ফলেই ‘দলিত সাহিত্য’। তাকে অনুসরণ করে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষায় গৌরবোজ্জ্বল দলিত সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও

তার প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, বইপত্রে দেখা গেছে। তপশিলি, আদিবাসী, অনগ্রসর।”[১১০]

তবে, এক্ষেত্রে আমরা বিশেষ করে ‘দলিতজাতি’ কে এবং কারা, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করব। তার কারণ হলো নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সদস্যরা হলেন বিশেষ করে ‘দলিত’ জাতির অন্তর্গত দু’টি জাতি। আর নমঃশূদ্র এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে আমরা এই আলোচনার পরবর্তী অংশে আলোচনা করব।

বর্তমানে ভারতীয় সমাজের ‘দলিত’ বলতে কাদেরকে শনাক্ত করা হয়, এ সম্পর্কে অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী মন্তব্য করেছেন, “ভারতীয় সমাজের অস্পৃশ্য জনগণের এই অবদমিত অংশই পরবর্তীকালে ‘দলিত’ নামে পরিচিত হন। ১৯৭০-এর দশক থেকে এই শব্দটির প্রচলন। এই শব্দটি একদিকে যেমন নিম্নশ্রেণির নির্যাতিত অবস্থা বোঝায় তেমনি আবার শোষণ সম্পর্কে একটা সচেতনতার অর্থও বহন করে। প্রথম থেকে ‘দলিত’ কথাটির কেউ একটা সংকীর্ণ সীমা বেঁধে দেন নি। ফলে পরবর্তীকালে গোষ্ঠীগত ভাবে অবদমিত বহু মানুষ নিজেদের ‘দলিত’ হিসেবে পরিচিত করেন, যদিও ‘দলিত’ বলতে এখনো মূলত শূদ্রদেরই বোঝায়।”[১১১] অধ্যাপিকা এই দলিতদের সম্পর্কে আরোও মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, “সামাজিক সোপানের সর্বনিম্নস্তরে দলিতদের অবস্থান। তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র, শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না।”[১১২] এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে দলিতদের ভারতীয় সমাজে যতই নাম পরিবর্তন করা হোক না কেন, তাদের অবস্থান যে হীনতায় ছিল তা থেকে হয়তো সামান্য পরিমাণে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। তবে এদের যথাযথ উন্নত ঘটেনি এখনও। একথা বলা যেতেই পারে। দলিত কে বা কারা সম্পর্কে অধ্যাপক বাসব সরকারের মন্তব্য হল, এইরূপ, “এক কথায় বলা যায় সমাজের নিম্ন বর্ণের শ্রেণীচেতনা উদাসীন কিন্তু স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে সজাগ সংগঠিত জঙ্গী অংশের নাম ‘দলিত’ ১৯৮১-র সুমারিতে ভারতের মোট জনসংখ্যা ৭৫ কোটির মধ্যে প্রায় ৩৫ কোটি যে মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী বলে চিহ্নিত হয়েছে ‘দলিত’রা হল তারই একান্তভাবে গোষ্ঠী সচেতন, সংঘবদ্ধ একটি অংশ।”[১১৩] উপরিউক্ত বিদগ্ধজনের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি ভারতে দলিত কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়।

জাতিভিত্তিক রাজনীতি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বহু বিতর্কিত একটি বিষয়। আর এই বিতর্কিত বিষয় নিয়ে গবেষণা করাটা আমাদের কাছে যথেষ্ট কঠিন বলে আমরা মনে করতে পারি। তবে আমাদের গবেষণা করার উদ্দেশ্য কোন জাতি, ভাষা, ধর্ম বা বর্ণের উপর আঘাত করা নয়। যেটা সত্য সেটা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তুলে ধরা। আজও আমরা সংবাদপত্রে দেখতে পাই যে রাজ্যের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা বেশির ভাগ নমঃশূদ্র জাতির মতুয়া ধর্মের পীঠস্থানে বা তাদের সম্মেলনে গিয়ে তাঁরা তাদের হৃদয় জয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনায় গিয়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, **“পশ্চিমবঙ্গের - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: তুলনামূলক পর্যালোচনা।** (১৯৭১ - ২০১৬)” এই লক্ষ্যেই আমরা আলোচনার চেষ্টা করব।

মূল্যায়ন

উপরিউক্ত জটিলতর ভারতের হিন্দু সমাজের কাঠামোগত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রচীন ভারতের হিন্দুসমাজে যেমন পেশা ও কর্মের ধরনের উপর নির্ভর করেও কমবেশি জাতিভেদ ব্যবস্থা ছিল, যা বিশেষ করে প্রাচীন কালেই আবার হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণের প্রেক্ষাপটে তৈরি, এই ভাবে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান ব্রাহ্মণই হবে, ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান ক্ষত্রিয়ই হবে। বৈশ্য ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান বৈশ্য হবে আর শূদ্রের ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান শূদ্র হবে এই ভাবেই আমাদের সমাজে পাকাপাকি ভাবে পেশা থেকে বেরিয়ে এসে জন্মগত জাতিভেদের কাঠামো স্থায়িত্ব পায়। মনু ভারতের হিন্দুসমাজের উক্ত চতুর্বর্ণের বাইরের আর কোনো বর্ণকে তিনি স্বীকার করেননি। মনু স্বীকার না করলেও তাতে কিন্তু হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ বা অস্পৃর্শ্য নামে পঞ্চমবর্ণের অস্তিত্ব তৈরি হয়, যা কালক্রমে পঞ্চমবর্ণ থেকে হাজার হাজার জাতির উৎপত্তি হয়। পঞ্চমবর্ণের অন্তর্গত এই হাজার হাজার জাতিই ভারতের হিন্দু সমাজে কালক্রমে কখনও ‘ডিপ্রেস ক্লাস’ ‘হরিজন’ ‘সিডিউল কাস্ট’ বা ‘দলিত’ জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়। প্রাচীন যুগেই আবার মনু সংহিতায় বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে চতুর্বণের পেশা ও সামাজিক উচু-নিচু এবং নারীদের সাময়িক অস্পৃশ্যতা তুলে ধরে আমরা হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা তুলে ধরে একটা চিত্র লিপিবদ্ধ করেছি। আমরা এই পরিচ্ছেদে বৈদিক, সিন্ধু সভ্যতা, হরপ্পা থেকে শুরু করে প্রাক আবার মধ্যকালীন ভারতের হিন্দুসমাজের

জাতিভেদ ব্যবস্থা যা কখনও কঠিন আবার কখনও কোমল হয়েছে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। এছাড়া এই পরিচ্ছেদে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় হিন্দুসমাজের উপর যেসকল দিক থেকে প্রভাব পড়ে, তা আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, অস্পৃশ্য দলিতদের উপরে তখনকার সমাজ কী ধরনের ব্যবহার করত। যদিও ব্রিটিশ শাসকেরা প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় হিন্দু সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ না করার ঘোষিত অবস্থান থেকে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে তারা অল্পদিনের মধ্যেই সরে আসে এবং বিভিন্ন দিক থেকে হিন্দু সামাজিক রীতি-নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এই জড়িয়ে পড়ার কারণ হল, তখনকার শাসকেরা নিজেদের স্বার্থে প্রশাসনিক সাফল্যের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে ও তার আচার-আচরণ, রীতি-নীতিকে বোঝার কাজকে সহজ করতে জাতি-বর্ণের কাঠামোকে অনুধাবন করবার নিমিত্তেই মনোনিবেশ করে, তা আমরা আলোচনায় তুলে ধরেছি। দেখা গেছে যে, ভারতের সমাজের পটভূমি থেকে জাতি এই সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান তুলে আনার প্রচেষ্টায় শাসকেরা জনগণনা শুরু করেন। এই শাসককুলের জনগণনার প্রধান লক্ষ্য ছিল, জাতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের। ১৮৮১ সাল থেকে ক্ষেত্রস্থল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, সর্বভারতীয় পটভূমিতে বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, জীবিকার ধরন, রীতি-নীতি, জাতি কাঠামোয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির সামাজিক অবস্থানের নির্ণয়ের চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের জাতিভেদ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞান লাভের লক্ষ্যে আমরা অগ্রসর হব। জনগণনার ফলে, কিছু সংখ্যক নিম্নজাতির মানুষের মধ্যে নিজ নিজ জাতির সামাজিক অবস্থান প্রশাসনিক এই নথিভুক্তির পথ ধরেই উন্নত করার প্রচেষ্টা করে।[১১৪] কাজেই নানা ধরণের টানাপোড়েন দেখা যায়, যার প্রভাব সমাজ, রাজনীতি ও তত্ত্বগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে সকল ছাপ রাখে, তা আমরা আলোকপাত করেছি, যা আমরা নমঃশূদ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরব।

আমাদের দেশের স্বাধীনতার পাঁচ–ছয় দশক আগে থেকেই অবদমিত জাতিদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জোরালো উপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করে স্বাধীন ভারতের পরিমণ্ডলে অবদমিত জাতির রাজনৈতিক অবস্থান বোঝার চেষ্টা করেছি। ১৯০৯ সালে মোন্টেমর্লে অ্যাক্ট পাশ হওয়ার দরুন অবদমিত জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের অক্সিজেন পায়। তার অনেকটাই, আগামী দিনে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অবদমিত জাতিদের সুরক্ষার জন্য যে রক্ষাকবচ সুনিশ্চিত পাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হয়েছিল। দেখা গেছে যে, ১৯১৯ সালে

সাউথবরো কমিটির কাছে প্রতিবেদনের সময় থেকেই আম্বেদকরের রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন, এবং একদিকে যেমন তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে জোরালো টানাপোড়নের সঙ্গে লিপ্ত হন, ও অন্যদিকে গান্ধী তথা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তীব্র সংঘাতের পথে চলে যান। আমরা এও উল্লেখ করেছি যে, তিরিশের দশকে আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন এই লড়াই অস্পৃশ্য জাতি বা ডিপ্রেসড ক্লাসের দাবি-দাওয়ার বিষয়টিকে ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে তুলে নিয়ে আসে।[১১৫] উক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকে আধুনিক রাজনীতির পরিভাষায় বলা হয়, সংগঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে অবদমিত জাতির লড়াই, যা আধুনিক ভারতের সেই সময়ের ইতিহাস তৎকালীন ঘটনাবলিকে অনেকটাই নথিভুক্ত করা হয়েছে, আমরা তা ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লিপিবদ্ধ করেছি। এর ফলে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে, প্রচলিত রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার পাশাপাশি দলিত গবেষক ও দলিত দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা প্রাপ্ত ফলের মধ্যে বেশ ফারাক থেকেই যায়, এছাড়া তুলে ধরেছি যে, ‘দলিত’ মানুষের চোখে সেই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। তা সত্ত্বেও সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসেও প্রাপ্ত স্থান থেকে পাওয়া যায়, ‘দলিত’ নারীদের রাজনৈতিক ইতিহাস। কাজেই পরবর্তীকালে নারীদের তাগিদেই সেই রাজনৈতিক ইতিহাস খননের দাবি ওঠে ও তার প্রক্রিয়াও শুরু হয়।[১১৬] তাইতো আমরা প্রাচীন, মধ্যকালীন এবং আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে দলিত নারীদের অবস্থান এই পরিচ্ছেদে তুলে ধরেছি। এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, দলিত পুরুষদের থেকেও যে বিপুল ভাবে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে দলিত নারীদের অবস্থান সমাজের একেবারে তলানিতে রাখা হয়েছিল।

আমরা আমাদের গবেষণা পত্রের এই পরিচ্ছেদে, ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ‘দলিত’ শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। এর কারণ হল, ভারতের সমাজে ‘দলিত’দেরকে সময়ের নিয়মে ও আন্দোলনের ধরনের দিকে লক্ষ দিয়েই তাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিতি পেতেছে। কাজেই আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে, দলিতদের নামের পরিবর্তন ঘটলেও তাদের সামাজিক ও রাজনীতিক আঙিনায় সম্মানের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। তাইতো আমরা ‘দলিত’ পরিচিতির নানা দিক থেকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি। যাতে করে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের জাতি-বর্ণ চেতনার রাজনীতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ‘দলিত’রা

কেন বা কী কারণে প্রভাব বিস্তার করেছে, উক্ত দলিত শব্দের ব্যবহারের মধ্যদিয়ে, সেটাও বিস্তারিত ভাবে আমরা তুলে ধরেছি। এর কারণ হল, ভারতের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক পরিকাঠামোর অভ্যন্তরে রচিত তা ভারতের রাজনীতিতে স্পষ্টতই দেখা গেছে যা 'দলিত' জাতি সমূহের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সম্মানের যে অক্লান্ত লড়াই করতে হয়েছে, যার ফলে যে কয়েক হাজার বছরের বর্ণ হিন্দুদের একক আধিপত্যের ভিত্তিতে ক্রমাগত আঘাত হেনেই চলেছে। এই আঘাত হানার সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের ইতিহাস আজকের দিনেও দলিত মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে লিপিবদ্ধ হয়নি-যেটুকু হয়েছে, তা প্রচলিত ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারায় এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে ঘটনাবলীর পেশ করা উপস্থাপন মাত্র। এই গবেষণায় ইতিহাসের সেই অন্ধকার থেকে 'দলিত' নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতিসম্মুহের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিচয় তুলে আনার প্রয়াস করা হবে।

নির্দেশিকা

১) S.C. Dube, Indian Society, National Book Trust, New Delhi, 1990, Re 2011, Page-1

২) সত্যব্রত চক্রবর্তী, (সম্পাদিত) "ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবনা" রামকৃষ্ণ দে, 'রাষ্ট্রভাবনাঃ মধ্যযুগের ভারত, প্রকাশন একুশে, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ৩৬।

৩) Damodar Dharmanand Kosambi, An Introduction to the study of Indian History, Popular Prakashan, Bombay, 1956 Re 2011, পৃঃ ৫০।

৪) Ram Sharan Sharma, Sudras in Ancient India, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD, Delhi, 1958, Re 1990, পৃঃ ১।

৫) Ram Sharan Sharma, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩,

৬) Romila Thapar, A History of India, (volume one) প্রাগক্ত, পৃঃ ২৮।

৭) Romila Thapar, A History of India, (volume one) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

৮) Romila Thapar, A History of India, (volume one) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

৯) Romila Thapar, A History of India, (volume one) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

১০) Romila Thapar, A History of India, (volume one) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

১১) S.C. Dube, Indian Society, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪-৫।

১২) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০ পুনর্মুদ্রণ ২০০৭, পৃঃ ৪৭।

১৩) Damodar Dharmanand Kosambi, An Introduction to the study of Indian History, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

১৪) রামশরণ শর্মা, আর্যদের ভারতে আগমন, (অনুবাদ- গৌতম নিয়োগী) ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ২০০১, পুনর্মুদ্রণ ২০০৩, পৃঃ ২২-২৩।

১৫) Damodar Dharmanand Kosambi, An Introduction to the study of Indian History, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।

১৬) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন,প্রাগুক্ত,পৃঃ ৭৫।

১৭) S.C. Dube, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

১৮) Damodar Dharmanand Kosambi, An Introduction to the study of Indian History, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৭।

১৯) Damodar Dharmanand Kosambi, An Introduction to the study of Indian History, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

২০) Ram Sharan Sharma, প্রাগোক্ত, পৃঃ ১২।

২১) Damodar Dharmanand Kosambi, An Introduction to the study of Indian History, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬।

২২) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন,প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।

২৩) Damodar Dharmanand Kosambi, An Introduction to the study of Indian History, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।

২৪) রমেশচন্দ্র দত্ত (অনুবাদ) ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম খণ্ড) হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৯।

২৫) রমেশচন্দ্র দত্ত (অনুবাদ) ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম খণ্ড) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

২৬) রমেশচন্দ্র দত্ত (অনুবাদ) ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৫৭০-৫৭১।

২৭) মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদ) মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, দোলযাত্রা ১৪১০, পৃঃ ১১।

২৮) রমেশচন্দ্র দত্ত (অনুবাদ) ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭১।

২৯) মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদ) মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, দোলযাত্রা ১৪১০, পৃঃ ১১।

৩০) F. Max Muller, (Translated by G.Buhler) The Sacred Book of the East, Oxford at the Clarendon Press, London, 1886, পৃঃ ২৪,২৫,২৬,২৭।

৩১) D. D. Kosambi, An Introduction to the study of Indian History, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।

৩২) D. D. Kosambi, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

৩৩) D. D. Kosambi, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১-১০২।

৩৪) D. D. Kosambi, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

৩৫) F. Max Muller, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

৩৬) F. Max Muller, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

৩৭) F. Max Muller, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০১।

৩৮) F. Max Muller, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০১-৩০২।

৩৯) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, (অনুবাদ কাবেরী বসু) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা (তৃতীয় মুদ্রণ) ২০০২, পৃঃ ১৬৩।

৪০) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০।

৪১) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।

৪২) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫।

৪৩) কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায়, নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে : অন্ধকারে আলোর দিশা, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ৫।

৪৪) কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায়, নারী শ্রেণী ও বর্ণ : নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান। প্রথম মিত্রম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃঃ ৩।

৪৫) F. Max Muller, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২০-২১।

৪৬) কল্যানী, নারী শ্রেণী, প্রাগক্ত, পৃঃ ৮।

৪৭) রামশরণ শর্মা, আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ, 'সামন্ত-প্রক্রিয়া বিষয়ে এক সমীক্ষা' (অনুবাদ লিখেলশ্বর সেনগুপ্ত), ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৩, পৃঃ ১৫০-৫১।

৪৮) রামশরণ শর্মা, আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫।

৪৯) মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

৫০) রামশরণ শর্মা, আদি মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ, (সামন্ত-প্রক্রিয়া বিষয়ে এক সমীক্ষা) ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ১১।

৫১) রামশরণ শর্মা, আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭।

৫২) সুকোমল সেন, ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ ১১০।

৫৩) রামশরণ শর্মা, আদি মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮-৫৯।

৫৪) রামশরণ শর্মা, আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২-৬৩।

৫৫) T.W. Rhys Davids, Dialogue of the Buddha, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

৫৬) Dr. H. Oldemberg, Buddha, His Life, His Doctrine, His Order, Kessinger publishing LLC, Kolkata 2003, পৃঃ ১৫২।

৫৭) Dr. H. Oldemberg, Buddha, His Life, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২।

৫৮) Dr. H. Oldemberg, Buddha, His Life, প্রাগুক্ত ,পৃঃ ১৫৪।

৫৯) Dr. H. Oldemberg, Buddha, His Life, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫।

৬০) রামশরণ শর্মা, আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

৬১) রামশরণ শর্মা, আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১।

৬২) রামশরণ শর্মা, আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২।

৬৩) রামশরণ শর্মা, আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৩-৫৪।

৬৪) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।

৬৫) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২।

৬৬) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩-৭৪।

৬৭) এম. আর. তরফদার, হোসেনশাহী আমলে বাংলা, ১৪৯৪-১৫৩৮ : একটি সামাজিক রাজনৈতিক পর্যেষণা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃঃ ১৪৮।

৬৮) D. D. Kosambi, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৮।

৬৯) D. D. Kosambi, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৮।

৭০) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪-৭৫।

৭১) P. Hardy, revised by C. Brunner, and D. Laly Veld, Islamic Mysticism in India, Sources of Indian Tradition, Vol, 1. Ed. Ainslic T. Embree, পৃঃ ৪৬৫।

৭২) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১-৮২।

৭৩) কোকা. আন্তানোভা, গ্রিগোরি. বোনগাদ - লেভিন গ্রিগোরি. কাতভস্কি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, (অনুবাদ মঙ্গলাচরণ চট্রপাধ্যায়) প্রগতি প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯১ পৃঃ ৩৩০।

৭৪) ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩০।

৭৫) Iqtidar Alam Khan, Akbar's Personality Traits and World outlook: A Critical Reappraisal, Social Scientist, vol. 232, 33, পৃঃ ২৯।

৭৬) ঐ পৃঃ ২০ এবং Professon Irfan Habib, Akbar and His Age, ঐ পৃঃ ৭০-৭১।

৭৭) Professon Satish Chandra, পৃঃ ৭১।

৭৮) Brihadaranyak Oponishad bhasya 4.5.1, Translated by Swami Madhavannda with Lommentary of Sankaracharya advaita Ashrsm, Mayavati, 1965, ৬.৪.১৭।

৭৯) Brihadaranyak Oponishad bhasya 4.5.1, ঐ ৬.৪.১৭।

৮০) ইরফান হাবিব, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।

৮১) J. H. Hutton, Caste in India oxford university press, পৃঃ ১৮০।

৮২) J. H. Hutton, প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৭৮।

৮৩) দেবী চ্যাটার্জী, পতিত, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ২০।

৮৪) Bhupendranth Datta, Studies in Indian Social polity, Nababharat Publishers, Calcutta, 1983, পৃঃ ২০।

৮৫) দেবী চ্যাটার্জী, পতিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

৮৬) দেবী চ্যাটার্জী, পতিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

৮৭) দেবী চ্যাটার্জী, বিশ্বায়নও দলিত, অমিয় কুমার বাগচী (সম্পাদিত) বিশ্বায়ন ভাবনা- দুর্ভাবনা (প্রথম খন্ড) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬ (পুনরায়) পৃঃ ১৩৫।

৮৮) রাহুল সাংকৃত্যায়ন, জাতিভেদ, সুজিত সেন (সম্পাদিত) জাতপাত ও জাতি : ভারতীয় প্রেক্ষাপট, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৩১,৩২।

৮৯) The Constitution of India, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 2016, পৃঃ ২০৬।

৯০) সুভাষ সি. কাশ্যপ, আমাদের সংবিধান (অনুবাদ পার্থ সরকার) ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লী, ২০০৫, (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃঃ ১২।

৯১) বিপান চন্দ্র, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ৩৪৭।

৯২) সুভাষ সি. কাশ্যপ, আমাদের সংবিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

৯৩) সুভাষ সি. কাশ্যপ, আমাদের সংবিধান, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৫।

৯৪) দেবী চ্যাটার্জী, পতিত, ক্যাম্প, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২।

৯৫) বসন্ত মুন (বাংলা ভাষায় অনুবাদ নীতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রী বীরেন সাহা), বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর রচনা সম্ভার, (দ্বিতীয় খন্ড), ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী, ১৯৯৫, পৃঃ ২৯।

৯৬) বসন্ত মুন (বাংলা ভাষায় অনুবাদ সজল বসু, স্নেহাশিস সান্যাল, অন্তরা ঘোষ), বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর রচনা সম্ভার, (ষোড়শ খন্ড), ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী, ১৯৯৯, পৃঃ ২৯।

৯৭) স্বপন কুমার বিশ্বাস; ভারতীয় সমাজ উন্নয়ন ধারা: ডঃ আম্বেদকর, ওরিয়ন পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ৩৭৫।

৯৮) বসন্ত মুন (বাংলা ভাষায় অনুবাদ সজল বসু, স্নেহাশিস সান্যাল, অন্তরা ঘোষ), বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর রচনা সম্ভার, (ষোড়শ খন্ড), ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭।

৯৯) দেবী চ্যাটার্জী, পতিত, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ১৫৪।

১০০) সত্যব্রত দত্তবাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে , পৃঃ ,২০০২ ,কলকাতা ,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ,গণতন্ত্র২১১।

১০১) Debi Chatterjee, Ideas and Movements Against Caste in India, Ancient to Modern Times, Abhijeet Publications, New Delhi, 2010, পৃঃ ২১৩-১৪।

১০২) Debi Chatterjee, Ideas and Movements Against Caste in India, Ancient to Modern Times, প্রাগক্ত, পৃঃ ২২৭-২৯।

১০৩) সুশান্ত কুমার সাহিত্যরত্ন; ভারতরত্ন বাবা সাহেব আম্বেদকর, নির্মল কুমার সাহা, সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ৫৮।

১০৪) সুশান্ত কুমার সাহিত্যরত্ন; ভারতরত্ন বাবা সাহেব আম্বেদকর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

১০৫) Subhash C. Kashyap, ‘Our Parliament’ An Introduction to the Parliament of India, National Book Trust, New Delhi, (Reprints) 2011, পৃঃ ২০।

১০৬) The Constitution of India, Lok Sabha Secretariat, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৪-১৫।

১০৭) The Constitution of India, Lok Sabha Secretariat, প্রাগক্ত, পৃঃ ৭।

১০৮) The Constitution of India, Lok Sabha Secretariat, প্রাগক্ত, পৃঃ ২৩।

১০৯) The Constitution of India, Lok Sabha Secretariat, প্রাগক্ত, পৃঃ ২০৮।

১১০) আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ২৮.০২.২০০৮

১১১) দেবী চ্যাটার্জী, বিশ্বায়ন ও দলিত, অমিয় কুমার বাগচী (সম্পাদিত) বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা (প্রথম খন্ড) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬ (পুনরায়) পৃঃ ১৩৫।

১১২) দেবী চ্যাটার্জী, বিশ্বায়ন ও দলিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬।

১১৩) বাসব সরকার, দলিত রাজনীতি প্রসঙ্গে, সুজিত সেন (সম্পাদিত) জাতপাত ও জাতি: ভারতীয় প্রেক্ষাপট, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৫৪২ - ৫৪৩।

১১৪) Ishita Banerjee-Dube (Edited), Caste in History, Oxford Univesity Press, New Delhi, 2008, পৃঃ ১০৮।

১১৫) Debi Chatterjee, Ideas and Movements Against Caste in India, Ancient to Modern Times, প্রাগক্ত, পৃঃ ২১৩-২২৯।

১১৬) Sharmila Rege, ‘A Dalit Feminist Standpoint’ Anupama Rao (Edited) Gender and Caste, Sage, New Delhi, পৃঃ ৯৫-৯৮, Sharmila Rege, Writing Casto/Writing Gender: Narrating Dalit Women’s Testimonios, Zubaan, New Delhi, ২০০৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে

নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করার পূর্বসূত্র হিসাবে সংক্ষেপে 'দলিত' কে বা কারা এই প্রসঙ্গ আমরা আগের পরিচ্ছেদে করেছি। এবারে বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যাক। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের চতুর্প্রান্তে নানা সময়ে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ ঘটেছে। আর এই আক্রমণের ফলে নানাজাতির সামাজিক তথা অর্থনৈতিক রীতিনীতি কায়েম হয়েছে। যার ধারাবাহিকতার রেশ বর্তমানেও বিরাজমান আছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। ফলত ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপটের বৈচিত্র্য ভিন্ন চরিত্রের বাহক। তবে আমাদের উপমহাদেশের যাবতীয় জাতি-ভিত্তিক রীতিনীতির ভিত আর্যদের নিজস্ব রীতির সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়ার প্রক্রিয়াটি মোটেই সহজ ছিল না, হয়নি। ভারতে আর্যকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম পর্বে সাংস্কৃতিক সংঘাতের সাথে সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ পর্যায়ক্রমে লেগেই ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে আর্যজাতি স্থানীয় আদিনিবাসীদের জমিতে কৃষিকার্য করার চেষ্টা চালায় এবং তারা ধীরেধীরে পশুপালন থেকে কৃষিকাজ আয়ত্ত করতে লাগল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আর এর ফলেই হয়তো আর্যদের নতুনপেশা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দরুন স্থানীয় আদিবাসিদের সঙ্গে বোঝা পড়ার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, নানাবিধ কারণে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির সমাজের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া চলছিলই। এই সমন্বয় আরও বৃদ্ধি পায় যখন আর্যরা পূর্বদিকে আরও বেশি এগোতে শুরু করল। আবার এমন একটা ধারণা আমরা করতে পারি যে, আর্যদের পূর্বদিকের অগ্রগতির সাথে সাথে স্থানীয়দের সঙ্গে যে সংঘর্ষ শুরু হল, তার ফলেই হয়তো সমাজে তৈরি হল অনার্য শক্তির। এই সকল সংঘর্ষে যারা যারা পরাজিত হল, তারা নিজেরা অনার্য পরিচয় ধরে রাখার সাথে সাথেই আর্যদের কিছু সংখ্যক সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণাও তারা গ্রহণ করতে শুরু করে বলে মনে করা যেতে পারে। উক্ত সংস্কারগুলি হয়তো বা বঙ্গদেশের নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয়রা গ্রহণ করার চেষ্টা করে থাকবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

আর্যদের আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে এবং সাংস্কৃতিক সত্তাকে রক্ষা করার জন্য কিছু সংখ্যক আদিবাসী স্থানান্তরিত হয়েছিল। এর উল্লেখ আমরা পাই অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবের মন্তব্য থেকে, “Some tribal groups refused to be absorbed and chose to recede to inaccessible forests and hills. Many of them still maintain their separate identities, although there are vaguely defined norms for their intaraction with others in the economic and social fields.”[১] এই মন্তব্য থেকে আমরা একটা অনুমান করতে পারি যে, সারা ভারতে সমপরিমাণে আর্যজাতিসত্ত্বা গড়ে ওঠেনি।

আবার ভারতে অনেক জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, যারা শূদ্র বা অনার্য জাতির পরিচয় বহন করার পক্ষে দুর্বল ছিল না। এর উদাহরণ হিসাবে আমরা তুলে ধরব এস.সি. দুবের আরেকটি মন্তব্যকে, তাঁর মতে, “The reddy in Andhra Pradesh, the Nayar in Kerala, the Marava in Tamil Nadu, and the Maratha in Maharashtra were Economicaly and Politicaly too Powerfully to be given shudra status. While they were not formally recognized as twice born, they claimed and obtained a near Kshatriya status.”[২] উক্ত মন্তব্য থেকে আমরা বলতেই পারি যে, সারা ভারতের শূদ্র জাতির মধ্যেও বেশ কিছু সংখ্যক জাতি তাঁরা নিজেদেরকে আর্যশক্তির নিকট হেয় প্রতিপন্ন করে রাখতে রাজি ছিলেন না। এক্ষেত্রে হয়তো তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা মাথা উঁচু করে ও গোষ্ঠীবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল।

এবারে আমরা আমাদের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার দিকে লক্ষ রেখে উপরিউক্ত আলোচনার ধারাবাহিকতার রেশ ধরে বঙ্গদেশের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কতটা বিরাজ ছিল, সেটা নিয়েই আলোচনা করতে সচেষ্ঠ হবো।

আর্থসামাজিক তথা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে, আমাদের দেশের জাতি ব্যবস্থা কালের নিয়মে বহুজাতিতে বিভক্ত হওয়ার ইতিহাস বিদ্যমান বলে মনে করা যেতে পারে। সেদিক থেকে যে জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি অন্যান্য সমগোত্রীয় জাতি অপেক্ষা ভালো, তারা নিজেদের সামাজিক ভাবে উচ্চজাতি হিসাবে ভারতীয় সমাজে পরিগণিত হওয়ার নিমিত্তে নানাবিধ যুক্তি অবতারণ করেন। সেই সমস্ত যুক্তি গুলি যে সবসময় যথাযথ

যুক্তির উপর নির্ভর করে, তেমন কিন্তু নয়, আবার যে তাদের কিছু সংখ্যক দাবি একেবারেই যুক্তি বর্হিভূত তাও কিন্তু নয়, তা সে ধর্মীয় কারণেই হোক বা উৎপাদনের তারতম্যের কারণেই হোক না কেন, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জাত-ভিত্তিক সামাজিকতা তথা রাজনৈতিক বিভাজন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান বললে বেশ একটা ভুল বলা হবে না।

বাংলায় কোনো এক সময়ে বর্ণ - জাতি কাঠামোর ধারাবাহিকতার উৎপত্তি ঘটে বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। বাংলার বর্ণ-জাতি কাঠামোর উৎপত্তি কবে হল? কেন হল? কারা করেছিলেন? কী ভাবে করেছিলেন? উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন। একজন একটি মত দিলে অন্যজন তার ভিন্ন মত পোষণ করেন। ফলে একটা জটিলতা তৈরি হয়, যার নানাবিধ কারণও আছে। আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা দুইএকটি কারণ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করার চেষ্টা করবো। তাহলে হয়তো একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, ঐতিহাসিকেরা যে সময়কালকে ধরে বাংলার জাতি-বর্ণের কাঠামোর আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করেন তা অতিপ্রাচীন। যার ফলে সেই সময়ের কোনো ঘটনা নথিভুক্ত নেই বললেই ধরাযেতে পারে। যেসময় থেকে ঐতিহাসিকেরা খননকার্য শুরু করেন তখন থেকেই নথিভুক্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও নানান মতপার্থক্যের মধ্য দিয়েই প্রাচীন ভারতের জাতি-বর্ণের ইতিহাস আমরা আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করব।

দ্বিতীয়ত, বাংলার বর্ণ-জাতি কাঠামোর উৎপত্তি, কবে হল? কেন হল, কারা করেছিলেন? কী ভাবে করেছিলেন? উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা আরও একটি জটিল সমস্যায় পড়েন, জাতি-বর্ণের কাঠামোর নির্দিষ্টভাবে উৎপত্তিকালকে চিহ্নিত না করতে পারার জন্য। ঐতিহাসিকেরা সকলেই প্রায় কমবেশি একমত যে, বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার নির্দিষ্ট সময়কাল চিহ্নিত করা যায়, আবার কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার চিহ্নিত করা যায় না। যেমন বলা যেতে পারে যে, কোন রাজার সঙ্গে কোনো যুদ্ধ হয়েছিল কবে কোন রাজা সিংহাসনে বসেছিলেন – এই সমস্ত ঘটনার সময় কাল নির্দিষ্ট ভাবে বলা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে আমরা অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী'র মন্তব্য তুলে ধরে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করব। অধ্যাপিকার মতে, "সামাজিক ব্যবস্থার কথা যেখানে বলা হয় সেখানে কোনো নির্দিষ্ট সন-তারিখ চিহ্নিত করা যায় না। সামাজিক ব্যবস্থা কোনো নির্দিষ্ট দিনে ঘটে না; তা একটি প্রক্রিয়া, যা

দীর্ঘ সময়কাল ধরে চলে। এর দৃশ্যমানতার আগেই এর বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। উদাহরণ হিসাবে দেখা যায়, ধর্মের উৎপত্তি পরিবারের উৎপত্তি, বর্ণ-জাতির ব্যবস্থার উৎপত্তি। কোনোটির ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সন-তারিখ চিহ্নিত করে তার উৎপত্তিকাল ধরা যায় না। তা একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া, যা পারিপার্শ্বিক বহুবিধ পরিস্থিতি ও প্রক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়"।[৩] উক্ত মন্তব্য থেকে একথা বলা যেতেই পারে যে, জাতি-বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস কোনো এক নির্দিষ্ট সময়কালে হয়েছে বলে বলা যায় না।

শুধুমাত্র উক্ত কারণের জন্যেই যে বাংলার জাতি-বর্ণের সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা অসম্ভব হয়ছে তা কিন্তু নয়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, নির্দিষ্ট সময়কাল চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা থাকলেও, জাতি-বর্ণের কাঠামোর উৎপত্তির একটা আনুমানিক সময়কাল ধরা যেতে পারে। কিন্তু ধরা যেতে পারে কোন সময়কালকে, সেটা অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী'র আরও একটা মন্তব্য তুলে ধরে বিষয়টাকে সহজ ভাবে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। অধ্যাপিকার মতে, "ধরা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১২০০-র মধ্যে ঋক্‌বেদের রচনার সময়কাল শুরু হয়; আর সেই সময় থেকেই জাতিবর্ণ বিভাজন, তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার সূচনা। সেই সময় থেকেই, সময়ের বিবর্তনের পথ ধরে সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এক বিস্তারিত দার্শনিক পরিকাঠামো যা সূত্র, শাস্ত্র ও নানাবিধ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার পূর্ণাবয়ব রূপ প্রতিষ্ঠা করে"।[৪] এই মন্তব্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ভারতে আর্যদের হাত ধরেই বৈদিক সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। উক্ত ধরে নেওয়ার পক্ষে যুক্তি হিসাবে আমরা প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি বিশ্লেষক, সুকুমারী ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য উল্লেখ করব, তাঁর মতে, আর্যরা ভারতে বেদ নিয়ে এসেছিলেন ' তারা হয়তো খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি কোনো সময়ে এখানে পৌঁছয়।[৫] প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার সমাজ ব্যবস্থার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক যাত্রাপথ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে; কখনো যেতে হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদের কড়াকড়ি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আবার বৈদেশিক শাসকদের শাসনের মধ্য দিয়ে। তবে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঋগ্বেদের সময়কালে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সূচনা হলেও তার নিয়মনীতির কঠোরতা পরবর্তীকালে বাংলায় প্রতিষ্ঠা পায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আবার প্রাচীন বাংলার সমাজ বিশ্লেষকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে জাতিদের মধ্যেকার সীমারেখাগুলি ছিল অনেকটাই নমনীয়,

বংশগত পেশা-র ধারণা শিথিল। একই পরিবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পেশা অবলম্বনকারীদের দেখা যেত বলে ধরে নেওয়া হয়। দেখা যায় যে, ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণের উল্লেখ কমই পাওয়া যায়; এখানে পাওয়া যায় এক অতিকায় এক রহস্যাবৃত শক্তি হিসাবে। সেই শক্তিই বিশেষ শক্তির অধিকারীই যে ব্রহ্মত্ব, ব্রাহ্মণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে আমরা উল্লেখ করতে পারি, ঐতিহাসিক এ.এল. ব্যাশাম্ একটি মন্তব্য, তাঁর মতে "perhaps the first trace of caste is to be found cataloguing of trades and ". professions in later vedic literature[৬] সংগতকারণেই বলা যেতে পারে যে তিনি মনে করেন বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে পেশার তালিকা রচনার মধ্যে জাতি ব্যবস্থার প্রথম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

পুরুষসূক্ত-য় আদি পুরুষের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টির দাবি করা হয়েছে, তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্র।[৭] মনে করা যেতে পারে যে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সাল থেকে খ্রিস্ট পরবর্তী ১২০০ সালের মধ্যে জাতি বর্ণ ব্যবস্থা অ-নমনীয় রূপ ধারণ করে যেখানে ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদার শীর্ষে স্থান দেওয়া হয় আর শূদ্রদের লাঞ্ছনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজকাঠামোর বিস্তারিত বিবরণ এই সময়কালের মধ্যে মনুস্মৃতিতে তুলে ধরা হয়।

কালের নিময়েই বাংলার শূদ্র সমাজ যুগ যুগ ধরে পদদলিত এবং শোষিত হওয়ার থেকে রক্ষা পাওয়ার সন্ধানে নতুন ধর্মের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের মনে হয় হয়তো, তারা হিন্দু হয়েও তারা হিন্দু নয়, এই রূপ চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে হয়তো, যে ধর্মে জাতের আঘাত নেই, অত্যাচার নেই পদদলিত নিম্নজাতের সমাজ তেমন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে জীবন ধারণ করতে চাইল। এই প্রসঙ্গে আমরা বসন্তকুমার মণ্ডলের মন্তব্য তুলে ধরবো, তাঁর মতে "ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারে জর্জরিত হিন্দু সমাজের দুর্বলতার সুযোগে জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করতে আরম্ভ করল। শূদ্র সমাজ যেন মুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দলে দলে তারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। "...যদিও রাজশক্তি বৌদ্ধদের পিছনে ছিল কিন্তু সে বল প্রয়োগের কোন প্রয়োজনই হয়নি"।[৮] বলাই যেতে পারে প্রাথমিক অবস্থায় বৌদ্ধ ধর্মের উদারতায় বাংলার যারা আজ নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামে পরিচিত তারাও হয়তো দলে দলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও আবার মনে করা হয় যে, বাংলায় সেন রাজত্ব কালে হিন্দু ধর্মে যুক্ত হয় কৌলীন্য প্রথা। "বল্লাল

সেনের সময়কে হিন্দুধর্মের অন্ধকার যুগ বা কলঙ্কিত যুগও বলা যায়। কৌলীন্য প্রথায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের মানুষ আরও দলিত হতে আরম্ভ করল”।[৯] আর এই কৌলীন্য প্রথার মাধ্যমে নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর নানা ধরনের অত্যাচারিত হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ফলে; তাঁরা ব্রাহ্মণদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে জলাভূমি ও জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আর যারা জলাভূমি ও জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন না, তাঁরাই আবার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নিজের বাসস্থানেই থেকে গেলেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বহুসংখ্যক মানুষ নিজধর্ম রক্ষার্থে জলাভূমি ও জঙ্গলে বসবাস করতে বাধ্য হন, বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আধুনিক সময়ে আমরা দেখতে পাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির বেশি ভাগ মানুষ জলাভূমি ও জঙ্গলেই বসবাস করেন।

বাংলায় মুসলমান শাসন কালে দেখা যায় অনেক হিন্দু রাজা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের রাজত্ব রক্ষা করেছিলেন। এর উদাহরণ হল রাজা শেখের গনেশকে বলেছিলেন তিনি যদি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন তাহলেই শেখর ইব্রাহিম শাহকে অনুরোধ করবেন গনেশের রাজত্বকে অধিগ্রহণ থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু গনেশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা না নিতে পারলেও তার অনুরোধেই “নূর কুতুব-উল-আলম গনেশের পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে জলাল-উদ্দীন নাম দিয়েছিলেন।[১০] দেখা গেলো যে একজন হিন্দু রাজকুমার রাজত্ব রক্ষার্থে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন অতি সহজেই। তাহলে বাংলার নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও দলে দলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বা চাপে পড়েই ইসলামধর্ম গ্রহণ করে থাকবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা লীনা চাকীর মন্তব্য তুলে ধরব, তাঁর মতে “রাজার পোষিত ধর্ম রমরমিয়ে শাসন করত অন্য ধর্মকে। এসবের চাপে পড়ে ও উচ্চবর্ণের সামনে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল বিরাট সংখ্যক দরিদ্র, নিম্নবর্ণের মানুষ। মুসলমান ধর্মান্তকরণের প্রবল চাপে এই মানুষগুলো ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করে”।[১১] তবে রাজধর্মের প্রবল চাপের মধ্যেও ব্রাহ্মণরাই বাঙালি হিন্দুসমাজের সর্বোচ্চ অবস্থানেই ছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরা কুলীন, বঙ্গজ, শ্রোত্রিয়, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ নানান গোত্রে এই সময় বিভাজিত হয়ে যান। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এত গোত্র থাকা সত্ত্বেও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বিশেষ করে গোত্রের কারণেই তাদের মধ্যেও বিভিন্ন বিভাগে বিভাজিত হওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কাজেই দেখা যায় যখন “....রাজশক্তির প্রভাবে দ্বিধাবিভক্ত শূদ্রসমাজ ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ

করল। পূর্বাঞ্চলের নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, প্রভৃতি বহুজন সমাজ ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল"।[১২] হিন্দুধর্মের রীতিনীতি অনুযায়ী কোনো মানুষ ধর্ম ত্যাগ করলে, তার পক্ষে আর হিন্দু ধর্মে ফেরাটা বেশ কঠিন হয়ে যায়। নিম্নবর্ণের মানুষ ধর্মান্তরিত হলেও ইসলামধর্মে সামাজিক মর্যাদা নিম্নের দিকেই ছিল এবং তাদের পদবির কোনো পরিবর্তন হয় না, শুধুমাত্র নামের পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন ইকবাল মণ্ডল, আব্দুল রফিক সরদার, মৌলা বিশ্বাস, তুফার্জল মুন্সি, ইউনিজ মিস্ত্রি, সফিকুল সরকার, আমিনুল লস্কর, বর্তমানেও বাংলায় মুসলমানদের অনেকের পদবি এই রূপ দেখা যায়।

সময়ের নিরিখে বাংলার সমাজে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানের মিলনের নতুন দিগন্ত তৈরি হয়। এর ফলেই হয়তো নিম্নবর্ণের থেকে যারা ইসলামে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার এই নতুন সাম্যবাদী ধর্মে দীক্ষিত হন। এই প্রসঙ্গে লীনা চাকীর মন্তব্য তুলে ধরব, তাঁর মতে "এর সঙ্গে দুলালচাঁদ জাতপাতের শেষ সিঁড়িতে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের একত্রিত করতে শুরু করলেন ধর্মের বাতাস দিয়ে। উদারতাই হল তাঁদের প্রকাশ্য চাবিকাঠি। অবশ্য মূল কাজটা করেছিলেন আউলচাঁদই। শ্রীচৈতন্যের উদারতার পথকে আদর্শ করে নিকটের শিষ্য মেনেছিলেন সদগোপ, কলু, ডোম, মুচি ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নবর্ণজাত মানুষকে।"[১৩] এই মন্তব্য থেকে আমরা একটা অনুমান করতে পারি যে, চৈতন্যের উদারতার ভাবধারায় সাধনায় বঞ্চিত জনসাধারণ ব্যাপক ভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তাদের মধ্যে থেকে ধর্মীয় গুরুর মর্যাদাও পান। কাজেই তারা নিজেদের চৈতন্যদেবের উদারতায় বাংলার চন্ডাল জাতি ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষ বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেই ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ খুঁজে পায়। নিম্নবর্ণের মানুষেরা যেমন ধর্মীয় ভাবনার অধিকার অর্জন করে অন্যদিকে উচ্চ তিন জাতির সমান অথবা উচ্চ তিন জাতির থেকে হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান পাবার বাসনায় জাগরিত হয় বৈষ্ণব ধর্মের নিম্নজাতির শিষ্যরা।

ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার জাতি – বর্ণ ব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের সমাজের উপর নানাদিক থেকে তার প্রভাব পড়ে, সেদিক থেকে বাংলার সমাজের উপরেও বেশ প্রভাব পড়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। ব্রিটিশ শাসকরা প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় সমাজজীবনের ক্ষেত্রে কোনোভাবে হস্তক্ষেপ না করার ঘোষিত অবস্থান থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে অল্পদিনের মধ্যেই সরে যায় এবং নানা দিক থেকে সামাজিক বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়ে। এই জড়িয়ে পড়ার নানাবিধ কারণও ছিল যা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল -

ব্রিটিশদের কাছে আমাদের দেশ অজানাদেশ হিসেবে পরিচিতি থাকার কারণেই, অচেনা মানুষের, অচেনা সমাজ ও এদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করার মধ্য দিয়ে যে তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করা যাবে বলে ধরে নিয়ে ভারতের জাতিভিত্তিক সমাজের দিকে লক্ষ দিতে হল। আর শাসকদের সাহায্যের জন্য তাকাতে হয় সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তিদের দিকে; নির্ভর করতে হয় তাঁদের দেওয়া ব্যাখ্যা – বিশ্লেষণের উপর।[১৪] বলা বাহুল্য, ভারতীয় সমাজ ও সমাজজীবন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সেই সহায়ক মাধ্যম হয়ে পড়ে ব্রাহ্মণদের দেওয়া তথ্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মসাহিত্য। এইসময় ব্রিটিশদের নিকট ভারতীয় তথা হিন্দুসমাজ পরিচালনের ক্ষেত্রে মনুস্মৃতি কঠোর জাতিবৈষম্যভিত্তিক ও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংবলিত নির্দেশাবলি এক অন্যমাত্রায় স্বীকৃতি লাভ করে। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে তা ভারতীয় সমাজজীবনের স্বাভাবিক, সর্বজন গৃহীত নিয়মাবলি হিসাবে গণ্য হয়।[১৫] আবার হিন্দু পণ্ডিতদের দেওয়া সমাজবিবরণ অনেকাংশে, গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রাথমিক পর্যায়েই তারা গ্রহণ করেন। এই সময় ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের শাসন কাজের স্বার্থে এবং প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে, ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে ও তার আচার-আচরণ, রীতি-নীতিকে বোঝার কাজকে সহজ করতে জাতি – বর্ণ ব্যবস্থার চিত্র অনুধাবন করায় মনোনিবেশ করেন। হিন্দুশাস্ত্রের পণ্ডিত ও জ্ঞানীসমাজ তথা রক্ষণশীল সমাজের মানুষের সাহায্যে সামাজিক জাতি বর্ণ কাঠামোর তথ্যাদির উপর নির্ভর করে যে সমাজ ব্যাখ্যা, শাসকের কাছে গুরুত্ব পায় তা জাতিভিত্তিক সমাজ ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বকে অনেকটাই স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়।[১৬] উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে প্রশাসকদের ভারতের সমাজের জাতিভিত্তিক কাঠামো নিয়ে গবেষণা করতে দেখা যায়। ব্রিটিশদের ভারতকে সুসংহতভাবে শাসনের জন্য, তার জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক তথ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। কোম্পানির উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীরা - জনসংখ্যা, অর্থনীতি, কৃষি, ভূমি এবং ইতিহাসের নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে এই কাজগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং রীতিসম্মত রূপ দেওয়া হয় সেন্সাস সার্ভে ও গেজেটিয়ার-এর সংকলন ও প্রকাশনের মাধ্যমে।[১৭]

ব্রিটিশ শাসকেরা বাংলার সমাজের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত রীতিনীতি ব্যবহার করেই শাসন কার্য পরিচালনা করতেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। J. H. Hutton তাঁর 'Caste in India' গ্রন্থে বাংলার বেশির ভাগ নিম্নবর্ণের জাতির পেশা ও সামাজিক অবস্থানের এবং অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্য উল্লেখ করেছেন।[১৮] কাজেই

ভারতের প্রথম জাতিভিত্তিক জনগণনা ১৮৭২/৭৩ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে ৬০ বছরে ৬ বার করা হয়েছিল। প্রথম দুটি সেন্সাসের জনগণায় জাতি বা বর্ণই প্রাধান্য পায়। আবার ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১- এর জনগনণায় রিজলি সাহেবের তত্ত্বাবধানে হওয়ার সময় থেকেই জাতি মর্যাদা বা র‍্যাঙ্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে নিম্নজাতিগুলোর ঐতিহ্যগত প্রথা ও রীতিনীতি বিষয়ক তথ্য বিশেষ গুরুত্ব পায়। ফলত এই সময় থেকে জাতিগত হীন অবস্থান থেকে নিজেদের মর্যাদাজনক অবস্থানে তোলার জন্য কমিশনারের কাছে ঐক্যবদ্ধভাবে স্মারকলিপি জমা করতে থাকেন। আর সম্মানজনক মর্যাদা পাওয়াকে কেন্দ্র করেই ভারতে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হত এবং এর মীমাংসা করার জন্য ব্রিটিশ আধিকারিকরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। কাজেই এক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় বিধানই প্রাধান্য পেত।[১৯] পরবর্তী সময়ে ১৯৪১ সালের জনগণনাতে জাতিভিত্তিক সমীক্ষার বিষয়টি ব্রিটিশ সরকার বাতিল করেন। জাতিগত হীন অবস্থান থেকে নিজেদের মর্যাদাজনক অবস্থানে তোলার জন্য কমিশনারের কাছে ঐক্যবদ্ধভাবে স্মারকলিপি জমা করা সম্পর্কে আমরা পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্রদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় তুলে ধরব।

নমঃশূদ্র জাতির আর্থসামাজিক ইতিহাস

এবারে আমরা আমাদের গবেষণার প্রাসঙ্গিকতার দিকে লক্ষ রেখে সংক্ষেপে নমঃশূদ্র জাতির আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব। সামাজিক তথা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের জাতি ব্যবস্থার কাঠামোই কালের নিয়মে বহুজাতিতে বিভক্ত হওয়ার ইতিহাস বিদ্যমান। সেদিক থেকে যে জাতির আর্থ- সামাজিক ভিত্তি অন্যান্য সমগোত্রীয় জাতি অপেক্ষা ভালো, তাঁরা নিজেদের উচ্চজাতি হিসাবে পরিগণিত করার নিমিত্তে নানাবিধ যুক্তির অবতারণ করেন, তা সামাজিক ইতিহাসে দেখা যায় এবং তা যে সবসময় যথাযথ যুক্তির উপর নির্ভর করে তেমন নয়, আবার তাঁদের দাবিগুলি যে একেবারেই যুক্তি বহির্ভুত তাও কিন্তু নয়; যে কারণেই হোকনা কেন তা সে ধর্মীয় কারণেই হোক বা উৎপাদনের তারতম্যের কারণেই, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জাতি-ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক বিভাজন তা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে।

প্রথমে আমরা নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় যাবো। বাংলার ইতিহাসের প্রাচীনযুগ নিয়ে যেসকল ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন, তাঁদের সকলেই একমত যে, বাংলার মানুষের মধ্যে বহুসংখ্যক জাতি-

উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। কালের নিয়মে সেই সমস্ত জাতি-বহিরাগত জাতির সংমিশ্রণ ও প্রভাবে ক্রমে ক্রমে বাঙালি সমাজ গঠিত হয় বলে ধরে নিয়ে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হব। আমরা ঐতিহাসিকদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে উল্লেখ করতে পারি যে, প্রাচীন বাংলায় চন্ডাল নামে কোনো একটি জাতির বসবাস ছিল এবং সেই চন্ডালজাতিই নানাবিধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আধুনিক সময়ে 'নমঃশূদ্র' নামে পরিচিতি বহন করে চলেছে। এই চন্ডালদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অনেক নামকরা ঐতিহাসিক প্রচলিত ধর্মীয়সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেননি বলেও মনে করা যেতে পারে। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, "যে সকল বৌদ্ধপুরোহিত তান্ত্রিকঅনুষ্ঠান করিয়া অতি হেয় জিনিস ভক্ষণ করিতেন তাহারাই সম্ভবত 'মেথর' শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিলেন। শব্দটি 'মহত্ত্বর' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করা হয়। হিন্দুর স্মৃতির বিধানে চন্ডালেরা মেথরদের বর্ত্মান কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু কালে কালে যখন চন্ডালেরা হিন্দুর নিতান্ত অনুগত ও সমাজের নিম্নশ্রেনীর গন্ডীভুক্ত হইয়া পড়িল, তখন বিজিত শত্রুগণের মধ্যে যাহারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির দরুন নিতান্ত হেয় জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, তাহারাই চণ্ডালের কাজের ভার লইতে বাধ্য হইলেন"।[২০]

চন্ডালদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সেন হিন্দুশাস্ত্রের ধারণা থেকে বেরিয়ে প্রকৃত আর্থসামাজিক অবস্থান বর্ণনা করতে হয়তো অসম্মত হয়েছেন। ঐতিহাসিক সেনের উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, চন্ডালদের পেশা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন মনু বা পরাশরকে অনুসরণ করেছেন বলে আমরা ধরে নিতেই পারি। কাজেই বলা যেতেই পারে যে, তাঁর লেখনীর সময়ে বাংলায় যারা চন্ডাল হিসেবে পরিগণিত হতো, তাদের জনসংখ্যা, পেশা, জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁর ধারণা না থাকাটা আমাদের কাছে বিস্ময়কর। চণ্ডালদের পেশা সম্পর্কে আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব, H. H. Resely সাহেবের মন্তব্য। তাঁর মতে, "Chandals actually work at anything. They are the only Hindus employed in the boats (bajra) hired by Europeans; they form a large proportion of the peasantry; and they are shopkeeper, goldsmiths, blacksmiths, carpenters, oilmen, as well as successful traders. They are, however, debarred from becoming fishermen, although fishing for domestic use is sanctioned. In Northern Bengal they catch fish for sale"।[২১] ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতির

পরিচয়ের উপর নির্ভর করে একটি জাতির সামাজিক অবস্থান, একথা আমরা এই আলোচনায় আগেও বলেছি, যে জাতির আর্থসামাজিক অবস্থান ভালো, সেই জাতিকে নিম্ন জাতিতে পরিণত করা হিন্দুসমাজ নিয়ন্ত্রকদের নিকট বেশ বেদনাদায়ক বলে মনে করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা J. H. Hutton, এর চণ্ডাল ও নমঃশূদ্রদের সম্পর্কিত মন্তব্য তুলে ধরব,তাঁর মতে "Thus the Chandals or Namasudras who are low in social position are longer headed than the Brahman or Kayastha of Bengal and the Rajbansi and Bauri still more. On the other hand, the Namasudra is often fair skinned and apt to be leptorrhine in some contrast to the bulk of the Muslim population of Bengal which is dark-skinned and rather flat-nosed, suggesting a considerable strain of the Australoid type, a type also apparent in many of the lower-class fishing and cultivating caste such as Bagdi, Bouri or Kaibartta"।[২২] J. H. Hutton, সাহেবের বক্তব্য থেকে একথা বলা যেতে পারে যে, নমঃশূদ্রদের শরীরের গঠন ছিল অন্যান্য জাতির থেকে ভালো এবং তাঁদের পেশা ছিল কৃষি কাজ ও মাছ ধরা। উক্ত মন্তব্য থেকে আবার এমন একটা কথা বললেও খুব একটা ভুল বলা হবে না যে, এই 'চণ্ডাল' নামের মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় বর্ণনায় ঘৃণাবাচকতার সম্পর্ক নিহিত থাকার কারণে, বর্তমানে আমরা যাদেরকে নমঃশূদ্র হিসেবে জানি, তারা কিন্তু নিজেদের কখনোও 'চণ্ডাল' পরিচয়ের স্বীকৃতি মেনে নিতে চাইতেন না বা এই ধরণের পরিচয় বহন এবং ধারণ করতে স্বাচছন্দ্য বোধ করতেন না। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, নিম্ন জাতির হিন্দুরা সবসময় নিজেদের ব্রাহ্মণে উত্তীর্ণ করার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, "সমাজে ব্রাহ্মণ্যতর অন্যান্য বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যাহারা যত উচ্চতর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণের সাদৃশ্য সেই অনুপাতে বেশী"।[২৩]

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব' থেকে আমরা জানতে পারি যে, 'চণ্ডাল' এবং 'নমঃশূদ্র'কে তিনি আলাদা দুটি জাতি হিসেবে বিবেচনা করেন। কারণ হল - 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব' আলোচনায় বারংবার তিনি 'নমঃশূদ্র' ও 'চণ্ডাল'কে আলাদা এককে তুলে ধরেছেন। এই দুটি জাতকে যে, তিনি আবার অভিন্ন জাতি হিসেবেও মনে করতেন, যেমন সে সব তথ্য তাঁর আলোচনায় আবার প্রকাশিতও হয়েছে, একটি জায়গায় তিনি সরাসরি

বলেছেনও, "আমরা তাহাদের চণ্ডাল বা চাঁড়াল বলিয়া জানি"।[২৪] 'নমঃশূদ্র' জাতিকে নীহাররঞ্জন রায় 'চণ্ডাল' বলে চিহ্নিত করলেও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দৈহিক গঠনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, এই ভাবে "ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নমঃশূদ্রদের কথা বলিতেই হয়, কারণ হইলো ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের কোনও পার্থক্য নেই একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। উচ্চবর্ণের লোকদের মতো ইহারাও দৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, মুণ্ডের গঠন মাধ্যমিক, এবং নাসা তীক্ষ্ণ ও উন্নত, ইহাদের চোখ ও চামড়ার রঙও মোটামুটি ভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মতো, অথচ স্মৃতিশাসিত হিন্দু সমাজে ইহাদের স্থান এত নিচে যে নরতত্ত্বের পরিমিত গণনার মধ্যে তাহার কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে যুক্তি হয়তো পাওয়া যাইবে জাত-সংঘর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে"।[২৫] উপরিউক্ত তথ্য থেকে আমরা এমন একটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি যে, দৈহিক গঠনে ব্রাহ্মণ ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে এতটা মিল থাকা সত্ত্বেও তারা বাংলার সমাজে সর্বনিম্ন সামাজিক স্থানে কীভাবে অবস্থানরত হলেন। তার কারণই বা কি?

এই সব তথ্য উত্থাপনের মধ্য দিয়েই আমরা বাংলার নিম্নজাতি নমঃশূদ্রদের নিম্নে থাকার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। নীহাররঞ্জন রায়ের বিভিন্ন মন্তব্য থেকে, এইভাবে নমঃশূদ্রদের সঙ্গে উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের মিল লক্ষ করে তিনি বলেন, এই 'ফলাফল চাঞ্চল্যকর, বাঙালি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মধ্যভারতের অব্রাহ্মণদের মিল লক্ষ করে তিনি বলেন, 'আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই'।[২৬] উক্ত তথ্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, বৃহত্তর ভারতের একপ্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্যপ্রান্তের মানুষের দৈহিক মিল থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যে যে স্থানে বসবাস করেন, সেই সেই স্থানের সামাজিক অবস্থানই বহন করে চলতে বাধ্য থাকেন।

বাংলার 'নমঃশূদ্র' জাতিকে যেসকল ঐতিহাসিক 'চণ্ডাল' নামে চিহ্নিত করেছেন, তাঁরা শাস্ত্রীয় বিধানানুসারেই করে থাকবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মনুসংহিতার বিধান অনুযায়ী বলা হয়, "শূদ্র পুরুষ এবং ব্রাহ্মণ নারীর মিলনে চণ্ডালের জন্ম হয়, আবার ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে শূদ্র নারীর গর্ভেও ব্রাহ্মণের জন্ম হয়"।[২৭] হয়তো উক্ত যুক্তির উপর ভিত্তি করেই শ্রী প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর দাবি করেন, "ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব।... খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মিথিলা হইতে আগত এক ব্রাহ্মণ পরিবার রাঢ় দেশে বাস করিতে ছিলেন। সেই

বংশের রামদাস মিশ্র নামক জনৈক নৈষ্ঠিক সাধক সস্ত্রীক তীর্থ ভ্রমন করিতে করিতে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথে উপনীত হন। ...রামদাসের ঘরে তখন এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম চন্দ্রমোহন। পুত্র বিবাহ যোগ্য হইলেও কোন ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্ভব হইল না। অতঃপর চন্দ্রমোহন এক নমঃশূদ্র কন্যার পানি গ্রহণ করেন। সেই অবধি তাহার বংশ শূদ্রত্বে পরিণত হইল”।[২৮] উক্ত যুক্তির উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন সামাজিক তথা ঐতিহাসিক তথ্যের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় বাংলার বেশির ভাগ দলিত জাতি নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর বলে দাবি করেন, সেদিক থেকে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর হয়তো তাই ভেবেই নিজের বংশের পরিচয় ব্রাহ্মণ দেওয়ার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। যেমন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেন, তা পরের আলোচনায় দেখতে পাব। আবার দেখা যায়, জেনেটিক্সের নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের শারীরিক গঠন একই রকম হওয়ারই কথা। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলতেও পারি যে, ‘নমঃশূদ্র’ জাতিকে ‘চণ্ডাল’ আখ্যা দেওয়ার সময় হয়তো বিজ্ঞানের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়নি।

‘নমঃশূদ্র’ জাতির সামাজিক পরিচয়ের প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, “বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের সামাজিক অবস্থান ছিল খুবই নিচের দিকে। এরা একসময় ‘চণ্ডাল’ নামে অভিহিত হত এবং প্রাচীন শাস্ত্রমতে ‘চণ্ডাল’রা অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হত। কিন্তু সঠিক অর্থে অস্পৃশ্যতা বাংলার সমাজে কখনই খুব বড় সমস্যা ছিল না। ত্রয়োদশ – চতুর্দশ শতাব্দীর পুরাণে বাংলার চণ্ডালদের অন্ত্যজ এবং সংকরজাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যি সত্যি তাদের অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা করা হত কিনা তার কোনো ইঙ্গিত নেই। এমনকী ষোড়শ শতকের বাংলার সবচেয়ে গোঁড়া স্মৃতিকার রঘুনন্দন ও চণ্ডালদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পংক্তিভোজন এড়িয়ে চলার কথা বলেছেন কিন্তু তাঁদের স্পর্শ সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে হবে এমন কথা জোর দিয়ে বলেননি। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মঙ্গল- কাব্যগুলিতে উল্লেখ আছে যে ‘চণ্ডাল’রা গ্রাম বা নগরের মধ্যেই বাস করত। মনু যাদের অন্তেবাসী বলে বর্ণনা করেছেন – অর্থাৎ যারা গ্রাম বা নগরের সীমান্তের বাইরে বাস করে – চণ্ডালরা মোটেই তা’ ছিল না”।[২৯] এই মন্তব্য থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, ঐতিহাসিক তথা ধর্মীয়গ্রন্থে ‘নমঃশূদ্র’ জাতির পরিচয় কখনও কখনও সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বেশ নিচের দিকে; আবার বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথা ধর্মীয়শাস্ত্রে ‘নমঃশূদ্র’দের সামাজিক অবস্থান মোটামুটি সম্মানজনক স্থানে রাখা হয়েছে।

মোটামুটিভাবে আমরা নমঃশূদ্র জাতির একটা আর্থ-সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারলাম বলে ধরে নিয়ে গবেষণার অগ্রসরের দিকে যেতে হবে। কাজেই এবারে আমরা ভারতের জাতিভিত্তিক রাজনীতিতে 'নমঃশূদ্র' জাতির অংশগ্রহণের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করব।

ভারতের জাতিভিত্তিক রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির অংশগ্রহণের ইতিহাস

ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে 'নমঃশূদ্র' জাতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমরা পূর্ববঙ্গের মতুয়া আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেবো। কারণ হল, 'নমঃশূদ্র' জাতির বেশির ভাগ মানুষ মতুয়া ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত থেকে তাঁদের সামাজিক তথা রাজনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের পথে অগ্রসর হয়েছেন। আবার মতুয়া ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমেই যে সমগ্র 'নমঃশূদ্র' জাতি রাজনৈতিক আন্দোলনে এসেছিল তা আমরা এই আলোচনায় দেখতে পাবো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মতুয়া আন্দোলন একটি ধর্মীয় আন্দোলন নামেই সুপরিচিত। মতুয়া ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কে ড. নন্দদুলাল মোহন্ত মন্তব্য করেছেন, "অবহেলিত ও নিপীড়িত নমঃশূদ্র সমাজের সামাজিক রাজনৈতিক আত্মবিকাশের বা বিদ্রোহের অগ্রদূত হিসেবে মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে নানাভাবে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগামী হিসাবে ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব বা ধর্মান্দোলনের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।"[৩০] উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে বলা যেতেই পারে যে, মতুয়া ধর্মান্দোলনের উদ্ভবের পশ্চাতে কোনো একজন ব্যক্তিমানুষের প্রভাবের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল। তারক চন্দ্র সরকারের লেখা 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বিশেষ ভাবে তদানীন্তন দুরাবস্থার বাস্তব প্রেক্ষাপটে মতুয়া ধর্মাদর্শের প্রবর্তন করেন হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২ – ১৮৭৮)।[৩১] হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম হয় ১৮১১ (অথবা ১৮১২ সালে) নমঃশূদ্র পরিবারের সফলডাঙ্গা গ্রামে যা বর্তমানে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত।[৩২] এই সময় 'নমঃশূদ্র' জাতি 'চণ্ডাল' নামেও পরিচিত ছিল। হরিচাঁদের ঠাকুরদা মোচনরাম বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাইতো তিনি গ্রামে মোচন ঠাকুর নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। মোচনরামের পুত্র যশোবন্তও বৈষ্ণব আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ তাঁদের ক্রিয়াকর্মের জন্যেই পুরোপুরি ভাবে 'ঠাকুর' পদবি দ্বারা নামাঙ্কিত হন। এক্ষেত্রে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, যশোবন্তের সময় থেকেই তাঁদের

পদবি পুরোপুরি ভাবে ঠাকুর পদবীতে পরিণত হয়, এঁদের মূল পদবী ছিল বিশ্বাস। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা যশোমন্ত ঠাকুরের দুধের ব্যবসা ছিল বলে জানা যায়।[৩৩]

প্রসঙ্গত প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক নয় কি যে মতুয়া ধর্মান্দোলন উদ্ভব হলো কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছেন ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত। তিনি যতীন বাগচীর 'জাতি ধর্ম ও সমাজ বিবর্তন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তুলে বর্ণনা দিয়েছেন - এইভাবে, "নূতন নূতন কুসংস্কারের বোঝা দিন দিন বাড়িয়ে দিয়েছেন এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে অন্যতম 'নমঃশূদ্র'গণকে আখ্যা দিয়ে, ছোট জাত বলে ঘৃণা এবং অস্পৃশ্যতায় ভূষিত করে অশিক্ষার অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। দলিত করেছে তাঁদের মানবিক অধিকার, আক্রান্ত করেছে হীনমন্যতার অমোঘ রোগে। আবাল্য "ছোটলোক,অস্পৃশ্য" চাঁড়াল - শুনে শুনে সংকুচিত হয়েছে তাঁদের মনোবল, সংকীর্ণ হয়েছে তাঁদের জীবনবেদ।"[৩৪] উপরিউক্ত যুক্তি থেকে একথা বলা যেতেই পারে যে 'নমঃশূদ্রজাতি' 'চন্ডাল' নামমোচনের জন্যেই হরিচাঁদের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন গুরুচাঁদ ১৮৪৭ সালে।**৩৫** এই মন্তব্যের প্রমাণ আমরা পাবো আলোচনার পরবর্তী অংশে। হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদের যৌথ ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে 'নমঃশূদ্র' জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের পথের সন্ধান পাওয়া যায়। মতুয়াধর্মের আদর্শের কথা ব্যক্তিদ্বয় বারবার এই জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য। শুধু এই বলেই তাঁরা থেমে থাকেনি। এক্ষেত্রে হরিচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্র জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য উপদেশ দিয়েছেন, এইভাবে "হাত কাম, মুখে নাম"[৩৬] হরিচাঁদের উপদেশ মতুয়াধর্মের মানুষেরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, মতুয়ারা মনে করতেন তাঁর বাক্য মানেই ঈশ্বরের বাণী। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করতেন হরিচাঁদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি বিরাজমান।

পিতার ধর্মকে অগ্রগতি দেওয়ার জন্য তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ মতুয়াসম্প্রদায়কে বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। এই মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকজন যে স্থানে বসবাস করতেন সেই জায়গাগুলো মাঝে মধ্যেই বন্যায় প্লাবিত হতো। ফলে কৃষিজীবী নমঃশূদ্র জাতিকে পরিত্রাণ দেওয়ার নিমিত্তে গুরুচাঁদ তাঁদেরকে উপদেশ দেন ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য। ভক্তরা যখন গুরুচাঁদকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁরা কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন। তখন গুরুচাঁদ ভক্তদের বলেন - তোমরা মাটির পাত্র তৈরি করো আর যে যা হাতের কাজ জানো সে তা তৈরী করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি

করো।[৩৭] এই উপদেশ ভক্তরা গ্রহণ করেন এবং তাঁরা ফলও হাতে নাতে পেয়ে যান। ফলে নমঃশূদ্র জাতি মতুয়া ধর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন।

মতুয়া ধর্মের সামাজিক আদর্শ ছিল বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় - হরিচাঁদের আচরিত ও নির্দেশিত পথে মতুয়া ভক্তগণ গার্হস্থ্য ধর্মের প্রশস্ত অঙ্গনে আর সংসারের গৃহী আর সন্ন্যাসীর মেলবন্ধন জীবনের পরাকাষ্ঠি রচনা করেছেন।

"ঈশ্বর আর সংসারে মিল এত দিনে পরে,
একক্ষেত্রে মিলি সব ধর্ম, কর্ম, নিষ্ঠা।
প্রেমের ধর্ম মতুয়া ধর্ম, প্রেমিক মতুয়া ধর্মের
বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় তাই বলা হয়েছে –
যদি ধরবি মতুয়ার বুলি যদি ধরবি মতুয়ার ঝুলি,
ত্যাজ্য কর সাধন ভজন দীক্ষা শিক্ষা কপ্নির কুলি মতুয়া ঝুলি ধরতে গেলে
জাতিকুলে দে জলাঞ্জলি।"[৩৮]

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে একথা বলা যেতেই পারে যে, মতুয়া ধর্মান্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা, উচ্চনীচ ভেদাভেদ দূর করা সম্ভব হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। এছাড়া গৃহ ধর্মের সঙ্গে লিপ্ত থাকাই হলো এই ধর্মের মূল আদর্শ। তবে অনেকে মতুয়া ধর্মান্দোলনকে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন।[৩৯] আবার অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মতুয়া আন্দোলনের সঙ্গে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মান্দোলন ও বিবেকানন্দের বেদান্তবাদী ধর্মান্দোলনের প্রগতিশীল মতবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাইতো নন্দদুলাল মোহান্ত উল্লেখ করেছেন, "সাধারণভাবে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত মতুয়া আন্দোলন ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন হলেও তা ছিল প্রকৃতপক্ষে দলিত জনজাতির আন্দোলনের প্রতিভূ"।[৪০] সে যাই হোক এবারে আমরা ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে মতুয়া ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাবে নমঃশূদ্র জাতি কীভাবে বাংলার জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে ভূমিকা রেখেছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করব।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বাংলার জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভূমিকাকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করব। প্রথমপর্যায় হলো - **১৮৭২** - **১৯৪৭** সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয়পর্যায় হলো - **১৯৪৭** সাল থেকে **১৯৭১** সাল পর্যন্ত। তৃতীয়পর্যায় হলো - **১৯৪৭** সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

প্রথম পর্যায় (১৮৭২ – ১৯৪৭)

এই আলোচনার আগের অংশে আমরা ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি ১৯০৯ সালের পরে, এদেশে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির সূচনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে ১৮৭২ সালে পূর্ববঙ্গের ওড়াকান্দিতে মতুয়াদের ধর্মগুরু গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্র জাতিকে ভারতের প্রথম আদমসুমারিতে চণ্ডাল লেখার দরুন তিনি এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং মিডসাহেবের সহযোগিতায় আদমসুমারি কর্তৃপক্ষের নিকট নিজেদের নমঃশূদ্র পরিচয়ে ভূষিত করার লক্ষ্যে আবেদনপত্র জমা দেন।[৪১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন আছে যে, সি. এম. মিড হলেন একজন অস্ট্রেলিয়ান খ্রিস্টান পাদ্রী। তিনি এদেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে। কিন্তু গুরুচাঁদ তাঁকে দিয়ে নিজ জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার তথা সরকারের কাছ থেকে যাবতীয় অধিকার অর্জন করার লক্ষ্যে বন্ধুত্ব করেছিলেন। এই সময় অনেকে মনে করতেন যে মিড তাঁর খ্রিস্টান ধর্ম নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে প্রবেশ করাবেন। কিন্তু বিষয়টি সে পথে পরিচালিত হয়নি।”[৪২] এক্ষেত্রে গুরুচাঁদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে। এই মিড সাহেবকে সঙ্গে নিয়েই গুরুচাঁদ বারংবার আদমসুমারি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র জ্ঞাপন করার পর অবশেষে ১৯১১ সালে চন্ডাল থেকে নমঃশূদ্র নামে সরকারিভাবে পরিচিত লাভ করে।[৪৩] ১৯১১ সালের পর থেকে যতবার আদমসুমারি ভারতে এসেছে ততবারই এদেরকে নমঃশূদ্র লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে গুরুচাঁদের ভূমিকা বিশেষ গৌরবময় সমস্ত নমঃশূদ্র জাতির নিকট।

ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উদ্ভব সম্পর্কে রজনী কোঠারী মন্তব্য করেছেন, “সাংস্কৃত্যায়ন তথা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে নিম্নবর্ণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা পূর্ব অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে”।[৪৪] এই মন্তব্য থেকে একথা বলাই যেতে পারে যে, নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে সাংস্কৃত্যায়ন তথা আধুনিক শিক্ষার বিস্তারের জনক হলেন গুরুচাঁদ। গুরুচাঁদের শিক্ষানীতির মাধ্যমেই পরবর্তী সময়ে নমঃশূদ্র জাতি ভারতের রাজনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন।

যদিও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল - “সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা করে আত্মোন্নতির নিজস্ব পথে অগ্রসর হ’লে অবহেলিত নমঃশূদ্র জাতির নিশ্চিত জাগরণ হবে এই ছিল গুরুচাঁদের ঐকান্তিক বিশ্বাস। সম্ভবতঃ এজন্যেই তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণে অগ্রণী হননি”।[৪৫] কাজেই আমাদের আলোচনা করতেই হয় যে, ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলার

রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবস্থা ছিল উত্তেজনা প্রবণ। এই পরিস্থিতির হাত থেকে তিনি কি নমঃশূদ্র জাতিকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন? তার কারণ হলো - ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার কারণে বঙ্গদেশকে বিভক্ত করে মুসলিম এবং নমঃশূদ্রপ্রধান পূর্ববঙ্গ এবং আসামকে নিয়ে একটা পৃথক প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত করে।[৪৬] কাজেই বাংলায় মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে সাময়িক ঐক্য স্থাপন হলেও তা দীর্ঘস্থায়িত্ব হয়নি বলেই চলে। বর্ণহিন্দু নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। অন্যদিকে এই বিভাগ পশ্চাৎপদ মুসলমান এবং নমঃশূদ্র সমাজের উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক বিধেয়, তারা একযোগে কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং সরকারকে সমর্থন জানায়। এরূপ একটা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক অধিকার চেতনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।[৪৭] এই সম্পর্কে সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস তাঁর "মতুয়াধর্ম এক ধর্ম বিপ্লব" নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, এইভাবে, "বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে গুরুচাঁদ ইংরেজ সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবং কংগ্রেস বা উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলন ও বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, এসব আন্দোলন বর্ণহিন্দুদের স্বার্থের আন্দোলন এবং তাতে পতিতদের সর্বনাশ হবে। বরং বঙ্গভঙ্গ হলে পতিত হিন্দু ও মুসলমান প্রজারা উচ্চবর্ণ হিন্দু জমিদারদের শোষণ নির্যাতনের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবেন বলে গুরুচাঁদ মনে করতেন। তাই মুসলমানদের সাথে জোট বেঁধে তিনি উচ্চবর্ণীয় স্বার্থের আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এই আন্দোলন যাতে যৌথভাবে করা যায় তার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজ পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরকে মুসলমান নেতা ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সাহেবের নিকট পাঠান এবং যৌথ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন।"[৪৮]

এই সময় কংগ্রেসের নেতাগণ গুরুচাঁদকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের অনুরোধকে তিনি সাড়া দেননি। এই প্রসঙ্গে সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, "শুধু যে এলাকার নমঃশূদ্র জাতির মানুষেরা ওড়াকান্দিতে গুরুচাঁদের বাড়ি গিয়ে তাকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন তাই নয়। বাংলার বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাস, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গুরুচাঁদকে পত্র লিখে ঐ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু গুরুচাঁদ দেশ ও জাতির স্বার্থে এই আন্দোলনে সামিল

হতে রাজি হননি।"[৪৯] উপরিউক্ত যুক্তি থেকে একথা বলা যেতেই পারে যে, এই সময় থেকেই বাংলার নমঃশূদ্ররা জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে আসীন হয়েছিল।

তিনি ডঃ মিডের সহযোগিতায় ওড়াকান্দির অঞ্চলের নিরক্ষর মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৮ সালে জানুয়ারি মাসে ওড়াকান্দিতেই উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং বিদ্যালয়টি ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতি পায়।[৫০] শিক্ষার মাধ্যমেই যে জাতির উন্নতি তথা রাজনৈতিক অধিকার অর্জিত করা সম্ভব সেটা অনুভব করতে পেরে গুরুচাঁদ নমঃশূদ্র জাতির শিক্ষার আলোড়নের পরিকাঠামো তৈরি করেছিলেন। গুরুচাঁদের শিক্ষানীতিতে নারীশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষানীতিও কার্যকর ভুমিকা পালন করে এই জাতিকে শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য।

নমঃশূদ্র জাতির মানুষের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ১৯০৭ সালে "নমঃশূদ্র সুহৃদ" নামক একটা মাসিক পত্রিকা বের হয়। ওড়াকান্দির আদিত্য কুমার চৌধুরী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং কার্যকর্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাধানাথ সরকার।[৫১] এই পত্রিকাটি কী কী কাজ নিয়ে লেখালেখি হত সে সম্পর্কে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, "এই পত্রিকা তখন নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকাটি একাধিকক্রমে ৭ বৎসর কাল একনিষ্ঠভাবে সমাজের সেবা করিয়া ছিল। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে ইহার অস্তিত বিলুপ্ত হয়, বলাবাহুল্য এই পত্রিকা ডাঃ মিডের পরামর্শ অনুসারে প্রকাশিত করা হইয়াছিল"।[৫২] উক্ত পত্রিকাটি নমঃশূদ্রদের যে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করেছিলেন তা আমরা ধরে নিতেই পারি। এছাড়াও পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ডাঃ মিড। কাজেই এই পরিকল্পনা গুলিও বেশ যুক্তিযুক্ত ছিল পিছিয়েপড়া এই জাতির জন্যে। ফলে গুরুচাঁদ মিডের সহযোগিতায় নারীদের শিক্ষাদান থেকে শুরু করে নমঃশূদ্র সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন করতে পেরেছিলেন।[৫৩] গুরুচাঁদের এই সকল সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ফলেই নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে সামাজিক তথা রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে অনেকটা এগিয়ে যায় বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে।

একথা বলা যেতেই পারে যে, গুরুচাঁদ নিজে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর জাতির লোকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। শিক্ষার আলোয় দীপ্ত হবার আহ্বান জানিয়ে এবং বিভিন্ন জেলায় সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত করে তিনি নমঃশূদ্রদের আত্ম জাগরণের যেমন

সূচনা করেছিলেন, তেমনি আবার তাঁর পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরকে রাজকার্যে অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে নিয়োগের মাধ্যমে নমঃশূদ্র জাতিকে তিনি তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন।[৫৪] বলা যেতে পারে যে, পরবর্তীতে তিনি তাঁর পৌত্র প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর - কেও হয়তো রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত করেন। এইমর্মে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গুরুচাঁদের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে যে রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করতে গেলে আগে রাজকার্যের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক ভাবে শক্তি অর্জন করার একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে "পরে ডঃ মিডের সহায়তায় ঠাকুর গুরুচাঁদ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ছোটলাট ল্যান্সলেটের কাছে এই অনগ্রসর সমাজের শিক্ষিত যুবকদের সরকারি কর্মে নিয়োগের দাবিপত্র পেশ করেন এবং তা মঞ্জুর হয়। ...দূরদর্শী গুরুচাঁদের প্রচেষ্টায় সেদিন অনগ্রসর সমাজের মানুষের চাকুরির ক্ষেত্রে নিয়োগের যে দাবি গৃহীত হয়েছিল পরবর্তীকালে তা সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে তপশিলিভুক্ত অনগ্রসর সমাজে সংরক্ষণের দাবি হিসাবে উত্থাপিত ও সরকারি ভাবে স্বীকৃত হয়"।[৫৫] কাজেই বলা যেতে পারে যে, নমঃশূদ্র জাতি রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের নিমিত্তে শিক্ষা ও সরকারি উচ্চপদে যুক্ত হওয়াটাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়াই তাদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতা সংগঠিতও হয়। এর উদাহরণ হিসাবে আমরা তুলে ধরব, "১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে উকিল শশীভূষণ বিশ্বাসের উদ্যোগে যশোহরের নড়াইলে অনুষ্ঠিত হয় নমঃশূদ্র জনসভা। আলোচ্য বিষয় স্ত্রীশিক্ষা, কুসংস্কার মোচন, জাতির একতা, সাধারণ শিক্ষা-জাতির ভাগ উপভাগ বিলোপ সাধন প্রভৃতি"।[৫৬] তাইতো যখন মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি গৃহীত হয়, তখন নমঃশূদ্ররা একই দাবি তোলেন। এই প্রসঙ্গে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য তুলে ধরা হল, তাঁর মতে "The Morle-Minto Reforms of 1909, by conceding the demand of the Muslim ledaders for separate representation, had stimulated similar aspirations for separate electorate in the minds of the leaders of many other social groups; the Namasudras were among them."[৫৭] কাজেই এই সময় নমঃশূদ্র নেতৃবর্গরাও অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি জানায়। সম্ভবত বলা যেতে পারে সর্বভারতের সর্বপ্রথম জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে নমঃশূদ্রদের পথ চলা শুরু হয়। এ সম্পর্কে ১৯০৯ সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারি দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এইভাবে, "ইদানীং নমঃশূদ্র সমাজের যুবকেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত, হওয়ার চেষ্টা করছেন। আর তাঁরাই হিন্দু বর্ণবাদ বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু

করেছেন। সবটা মিলিয়ে নমঃশূদ্রদের আন্দোলন একটা রাজনৈতিক চরিত্র পেয়েছে। তাঁরা তাঁদের দাবির সমর্থনে যে আন্দোলন করছেন তার ফলে কতটা তাঁরা জয়ী হবেন তা নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।[৫৮] এই আন্দোলনটা কতটা নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে সহযোগিতা করেছিল সেটাও আমরা দেখার চেষ্টা করব।

মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নমঃশূদ্রদের বাসস্থানের কারণেই হয়তো তাঁরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতেন। কারণ, তাঁরা তো হিন্দুদের কাছে হিন্দু হিসাবে গ্রাহ্য হন না। তাই তাঁরা মুসলিমদের সঙ্গে মিলিত ভাবে আন্দোলন করার পক্ষে ছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যখন মুসলিমদের মতো পৃথক নির্বাচনি ও সংরক্ষণের দাবিতে সোচ্চার হলেন নমঃশূদ্ররা তখন তাঁদের সঙ্গে শিক্ষিত মুসলমানদের একটা জাতি দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি হয়। “In June 1911 at Jaynagar hat in Faridpur district an altercations over the damage done by some cows trespassing in a field was about to cause a serious riot between the Muslims and the Namasudras,..”[৫৯] উক্ত জাতি দাঙ্গার আকার বেশ বড় আকার ধারণ করেছিল। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “In fact, the first half of the year 1911 witnessed a series of riots in contiguous around the Jessor – Khullna border where the Muslims and the Namasudras lived side by side”.[৬০] এর ফলে নমঃশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের যৌথ আন্দোলন বেশ গতিরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কাজেই নমঃশূদ্ররা স্বতন্ত্র আন্দোলনের পথে এগিয়ে যায়।

মতুয়া ধর্মান্দোলনের প্রভাব নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিকভাবেও জাগিয়ে তুলেছিল। এর যুক্তি হিসাবে বলা যেতে পারে যে, ১৯১১ সালে যখন আবার দুই বাংলা পুনরায় এক হয়ে যায় তখন নমঃশূদ্র জাতি ১৯১২ সালে ২২টি জেলার ‘প্রতিনিধি’ নিয়ে “The Bengal Namasudra Association” নামে সংগঠন তৈরি করে। এই সংগঠনের মাধ্যমে নিজ জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সরকারের নিকট দাবি জানাতে থাকেন। ফলে ১৯১২-১৩ সালে সরকার নিকট থেকে ৯ লক্ষ ৪২ হাজার ২০০ টাকা পান। এই টাকা দিয়ে নমঃশূদ্র ছাত্রদের জন্য ওড়াকান্দি, ঝালকাঠি, পিরোজপুর এবং বরিশালে ছাত্রনিবাস গড়ে তোলা হয়।[৬১] এই সংগঠন সম্পর্কে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, তাঁর মতে “... the Bengal Namasudra Association with its headquarter in

Calcutta keshab's brother Mohini Moham became its Secretary and Mukunda Behari Mullick its President. It was indeed another attempt to gain influence over the Namasudra masses to integrate their movement into the mainsterm of nationalist politics."[৬২] কাজেই বলা যেতে পারে যে, নমঃশূদ্র জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা থাকার কারণেই অস্পৃশ্যতা বিরোধী জাতি মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আন্দোলন ক্রমে জাতির সার্বিক বিকাশের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা সমিতি সমূহের কর্মসূচির পর্যালোচনার সভায় পরিণত হয়। ঐক্যবদ্ধ সভায় পরিণত হওয়া সত্ত্বেও সংগঠনের মাধ্যমে নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এর কারণ হল কলকাতার নিটক অঞ্চলে বসবাসরত শিক্ষিত নমঃশূদ্ররা অনেকেই জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, "To the Namasudra middle class, Mohini Mohan was a suspect for his past connections with the Swadeshi movement and Mukunda Behari in 1912 was still relatively a less-known figure."[৬৩] এই সময় নমঃশূদ্র জাতির অন্যতম নেতা মুকুন্দ বিহারী মল্লিক তেমন কোন প্রভাব দেখাতে পারেন নি। কারণ হল তখন তিনি পড়া শেষ করে এসে সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত থাকায় জাতির ঐক্য স্থাপনের সভা সমিতিতে তেমনভাবে যোগ নাদিতে পারলেও নিজের মানসিক চেতনায় সমাজ সেবায় ধারণা তৈরি হয়। তাই, পরবর্তী সময়ে নমঃশূদ্র জাতির সমাজের নিজস্ব প্রয়োজন ও রাজনৈতিক অধিকার পূরণের জন্যই ১৯১৪ সালে তরুণ সমাজসেবক এবং রাজনৈতিক নেতা মুকুন্দবিহারী মল্লিকের (১৮৮৮-১৯৪৭) সুযোগ্য সম্পাদনায় নমঃশূদ্র জাতির মুখপাত্র হিসাবে 'পতাকা' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৬৪] এই পত্রিকাটি নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক চিন্তাধারার বাহক হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

আবার ১৯১৭ সালে মুকুন্দবিহারী মল্লিকের সভাপতিত্বে, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, ভীষ্মদেব দাস, ধনঞ্জয় রায় ও রসিকলাল বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতারা "All India Depressed Classes Association" নাম নিয়ে নতুন করে নমঃশূদ্ররা জাতীয় সংগঠন তৈরি হয়।[৬৫] এই Association পরবর্তীকালে বিশেষ পরিস্থিতিতে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের নেতৃত্বে গঠিত নিখিল ভারত তপশিলি ফেডারেশনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহুকাল ধরে এই সমিতিই বাংলার নমঃশূদ্র সমাজের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিনিধিত্ব

করেছে। ১৯১৮ সালের Association-এর বার্ষিক সভায় 'Bengal Depressed Classes Association' এর নেতৃত্ব মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (পৌন্ড্রক্ষত্রিয়), নমঃশূদ্র নেতৃত্ব মকুন্দ বিহারী মল্লিক, রেবতী মোহন সরকার ও ভীষ্মদেব দাসের সঙ্গে রাজবংশী বৈশাকপালী এবং অন্যান্য অনুন্নত জাতির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সমস্ত অনুন্নত ও নিপীড়িত জাতি সমূহের মধ্যে একটি ঐক্য স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়। অনুন্নত জাতির নেতৃবৃন্দও এই আহ্বানে সাড়া দেন।[৬৬] ফলে ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইনে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার মেনে নেওয়া হয়। ১৯২১ সালে বাংলার বিধান পরিষদে ১৩৯ জন সদস্যের মধ্যে দুই জন ছিলেন নিম্নবর্ণের সদস্য, সেক্ষেত্রে নমঃশূদ্রদের মধ্যে যোগ্যপ্রার্থী থাকায় ওড়াকান্দির ভীষ্মদেব দাস ও নীরোধ বিহারী মল্লিক মনোনীত হন। এই দুই জন নমঃশূদ্র জাতির প্রতিনিধি বাংলার বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৬ শতাংশ সংরক্ষণ এবং নমঃশূদ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত হন। এর ফলেই হয়তো পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির শিক্ষিত নিম্নবর্ণের যুবকদের সরকারি চাকরিতে ব্রিটিশ সরকার জেলাগুলির আধিকারিকদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেন।[৬৭]

১৯২৩ সালে নিখিল বঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতির উদ্যোগে খুলনার টাউনহল ময়দানে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সভাপতিত্বে নমঃশূদ্র জাতির এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন সমিতির সভাপতি মুকুন্দবিহারী মল্লিক।[৬৮] এইরূপ ক্রিয়া কর্মের মাধ্যমে মতুয়া আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র জাতি রাজনৈতিক জাগরণে জাগরিত হয়েছিল। গুরুচাঁদ ঠাকুর কংগ্রেসকে সমর্থন করেননি পরবর্তীকালে তাঁর পৌত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ও অন্যান্য নমঃশূদ্র দলনেতারা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এমনকী প্রমথরঞ্জন ঠাকুর কলকাতায় পড়ার সময় গান্ধির মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নমঃশূদ্র জাতির সর্বপ্রথম কংগ্রেসের প্রার্থী রূপে এম.এল.সি নির্বাচিত হন ডাঃ মোহিনীমোহন দাস (১৯২৪)। আবার ১৯৩০ সালের নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য এম.এল.সি নির্বাচিত হন।[৬৯] এই সময় নমঃশূদ্রদের বেশ কয়েকজন নেতৃত্ব কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অন্যতম একটা কারণ হল, ১৯২৬ সালে বরিশাল জেলায় অনুষ্ঠিত নমঃশূদ্র সম্মেলনে তদানীন্তন ভারতের অন্যতম জাতীয় নেতা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, সরলাদেবী, উকিল যোগেন্দ্রনাথ সরকার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও অশ্বিনী দত্তের স্নেহধন্য নমঃশূদ্র জাতির ভেগাই হালদার, অগ্নিকুমার মণ্ডল, গোপিচাঁদ মণ্ডল, মম্মথনাথ রায়, ডাঃ গৌরীকান্ত মণ্ডলদের সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসেন।[৭০] কাজেই নমঃশূদ্রদের মধ্যে রাজনৈতিক

বিভাজনের একটা প্রেক্ষাপটের ভিত তৈরি করতে কংগ্রেস সক্ষম হয়। আবার এই বছরেই রসিকলাল বিশ্বাস, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, মুকুন্দবিহারী মল্লিকের নেতৃত্বে কাঁচরাপাড়ায় নমঃশূদ্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের নেতৃবর্গ আলাপ আলোচনায় "বঙ্গীয় নমঃশূদ্র সংঘ" স্থাপন করেন। মুকুন্দবিহারী মল্লিক নমঃশূদ্র তথা নিম্নজাতির জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সামিল হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।[৭১] এই পৃথক নির্বাচন নিয়ে আম্বেদকর ও মুকুন্দ বিহারী মল্লিক একই দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। "মুকুন্দ বিহারী তাই বলেন, আমাদের হিন্দু বলা হয় যেহেতু আর কোন শ্রেষ্ঠতর নাম নেই। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ১৯২৭ সালের ৩রা এপ্রিল বোম্বাইতে ডঃ আম্বেদকর মারাঠিতে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করেন এবং এর নাম দেন 'বহিষ্কৃত ভারত'। কাজেই আম্বেদকর ও মুকুন্দ বিহারী একই নৌকায় পাড়ি দিতে চেয়েছেন"।৭২ প্রসঙ্গক্রমে আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, ওড়াকান্দির ঠাকুর পরিবারের নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় বি. এ. পড়ার সময় থেকেই কংগ্রেসের রাজনীতি ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯২৭ সালে রাহুথড় গ্রামে একটি বিরাট কংগ্রেসি সভার আয়োজন করেন। নড়াইলের জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় ও স্যার পি. সি. রায়ের ন্যায় নেতৃত্বরা উপস্থিত হয়ে নমঃশূদ্রদের লাঠিয়াল বাহিনীকে কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান করেন। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৈলাস সর্দারের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ লেঠেল দল নিয়ে যোগদান করেন। "নমঃশূদ্র লাঠিয়ালগণ ঢাল, সড়কী ও রাম দাও সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশন হতে শোভাযাত্রা করে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। তাঁদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা হয় পার্ক সার্কাসে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ঐ অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন"।[৭৩] অতএব আমরা মনে করতে পারি যে গুরুচাঁদ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের সময় কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে নমঃশূদ্র নেতাদের যুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নমঃশূদ্রদের মধ্যে থেকে যে সকল যুবক কলকাতা তথা বিদেশে পড়তে যান, তাঁদের বেশির ভাগই জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে যেমন নিজ জাতের জন্য একটা অংশ স্বতন্ত্র রাজনীতির পথে চলেছেন, আবার একটা অংশ কংগ্রেস তথা স্বদেশী আন্দোলনের পথেও গিয়েছেন।

আবার দেখা যায় ১৯২৯ সালে সাইমন কমিশনকে বয়কট করলেও কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দ কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময় মুকুন্দ বিহারী

মল্লিক নমঃশূদ্র তথা বাংলার অস্পৃশ্য জাতির পক্ষ থেকে কমিশনকে, বর্ণহিন্দুরা যে যুগের পর যুগ ধরে অস্পৃশ্য জাতির মানুষদের প্রতি যে ভয়ংকর অমানবিক ব্যবহার করে আসছেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের যে তীব্র ঘৃণার শিকার হতে হচ্ছে, এর অনেক উদাহরণসহ তিনি কমিশনকে রিপোর্ট দেন। মল্লিক মহাশয় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে তাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের নিমিত্তে লিখিতভাবে দাবি করেন। কাজেই সাইমন কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করেন ১৯৩০ সালের মে মাসে। এতে দ্বৈতশাসনের বিলও সুপারিশ করা হয়। প্রতিবেদনে নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেশনের কথাও উল্লেখ হয়। পরে সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন স্বীকৃতি হতে লাগল। কাজেই জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করার কারণেই তাঁদের দলের নেতৃত্ব স্থানের সকলের ব্রিটিশ সরকার জেলে বন্দি করেন। ফলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলের নেতাদের নিয়ে ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রথম গোলটেবিল বৈঠক করেন।[৭৪]

আমরা এর আগেই দেখেছি পুনাচুক্তি নিয়ে আম্বেদকরের সঙ্গে গান্ধির মতবিরোধ হয়েছে। এমন একটা কথা বলা যেতেই পারে যে পুনাচুক্তি পরে এদেশে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে আম্বেদকর অন্যতম নেতা হিসেবে সারা ভারতে সুপরিচিত হন। এই সময় বঙ্গদেশ থেকে আম্বেদকরকে পূর্ণসমর্থন করেন নমঃশূদ্র জাতির অকংগ্রেসী নেতাগণ। ১৯৩২ সালে পুনায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । চুক্তি সম্পাদন কালে বঙ্গীয় অস্পৃশ্যদের পক্ষ থেকে নমঃশূদ্র সমিতির রসিকলাল বিশ্বাস এবং ভীষ্মদেব দাস প্রমুখেরা উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় প্রতিনিধিরা এই চুক্তি বিরোধী হলেও আম্বেদকরের জীবন বিপন্নতার কারণে মেনে নিতে বাধ্য হন। শর্ত হিসেবে বঙ্গীয় আইনসভায় তারা ৩৭ টি আসনের দাবি করেন। কিন্তু বঙ্গীয় আইন সভায় ১০ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীকেন্দ্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আম্বেদকরের অনুরোধে বঙ্গীয় অস্পৃশ্য নেতারা সেটা মেনে নেন তখন। এই পুনাচুক্তির মাধ্যমে অস্পৃশ্যদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার মূলত তাঁদের হাতের বাইরে চলে গেল।[৭৫] উক্ত চুক্তি অনুসারে বঙ্গীয়ক্ষেত্রে যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থায় ও বিধানসভায় নিম্নবর্ণের জন্য ৩০ টি আসন সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এই সময় বাংলার নিম্নবর্ণের নেতৃত্বের মধ্যে আম্বেদকরপন্থী মুকুন্দ বিহারী মল্লিক এবং চুক্তির সময় উপস্থিত সমঝোতাকারী কংগ্রেস নেতা রসিকলাল বিশ্বাস এই প্রস্তাব মেনে নিলেও 'Bengal Namasodra Association' এবং ' Bengal Depressed Classes Association' এর বেশিরভাগ সদস্যরা আম্বেদকর কে সমালোচনা করেন।[৭৬] এই পরিস্থিতিতেই

প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ১৯৩২ সালে নিজেকে সভাপতি হিসাবে ‘মতুয়া মহাসঙ্ঘের’ দায়িত্ব নিয়ে নমঃশূদ্রদের ঐক্যবদ্ধ করতে ‘Faridpur District Depressed Classes Association’ গঠন করেন। ২২ সেপ্টেম্বর সভাপতি সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নেন, ‘সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা’ নীতি গৃহীত হওয়ার জন্য তাঁদের সমর্থন থাকবে। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ২৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ আধিকারিককে জানান যে, যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাংলার নিম্নজাতির জন্য ৫০ টি আসন ও ২ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী সংরক্ষিত রাখতে হবে।[৭৭] এ থেকে বলা যেতে পারে যে, এই সময় ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতি প্রভাব বিস্তার করতে থাকে বলে মনে করা যেতে পারে। আবুল মনসুর আহমেদ মন্তব্য করেছেন, “যদিও এইসময় মুসলিম নেতারা মনে করিলেন, আমাদের এটা সমর্থন করা দরকার। অতএব রোয়েদাদের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হইলে তপশিলিরা মুসলিম লীগকেই সমর্থন করিবে”।[৭৮] বলা যায় যে, মুসলিমরা বাংলার নিম্নজাতির সঙ্গে গোপন যোগাযোগের ফলেই নমঃশূদ্ররা উক্ত চুক্তিতে জোরালো ভাবে সোচ্চার হতে পেরেছিলেন। তা নাহলে বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দু কংগ্রেস নেতাদের চাপে তাঁরা পিছুপা হতেন। তবে সার্বিকভাবে দেখতে গেলে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাতে মুসলিমদের বেশ লাভ হয়।

আবার উক্ত চুক্তি নিয়ে আবুল মনসুর আহমেদ মন্তব্য করেছেন, “সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে তফশিলি হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধি জেলের মধ্য হইতেই ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধিকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর মধ্যস্থতায় সকল শ্রেণীর হিন্দু নেতারা তফশিলি হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচনে আপোস – রফা করেন। ব্রিটিশ সরকারও তৎক্ষণাৎ এই আপোস – রফা গ্রহণ করিয়া রোয়েদাদ সংশোধন করেন। এই ঘটনা হইতে আমরা ইহা আশা করিলাম যে, মহাত্মা রোয়েদাদের মুসলিম অংশের তেমন তীব্র বিরোধিতা করিবেন না”।[৭৯] এই মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, নমঃশূদ্র তথা নিম্নজাতির মানুষ মনে করলেন গান্ধি তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের থেকে বঞ্চিত করলেন। আর মুসলমানরা ভাবলেন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে গান্ধি চেয়েছিলেন ঐক্যবদ্ধ ভারত ও স্বাধীন ভারত। এছাড়াও তিনি সমগ্র হিন্দু জাতিকে একই নির্বাচনী কাঠামোতে রাখার পক্ষেও সওয়াল করেন।

এবারে আসা যাক, বঙ্গীয় নির্বাচনের ব্যবস্থার দিকে, ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন অনুসারে বঙ্গের নিম্নবর্ণের জন্য ৩০ টি আসন সংরক্ষিত হয়। আর এই সংরক্ষণের জন্যেই ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে দুইজন তপশিলি প্রার্থী জয়ী হন - তাঁদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন। ৩৭এর নির্বাচনে বাংলার আইন সভায় যে ৩২ জন তপশিলি সদস্য নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে ১৩ জন নমঃশূদ্র জাতির সদস্য যাঁরা সকলেই প্রায় গুরুচাঁদ ঠাকুরের অনুগামী ছিলেন বলে জানা যায়।[৮০]

নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে প্রথম যিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন তিনি হলেন জননায়ক মুকুন্দ বিহারী মল্লিক। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯২০- এর নভেম্বরে (মতান্তরে ১৯২১) যে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়, মুকুন্দ বিহারী তাতে নির্দল প্রার্থী হিসেবে বাগেরহাট কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জমিদার শৈলেন্দ্র রায় চৌধুরীর কাছে পরাজিত হন।[৮১] কিন্তু ১৯২৯ সালে তিনি অবশ্য লাটের মনোনয়নে এম. এল. সি. হন। ঐ সালের ২১শে জানুয়ারি মল্লিক সাহেবের নেতৃত্বে কলকাতায় সাইমন কমিশনের কাছে বেঙ্গল নমঃশূদ্র অ্যাসোসিয়েশন ও বেঙ্গল ডিপ্রেসেড ক্লাস অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে দুটি স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং ১০ জন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল সাক্ষ্য প্রদান করে যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।[৮২] এই স্মারকলিপি প্রদান করার ফলস্বরূপ আম্বেদকরের আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুকুন্দ বিহারী মল্লিক নির্দল প্রার্থী হয়ে খুলনা জেলার বাগেরহাটের সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সরকার গঠন করতে চাইলেন, কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা রাজী না হওয়ায়, পরে তিনি মুসলিম লীগ ও তফশিলি নির্দল প্রার্থীদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। নমঃশূদ্র নেতা মুকুন্দ বিহারী মল্লিক ও জলপাইগুড়ির রাজবংশী নেতা প্রসন্নদেব রাইকতও মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন।[৮৩] মুকুন্দ বিহারী মল্লিকই তাঁর জাতির প্রথম মন্ত্রী (১৯৩৭-৪১) হয়ে দায়িত্ব নিলেন - সমবায় ও ঋণ সালিসি দপ্তরের। তাঁর আমলে তিনি প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের চাষীদের ঋণ মুক্ত করেছেন সালিসি বোর্ডের মাধ্যমে। কাজেই নমঃশূদ্র চাষী তথা সমগ্র চাষীদের অনেকটা উপকার পান।[৮৪] মল্লিক কংগ্রেসি রাজনীতিতে যোগদান না করে তিনি আম্বেদকরের সঙ্গে দেশভাগের আগে পর্যন্ত সুসম্পর্ক স্থাপন করে ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে অগ্রসর করতে সাহায্যে করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখও যে, ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি কোল মাইনস স্টোয়িং

বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। দেশভাগের পরে তিনি আর সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হননি। মল্লিক আইনজীবী ও কলকাতার হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে ১৯৭৪ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কাজে নিযুক্ত ছিলেন।[৮৫]

ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে রসিকলাল বিশ্বাসের (১৯০২-১৯৭৪) নাম উল্লেখযোগ্য। তার কারণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৩২ সালে তিনি আম্বেদকরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাগপুরে 'সারা ভারত ডিপ্রেসড ক্লাস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন এবং তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। আম্বেদকর এই অ্যাসোসিয়েশনের নেতা হন। মাদ্রাজের ভি. আই. মুন্নি স্বামী তার সভাপতি নির্বাচিত হন। কয়েক বৎসর পরে ঐ অ্যাসোসিয়েশন সর্বভারতীয় তপশিলি ফেডারেশনে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাস মন্তব্য করেছেন, "রসিকলাল সর্বভারতীয় অনগ্রসর শ্রেণীর একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি 'সারা ভারতে ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগের' প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী বাবু জগজীবন রাম তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। জগজীবন বাবুর প্রথম রাজনৈতিক জীবনের পথপ্রদর্শক ছিলেন বিপ্লবী রসিকলাল। ১৯৩৬ সালে তিনি এলাহাবাদে সারা ভারত নিম্নবর্ণের হিন্দু মুসলমান নেতৃত্বের সম্মেলনে অন্যতম নেতা ছিলেন এবং উক্ত সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।"[৮৬] এই মন্তব্য থেকে একথা বলা যেতেই পারে যে সমস্ত তপশিলি জাতির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য রসিকলাল বিশ্বাস নানা ধরনের ক্রিয়াকর্ম অবলম্বন করেছিলেন। শেষ জীবনে রসিকলালের মধ্যে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে এবং তিনি তাঁর রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক ও সহকর্মী আম্বেদকরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রজ্ঞা, করুণা ও সাম্যের পূজারী বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।[৮৭]

জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে আরও একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯০৪-১৯৬৮)। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে তিনি কংগ্রেস নেতা সরল দত্তকে পরাজিত করেন। প্রায় ৯০শতাংশ ভোট পেয়ে জয়যুক্ত হন। এই সময় তিনি রসিকলালের সঙ্গে একমত হয়ে তপশিলিদের জন্য অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেন। যা তাদের অগ্রগতির পথে যথেষ্ট অবদান যুগিয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাসের মতে ১৯৩৭ সালের শেষ ভাগে তিনি বরিশাল জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। এইসব নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা

১৯৪০-৪১ সালে তপশিলিদের সরকারি চাকুরিতে শতকরা ১৫শতাংশ সংরক্ষণ ভাগ নির্ধারিত হয়।[৮৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯২০ সালে গুরুচাঁদের পুত্র শশীভূষণ ঠাকুর তৎকালীন গভর্নরের কাছে তপশিলিদের জন্য ২০শতাংশ চাকুরিতে সংরক্ষণের দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ১৯৪০-৪১ সালে এসে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের নেতৃত্বে সরকারি চাকুরিতে ১৫শতাংশ সংরক্ষণ পেল। যা আজও ভারতে প্রচলিত আছে।[৮৯]

১৯৩৮ সালে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন। হকের মন্ত্রী সভার কার্যকলাপে তপশিলি সদস্যদের অসন্তোষ লক্ষ করে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পি. আর. ঠাকুর, হেমচন্দ্র নস্কর সহ আইনসভায় ২০ জন সদস্য নিয়ে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিডিউল কাস্ট পার্টি' গঠন করেন এবং তার সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৯০] তিনি ১৯৪২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক তপশিলি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলাদেশে পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভায় তিনি অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে হঠাৎ ভোটগ্রহণ করায় ঐ মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ১৯৪৬ সালে অক্টোবর মাসে মুসলীম লীগের সহযোগিতায় যোগেন্দ্রনাথ ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী রূপে যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লিয়াকৎ আলী খান, গজনখার আলী, আই.আই. চন্ডীগড় এবং বাবু জগজীবন রাম কংগ্রেস থেকে মন্ত্রী ছিলেন। নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতের আইন মন্ত্রী হলেন।[৯১] আইনমন্ত্রী হওয়ার ফলে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তপশিলি জাতির জন্য তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছ থেকে একগুচ্ছ সুযোগ সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৪৬ সালে গণপরিষদের মনোনীত সদস্য পদের জন্য আম্বেদকর নির্বাচনে তাঁর নিজ এলাকা থেকে পরাজিত হলে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বঙ্গদেশ থেকে আম্বেদকরকে নির্বাচিত করে গণপরিষদে পাঠান। এর ফলস্বরূপ আম্বেদকর ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এর জন্যেই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে অনেকে বাংলার আম্বেদকর বলে অভিহিত করেন।[৯২]

আবার ১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদের মৃত্যুর পর বাংলার কংগ্রেসি নেতৃত্বের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎ বসু নিম্নবর্ণের তপশিলি নেতৃত্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। আর এই সময় প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ফরিদপুরের নমঃশূদ্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অপর দিকে ১৯৩৮ সালে

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, যজ্ঞেরশ্বর মণ্ডল এবং রসিকলাল বিশ্বাসের নেতৃত্বে 'Calcutta Scheduled Caste Language' গঠিত হয়। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'Bengal Depresses Classes Federation' এবং 'Independent Scheduled Caste Prty' উভয় সংগঠনের নেতাগণ ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[৯৩] এই সময় মন্ত্রীসভার কার্যকলাপে মুসলিম লীগের নেতিবাচক ভুমিকা দেখে পি.আর. ঠাকুর বলেন, তপশিলিদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থন পাবার তাগিদে সহানুভূতি ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েও সরকার গঠনের পরে তাঁরা তপশিলিদের সুযোগ দানের পরিবর্তে বিরোধিতা করছেন কী করে।[৯৪]

এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, পিতামহ গুরুচাঁদের প্রদর্শিত নমঃশূদ্র তথা নিম্নবর্ণের রাজনীতির পথ ধরে যাত্রা শুরু করলেও পি. আর. ঠাকুর পরবর্তীতে সেই পথ থেকে সরে গিয়ে কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। '৩৭ ও ৪৬' দু'বারেই তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এম.এল.সি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং কংগ্রেসি উঁচু নেতৃত্বের চাপে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দেন। তবে, তিনি সমগ্র গোপালগঞ্জ মহাকুমা মাদারিপুরের কিছু অংশ এবং সন্নিহিত যশোর ও বরিশালে আন্দোলন গড়ে তোলেন।[৯৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, পি. আর. ঠাকুরের সঙ্গে আম্বেদকরের রাজনৈতিক ভাবে তেমন কোনো দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে ১৯৪৬ সালে সারা ভারতে সাধারণ নির্বাচনে পি.আর. ঠাকুর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাসত্ত্বেও তিনি ভারতের তপশিলি ফেডারেশনের প্রার্থী হলেন না। এই নির্বাচনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তপশিলি ফেডারেশনের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জয়যুক্ত হন।[৯৬] এই কারণেই আম্বেদকরের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল অটুট বন্ধন আর পি. আর. ঠাকুরের সঙ্গে ছিল বন্ধনহীন।

এমন একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক নয় কী - যে, পিতামহ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও তিনি যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মুসলিম লিগের সঙ্গে বঙ্গীয় পতিত দলনেতাদের যুক্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালের পরে এসে কেন প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলেন। এই সময় কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দরুন তাঁকে দলিত

তথা মুসলিম লিগের নেতৃত্বের নিকট সমালোচিত হতে হয়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতাদর্শ পরিবর্তনের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ জড়িত থাকে, কোনো একটি কারণকে এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য দেওয়া আমাদের ভুল হবে। প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলার কারণ হলো ১৯২৭ সালে বঙ্গদেশ থেকে যে ১৩ জন বাঙালি উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন।[৯৭] ফলত বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে তাঁর একটা পরিচয় হয়েছিল এমন একটা ধারণা করা যেতেই পারে। আমরা এরকম একটা ধারণা করতে পারি যে, যেসময় তিনি কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, সে সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। একদিকে দেশ স্বাধীন হবে, অপরদিকে দেশ দ্বিখন্ডিত হবে ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের শীর্ষে থাকার লোভের কারণে। ধর্মগত সংখ্যার দিক থেকে পি.আর. ঠাকুরের জন্মস্থানের ভাগে মুসলিম মানুষের সংখ্যা অধিক। ফলত যতই তাঁর জাতির মানুষ নিম্নবর্ণের হিন্দু হোক না কেন, তাঁরাও তো মুসলিমদের কাছে হিন্দু। তাঁদেরকেও যে একদিন এ স্থান ত্যাগ করতে হবে এমন একটা আশঙ্কা থেকেই হয়তো তিনি কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এর কারণ হলো, গুরুচাঁদ চরিত থেকে আমরা জানতে পারি যে, গুরুচাঁদ নিজে একসময় মন্তব্য করেছিলেন, "রাজ-শক্তি বিনা সমাজ জাগেনা বহুতাপ্রমাণে পাই। রাজশক্তি ধরে এ ভবসংসারের উচ্চপদে উঠা চাই।"[৯৮] অর্থাৎ এই মন্তব্য থেকে এমন একটা কথা বলা যেতেই পারে পি. আর. ঠাকুরের নিজ জাতির মানুষ যখন নিজভূমিতে থাকতেই পারবে না, তাইতো হয়তো মনে করেছিলেন, তাহলে তাঁর জাতির মানুষ কী করে রাজ শক্তি ধরে উচ্চপদে আসীন হবে। এছাড়াও এপ্রসঙ্গে আরও একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছাত্রজীবনে পি. আর. ঠাকুর যেভাবে গান্ধির ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তিনি যে, কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবেন, এমন একটা সম্ভাবনা তাঁর মনের মধ্যে হয়তো অনেকদিন আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের নিমিত্তে, কিন্তু দেশভাগে পক্ষপাতিত্ব করার জন্য নয়। কিন্তু পি. আর. ঠাকুর কেন দেশভাগের পক্ষে ভোট দিয়ে কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলেন, এর উত্তরে এমনটি বলা যেতে পারে যে, আমাদের দেশে তো ১৯৪৩ সালেই বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেসময় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে

দেশ শাসনের নেতৃত্বের লড়াই চলছিল।[৯৯] অপরদিকে, ইংরেজরা তো দেশভাগের পক্ষেই ছিলেন। এই সময় কংগ্রেসের নীতির কিছু পরিবর্তন ঘটে, বিশেষ করে গান্ধির নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক উচ্চবর্ণের নেতাগণ দলিত জাতির উন্নয়নের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এর প্রমাণ আমরা পাই ১৯৪৬ সালে ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রিসভায় বাবু জগজীবনরামকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপ-প্রধানমন্ত্রী করার মাধ্যমে। আবার অপরদিকে, মুসলিম লীগের সহযোগিতায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল আইনমন্ত্রী মনোনীত হন। এই সময় দলিত জাতি সাধারণভাবে মুসলিম লীগের ও কংগ্রেসের নিকট রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১০০] এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কংগ্রেস জগজীবনকে মন্ত্রী করে তাঁর উদারতার পরিচয় দিলেন, অপরদিকে মুসলিম লীগ মণ্ডলকে মন্ত্রী করে তাঁর উদারতার পরিচয় দিলেন। দলিতদের সঙ্গে মুসলিম লীগ তার ব্যবহারে বা প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি, এর প্রমাণ হিসেবে বলা যেতেই পারে, মন্ডলের পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসাকে। এই যুক্তি থেকে একথা বলা যেতে পারে যে, হয়তো পি. আর. ঠাকুর মুসলিম লীগের উপর আস্থা না রাখতে পেরেই অথবা তখন ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির স্বতন্ত্রতা নিয়েও জটিলতার জন্যেই তিনি হয়তো কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস উল্লেখ করেছেন যে, “পি. আর. ঠাকুর গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।”[১০১] এই তথ্য থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, তখনকার দিনে একজন ‘পতিত দলিত’ যদি একটা হিন্দু কলেজের কার্যকরী কমিটির সদস্য পদে নিযুক্ত হন, তাহলে তাঁর পক্ষে কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া কোনোভাবেই ক্ষমতা লোভের লাভের ঊর্দ্ধে হতে পারে না। এর কারণ হিসেবে বলা যেতেই পারে যে, মন্ডল যখন বাংলা থেকে আম্বেদকরকে ভারতের গণপরিষদে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছিলেন, তখন ঠাকুরও বাংলা থেকে গণপরিষদে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মন্ডলের জনপ্রিয়তার কাছে ঠাকুরকে ইচ্ছা থেকে সরে আসতে হয় । ১৯৪৭ সালে পি. আর. ঠাকুর কংগ্রেসি রাজনীতির সহযোগিতায় গণপরিষদের সদস্য পদে মনোনীত হন।[১০২] এ থেকে এরূপ একটা ধারণা করা যেতেই পারে যে, ঠাকুরের একদিকে ক্ষমতা লাভের জন্যই হয়তো তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। অপরদিকে হয়তো ভারতের চিরাচরিত জাত ব্যবস্থাও তাঁকে কংগ্রেসি রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি সমস্ত দলিত জাতিই সামাজিক দিক দিয়ে সমান নয়, তাঁদের

মধ্যে সামাজিকভাবে উঁচুনিচু ভেদাভেদ আছে, আম্বেদকরের যে জাতি পরিচয় ছিল, তা বঙ্গদেশে মুচি হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলে ঠাকুরের মনে হতেই পারে যে, আম্বেদকর সামাজিক দিক থেকে নমঃশূদ্রদের চেয়ে নীচু। এইরূপ মনে হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হতেই পারে, এর প্রমাণ আমরা পাই, তাঁরই রচিত, "আত্মচরিত বা পূর্ব স্মৃতি" থেকে। এই গ্রন্থে তিনি নিজ বংশ পরিচয় সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, এইভাবে, "অধুনা পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ওড়াকান্দি গ্রামে বিখ্যাত ঠাকুর বংশে আমার জন্ম হয়। ওড়াকান্দির ঠাকুর বংশ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব।"[১০৩] যিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করতে সচেতন তিনি কী করে নিজের ভক্তদের উপর দলিত আম্বেদকরের নেতৃত্ব মেনে নেবেন। অর্থাৎ একথা বলা যেতেই পারে যে, হিন্দু সমাজের জাতি সোপানের উপর পি. আর. ঠাকুরের পূর্ণ আস্থাও জন্ম নিয়েছিল।

পি. আর. ঠাকুরের কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আর একটা বড় কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে, অধ্যাপক দাসের মন্তব্যকে তুলে ধরে। তাঁর মতে, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয় পি.আর. ঠাকুর খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল জেলাকে ভারতভুক্ত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় তিনি দেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন । এদেশে এসে তিনি ভারতের সর্বপ্রথম উদবাস্তু উপনিবেশ ঠাকুরনগর প্রতিষ্ঠা করেন।"[১০৪] উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে একথা বলা যেতেই পারে যে, তাঁর অনুগামী ভক্তদের পুনর্বাসনের জন্যেই হয়তো তিনি পিতামহের আদর্শ রাজনৈতিক পথ থেকে সরে এসে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

দেশভাগের আগে পর্যন্ত ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে মতুয়া আন্দোলনের হাত ধরে নমঃশূদ্র জাতি স্ববিশেষ ভূমিকা রাখতে পেরেছিল। একথা আমরা সকলেই স্বীকার করব যে বঙ্গদেশে নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ভারতের রাজনীতি তথা জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৪৭ - ১৯৭১ সাল পর্যন্ত)

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার ১ দিন আগে আমাদের দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় যার নাম পাকিস্তান। ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থান করে পশ্চিমপাকিস্তান আর পূর্ব দিকে অবস্থান করে পূর্বপাকিস্তান। ধর্মের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে দেশ

দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। ফলে পূর্বপাকিস্তান থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বে বা কিছুদিনের মধ্যেই বেশিরভাগ মানুষ ভারতে চলে আসে। কিন্তু নমঃশূদ্র তথা অন্যান্য দলিতরা নিজস্ব চাষের জমি ফেলে এদেশে এল না। তার কারণ হিসাবে দুটো কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথমত, কৃষিজীবী নমঃশূদ্ররা ভারতে এসে চাষের জমি না পাওয়ার আশঙ্কায়। দ্বিতীয়ত, তাঁদের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় যোগদান করার জন্য তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি পায় । ফলে পাকিস্তানে গিয়ে তিনি সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সমস্ত সংখ্যালঘু শ্রেণী তাঁকে তাঁদের নেতা হিসাবে মেনে নেন। কিন্তু তিনি পাকিস্তানের থাকতে পারলেন না, "যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন" পাকিস্তানের প্রাধান মন্ত্রী বলেন যে আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কটুক্তি করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, লীগ সরকার তপশিলিদের জন্য কিছুই করেন নাই। আমি এই দুইটি অভিযোগই অস্বীকার করি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলি যে (১) যে সকল মুসলমান নিরস্ত্র হিন্দুদের হত্যা, তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও ঘরবাড়িতে অগ্নি সংযোগ এবং হিন্দুনারীদের মর্যাদা হানি করিয়াছে, তাহারা গুন্ডা এবং (২) কায়েদে আজমের পত্রিকা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও লীগ নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাগের পরবর্তীকালে তপশিলিদের স্বার্থের প্রতি কিছুটা ঔদাসীন্য যেন দেখাইয়াছেন। ইহার ফলে পত্রিকাটি পাকিস্তানে বন্ধ হইয়া যায়"।[১০৫] এই উক্তি থেকে এমন একটা ধারণা করা যেতেই পারে যে, দেশ ভাগের আগে অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে মুসলিম লীগ নমঃশূদ্র নেতাদের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব রেখে চলতেন, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে লীগের ব্যবহার পাল্টে যায়। আর যোগেন বাবু লীগের মানসিকতা বুঝতে পারেন নি। তাইতো তিনি পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র জাতি তথা নিম্নজাতির মানুষদের জাতি দাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। সেই কারণেই হয়তো নমঃশূদ্ররা দলে দলে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। তিনি ১৯৫০ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসেন। খুলনা, কালশীরা দাঙ্গা এবং পশ্চিমপাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ব্যথিত হয়ে তিনি পাকিস্তান ত্যাগ করেন। বিশেষ করে কাশ্মীর যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তাঁকে বাদ দিয়ে, পাকিস্তান মন্ত্রীসভার বৈঠক হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। পরে, পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে দাঙ্গা হওয়ায় তিনি তীব্র ভাষায় পাকিস্তান সরকারের নিন্দা করেন এবং সরকারকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে বলেন। এর ফলে তিনি পাকিস্তান সরকারের নিকট ভারতীয় গুপ্তচর হিসেবে গণ্য হতে লাগলেন। পরে ১৯৫০ সালের ৭ই অক্টোবরে পাকিস্তান মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। ঐ বিবৃতি তখনকার ভারতের প্রায় সব খবরের কাগজে বড় করে ছাপা হয়। যোগেন্দ্রনাথ পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন

সংঘ্যালঘুদের রক্ষার জন্য। কিন্তু সে কাজে তিনি ব্যর্থ হওয়ায় ঐ দেশ ছেড়ে চলে আসেন।[১০৬]

ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির অন্যতম জনক আম্বেদকর বারংবার নিজদলের নাম পরিবর্তন করেন। যেমন ১৯৪২ সালে 'লেবার পার্টির' পরিবর্তে 'সিডিউলস কাস্ট ফেডারেশন' নামকরণ করেন। আবার ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের পর 'সিডিউলস কাস্ট ফেডারেশন' গুটিয়ে ফেলে তার স্থানে নতুন করে প্রশস্ত বুনিয়াদযুক্ত, নতুন দল, 'রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া' গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত হন এবং দলের নাম আর.পি.আই রাখা হয়। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে ১৯৫৬ সালে ৬ই ডিসেম্বর তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ১০ই মার্চ থেকে আর. পি. আই. কার্যকর হয়। আর. পি. আই.'র সংবিধান প্রস্তুত করেন বি. সি. কামলে, বাবু হরিদাস আওয়ালে ও ব্যারিস্টার খোবড়াগড়ে।[১০৭] প্রসঙ্গত, বলা যেতে পারে যে, ১৯৬৭ সালে সি. পি. আই. এম. সমর্থিত আর. পি. আই. প্রার্থী হিসেবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তাঁর বিরুদ্ধে এত নিন্দামন্দ, রটনার পরেও তিনি কোনওরকম সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক ব্যতিরেকেই ৮৪,৬৪৪ ভোট সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন - যে রেকর্ড আজপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোনও দলিত রাজনীতিবিদও ভাঙতে পারেননি।"[১০৮] বাংলা ভাগ হওয়ার পর ভারতে এসে কোনও দলিত রাজনৈতিক নেতা পূর্বের মহিমা ফিরিয়ে আনতে পারেননি। তাঁর কারণ হিসেবে অনেকে মন্তব্য করেন দেশভাগের ফলে নমঃশূদ্র জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দরুণ তাঁদের এই করুণ অবস্থা। কথিত আছে যে, ১৯৬৮ সালের ৫ই অক্টোবর বনগাঁয় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে আর কেউ এত সক্রিয়ভাবে আর. পি. আই. নেতা হতে পারেনি। আর. পি. আই.-এর বিপর্যয়ের জন্য অনেকে আম্বেদকরের উত্তরসূরীদের অযোগ্যতাকে দায়ী করেন।

দেশভাগের ফলে একদিকে যেমন মতুয়া আন্দোলনের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল অপরদিকে আম্বেদকরের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পথে শারীরিক অসুস্থতার বাঁধা হয়েছিল। মতুয়া আন্দোলনের ব্যক্তিবর্গ এদেশে এসে অনেকে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। আবার অনেকে কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। এছাড়াও তাঁরা ভারতে এসে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার দরুণ তাঁদের আন্দোলনের ধারায় বাধা পড়ে। আরও উল্লেখ করতে হয় যে, যে ওড়াকান্দিকে কেন্দ্র করে মতুয়া আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল, তা দেশভাগের ফলে দ্বিখণ্ডিত হয়।

গুরুচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ১৯৪৭ সালে ভারতে এসে ঠাকুরনগর উদ্বাস্তু উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেন। আর কনিষ্ঠ পুত্র মন্মথরঞ্জন ঠাকুর ওড়াকান্দিতে থেকে যান। বর্তমানে ঠাকুরনগরে মতুয়া মহাসংঘের প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রমথরঞ্জন ঠাকুর।[১০৯] পূর্বপাকিস্তান থেকে চলে আসা নমঃশূদ্র তথা মতুয়া অনুগামী উদ্বাস্তু যাঁরা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, তাঁদের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে ‘মতুয়া মহাসংঘ’ ঠাকুরনগরে নবরূপে স্থাপন করেন। আর এই ঠাকুরনগরের উন্নয়ন কল্পে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে ও পূর্বপাকিস্তানে ফেলে আসা উদ্বাস্তুদের সমপরিমাণ চাষের জমি এবং সম্পদের পরিমাণের ক্ষতিপূরণ, কর্মসংস্থানের বার বার আবেদন জানিয়েও সুফল পাননি। তাইতো হয়তো তিনি ১৯৫০ সালের ৩১ জুলাই দিল্লিতে উদ্বাস্তু সম্মেলনে যোগদান করে পূর্বভারতের উদবাস্তুদের পুনর্বাসন ও দেশভাগের নীতি নিয়ে অভিযোগ মূলক বক্তব্য রাখেন।[১১০] ঠাকুরনগরের উদ্বাস্তু কলোনির উন্নয়ন করার লক্ষ্যে পি. আর. ঠাকুর নিজের অনুগামীদের নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উদ্বাস্তুদের সেবার কাজে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৫১ সালের ২ মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ঠাকুরনগরে এলে, ঠাকুরের নেতৃত্বে বিরাট জনসভার আয়োজন করেন, মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, চারুমিহির সরকার, ভবানী শংকর গাইন, মহানন্দ হালদার ও অন্যান্য ব্যক্তিরা। পি. আর. ঠাকুর নমঃশূদ্রদের নানান ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য রাজ্য পালের নিকট আবেদন রাখেন।[১১১]

দেশভাগের পরে পি. আর. ঠাকুর ভারতে এসে ১৯৫২ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরে তিনি নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার অর্জনের চেষ্টায় মনোযোগ দেন। ২৪ পরগনার হাবরা, স্বরূপনগর, গোবরডাঙ্গা, বনগাঁ, বাগদা, হরিণঘাটা, নদীয়ার বগুলা, হাঁসখালি, কৃষ্ণনগর, মাঝদিয়া, তেহট্ট, নবদ্বীপে বসবাস রত নমঃশূদ্র উদবাস্তুদের ঐক্যবদ্ধ করণে মতুয়া মহাসংঘের আঞ্চলিক শাখাসংঘ স্থাপনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করেন।[১১২] কাজেই পি. আর. ঠাকুর ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচনে হরিণঘাটা থেকে এবং ১৯৬২ সালে তৃতীয় বিধানসভা নির্বাচনে হাঁসখালি থেকে কংগ্রেস দ্বারা মনোনীত বঙ্গীয় বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হন। মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ১৯৫৭ সালে বনগাঁ, ১৯৬২ সালে বাগদা তপশিলি সংরক্ষিত আসনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে পরাজিত করেন। মহানন্দ হালদার ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে নদীয়ার চাপড়া সংরক্ষিত আসনে জয়ী হন।১১৩ ১৯৬২ সালে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পি. আর. ঠাকুরকে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার

তপশিলি ও আদিবাসী দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী করেন। ১৯৬২ সালের ১ জুলাই আকস্মিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের মৃত্যু হয়। পরে প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের আমলে কে. কামরাজ নাদারের সযোগিতায় নেহেরু সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ বৃদ্ধি ও নেতাদের দুর্নীতি মুক্ত করার পরিকল্পনা নেন। কামরাজ পরিকল্পনায় প্রত্যেক রাজ্যের কিছু মন্ত্রী ছাঁটাই এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত কাজে লাগিয়ে প্রফুল্ল সেন পি. আর. ঠাকুরকে মন্ত্রীসভা থেকে ছাঁটাই করেন।[১১৪]

কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে ১৯৬৩ সালে ডিসেম্বর মাসে হজরত মহম্মদের এক গোছা চুল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি হয়। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণেই ১৯৬৪ সালে পূর্বপাকিস্তানের যশোহর, খুলনা, বাগের হাট প্রভৃতি নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলিমরা সাংঘাতিক অত্যাচার চালায়। এর ফলে পূর্বপাকিস্তান থেকে আনুমানিক প্রায় ১২ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়।[১১৫] উক্ত কারণেই হয়তো পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার এন্টালী, বেলেঘাটা, রাজাবাজার, বরানগর, যাদবপুর, সোনারপুর, মহেশতলা, বজবজ, এইসব দাঙ্গাকবলিত অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হল, বনগাঁ, হাবড়া, বারাসাত ও নদীয়ার চাপড়া, তেহট্ট নানা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করে।[১১৬] এই সময় প্রফুল্ল সেনের প্রশাসন উদ্বাস্তুদের উপর ভীষণ পুলিশি অত্যাচার চালায়। ১৯৬৪ সালের ১৪ জানুয়ারি দাঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় কার্ফু জারি করা হয়। কাজেই পুলিশ বহুসংখ্যক নিরস্ত্র মানুষকে জেল বন্দী করে। বনগাঁ ও নদীয়ার উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের নির্বিবাদে দাঙ্গাবাজ ও সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এই সময় উক্ত অঞ্চলের দাঙ্গাকারী ছাড়াও উদ্বাস্তু সাধারণ মানুষের উপর পুলিশি অত্যাচার চলে।[১১৭] এই সময় উদ্বাস্তু মহিলাদের উপরও চরম অত্যাচার ও ধর্ষণের মতো পাশবিক নানান ধরনের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে পি. আর. ঠাকুর মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে মহিলাদের রক্ষা করা ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোন ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস না দেওয়ার প্রতিবাদে পি.আর. ঠাকুর কংগ্রেস ত্যাগ করেন ১৯৬৪ সালের ৬ই মার্চ।[১১৮] কংগ্রেস ত্যাগ করা সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়, 'বস্তুতঃ শ্রদ্ধেয় ঠাকুর আপোষহীন নীতি নিষ্ঠা, মুখের উপর কঠোর ভাষায় উচিত জবাব দেবার প্রবণতা, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও বজ্র কঠোর মনোভাব মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ভয় করতেন। তাই তিনি ঠাকুরকে দলের মধ্যে অবাঞ্ছিত উৎপাত বলে গণ্য করতেন'।[১১৯] উক্ত কারণের জন্যেই বেশির ভাগ কংগ্রেসের তপশিলি উদ্বাস্তু

নেতারা কংগ্রেসের উপর বিরূপ হয়ে পড়েন। মুখ্যমন্ত্রীর কাজের জবাব দেওয়ার জন্য বিধানসভায় তপশিলি বিধায়করা মিলিত ভাবে জবাব দিতে প্রস্তুত হন। বিধানসভায় মহানন্দ হালদার, মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বামপন্থী নমঃশূদ্র বিধায়ক অপূর্বলাল মজুমদার ও অন্যান্য তপশিলি বিধায়কগণ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। তপশিলি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক পরমানন্দ হালদার, অধ্যাপক নরেশ দাস, খগেন্দ্রনাথ নস্কর, শক্তি সরকার, নেপাল বাউরি প্রমুখ উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের আশায় তৎকালীন পুনর্বাসন মন্ত্রী আভা মাইতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজেদের প্রতিবাদী বক্তব্য রাখেন।[১২০] উক্ত সকল ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে নদীয়া ও ২৪ পরগনার বেশ সংখ্যক নমঃশূদ্ররা কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রী সেনের উপর রাগ করে বামপন্থী তথা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দিকে সমর্থনে চলে যান।

অজয় মুখার্জী ১৯৬৪ সালে কংগ্রেসের মধ্যে অপমানিত বোধ করে 'বাংলা কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা কংগ্রেসের সহসভাপতি হিসেবে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর যোগদান করেন।[১২১] এই সময় বাংলা কংগ্রেসের প্রথম লক্ষ্য হয়, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ও কংগ্রেস পার্টি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে বিরূপ চিন্তাভাবনা তৈরি করা। এছাড়াও জনমানসে পি. আর. ঠাকুর ও বাংলা কংগ্রেসের নেতারা তপশিলি জাতিদের বোঝাতে থাকেন, ডাঃ বিধান রায়ের পরে কংগ্রেসের নেতারা তপশিলি নেতৃত্বের প্রতি ভালো ব্যবহার করতেন না। কাজেই কংগ্রেস তপশিলি জনগণের সমর্থন হারাতে থাকে। তাইতো ১৯৬৭ সালের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে মতুয়া প্রভাবিত নমঃশূদ্ররা কংগ্রেসকে ভোট না দিয়ে বাংলা কংগ্রেস ও বামপন্থীদের ভোট দিয়েছেন। কাজেই তপশিলি সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের জয়ী আসন সংখ্যা কমে যায়। যেমন ১৯৬২ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের তপশিলি জয়ী সদস্য ছিল ৩৩ জন, সেখানে ১৯৬৭ কমে দাড়ায় ২৫ জন।[১২২] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ২৪ পরগনাও নদীয়ার ৪ টি তপসিলি আসন কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়। নদীয়ার মণীন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল ও চারুমিহির সরকার বাংলা কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হন। আর রাণাঘাট পূর্ব থেকে সি. পি. আই এর নিতাই পদ সরকার ও বাগদা কেন্দ্র থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের অপূর্বলাল মজুমদার জয় লাভ করেন। এনারা সকলেই ছিলেন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে পি. আর. ঠাকুর বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন।[১২৩] ১৯৬৭ সালে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে নমঃশূদ্র নেতা চারুমিহির সরকার প্রথম যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভায়

রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। অন্যাদিকে, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর কেন্দ্রীয় সরকারের (National Harbour Board) এর সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে গেলে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তপশিলি আসনে কংগ্রেসের ফলাফল ৫৪ টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ১১ টি, বাংলা কংগ্রেস ১০ টি, সি. পি. আই. এম ১৫ টি, আসনে জয় লাভ করে।[১২৪] পশ্চিমবঙ্গে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে যে দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়, তাঁদের শাসনকালে গ্রামবাংলার কৃষিজীবী মানুষের উন্নয়ন নিয়ে তেমন কোন চিন্তা ভাবনা না থাকার কারণে ফ্রন্ট সরকার সাফল্য পায়নি। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের আদিকংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের অনেক নেতাকর্মীরা ইন্দিরা গান্ধির জনপ্রিয় নেতৃত্বে পুনরায় কংগ্রেসের মধ্যে দৃঢ়তা তৈরি হয়। ফলে পি.আর. ঠাকুর ইন্দিরা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসে পুনরায় যোগদান করেন।[১২৫] এ প্রসঙ্গে পি. আর. ঠাকুর সম্পর্কে, অধ্যাপক দাস মন্তব্য করেছেন, "লোকসভায় তপশিলি ও আদিবাসী ও বাংলার উদ্বাস্তুদের দাবিসমূহ আদায়ের জন্য লড়াই করেন। তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক দেশনেতা"।[১২৬] তবে অধ্যাপক দাসের এই মন্তব্যের অনেকটা বিরোধিতা করে শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, "কংগ্রেসের পি. আর. ঠাকুর ও জগজীবন রাম দলিত সমাজটাকে বিকিয়ে দিয়েছেন।"[১২৭] এই যুক্তি থেকে এ কথা বলা যেতে পারে যে, মতুয়া সংঘাধিপতি পি. আর. ঠাকুর স্বাধীন ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে কোনোরূপ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

এবারে আমরা আমাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক -ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করব।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির আর্থসামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাংলার নিম্নবর্ণের জাতির মানুষেরা নিজেদের উচ্চজাতির পরিচয় দেওয়ার জন্য নানাবিধ যুক্তি অবতারণ করে থাকেন। এখানে যাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলে ধরা হয়েছে আজকের দিনেও ভারতের আদমসুমারিতে 'পোদ' (Pod) জাতি নামেই পরিগণিত হয়। আর এই 'পোদ' নামের হীনতা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে নানাবিধ যুক্ত অবতারণ করেন। 'পোদ' সম্পর্কে পৌণ্ড্র – মনীষা ৩য় খণ্ডে বলা হয়েছে,

"পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারগণ বা ঐতিহাসিকগণ "পোদ" শব্দ দ্বারা "পৌণ্ড্রকগণের" পরিচয় লিপিবদ্ধ না করায়, "পোদ" শব্দ যে "পৌণ্ড্রক" পরিচায়ক তাহা পরবর্ত্তীকালের কেহ নির্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই"।[১২৮] এই 'পোদ' শব্দটা যে ভারতীয় জাতিভিত্তিক সমাজে হীনতম জাতির নিদর্শন হিসেবেই পরিগণিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকার কারণ নেই। 'পোদ' জাতি নামকরণ নিয়ে পৌণ্ড্রদের অত্মসন্মানে আঘাত লাগে বলেই বসন্ত কুমার মণ্ডল উল্লেখ করেছেন, "নিম্নবর্ণের মানুষদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, যেমন নাপিতকে 'নাপতা' নমঃশূদ্রদের 'চাঁড়াল' বলে গালাগালি করা হয়ে থাকে, তাচ্ছিল্য করা হয়ে থাকে তেমনি 'পুড়ো' 'পৌণ্ড্র' বা 'পদ্মরাজ' শব্দের অপভ্রংশ ঘটিয়ে 'পদ্মরাজে'র রাজ বাদ দিয়ে 'পদ্মে'র পদকেই অশালীন 'পোদ' শব্দ বানিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে"।[১২৯] বাংলার সমাজের কোন জাতিকে তাচ্ছিল্যকর শব্দের ব্যবহার করার প্রবণতা আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে বারবার প্রমাণ পেয়েছি। নানাবিধ তাচ্ছিল্যকর শব্দের ব্যবহার করে হয়তো জাতিভিত্তিক সমাজকে আরও জটিল করা হয়েছে। কোন সভ্যসমাজের জাতিগোষ্ঠীই তাঁদের জাতির ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্যকর শব্দের ব্যবহার মেনে নিতে পারেন না। তাইতো পৌণ্ড্রাও এই 'পোদ' শব্দটি তাদের জাতির ক্ষেত্রে মেনে নিতে পারছেন না।

আবার 'পোদ' শব্দের ব্যবহার নিয়ে মহেন্দ্রনাথ করণ বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও গবেষকদের গবেষণা তুলে বিষয়টা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। কারণের উল্লেখ থেকে পাওয়া যায়, এই তথ্য "বঙ্কিমবাবু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান সম্বন্ধীয় গবেষণাবিদ শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু ও বহু মনীষীবর্গ 'পৌণ্ড্র' হইতেই অপভ্রংশজ 'পোদ' নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন"।[১৩০] আমরা এর আগেও উল্লেখ করেছি যে, নিম্নজাতির মানুষ সবসময়ই চেষ্টা করেন নিজজাতিকে উচ্চজাতিতে প্রতিপন্ন করার। সে জন্যই সব সময় তাঁরা ধর্মীয়শাস্ত্র, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে। তাই, বসন্তকুমার মণ্ডল উল্লেখ করেছেন, "ব্রহ্মার পদ থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছে। পদ থেকে যখন জন্ম হয়েছে, জাতিবাচক শব্দই থাকা উচিত ছিল। কোনো এক অলিখিত কারণে প'য়ের সঙ্গে 'ও'কার যুক্ত করে পদ শব্দটিকে 'পোদ' করা হয়েছে এবং সেটাই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে"।[১৩১] সেইদিক থেকে পৌণ্ড্ররাও নিজেদের 'পোদ' জাতির পরিচয় বহন করা অব্যাহতি পাওয়ার নিমিত্তেই আন্দোলন করে চলেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আবার ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় 'পোদ' জাতির সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, "সমাজের অঙ্গ-নির্গত আবর্জনা-পরিষ্কারক রজক-চন্ডাল বাউরী-পোদ বাগদী ইত্যাদি নিম্নজাতির মানুষের সঙ্গে"।[১৩২] কাজেই দেখা গেল যে, 'পোদ' জাতির পরিচায়ক কাজ হল সমাজের অন্যান্য উচ্চজাতির মানুষের তৈরি করা আবর্জনা পরিষ্কার করাই ছিল প্রধান কাজ। তবে 'পোদ'দের এই জাতীয় কাজের বাইরেও যে কৃষি ও অন্যান্য শারীরিক শ্রমের কাজগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বলেও অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন।

অতএব, আমাদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থ-সামাজিক দিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে। পৌণ্ড্রদের জাতি - উৎস- বসতি সম্পর্কে আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব H. H. Resely , সাহেবের মন্তব্য। তাঁর মতে, "Their origin is uncertain. Babu Bankim Chandra Chatterji, quoted at page 188 of the Census Report of 1872, notices their "marked approach to the Turanian and aboriginal type" of features, and seeks to identify them with the poundra mentioned in the Mahabharata as one of the five chief rases of Eastern India between Magadha and the sea. The educated members of the caste claim for it a mixed descent from a Kayasth father and a Napit mother. Other tell a highly indelicate story regarding the miraculous birth of the first Pod from Revati, the wife of Balaram."[১৩৩] এই মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুৎসুদ্দিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র বঙ্কিমচন্দ্র "তুরানিয়" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মহাভারতে মগধের দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলা হয়েছে। রিজলি সাহেবের ভাষ্য অনুসারে পোদ জাতির শিক্ষিত মানুষেরা যে মিশ্রিত জাতির দাবি তোলেন, সেই দাবিটা তোলা আমদের দেশের জাতিভিত্তি সমাজের বেশির ভাগ নিম্নজাতির মানুষেরা করেই থাকেন। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি এই সম্পর্কে। ধর্মীয়বিধান অনুযায়ী এদেশের সামাজিক উচ্চনীচ ভেদাভেদ থাকার কারণেই নিম্নজাতির মানুষেরা অনেক সময় ভগবানের সন্তান বলেও যুক্তি ও দাবি তোলেন। 'পোদ' বা 'পৌণ্ড্ররা'ও বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রের বিধান তুলে ধরে নিজজাতিকে ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে বাংলার সমাজে তাঁদেরকে সামাজিক প্রেক্ষাপটের কোন স্তরে রাখা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমাদের সংক্ষেপে আলোচনা করে নিতে হবে ।

পৌণ্ড্রদের বাংলার সমাজে সামাজিক অবস্থান নিয়ে বলতে গেলেই উল্লেখ করতে হয় রিজলি সাহেবের আরেকটি মন্তব্য, তাঁর মতে "The caste employ as their priests Rarhi Brahmans, who are the held to be so far degraded by serving them that high class Brahmans will not take food or water from there hands.... The social status of Pods is decidedly low."[১৩৪] জাতিগত ভাবে পৌণ্ড্রদের ব্রাহ্মণরা কখনও ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে গ্রহণ তো করতেন না এবং তাঁদের বাড়ির পৌরোহিত্য করতেন না। উচ্চ ব্রাহ্মণরা পৌণ্ড্রদের হাতের জল পর্যন্ত খেতেন না। কাজেই আমরা বলতে পারি যে বাংলার সমাজে তাঁরা ক্ষত্রিয় হিসাবে ব্রাহ্মণদের কাছে গন্য হতেন না। কিন্তু পৌণ্ড্র জাতির গবেষক বসন্ত কুমার মণ্ডল যুক্তি দেখিয়েছেন, এইভাবে " পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়েরা সাহসী বলিষ্ঠ এবং যুদ্ধ বিগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ক্ষত্রিয়ের যত রকম গুণ সবই তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল এবং আছে। অতএব পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতিকে ক্ষত্রিয় জাতি বলতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। জাতি নির্ণয়ে পৌণ্ড্রের সঙ্গে ক্ষত্রিয় যোগ করে যদি বলা হয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় তাহলে সেটাই হবে যুক্তিসঙ্গত"।[১৩৫] সংগত কারণেই বলা যেতে পারে যে, বাংলার হিন্দু সমাজে উক্ত যুক্তিটা কতটা গ্রহণযোগ্য বাস্তবের জাতিভিত্তিক সমাজে তা একথাই বলা কষ্টকর। তবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, পৌণ্ড্রদের আদি পেশা কী ছিল, তাহলেই হয়তো মণ্ডলের যুক্তির সঙ্গে বাস্তবের প্রেক্ষাপটটা কতটা পার্থক্য বা মিল আছে বোঝা যাবে। এক্ষেত্রেও আমরা রিজলি সাহেবের বক্তব্য তুলে ধরব, তাঁর মতে "The great majority of the caste are engaged in the agriculture, as tenure-holders, and occupancy or non-occupancy raiyats. A few have risen to be zaminders, and some at the other end of the scale work as nomadic cultivators on freshly-cleared land in the sundarbans, changing their location every two or three years according to the fortune of their crops."[১৩৬] বলা যায় যে, পৌণ্ড্রদের প্রধান পেশা যাযাবর প্রকৃতির কৃষি কাজ করা। এদের মধ্য যে কয়জন জমিদার ছিলেন তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যেই হয়তো নিজ জাতির মধ্যে থেকেই লাঠিয়াল বাহিন গড়ে ওঠে। কাজেই পৌণ্ড্রদের থেকে দাবি করা হয় যে, তারা ক্ষত্রিয় জাতি। যে পৌণ্ড্রজাতিকে ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করতেন না। তাদের কে কী করে ক্ষত্রিয় বলা যায়। যাযাবর কৃষি কাজ করার নিমিত্তেই এদের প্রয়োজন হয়, নিরাপত্তার ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও চোর ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেও সম্ভবত লেঠেল বাহিনী পৌণ্ড্রদের মধ্যে থেকেই তৈরি হয়। এই

লেঠেল বাহিনীই হয়তোবা তাঁদের নিরাপত্তা দিতেও পারতেন। ফলত মণ্ডলের যুক্তিতে যেমন গোটা জাতিই ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। আমরা কিন্তু আবার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে গোটাজাতিই ক্ষত্রিয় জাতি বলে ধরে নিতে পারব না। এর কারণ হল কিছু সংখ্যক মানুষ লেঠেল হলেই যে গোটাজাতি ক্ষত্রিয় হয়ে যাবে, এদেশের জাতিভিত্তিক সমাজে তা প্রমানিত করা বেশ কঠিন। নীহাররঞ্জন রায় যেখানে উল্লেখ করেছেন, "বৃত্তি বা জীবিকা বর্ণনির্ভর, এবং বর্ণ জন্মনির্ভর"[১৩৭]। এইরূপ প্রশ্ন আমাদের সামনে ওঠাটাই স্বাভাবিক বলেই মনে করা যেতে পারে। নিজ নিজ জাতির স্বার্থেই যে বাংলায় বিশেষ করে নিম্নবর্ণের মানুষেরা কখনও ব্রাহ্মণ কখনও আবার ক্ষত্রিয় হিসাবে তুলে ধরেছেন। এই ক্ষেত্রে বসন্ত কুমার মণ্ডল আরও একটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন। তথ্যটি হল "পূর্বাঞ্চলের রাজা প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহী হলেন এবং দিল্লী থেকে সম্রাট আকবরের শ্যালক রাজা মানসিংহ বিদ্রোহ দমনে এলেন। মানসিংহের সেনাপতি ছিলেন বুদ্ধেশ্বর দাস নস্করের পিতা এবং প্রতাপাদিত্যের সেনানায়ক ছিলেন এক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বীর পুরুষ। উভয়পক্ষের লাঠিয়াল এবং ঢালীসৈন্য বাহিনীতে ছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বীরপুরুষগণ। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে যুদ্ধ হয়েছিল মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের। অলিখিত ইতিহাস বলে যুদ্ধটি হয়েছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বাদশাহী লাঠিয়াল, ঢালীসৈন্যদের সঙ্গে যশোহর খুলনা জেলার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ঢালী এবং লাঠিয়ালদের। একথাও বলা যায় যুদ্ধটি হয়েছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সঙ্গে নমঃশূদ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মিলিত শক্তির। এই সাহসী বীর পুরুষদের ক্ষত্রিয় বলতে আপত্তি কোথায়।"[১৩৮] অবশ্য গান্ধিজি নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে ঢালী অংশের মানুষকে রাজপুত ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সেই অর্থে হয়তো মণ্ডল ও নিজজাতির ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিচিতি দিতেই চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে ভারতের জাতিভিত্তিক সমাজে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় পদমর্যাদা দেওয়া নানান আপত্তি দেখা গেছে। আমরা একথাও উল্লেখ করতে পারি যে, সাম্প্রতিককালে দুই ২৪ পরগনার নানা স্থান থেকে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে বিভিন্ন গবেষক মনে করেন যে, সুন্দরবনের সভ্যতার ইতিহাস অতি প্রাচীন। আর্য্য – পৌণ্ড্রক নামের গবেষণা পত্রে মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল উল্লেখ করেছেন, "যেরূপ আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন সেইরূপ "পোদ" গণ যদি "পৌণ্ড্রক" দিগকে বিদূরিত করিয়া এতদাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকে, তবে "পৌণ্ড্রক" গণের নাম এ প্রদেশে লোপ পাইবার কথা যথার্থ হইতে পারে"।[১৩৯] 'পোদ' প্রসঙ্গে মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল কিন্তু সেরকম কোনো আপত্তি তোলেন নি বরং তিনি পোদ জাতিকে প্রাচীন জাতির মধ্যে একটি শক্তিশালী

জাতি হিসেবে মনে করেছেন। তবে ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে নজর দিয়েই এই সভ্যতার স্রষ্টা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রাই। প্রাচীন কাল থেকেই পৌণ্ড্ররা বাংলার সামাজিক কাঠামোতে জনজাতির অংশ ছিলেন। নীহাররঞ্জন রায়ের উল্লেখ থেকে জানা যায়, "বরেন্দ্রভূমি প্রাচীন পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনেরই এক সুবৃহৎ অংশ, এমনকী কখনও কখনও সমার্থকও।... য়ুয়ান-চোয়াঙের কামরূপ বিবরণ, সেই জন্যই পুন্ড্রবর্ধনের সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলিয়া যায়। সেখানেও ভূমি সমতল এবং জলীয়, শস্যসম্ভার নিয়মিত এবং জলবায়ু মৃদু। কামরূপের লোকেরা খর্ব ও কৃষ্ণকায়; সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রকৃতি হিংস্র"।[১৪০] যখন থেকে স্থায়ী কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে তখন থেকেই পৌণ্ড্রদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন দেখা দেয় । রিজলির বর্ণনায় দেখা গেছে যে, "তাঁদের মধ্যে বহুসংখ্যক মানুষ কৃষিতে নিযুক্ত, তাঁরা হয় জমির মালিক নয়তো ভূমিহীন কৃষক। পৌণ্ড্রদের মধ্যে কিছু জমিদার দেখা যায়। ফলত এদিক থেকে তাঁদের অবস্থান অনেকটা পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র বা উত্তরবঙ্গের কোচ- রাজবংশীদের মতন। ভারতীয় আদমসুমারিতে এখনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের 'পোদ' লেখা হয়। এনিয়ে পৌণ্ড্রদের মধ্য সময়ের নিরিখে নানাবিধ আন্দোলন হলেও নমঃশূদ্রদের 'চণ্ডাল' নাম মোচনে, মতন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় 'পোদ' মোচনে কোনো আন্দোলনই কার্যকর হয়নি। অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর স্বজাতি সেবক মাসিক 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার' পত্রিকার উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন, এই ভাবে " উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়া থেকেই লেখা হতে থাকে বিভিন্ন জাতিতত্ত্বের বই। এ জাতীয় উদ্যোগকে বেশি করে ইন্ধন যোগায় ১৮৭২ সাল থেকে চালু হওয়া আদমশুমারি। জনগণনার সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব-নিকেশের পাশাপাশি সরকারি খাতায় নথিবদ্ধ হতে থাকে জাতি তথা বর্ণ ও বৃত্তিকেন্দ্রিক তথ্যাদি। বাংলার জনবিন্যাসের একটি নৃতাত্ত্বিক চেহারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এ ধরণের প্রতিটি আদমসুমারিতে। এর দ্বারাও নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে স্বজাতি সেবক পত্রিকাগুলি"।[১৪১] কাজেই আমরা বলতে পারি যে, নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌন্ড্ররাও পোদ মোচনের নিমিত্তে স্বজাতি পত্রিকাগুলিতে সামাজিক স্তরে ক্ষত্রিয় জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার লক্ষ্যেই আদমসুমারি তথা স্বাধীন দেশের সুমারিতেও গৃহীত হয়নি বলেই আজও পৌন্ড্রদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। পৌন্ড্রক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয় তে মহেন্দ্রনাথ করণ উল্লেখ করেছেন, "সুতরাং 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' বলিলে কখনও একমাত্র পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জাতিকে বুঝাইতে পারে না।....বেণীমাধাব হালদার মহাশয় সেন্সাস সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপনপত্র প্রচার করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, গভর্নমেন্ট আমাদিগকে ১৯০১ সালের সেন্সাসে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।....Sir, With reference to your letter dated

the 26th Oct.1903, enquiring whether the higher class Pods heve been classed as Bratya Kshattriya in the Cencus Report, I am directed to refer you to page 373.para 593 of vol. VI, Part-I of the Cencus Report of 1901."[১৪২] এতদ্‌সত্ত্বেও পোদদের সেন্সাস কতৃপক্ষ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলে গ্রহণ করলেন না। ফলে পৌণ্ড্রদের শিক্ষিত মহল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে সরকারি খাতায় নথিভুক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যান। **১৯১১** সালে বেণীবাবু সেন্সাস কর্তৃপক্ষকে আবার একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির উত্তর দেন, এই ভাবে "Sir, In returning herewith the document in origin which accompanied your supplementary memorial, dated the 8th March, 1911, regarding the classification of Pods as Bratya Kshattriyas in the Cencus, I am directed to say that Superitendant of Census Operation. I am directed to say that Superintendent of Census of Bengal for 1911 to the claims of the reports on the Cencus of Bengal for 1911 to the claims of the Bratya Kshattriya sections of the Pod community to be registered as the separate caste."[১৪৩] এই অংশ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, তা 'পোদ'দের মধ্য থেকেই একটা শ্রেণী ব্রাত্যক্ষত্রিয় স্বতন্ত্র জাতিরূপেই সেন্সাস কর্তৃপক্ষের নিকট স্বীকৃতি পেল। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি বিভিন্ন নামে সরকারি দলিল ও নথিপত্রে তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে। এই নথিভুক্ত নিয়ে এদের সমাজে নানান ধরনের বিভ্রান্তির মধ্য দিয়েও একটা অসংগঠিত আন্দোলন মাঝে মাঝেই দেখা গেছে। কিন্তু তাতে 'পৌণ্ড্র' সমাজের মূল দাবিতে পৌঁছনো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের কাছে এমন একটা প্রশ্নও ওঠে যে সমাজে একই জাতির পাঁচ ছয় প্রকারের নামকরণ হওয়াটাও অসঙ্গত এবং বিভ্রান্তিকর।

পৌণ্ড্রদের মধ্যে যাঁরা ব্রাত্যক্ষত্রিয় হিসাবে পরিগণিত হওয়ার নিমিত্তে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁদের বেশির ভাগ মানুষ কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আন্যান্য পৌণ্ড্রদের সাথে সামাজিক দূরত্ব মেনেই চলত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাঁদের থেকে ব্রাত্যক্ষত্রিয়রা নিজেদের উচ্চ বা উন্নত শাখা বলেই মনে করেন। কারণ হল, এরা মনে করতেন মাছধরা থেকে কৃষিকাজ করা সমাজের নিকট অনেকটা সম্মানজনক। এর উল্লেখ আমরা বসন্তকুমার মণ্ডল লেখায় পাই "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের চার বিভাজনের মধ্যে ধুলিপুরী বলা হ'ত যারা খুলনা যশোহর অঞ্চলে বসবাস করতো তাদের। এরা

নাকি আচার আচরণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে কিছুটা পশ্চাৎপোদ"।[১৪৪] পৌণ্ড্র জাতির মধ্যে উচু-নিচু ভেদাভেদ এবং নানান নামে নামাঙ্কিত করার দরুন এদের সমাজের ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও সমাজ সেবক মানুষেরা একক জাতির পরিচিত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন। কাজেই পৌণ্ড্ররা কখনও নিজের জাতিপরিচয়ে 'পোদ' বা 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' হিসাবে মেনে নিতে পারেন নি। তাইতো লেখক উল্লেখ করেন "১৯২১ সালের সেন্সাসে আমাদের সমাজের শ্রদ্ধেয় নেতৃমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় এবং বিশেষভাবে বেলেঘাটার স্বনামখ্যাত জমিদার, বেঙ্গল কাউন্সিলের নির্বাচিত সভ্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্যতম অলডার-ম্যান ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের সহৃদয়তাপূর্ণ আনুকূল্যে আমাদের জাতি-নাম 'পোদ'র পরিবর্তে 'পৌণ্ড্র' বলিয়া গৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' সাধারণতভাবে জাতির প্রতি প্রযুজ্য বলিয়া গভর্নমেন্ট বা কোন বিবেচক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি আমাদের এই নাম পরিচায়করূপে গ্রহণ আনুমোদন করিতে পারেন না"।[১৪৫] যা বোঝা গেলো যে, 'পোদ' জাতি নিজের ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতির পরিচয় বহনের থেকে সরকারি নথিতে পৌণ্ড্র জাতির পরিচয় পেলো এই সময় থেকে ।

'দেশের নামে জাতির নাম' এর আন্দোলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষেরা ''পৌণ্ড্র' শব্দ দেশাত্মবোধক দেশের নামে জাতির নাম হইতে পারে না। এই তর্ক যে নিতান্ত অসার এবং তর্ককারীর অতীব অজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা যেকোনো একখানি অভিধানের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া 'পৌণ্ড্র' শব্দের অর্থ দেখিলেই সহজেই প্রতীয়মান হইবে। বাচস্পত্যাভিধানে 'পৌণ্ড্র' শব্দের অন্যতম অর্থ বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া লিখিত আছে"।[১৪৬] এই যুক্তি থেকে বলা যায় যে, আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসে দেখা যায় যেমন বিহারে যারা বসবাস করেন তাঁদের বিহারি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার গুজরাটে বসবাস করেন, তাঁদের গুজরাটি হিসেবেই জানি। তবে বিহারি বা গুজরাটিদের মধ্যেও সামাজিক উঁচু-নিচু ভেদাভেদ বিদ্যমান। সেই অনুসারে পৌণ্ড্রদেশে শুধুমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতিই থাকবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ডঃ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের মন্তব্য, তাঁর মতে "আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি 'বঙ্গ' জনগণ একটি জাতি, গোষ্ঠী একটি উপজাতি। অনুরূপ উপজাতি ছিল, যেমন পোদ, রাজবংশী, কোচ যারা সমবঙ্গীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন"।[১৪৭] এবারে আমরা উল্লেখ করব পোদ/ পৌণ্ড্ররা ভারতীয় সরকারি দলিলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হিসেবে পরিগণিত না হওয়ার কারণ হল বঙ্গদেশের রেজিস্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল, খাঁ – বাহাদুর আমিন-উল-ইসলাম

মহেন্দ্রনাথ করণকে লিখেছেন, "আপনার নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জাতি "পোদ" স্থলে "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়" বলিয়া দলিলে লিখিত হইলে রেজিস্ট্রিকার্য্য অগ্রাহ্য হইবে না"।[১৪৮] এতো জমি বাড়ি কেনা বেচার ক্ষেত্রে পোদরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি লেখার অধিকার পেয়েছিল। আবার পরক্ষনেই খাঁ-বাহাদুর বললেন 'পোদ' স্থলে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' বলিয়া লিখিত হইলে দলিলের রেজিস্ট্রিকার্য্য নামঞ্জুর হইবে না"। [১৪৯] অনেকটা সময় নিয়ে মহেন্দ্রনাথ করণ উল্লেখ করেন, " পৌণ্ড্রের সঙ্গে ক্ষত্রিয় যুক্ত করায় ব্রাহ্মণবাদী সাংসদরা বিরোধিতা করেছিলেন । তাঁদের যুক্তি ছিল ক্ষত্রিয় যুক্ত করলে তাঁরা আর তপশিলি ভুক্ত জাতির তালিকায় থাকতে পারেন না । 'পোদ' শব্দের শিকার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অনেকেই হয়েছেন"।[১৫০] ভারতীয় জাতিভিত্তিক সমাজে ক্ষত্রিয়রা তো উচ্চজাতির পরিচিত, তাঁরাতো কোনরূপ সরকারি ক্ষেত্রে জাতিগত পিছিয়ে পড়া সংরক্ষণ উপভোগ করেন না। এক্ষেত্রে পৌণ্ড্ররা তপশিলি সংরক্ষণও নেবে আবার ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে স্বীকৃতিও নেবে এটা তো আমাদের সংবিধানে নেই। যেমনটি ঘটেছিল যেসমস্ত দলিত আম্বেদকরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে পরবর্তী সময়ে তাঁরাও তপশিলি জাতির সংরক্ষণ পাওয়ার দাবি তোলার মতন। তবে, হ্যাঁ কোন জাতিকে 'পোদ' বলেও তাঁর ক্রিয়াকর্মে ছোটো বা হীন করে দেখাটাও বাঞ্ছনীয় নয়। যে জাতিই হোকনা কেন তাঁর মেধাকেই গুরুত্ব দেওয়াটা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় ।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ইতিহাস

নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে স্বজাতির অধিকার অর্জনের নিমিত্তে মহেন্দ্রনাথ করণের ভূমিকা পৌণ্ড্র সমাজে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখে। ১৯১০ সাল থেকেই নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকার অর্জনের জন্য তিনি সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এর ঠিক দশ বছর আগে থেকেই পৌণ্ড্রসমাজে নিজেদের জাতিকে সেন্সাস কর্তৃপক্ষ 'পোদ' নামে চিহ্নিত করায় তাঁরা ঘোরতর আপত্তি তোলেন এবং ওদের মধ্যে থেকে শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ, বেণীমাধব হালদার ও রাইচরণ সরদারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে "ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব" নামের মাসিক পত্রিকা।[১৫১] যুবক মহেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর থেকে এসে চব্বিশ পরগনায় এই পত্রিকায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নিজের ভূমিকা পালনে নিয়মিত লেখালেখি করেন, অল্পদিনের মধ্যেই নিজস্ব সমাজে সুনাম অর্জন করেন। দীর্ঘ সাত বছর ধরে পৌণ্ড্রদের নানাবিধ সামাজিক দাবিদাওয়া ও বক্তব্য দিয়ে জাতির মধ্যে একটা নবজাগরণের পরিবেশ গঠন করতে সক্ষম হন। ১৯১৭ সালে বারুইপুরের জমিদার জয়কৃষ্ণ মণ্ডলের বাড়িতে "ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি'র" সভার

আয়োজন করা হয়। সেই সভায় সকলের সম্মতিক্রমে "ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতির" নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি"।[১৫২] এই নবগঠিত সমিতির কার্যপোনালিতে তিনি সহকারী সম্পাদকের ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালন করেন । নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মহেন্দ্রনাথ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতি পরিচয়ের যে তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস রচনার মাধ্যমে ২০২১ সালে আদমশুমারি কর্তৃপক্ষকে নিকট যে যুক্তি দেখান তাতে তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তোলেন।

এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাইচরণ বাবুর "ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব" মাসিক পত্রিকার কথা, সেই পত্রিকার আরেকজন লেখক ও সমাজসেবক মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও মহেন্দ্রনাথের ন্যায় পত্রিকা সম্পাদনার কাজে মোটামুটিভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি পৌণ্ড্রদের সামাজিক ও শিক্ষার এবং রাজনৈতিক উন্নতিকল্পে সারা বাংলায় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেশ বড় ভূমিকা পালন করেন। মণীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, "অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস অ্যাসোসিয়েশন"। এই সংগঠনের মুখপত্রে স্বরূপ প্রকাশ করেন 'বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ' নামের একটি পত্রিকা। এর পাঁচ বছর পর 'বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ' নামক একটি গণসংগঠনও গড়ে তোলেন। "যাঁর সঙ্গে পড়ে যুক্ত হন তৎকালীন নমঃশূদ্র নেতা মুকুন্দবিহারী মল্লিক ও ভীষ্মদেব দাস"।[১৫৩] এর থেকেই আমরা একটা অনুমান করতে পারি যে, বাংলার নিম্নবর্ণের নিজ নিজ জাতিগুলির আন্দোলনকে একত্রিত করতে মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তাসত্ত্বেও তিনি পৌণ্ড্রদের 'পোদ' জাতি থেকে সরকারি নথিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি। পরবর্তী সময়ে মণীন্দ্রনাথ নিজ জাতির সাহিত্য, কবিতা, নাটক এবং জাতিতত্ত্বর, শিক্ষাতত্ত্ব মাধ্যমে বাংলার অন্যান্য নিম্নজাতির সামাজিক অধিকার অর্জনে সাহায্য করে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

১৯১৭ সালের পর থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে অনেকগুলো পত্রিকা বেরিয়েছিল, সেগুলো হল, প্রতিজ্ঞা, ক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার, সত্যযুগ, দীপ্তি, সঙ্ঘ ইত্যাদি। এই পত্রিকার মাধ্যমে পৌণ্ড্র জাতি তথা বাংলার নিম্নজাতিদের নিয়ে নানাবিধ দাবিদাওয়া নিয়ে লেখা প্রকাশিত হয়। কাজেই পৌণ্ড্রদের 'পোদ' থেকে যাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় হওয়ার দাবিতে সামাজিক আন্দোলনের বিক্ষিপ্ত ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা চালায়। " ১৯৩৮ সালে এই সমাজের মুখপত্র স্বরূপ দেখা দেয় আমাদের আলোচ্য 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'। পত্রিকাটি বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ

সরকার। পরে সম্পাদক হন পতিরাম রায়। পতিরামের পর পত্রিকা চলে যায় কুঞ্জবিহারী রায় ও গোপালচন্দ্র নস্করের হাতে। সবশেষে এটি সম্পাদনা করেন দিগম্বর সরকার সাহিত্যরত্ন। পত্রিকাটি কুড়ি বছরের বেশি সময় ধরে চলেছিল”।[১৫৪] উক্ত পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যাঁদের নাম আমরা পেলাম তাঁদের পদবি বেশির ভাগই বাংলার উচ্চজাতির পদবি। তবে এদের মধ্যে পদবি নিয়ে একটা সামাজিক আন্দোলনের প্রতিবাদী কাঠামো তৈরি করেছেন। সেটা আমরা অতিসহজেই অনুমান করতে পারি। ফলে, আমরা এটা অনুমান করতে পারি যে, নমঃশূদ্র জাতি যেমন তাঁদের মধ্যে মতুয়া ধর্মীয় মতামত প্রচার করে নিজ জাতির মানুষদের ধারাবাহিক ভাবে সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ‘চণ্ডাল’ থেকে ‘নমঃশূদ্র’ জাতিতে উপনীত করতে পেরেছিলেন। পৌণ্ড্ররা কিন্তু সেটা পারেন নি বলেই আমরা মনে করতে পারি। তাই ‘আর্য্য- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ’ এ পূর্ণচন্দ্র রায় মন্তব্য করেছেন, তাঁর মতে “পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বিষয় যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন তাঁহারা নিশ্চয় বলিবেন যে ‘পৌণ্ড্রসমাজের মধ্যে ঐক্যের বড়ই অভাব’, সামান্য কর্ম সম্পাদনও শক্তির অপেক্ষা করে। এজন্য কোন কার্য্যারম্ভের পূর্বে শক্তি অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। সামাজিক শক্তি একতার উপর নির্ভর করে”।[১৫৫] সামাজিক ঐক্য না থাকার কারণে পৌণ্ড্রদের মধ্যে এই সময় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মতামত গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি বলেই চলে।

পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্রদের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী একটা রাজনৈতিক মত গড়ে উঠলেও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পৌণ্ড্রদের মধ্যে তেমন কোন কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক মতামত গড়ে ওঠে নি। এই গড়ে না ওঠার কারণ হিসাবে আমরা এমন একটা কথা বলতে পারি যে, বেশিরভাগ পৌণ্ড্রদের বসবাস ছিল এপার বাংলায়, কাজেই তাঁদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব না পড়ায় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মতামত গড়ে ওঠেনি। নমঃশূদ্ররা যেমন নির্দল প্রার্থী হয়ে ভোটে কংগ্রেসকে হারিয়েছে। সেখানে পৌণ্ড্ররা বেশিরভাগ কংগ্রেসের সঙ্গে থেকেই ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন এবং মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র পদেও আসীন হয়েছেন। পৌণ্ড্রদের মধ্যে সামাজিক জাগরণ ঘটাতে গেলে তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক জাগরণ ঘটানো বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ, নমঃশূদ্র জাতি দেখেছিলেন কংগ্রেসের কার্যকারী নেতৃত্ব প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাই, তাঁদের বেশিরভাগ নেতৃত্ব কংগ্রেসের সঙ্গে না গিয়ে নির্দল প্রার্থী হয়ে ভোটে জয়লাভ করে। কখনও মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস কে সমর্থন করেছেন। কিন্তু পৌণ্ড্রদের বেশিরভাগ নেতৃত্ব কংগ্রেসের সঙ্গেই থেকেছেন। এর কারণ হিসেবে আমরা

বলতেই পারি যে, নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রদের মধ্যে সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় ছিল না। এছাড়াও উপরিউক্ত যুক্তি গুলির মধ্য দিয়ে নিজের জাতি নিয়ে ভাববার নেতৃত্বেরও অভাব ছিল। আর পৌণ্ড্রদের মধ্যে একটা শ্রেণি জমিদার ও আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকার দরুন হয়তো বা নিজের জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্দল স্বতন্ত্রতা দেখাতে না পারলেও ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে পৌণ্ড্রদের অনেক নেতাই স্বতন্ত্র ও নির্দল প্রার্থী হয়েও নির্বাচিত হয়েছেন। আবার তাঁদের পত্রপত্রিকার মাধ্যমেও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা থেকে বিরত অনেক সময় থাকেনি।

১৯৩৭ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তপশিলিদের খুলনা জেলায় তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকায় একটা সমস্যা দেখা দিল। এই জেলায় নমঃশূদ্ররা বেশি থাকার কারণে দুটি আসন পেলেন, আর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা পেলেন একটি আসন। পতিরাম রায় নির্দল প্রার্থী হয়ে ভোটে জয়লাভ করেন। রাজেন্দ্রনাথ সরকার যেহেতু আগে থেকে কংগ্রেসের দ্বারা খুলনা সদর ডিস্ট্রিক বোর্ডের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন, তাইতো তিনি নিজের জাতির জন্য বিদ্যালয় ও চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করতে পেরেছিলেন, সেহেতু তাঁর মনোনীত তপশিলি জাতির প্রার্থী পতিরাম বাবু নির্বাচনে জয়লাভ করেন। নির্বাচনের আগে রাজেন্দ্রনাথ সরকার কংগ্রেসের সমর্থন কিন্তু পাননি।[১৫৬] আবার অন্যদিকে, হেমচন্দ্র নস্কর তপশিলি জাতির স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁরা সঙ্গে ছিলেন ভবসিন্ধু লস্কর, অনুকুলচন্দ্র দাস সহ কয়েকজন স্বতন্ত্র দলের হয়ে নির্বাচিত হন।[১৫৭] নির্বাচনের সরকার গঠন নিয়ে যখন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে ১১ জনের মন্ত্রীসভা গঠিত হল। মুসলিম পেলেন ৬ মন্ত্রী হিন্দু পেলেন ৫ মন্ত্রী। মুসলিম ৬ জনের মধ্যে ৩ জন কৃষক প্রজা পার্টির ও ৩ জন মুসলিম লীগের। হিন্দু ৫ জনের মধ্যে ৩ জন বর্ণহিন্দু ও ২ তপশিলি হিন্দু ছিলেন।[১৫৮] এই মন্ত্রী সভায় তপশিলিদের মধ্যে থেকে নমঃশূদ্র জাতির মন্ত্রী থাকলেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির কোন মন্ত্রী না থাকায় তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস যোগাযোগ করেন সংখ্যা গরিষ্ঠতার লক্ষ্যে। এই সময় পৌণ্ড্রদের নেতা হেমচন্দ্র নস্কর কংগ্রেসের নেতাদের মাধ্যমে রাজেন্দ্রনাথ সরকার আলোচনা করে পতিরাম রায়কে কংগ্রেসকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করেন। কংগ্রেস দ্বারা আয়োজিত উক্ত সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কিন্তু পতিরাম কংগ্রেসকে এইমর্মে সমর্থন করেননি।[১৫৯] এই সময় দেশের রাজনৈতিক বন্দি মুক্তির নিমিত্তে জাতীয় কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকপ্রজা পার্টির অভিযোগের কারণে হক সাহেবের মন্ত্রীসভা

সমালোচনার মুখে পড়েন। কৃষক প্রজা পার্টির উক্ত মন্ত্রী সভাকে জমিদারী মন্ত্রীসভা বলে আখ্যা দেন। নওসাদ আলিকে হক সাহেব মন্ত্রী সভা থেকে বাদ দিয়ে দেন। কাজেই এইসময় ১০ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৬ জন মন্ত্রী ছিলেন জমিদার। অবশেষে ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশনে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কৃষক প্রজা পার্টি অনাস্থা প্রস্তাব আনলে কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন।[১৬০] কিন্তু দেখা গেছে যে, উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে মুসলিম জনমত বেশিরভাগ হকের মন্ত্রীসভার দিকে চলে যায়। কাজে বাংলায় মুসলিম লীগ আগের থেকে আরও বেশি শক্তিশালী হয় বলেই আমরা মনে করতে পারি।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলতেই পারি যে, উক্ত পরিস্থিতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় তথা তপশিলি জাতির বেশিরভাগ নেতাদের কংগ্রেসের সঙ্গে অনেকটা সখ্যতা তৈরি হয়েছিল। এই সখ্যতা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায় যখন "১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ হক সাহেবের প্রস্তাবে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ায় মুসলমানদের চিন্তাধারাও নতুনদিকে আকৃষ্ট হয়"।[১৬১] কাজেই একদিকে যেমন বর্ণহিন্দুরা হকের উপর ভরসা রাখতে পারলেন না, তেমনি আবার বেশকিছু সংখ্যক পৌণ্ড্র তথা তপশিলি নেতারাও ভরসা না রাখতে পেরে কংগ্রেস স্বতন্ত্র দলের দিকে আগের চেয়ে অধিকভাবে যুক্ত হন।

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে হক সাহেবের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাওয়ায় পরে যে নতুন মন্ত্রীসভা তিনি গঠন করেন সেখানে তিনি তপশিলিদের থেকে একজন মন্ত্রী করেন। তিনি হলেন রাজবংশী নেতা উপেন্দ্রনাথ বর্মন। তপশিলি নেতাদের চাপ ছিল হক মন্ত্রীসভায় আরেকজন মন্ত্রী করার। অপর দিকে এই সময় হেমচন্দ্র নস্কর কলিকাতার মেয়র হিসাবে ২৯ এপ্রিল ১৯৪১ সালে কংগ্রেসের সমর্থনে নির্বাচিত হন এবং তিনি ২৯ এপ্রিল ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। আর এই দায়িত্ব পালনের সাথে সাথেই জাতীয় রাজনীতি তথা তপশিলিদের কাছে সুপরিচিত হয়েছেন। সারা বাংলার তপসিলি নেতাদের চাপে পরেই নতুন মন্ত্রীসভায় আরেকজন তপশিলি জাতিকে মন্ত্রী করেন হক ও শ্যামা শাসিত মন্ত্রীসভা।[১৬২] হেমচন্দ্র নস্কর কলকাতা পৌরসভার মেয়রের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তার থেকে সরে আসেন নি। তাইতো তিনি নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলার তপশিলি জাতিদের ঐক্যবদ্ধ করে রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করেন।

বাংলার রাজনীতিতে ১৯৪২-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সহায়ক মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠে 'প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা'। এই মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক, মন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ বাহাদুর, সন্তোষকুমার বসু, আবদুল করিম, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসেম আলি, শামসুদ্দিন আহমদ, উপেন্দ্রনাথ বর্মন, হেমচন্দ্র নস্কর ও খান বাহাদুর জালালউদ্দিন। শরৎচন্দ্র বসুর উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথা থাকলেও ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। কাজেই ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদের দায়িত্বে এসে গেল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপন করা।[১৬৩] উক্ত আলোচনা থেকেই আমরা পৌণ্ড্রনেতা হেমচন্দ্র নস্করের জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক কৌশলের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারলাম। যদিও ১৯৩৭ সালের মন্ত্রীসভায় হেমচন্দ্র স্থান পাননি। নতুন মন্ত্রীসভায় সুযোগ পেয়েই তিনি তপশিলিদের জন্যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য তুলে ধরবো, তাঁর মতে "1942 On 12 March the supporters of Progressive Coalition Ministry reorganised themselves and formed a new parliamentary party, called the Progressive Scheduled Caste Assembly Party, with Hem Chandra Naskar as the leader"[১৬৪] হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় রাজবংশী পৌণ্ড্র মন্ত্রী রেখে নমঃশূদ্র নেতাদের বার্তা দেওয়া হয় যে তারা হয় কৃষক প্রজা পার্টি না হলে কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে হবে। মুলসিম লীগের সঙ্গে থাকলে হক মন্ত্রী সভায় স্থান পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না বলে শ্যামা হক মন্ত্রীসভা পরোক্ষ ভাবে নমঃশূদ্র নেতাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই মনে করা যেতে পারে যে, শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপন করা, না কি নিম্নবর্ণের যে জাতি রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হবে তাদের মন্ত্রীসভায় স্থান না দিয়ে অবদমিত করে রাখা। ভারতের জাতিভিত্তিক রাজনীতিতে নমঃশূদ্রদের এই সময় ক্ষমতায়ন থেকে সুকৌশলে সরিয়ে রাখা চেষ্টা করেন বলে মনে করা যেতে পারে।

১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মাসে ফজলুল হকের সঙ্গে নীতিগত ও মতপার্থক্য কারণে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কাজেই বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আবার জটিলতা তৈরি হয়। এই সময় ব্রিটিশ আমলা ও গভর্নর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনের সব ধরনের প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করে মুসলিম লীগকে সরকার গঠনের সব ধরনের সহায়তা করেন।[১৬৫] বলা যেতে পারে যে হকের মন্ত্রীসভার উপর ব্রিটিশ শক্তির চাপটা বেশ বড়

আকার ধারণ করে। আমলাদের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর রসদ সংগ্রহ করার নামে বাংলার খাদ্যভান্ডার শূন্য করে দুর্ভিক্ষের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। নোয়াখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচার ও সাধারণ মানুষের উপর নানাবিধ অত্যাচার দেখে হক সাহেব গভর্নরকে চিঠি লেখেন, কিন্তু উত্তর না পেয়ে তিনি বিধানসভায় জানান যে, গভর্নর আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য মন্ত্রীসভায় চাপ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালাচ্ছেন।[১৬৬] এই সুযোগে তাজিমুদ্দিন খাঁ ইউরোপীয় সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হকের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন কিরণশংকর রায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য সদস্যারা। এই অনাস্থা প্রস্তাব ৮৬-১১৫ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলের ভাঙন শুরু হয়। এই সময় হকের মন্ত্রীসভা থেকে বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলিম সদস্য তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার হ্যামিলটন ছাঁটাই প্রস্তাব আনলেও ১০ ভোটে ব্যবধানের হেরে যায়। তবুও বিধানসভায় ফজলুল হকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকেই যায়। ২৮ মার্চ হক গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের পদত্যাগপত্র দিতে বাধ্য হন। ২৪ এপ্রিল ১৯৪৩ সালে নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। সদিও এই মন্ত্রীসভায় সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের কথা থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। কাজেই কিছু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী গঠিত না হওয়ার জন্য ক্লাইভ স্ট্রিট ও গভর্নরের ষড়যন্ত্রকেই দায়ী করেন।[১৬৭] তবে বলাবাহুল্য যে নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভায় তপশিলি জাতির তিনজন মন্ত্রী ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রেমহরি বর্মা ও পুলিন বিহারী মল্লিক।[১৬৮] এই মন্ত্রীসভায় হেমচন্দ্র তথা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে কাউকেও নেওয়া হয়নি। কাজেই হেমচন্দ্র নস্কর, রাজেন্দ্রনাথ সরকার ও পতিরাম রায়ের নেতৃত্বে পৌণ্ড্র স্বজাতি দলের দিকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে কংগ্রেসের সমর্থনের দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভা ১৯৪৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার পর অধ্যক্ষ নৌশের আলি তাঁর বিখ্যাত রুলিং দিয়ে মন্ত্রীসভাকে অবৈধ ঘোষণা করেন। কাজেই বাংলার শাসন ভার চলে যায় গভর্নরের হাতে। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে সুরাবর্দী মন্ত্রীসভা গঠন করেন ২৮ এপ্রিল। মন্ত্রীসভাটি দেশভাগের পর্যন্ত বাংলায় কার্যকর থাকে।[১৬৯] এই সময় বাংলায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটা নতুন দিগন্তের পথের দিকে চলে যায়। জাতীয় রাজনীতি তথা দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য রাজেন্দ্রনাথ সরকার

ও পতিরাম রায় ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে হেমচন্দ্র নস্করের পরামর্শে কংগ্রেসে যোগদান করেন।[১৭০] ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখার পরে হেমচন্দ্র নস্কর, রাজেন্দ্রনাথ সরকার তথা পৌণ্ড্র নেতাদের বেশিরভাগ নেতাই কংগ্রেসে চলে আসেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত-পাকিস্তান দুটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেলে, খুলনা জেলা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ১৮ আগস্ট ১৯৪৭ সালে আবার খুলনা জেলা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কাজেই পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র জাতির বহুসংখ্যক মানুষ পাকিস্তানে থেকে গেলেন।[১৭১] তবে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের বলে রাখা প্রয়োজন যে ছয় ও সাতের দশকে খুলনা জেলার তথা পূর্বপাকিস্তানের তপশিলি হিন্দু তথা উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হন। তাঁরা এদেশে বিভিন্ন রাজ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু সংখ্যাগুরু তপশিলি উদবাস্তরা অবিভক্ত চব্বিশ পরগনানদীয়াতে বসতি গড়ে তোলেন।

স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে ১৯৪৭-২০১৬ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ

যাই হোক দেশ ভাগের পরে ১৯৪৭ সালের ২১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৮৩ তে। এর কারণ হল, সুরাবর্দী সহ মুসলিম লীগের প্রায় সব নেতাই পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। এদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতা কিরণশংকর রায়ও চলে যান, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি আবার চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। যাঁরা থেকে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা হলেন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, নিশাপতি মাঝি, হেমচন্দ্র নস্কর। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও হেমচন্দ্র নস্কর মন্ত্রিত্ব পান।[১৭২] ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। রায়ের মন্ত্রীসভাতেও হেমচন্দ্র নস্কর মন্ত্রিত্ব পান। তবে ১৯৪৭-১৯৫১ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ১৯৫০ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আসার কারণেই খাদ্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যার ফলেই কংগ্রেসের মধ্যে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্যেই প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস ত্যাগ করেন।[১৭৩] ফলে এই সময় থেকেই কমিউনিস্ট পাটির সক্রিয়তা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেশ ছড়িয়ে পরে। আমরা পরের আলোচনায় দেখতে পাবো যে পৌণ্ড্র

ও নমঃশূদ্রদের নামি নেতারা পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করব জয়া চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য, “স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে দেশভাগের রাজনীতি যে অনেকাংশেই জাতিকেন্দ্রিক ছিল তা ইতিমধ্যেই খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত”।[১৭৪] কাজেই আমরা বলতে পারি যে, বাংলা ভাগের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সমস্ত মতামতগুলি উঠেছিল সেগুলি জাতি-বর্ণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েই প্রচারিত হয়।

দেশভাগের ফলেই যে, উদ্বাস্তু সমস্যাও জাতি বর্ণের মানদন্ডের দ্বারায় নিয়ন্ত্রিত হয় বলেও মনে করা যেতে পারে। পূর্বপাকিস্তান থকে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে বর্ণ হিন্দুরা যে ধরনের ব্যবহার পান, তার তুলনায় নিম্নবর্ণের নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয় তথা অন্যান্য দলিত জাতিরা পরে আসার কারণেই উদ্বাস্তু হওয়া সত্ত্বেও এদের অবস্থা ছিল বেশ খারাপ। ফলে উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনের ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য ব্যাপকভাবে অনুধাবন হয়েছে। সেই বৈষম্য-এর সামনে দাঁড়িয়ে নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষেরা তাদের নূন্যতম জীবন ও জীবিকার তাগিদে কঠোর পরিশ্রম করেই সংঘটিত হয়েছে, এই কারণেই তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলে আমরা ধরে নিতে পারি। নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয় এবং নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তু বা রিফিউজি আন্দোলনের নিজস্ব ধারা।[১৭৫] কাজেই আমরা বলতে পারি যে, তাঁদের মধ্যে সেই সময়ের সেই অভিজ্ঞতা বা ঘটনাপ্রবাহের পরিস্থিতি গল্প কবিতা আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ ও নাটকের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

নমঃশূদ্রজাতি মূলত দেশ ভাগের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে নদীয়া ও অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় বসতি স্থাপন করেছে। বর্তমানে এদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে উত্তর চব্বিশ পগরণা ও ইয়াতে। আবার পৌন্ড্রক্ষত্রিয়রা মূলত পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসী ও কিছু সংখ্যক দেশভাগের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় বসতি স্থাপন করেছে এবং বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতেই এদের সংখ্যাধিক্য।

এবারে আমরা স্বাধীন ভারতের প্রথম লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনে পৌণ্ড্রদের ভুমিকা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব। “১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার জনপ্রতিনিধি

নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়”।[১৭৬] এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতিভিত্তিক রাজনীতির প্রাধান্য তেমন দেখা যায় না। যেহেতু দেশভাগের ফলে বাংলার তপশিলিদের বিরাট একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ায়, সেহেতু পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত তপসিলিরা জাতিভিত্তিক রাজনীতির স্বতন্ত্রতার ভূমিকা ধরে রাখতে পারেন নি। আরও বলা যেতে পারে যে **১৯৫২-১৯৫৭** সালের ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভায় ৭ জন নতুন ও অনভিজ্ঞ মন্ত্রী থাকার কারণে কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বিধানসভা পরিচালিত হত। আর কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ ছিল শ্রেণী চেতনার। কাজেই তারা জাতিভিত্তিক চেতনাকে প্রাধান্য না দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। কংগ্রেস তো দেশ স্বাধীন হয়ার আগে থেকেই সমস্ত তপশিলি নেতাদের নিজেদের পক্ষে রাখার চেষ্টা করেছেন। ডাঃ রায় ও বসুর মিলিত চেষ্টায় এই সময় তপশিলি নেতারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। একা হেমচন্দ্র নস্করের পক্ষে তপশিলিদের রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষ নিয়ে ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভায় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন। তাই, মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর মন্তব্য করেন, “রায়মন্ত্রীসভার সদস্যরা ছিলেন ‘কচ্ছপ মন্ত্রী’- রাইটার্স বিল্ডিং-এ এসে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের কচ্ছপের মত উল্টে দিতেন। সারাদিন মন্ত্রীরা শূন্যে হাত-পা ছুঁড়তেন, দিনশেষে মুক্তি পেতেন”।[১৭৭]

পৌণ্ড্রদের মধ্যে থেকে যে সকল ব্যক্তিরা **১৯৫২** সালের লোকসভা ও বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের নাম এবং দলের নাম জেলার নাম নিম্নে ২.১ ও ২.২ সারণির তুলে মাধ্যমে ধরা হল।[১৭৮]

সারণি ২.১: ১৯৫২ সালের লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জনপ্রতিনিধি

নাম	দলের নাম	কেন্দ্রের নাম	জেলা নাম
বসন্তকুমার দাস	কংগ্রেস	কোনটাই	মেদিনীপুর
পতিরাম রায়	কংগ্রেস	বসিরহাট	২৪ পরগনা
পূর্ণেন্দুশেখর নস্কর	কংগ্রেস	ডায়মন্ডহারবার	২৪ পরগনা

সারণি ২.২: ১৯৫২ সালের বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জনপ্রতিনিধি

নাম	দলের নাম	কেন্দ্রের নাম	জেলার নাম
কৌস্তভকান্তি করণ	কংগেস	খেজুরী	মেদিনীপুর
হেমচন্দ্র নস্কর	কংগ্রেস	ভাঙ্গর	২৪ পরগনা
গঙ্গাধর নস্কর	কংগ্রেস	সোনারপুর	২৪ পরগনা
অর্দ্ধেশেখর নস্কর	কংগ্রেস	মগরাহাট	২৪ পরগনা
প্রাণকৃষ্ণ কামার	জনসঙ্ঘ	কুলপী	২৪ পরগনা
জ্যোতিশচন্দ্র রায়সরদার	কংগ্রেস	হাড়োয়া	২৪ পরগনা
জ্যোতিশচন্দ্র রায়	কমিউনিস্ট	ফলতা	২৪ পরগনা
রাজকৃষ্ণ মণ্ডল	কংগ্রেস	হাসনাবাদ	২৪ পরগনা
দীনতারণ মণি	কমিউনিস্ট	জয়নগর	২৪ পরগনা
বৃন্দাবন গায়েন	কংগ্রেস	মথুরাপুর	২৪ পরগনা
বসন্তকুমার মাল	কংগ্রেস	বিষ্ণুপুর	২৪ পরগনা

২.১ ও ২.২, সারণী থেকে আমরা দেখতে পেলাম পৌণ্ড্রদের লোকসভার তিন জন সাংসদই কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হন। আর বিধানসভায় **১১** জন প্রার্থীর মধ্যে ৮ জন কংগ্রেস ও ২ জন কমিউনিস্ট ও **১** জন জনসঙ্ঘ এর টিকিটে নির্বাচিত হন। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, "All India Scheduled Caste Federation” (AISCF) থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেননি। পৌণ্ড্র নেতারা জাতিভিত্তিক রাজনীতি থেকে সরে এসে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও জনসঙ্ঘ পার্টিকে সমর্থন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে তপশিলি জাতির জন্য ৩৯ টি আসন সংরক্ষণ ছিল তার মধ্যে ২৯ কংগ্রেস মনোনীত হন আর বাকি সংরক্ষণ আসন থেকে অন্যান্য দলের প্রার্থী হয়ে মনোনীত হন। যদিও আম্বেদকর সাহেব সব সংরক্ষিত আসনেই প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন, তবে পশ্চিমবঙ্গে তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।[১৭৯] অন্যদিকে উক্ত নির্বাচনে নমঃশূদ্রদের বেশির ভাগ নেতাই নাগরিকত্বের কারণে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে পারেননি। **১৯৫২** সালের নির্বাচনের প্রতিযোগিতা থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অংশগ্রহণ থেকে বাতিল হওয়া সম্পর্কে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, “So the only alternative Dalit voice in this election was that of the independent candidates, like Jogendranath Mandal who contested in the Beniyapukur-Ballygunge reserved seat in

Calcutta, after the Returning Officer dismissed an objection about his citizenship status".[১৮০] উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, **১৯৫২-১৯৫৭** সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নমঃশূদ্রদের অপেক্ষা পৌণ্ড্ররা অধিক সংখ্যায় প্রতিযোগিতা করতে পেরেছেন। এবং পৌণ্ড্রদের থেকে মন্ত্রী হয়েও তাঁরা নমঃশূদ্রদের থেকে রাজনৈতিক ভাবে এগিয়েও ছিলেন।

১৯৫৭-১৯৬২ সালের ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভায় হেমচন্দ্র নস্কর স্থান পান। আর উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন নমঃশূদ্র জাতির কংগ্রেস দলের আশুতোষ মল্লিক। কাজেই নমঃশূদ্র পৌণ্ড্রদের মধ্যে থেকে ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভায় কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েই মহানন্দ হালদার ও পি.আর. ঠাকুর নির্বাচিত হলেও তাঁরা কিন্তু বিধানসভায় তপশিলি উদ্বাস্তুদের হয়ে যুক্তি তর্কে অধিকভাবে নিয়োজিত থাকেন। হেমচন্দ্র নস্কর খুলনা থেকে আসা পৌণ্ড্র উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দিকেও অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্বিতীয় নির্বাচনে কংগ্রেস মোট আসনের ৬০ ভাগ আসন পান। পৌণ্ড্রদের থেকে কংগ্রেস প্রায় ৮০ ভাগ আসন পান। নমঃশূদ্র ক্ষেত্রেও কংগ্রেস এই সময় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। তার কারণ হলে সরকারি দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে উদ্বাস্তু নমঃশূদ্ররা নাগরিকত্ব ও নানাবিধ সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আসায় তাঁরাও অধিকভাবে কংগ্রেসের সমর্থনের দিকেই এগিয়ে যায়। গ্রাম অঞ্চলে জাতিভিত্তিক শক্তির উপরেই কংগ্রেস তার শক্তি ধরে রাখেন। পক্ষান্তরে সি পি আই দল উদ্বাস্তু ও শ্রমিক প্রধান অঞ্চল থেকে আসন পায়। কমিউনিস্ট দল ৪৬ আসনের মধ্যে সি পি আই ২৮ টি আসন পান কলকাতা থেকে ১০ টি হাওড়া থেকে ৪ টি ২৪ পরগনাথেকে ১৪ টি।[১৮১] এই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পাটির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যেমন খাদ্য আন্দোলন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পাঠানো, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পদত্যাগ, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক, জমিদার প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কার আইনের প্রয়োগে ব্যর্থতা, বর্গাদার উচ্ছেদ, আসাম দাঙ্গা, উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক এবং ভারত-চীন সীমানা বিরোধ নিয়েও সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে মতভেদ নিয়েই ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভা ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে।[১৮২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের সকলের প্রায় আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। কাজেই তাঁরা বিধানসভায় অনেক বেশি সময় দিয়ে নিজেদের দাবিদাওয়া পেশ করে জাতির অধিকার অর্জনে নিয়োজিত থাকতে পারতেন। কিন্তু সংরক্ষিত আসন

থেকে যে দুজন তপশিলি সদস্য নিঃস্ব পরিবার থেকে এসেছিলেন তাঁরা হলেন, জমিদার মাঝি তিনি কমিউনিস্ট সদস্য অন্যজন নিশাপতি মাঝি কংগ্রেসের সদস্য। এরা কেউই পৌন্ড্র বা নমঃশূদ্র জাতির মানুষ না হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ করে নিশাপতি মাঝি তপসিলি জাতির ও অনুন্নত জাতির লোকদের সংগঠিত করার মধ্য দিয়েই সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর উদ্যোগে বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজ এবং বোলপুরের বাঁধগড়ায় সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়।[১৮৩] এর প্রভাব পরে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু তপশিলিদের মধ্যেও। বিশেষ করে পৌণ্ড্ররা সমবায় সমিতি ও স্কুল কলেজের কাজে নিযুক্ত হন।

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু পাঠানোর সঙ্গে পৌন্ড্রক্ষত্রিয় এবং বিশেষ করে নমঃশূদ্রদের রাজনীতির স্বার্থ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। ৫ জুলাই ১৯৫৮ সালে কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহার দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পাঠানোর প্রস্তাব পেশ করলে কংগ্রেসের বেশিরভাগ সদস্য সমর্থন করলেও বিরোধীরা সমর্থন করেন না। ফলে ১৯৬০ সালে ডাঃ রায় পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কয়েকজন মন্ত্রীকে দণ্ডকারণ্যে পাঠান। তারা ঘুরে এসে রায় কে জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের যে পরিকাঠামো তৈরি করেছেন তা মোটেই বসবাস যোগ্য নয়। কাজেই ডাঃ রায় ও প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে একটি আলোচনার মাধ্যমে সুকুমার সেন কে চেয়ারম্যান করে দণ্ডকারণ্যে ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পুনর্গঠন করা হয়। এই সময় প্রফুল্লচন্দ্র সেন উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেন যারা স্বেচ্ছায় যাবেন তাদের জন্য সবধরনের ব্যবস্থা করা হবে। যারা যাবেন না তাদের ছয় মাসের ক্যাশ ডোল নিয়ে ক্যাম্পে চলে যেতে হবে। কমিউনিস্ট প্রভাবিত সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের প্রবল আন্দোলনের চাপে পরে ডাঃ রায় সরকার ঘোষণা করেন, কোন শরণার্থীকেই বাংলার বাইরে পাঠানো হবে না ও ক্যাশ ডোল বন্ধ করা হবে না।[১৮৪] যাই হোক এই সময় উদ্বাস্তুদের সাময়িক ভাবে জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো থেকে বিরত থাকলেও পরবর্তী সময়ে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু অনেকটা বাধ্য হয়েই দণ্ডকারণ্যে চলে যান। এই সময় থেকে পৌন্ড্রক্ষত্রিয় নেতাদের মধ্যে অনেকেই বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে নমঃশূদ্রদের সংখ্যাটা কম ছিল এই সময়। যেহেতু পৌন্ড্রদের বেশির ভাগ মানুষ আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতেন কাজেই তাদের পক্ষে রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করাটা অনেকটা সহজ ছিল। যেটা নমঃশূদ্ররা করতে ততটা সাহস পেতেন না। ১৯৬২-১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পৌন্ড্রদের মধ্যে থেকে বেশ সংখ্যক সদস্য বামপন্থী দলের হয়ে নির্বাচিত হন। কিন্তু আবার

দেখা যায় নমঃশূদ্রদের নির্বাচিত সদস্যরা কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হয়েও মন্ত্রীও হন। ১লা জুলাই ১৯৬২ সালে ডাঃ রায়ের মৃত্যু হয়। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পরে কংগ্রেসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়াকে কেন্দ্র করে অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হন।[১৮৫] এই মন্ত্রীসভায় পৌণ্ড্র জাতির মন্ত্রীদের তেমন কোন বড় ভূমিকা পাওয়া যায় না, নিজ জাতির উন্নয়ন কল্পে। তবে প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করব যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা পুর্নেন্দুশেখর নস্কর নেহরুর মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীত্ব পান। Deputy Minister in the Ministry of Rehabilitation (From 2/4/1958 to 10/04/1962)।[১৮৬] আবার ১৯৬২ সালের লোকসভা নির্বাচনে পুর্নেন্দুশেখর নস্কর মথুরাপুর কেন্দ্র থেকে থেকে কংগ্রেসের টিকিটে পুনরায় নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিমন্ত্রী হন। তাঁর ১৯৬২-১৯৬৭ সালের মধ্যে যে সমস্ত মন্ত্রীত্বের দায়িত্বে ছিলেন। সেগুলো হল, ক. Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (From 16/4/1958 to 15/11/1962), খ. Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing (From 15/11/1962 to 05/12/1962), গ. Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (From 05/12/1962 to 16/04/1964), ঘ. Deputy Minister in the Ministry of Rehabilitation (From 16/04/1964 to 27/05/1964), ঙ. Deputy Minister in the Ministry of Health (From 01/10/1964 to 11/01/1966, again from 11/01/1966 to 24/01/1966), চ. Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (From 24/01/1966 to 13/03/1967)।[১৮৭] উক্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, পুর্নেন্দুশেখর নস্কর নয় বছর ধরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন বারংবার মন্ত্রীত্বের পরিবর্তনের কারণেই হয়তো যথেষ্ট ভাবে নিজের জাতির হয়ে কাজ না করার কারণেই ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে সি.পি.আই প্রার্থী কংসারি হালদারের নিকট পরাজিত হন।[১৮৮] পুর্নেন্দুশেখর নস্কর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বাদ পড়েন। কংসারি হালদার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ ছিলেন, এবং তিনি সি.পি.আই পার্টি করার জন্য মন্ত্রী না হতে পারলেও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত লোকসভায় উদ্বাস্তু ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে সওয়াল হয়েছেন। যদিও তিনি ১৯৫৭-১৯৬২ সালে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৮৯] কাজেই কংসারি হালদারের সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী নেতা হিসাবে পৌণ্ড্র জাতির প্রতিনিধি লোকসভায় ভুমিকা রাখতে পেরেছেন বলে মনে করা যেতে পারে।

১৯৬৭ - ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনিতিতে বেশ জটিলতা তৈরি হয়। এই চার বছরে প্রায় চার বার সরকার বদল ঘটে এবং তিন বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার সুযোগ না দিয়ে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।[১৯০] এর ফলেই পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি পায় বলে মনে করা যেতে পারে। আবার যখন ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষ মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করায় পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ফলে রাষ্ট্রপতি শাসনকে কেন্দ্র করেই সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হন। পরের বছর সাধারণ নির্বাচন হলে কংগ্রেস সরকার গড়তে না পারায় বাংলা কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেন। অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হন এবং জ্যোতি বসু উপমুখ্যমন্ত্রী হন। এই মন্ত্রীসভা ভূমি সংস্কার ও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে পরিচালিত হয়।[১৯১] কিন্তু এই সরকারও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। ১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ মাসে অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করায় আবার এক বছরের জন্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা বেশ অবনতি হয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ষষ্ঠ নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের ফল খুব খারাপ হওয়ায়। ৫ জন সদস্য নিয়ে অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু এই সময় কংগ্রেস মুসলিম লীগকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে সরকার গঠন করেন। এই সরকারটিও তিন মাসের মধ্যে ভেঙ্গে যায়। কাজেই তৃতীয় বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।[১৯২] উক্ত পরিস্থিতি থাকার কারণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নিজ জাতির হয়ে বিধানসভায় সওয়াল করা থেকে বিরত থাকেন বলে বিভিন্ন দলিল ও সরকারি তথ্য থেকে জানা যায়। এই সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। কাজেই উদ্বাস্তু নেতারা বিশেষ করে নমঃশূদ্ররা গভীর সংকটের মধ্যে পরে। কাজেই তাদের দাবি দাওয়াও প্রবল আকার ধারণ করে।

মুল্যায়ন

নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনার করার সময় আমরা লক্ষ্য করলাম যে, দলিত জাত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত জাতি দু'টির সামাজিক ইতিহাসটা একনয়। উপরিউক্ত দলিত জাতির দু'টির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর কয়েকটি প্রামাণ্যগ্রন্থ ছাড়া তেমন কোন গন্থ নেই। ফলে দুটি জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে, প্রামাণ্যগ্রন্থের ও তথ্যের প্রয়োজন

হয়। যেমন আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির উক্ত আলোচ্য বিষয়ের গ্রন্থের থেকে নমঃশূদ্র জাতির অধিক সংখ্যক গ্রন্থ আমরা পেয়েছি। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষেরা নিজের মতো করে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন। সেই সমস্ত গ্রন্থ থেকে এবং কিছু সংখ্যক গবেষকের গবেষণা ও আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে যেসকল তত্ত্ব ও তথ্যের সাহার্য্যে আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনায় আমরা নমঃশূদ্রদের সামাজিক পরিচয় পেয়েছি অতিশূদ্র ও চণ্ডাল বা চাঁড়াল হিসাবে, যাদেরকে হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণের বাইরে রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনকালের শেষের দিকে মতুয়া ধর্মগুরু গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে নমঃশূদ্ররা অস্টোলিয়ান খ্রীষ্টান পাদরী মীড সাহেবের সহযোগিতায় ভারতের প্রথম আদমসুমারি থেকেই বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ঐতিহাসিকদের তথ্য তুলে ধরে তারা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন, এই মর্মে যে তারা চণ্ডাল নয় তারা নমঃশূদ্র। প্রথম ও দ্বিতায় আদমসুমারিতে নমঃশূদ্রদের চণ্ডাল হিসেবেই কর্তৃপক্ষ তালিকাতে নথিভুক্ত করেন। নমঃশূদ্রদের নিকট বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় আদমশুমারিতে নমঃশূদ্র হিসেবে নথিভুক্ত করা, তাইতো তারা বিভিন্ন সামাজিক সমিতি এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করে তারা সরকারি দলিলে পাকাপাকি ভাবে নমঃশূদ্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের হিন্দু সমাজ কাঠামোর চতুর্বর্ণের বাইরে রাখা হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আদমশুমারিতে পোদ নামে কর্তৃপক্ষ নথিভুক্ত করেন। যেমন ভাবে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এবং ধর্মীয় ও ঐতিহাসিকদের তথ্য তুলে ধরে চণ্ডাল থেকে নমঃশূদ্র হয়েছিল, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সেই ভাবে পোদ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হওয়ার জন্য আদমশুমারি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এখনও আদমশুমারিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পোদ/পৌণ্ড্র হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। কাজেই বলা যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে একজন গুরুচাঁদ ঠাকুর ন্যায় নেতৃত্ব ছিল না এবং তাদের সামাজিক আন্দোলন নমঃশূদ্রদের মতন সুসংগঠিত ছিল না বা এখনেও গড়ে ওঠেনি। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, পোদ বা পৌণ্ড্রদের কেন আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি হিসেবে তুলে ধরলাম, এর কারণ হল, সাংস্কৃতিয়াজেশন। ভারতের অনেক দলিত জাতিই সরকারিভাবে যে নামে তালিকাভুক্ত থাকেন, সেটা ব্যাবহার না করে সম্মানীয় শব্দ ব্যাবহার করেন । ঠিক 'পোদ' বা পৌণ্ড্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি হিসেবে সমাজে পরিগণিত হয়। তবে 'চণ্ডাল' থেকে 'নমঃশূদ্র'

এবং পোদ থেকে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' হলেও আমাদের সমাজের যে জাতিভেদ কাঠামো তাতে করে উক্ত দলিত জাতির সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে কি না পাবে না তা একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন। সামাজিক সম্মান পেতে হলে জাতিগত একটা পরিচয় লাগেই কিন্তু বর্তমানে সুশিক্ষিত হলে ও সুকর্মের সঙ্গে লিপ্ত থাকলে সম্মান পাওয়া যায়। আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষা ও বিভিন্ন সরকারি তথ্যের থেকে জানতে পেরেছি নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার এবং সরকারি উচ্চ পদে নিযুক্তির সংখ্যাটা বেশ আশা জনক। নমঃশূদ্র জাতির থেকে পৌণ্ড্রজাতির মানুষেরা শিক্ষার শতাংশের হারে এগিয়ে থাকলেও সরকারি উচ্চপদের ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্ররা অনেকটা এগিয়ে।[১৯৩] এর কারণ হল দেশভাগের ফলে কৃষি জমি হারা নমঃশূদ্রজাতির মানুষেরা শিক্ষায় ও চাকরির পাওয়ার ক্ষেত্রে সংরক্ষণকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে চলেছে। কাজেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বেশ সংখ্যক মানুষ প্রশ্ন তোলেন তাঁদের সংরক্ষণের ভাগের সরকারি চাকরির উপর নমঃশূদ্ররা ওপারবাংলা থেকে এসে ভাগ বসিয়েছে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষ মূলত কৃষিজীবী। পৌণ্ড্রদের একটা বড় অংশের মানুষ মাছ ধরার পেশায় যুক্তছিলেন এবং আছেন। এর প্রমাণ আমরা পাই, একসময় 'পৌণ্ড্র' অধ্যুষিত কোলকাতার কিছু জায়গার নাম থেকে যেমন, তপসিয়া, বেলেঘাটা, টেকরা, চিংরীঘাটা ও কৈখালী।[১৯৪] শহরের সম্প্রসারণ হওয়ার মধ্যে দিয়েই কৃষিজীবী পৌণ্ড্রদের সুন্দর বনের দিকে চলে যেতে হয়। ফলে সেখানে গিয়েও তাঁদেরকে কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরার পেশাটাও ধরে রাখতে হয়েছে আর্থিক কারণে। সুন্দর বনের প্রাকৃতিক কারণেই পৌণ্ড্রদের কঠোর পরিশ্রমিক ও সাহসী জাতিতে পরিণত করেছে । আবার অধিকাংশ নমঃশূদ্ররা পূর্ববঙ্গে থাকার সময় থেকে জলাজমিতে বসবাস করার কারণে তাদের কৃষিকাজ ও মাছ ধরার পেশার সঙ্গে যুক্ত করেছে।[১৯৫] এর প্রমাণ পাওয়া যায় নমঃশূদ্রজাতির প্রাক্তন একজন আই.পি.এস (সি.বি.আই. অধিকর্তা) আধিকারিকের বক্তব্যে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্যে তারঁ কাছে গেলে তিনি আমাদের জায়িয়েছেন যে, নমঃশূদ্রজাতির একটা অংশের মানুষ মাছ ধরা ও ব্যবসার জন্যে নৌকার ব্যবহার করতেন ব্যাপক হারে, তাইতো দাঁড় টানতে টানতে তাদের বুকের ছাতি বীরপুষেদের এবং যোদ্ধা শ্রেণীর ন্যায় হয়।[১৯৬] পশচিমঙ্গে এসেও তারা জলা জমিতে বসবাস করার জন্যে কৃষি কাজের সাথে সাথে কিছু সংখ্যক মানুষ মাছের চাষ করেন। এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি সাংবিধানিক সংরক্ষণের মাধ্যমে উক্ত জাতি দুটি শিক্ষা অর্জন করে

সরকারি ও বেসরকারি চাকরি করে আগের থেকে তাঁদের আর্থিক অবস্থার অনেক বড় উন্নতি হয়েছে। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ২০০ জন মানুষের উপর আমরা যে, ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি, তাদের মধ্যে থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন আগের থেকে বর্তমানে তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থান অনেক উন্নতি হয়েছে।[১৯৭]

নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের তুলনামূলক তেমন কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই। ফলে আমরা আমদের ক্ষেত্রসমীক্ষার ও সরকারি দলিল দস্তাবেজের তথ্যকে ব্যবহার করে উপরের আলোচ্য অংশটা প্রস্তুত করেছি। পরাধীন ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে পৌণ্ড্রজাতি এবং নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস মোটামুটি ভাবে একই ধারায় ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু দেশভাগের পরের দুই দশকে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বেশ বেশি ছিল। নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক অবস্থানের ইতিহাস স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে (১৯৪৭-১৯৭১ –এর অংশগ্রহণের পর্যায়) ঠিক কেমন ছিল এবার আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করব। আমরা উপরিউক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিষয় নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলাম নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থ-সামাজিক জীবনে যেসকল সমস্যা ছিল বা আছে তা ঠিক কতটা বেদনাদায়ক বা সুখকর ছিল। এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, ১৯৬৪ সালের জাতিদাঙ্গা এবং ১৯৭০-এর দশকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। কাজেই দেশভাগের কারণে যেমন খুলনার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজনৈতিক নেতা পতিরাম সরকার ও রাজেন্দ্রনাথ সরকারের মতন ব্যক্তিদের ভারতে চলে আসতে হয়েছিল। ঠিক তেমন ভাবে অধিকাংশ নমঃশূদ্র নেতাদের ভারতে চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু ৬০ এবং ৭০ এর দশকে ধারাবাহিক ভাবে নমঃশূদ্র জাতির মানুষদের ভারতে চলে আসতে হয় উদ্বাস্তু হিসেবে। নমঃশূদ্র জাতির অধিকাংশ উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও ২৪ পরগনা তে বসতি স্থাপন করে। উপযুক্ত নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার না থাকার কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্ররা অনেকটা পিছিয়ে যায়।[১৯৮]

কোন জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে বর্তমানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের ব্যাখ্যা করাটা বৈজ্ঞানিক ভাবে তুলনামূলক পর্যালোচনা যথোপযুক্ত। নমঃশূদ্র জাতির আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে হরিচাঁদ গুরুচাঁদের মতুয়া আদর্শ স্ববিশেষ

ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় লক্ষ করেছি যে, মতুয়াদের মধ্যে এক শ্রেণীর গুরুদেবের আবির্ভাব হয়েছে, এরা শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে তাঁদের কাছ থেকে প্রণামি গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বর্তমানের মতুয়াদের সংঘজনী কে প্রশ্ন করা হলে তিনি আমাদের জানান যে, উক্ত শোষক ধর্ম গুরুর প্রাধান্যের কথা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেননি। কাজেই এরা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের সমাজসেবার ধর্মীয় আদর্শ বুঝতে পারেন নি। তিনি বলেন মতুয়া ধর্মের আদর্শ শুধু ডাংকা বাজানো বা সাধুসেবা দেওয়া নয়। সমাজের পতিত মানুষকে সামাজিক ও আর্থিক ভাবে উন্নত করার লক্ষ্যে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই কাজ করাকেই মতুয়া ধর্মের মূল আদর্শ। এখন কিছু ভেকধারি সাধুদের আচরণের ফলে মতুয়া আদর্শ অবনমিত হচ্ছে। সংঘজনী আরও, বলেন শাশুরীমা ঠাকরাণী জলপড়া ও চালপড়া এবং তুকতাক দিয়ে ভক্তদের নিকট থেকে প্রণামী নিতেন। আমি এই নীতিতে বিশ্বাসী নই। কারণ হল আমিও তো শোষক ধর্মগুরুদের ন্যায় হয়ে যাবো যা কিনা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর কঠোর ভাবে প্রতিবাদ করতেন, মতুয়াদের মধ্যে উক্ত ধর্মীয় গুরুদের কারণেই মতুয়া সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে কাজেই সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পরছে। তিনি বলেন, আমি বৌদ্ধকে মানি, রাজা রামমোহন রায়কে ও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। যাঁরাই সমাজ সংস্কারের কাজ করবেন আমি তাঁদের প্রদ্ধা করি।[১৯৯] ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় দেখতে পেয়েছি নমঃশূদ্রদের একটা অংশ পুরোহিত তন্ত্রকে না মেনে নিজের আদর্শের মধ্যে দিয়ে পিতা মাতার শ্রাদ্ধর ক্রিয়াকর্ম করে এবং বিবাহের ক্ষেত্রেও নিজের মতন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নৈহাটির একজন মতুয়া গবেষক, উক্ত সকল ক্রিয়াকর্ম গুলো মতুয়া মতে করে থাকেন। কিন্তু আমরা এও দেখেছি যে, অধিকাংশ নমঃশূদ্রই হিন্দু রীতি নীতি ও পুরোহিত তন্ত্র মেনে পিতা মাতা শ্রাদ্ধ থেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং বিভিন্ন পুজো পার্বন সবই প্রচলিত সংস্কার মেনেই করেন।[২০০] তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী নমঃশূদ্র জাতিতে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ হয়েছেন। কাজেই বলা যায় যে, নমঃশূদ্রদের মধ্যে যেমন রাজনৈতিক মতপার্থক্যের মানুষ আছেন আবার তাদের মধ্যে ধর্মীয় মতের পার্থক্যের মানুষ ও আছেন। ফলে আমরা যদি মনে করি নমঃশূদ্রদের মধ্যে কোন ধর্মীয় পার্থক্য নেয় তা হলে আমাদের ভুল হবে।

আমরা ক্ষে সমীক্ষায় গিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেখতে পেয়েছি যে, এদের একটা অংশের মানুষ চরম হিন্দু ধর্মের পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধী তারা

নিজেদের পিতা মাতার শ্রাদ্ধ এবং বিবাহ বন্ধন ও পুজো পার্বন পালন করেন নিজেদের মতন করে। যেমন যেমন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসংঘের কয়েকজন সদস্য ও কয়েকজন অধ্যাপক, স্কুল শিক্ষক এবং আরও অনেকে আছেন এই মতের মানুষ। এছাড়াও এদের মধ্যে একটা অংশের মানুষ বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী। তবে নমঃশূদ্রদের মতন এদের অধিকাংশ মানুষ হিন্দু রীতি নীতি ও পুরোহিত দিয়েই সামাজিক ক্রিয়াকর্ম পুজো পার্বন করে। নমঃশূদ্রদের মতন মতো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যেও ধর্মীয় মতপার্থক্য বিদ্যমান এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্যও বিদ্যমান।

নির্দেশিকা

১) S.C. Dube, INDIAN SOCIETY, National Book Trust, New Delhi, (reprints) 2011, পৃঃ ৭।

২) S.C. Dube, INDIAN SOCIETY, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৩) দেবী চ্যাটার্জী , ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে জাতি-বর্ণ সমীকরণ, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ ১৩।

৪) দেবী চ্যাটার্জী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

৫) সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'আর্যরা; সংহিতাযুগ', প্রবন্ধ সংগ্রহ ১, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ১৫।

৬) A.L. Basham, The wonder that was India, Rupa, New Delhi, 1994, পৃঃ ২১৩-২২।

৭) মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মনুসংহিতা' সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, (অনুবাদ ও সম্পাদনা), বঙ্গাব্দ, ১৪১০, পৃঃ ১১।

৮) বসন্ত কুমার মণ্ডল, সেদিনের কথা, প্রথম খণ্ড, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ণ পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৮৮।

৯) বসন্ত কুমার মণ্ডল, সেদিনের কথা, প্রথম খণ্ড, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ণ পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৮৯।

১০) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাস' (অখন্ড সংকরণ, দ্বিতীয় ভাগ), দে,জ পাবলিকাশন, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ৯৩।

১১) লীনা চাকী ,বাউলের চরণদাসী ,গাঙচিল সংস্করণ ,কলকাতা ,২০০৯ , পৃঃ ১৩।

১২) বসন্ত কুমার মণ্ডল, সেদিনের কথা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

১৩) লীনা চাকী, বাউলের চরণদাসী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

১৪) G.S. Ghurye, Caste and Race in India, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, LTD, London, 1932, পৃঃ ১৪৯।

১৫) G.S. Ghurye, Caste and Race in India, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৫০।

১৬) Bernad Cohns, "The British Colonialism and its Froms of Knowledge in India" Princeton University Press, London, 1996, pp. 20-28.

১৭) Bernad Cohns, "An Anthropologist the Historians and Other Essays, Oxford University Press, New Delhi, 1987, pp. 227-32.

১৮) J.H. Hutton, 'Caste in India, Oxford University Press, (3rd Edition), Bombay, 1961, pp. 27-32.

১৯) G.S. Ghurye, Caste and Race in India, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১-৬৩।

২০) দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম খণ্ড, বৃহৎ বঙ্গ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ১০।

২১) H.H. Risley. The Tribes & Castes of Bengal, 1st Edition: Calcutta 1891 (Bengal Secretariat Press) Reprint: Culcutta 1998 Vol. II, Selling Agents, Firma KLM Private Limited, Reprint, Culcutta, 1998, পৃঃ ১৮৮।

২২) J.H. Hutton, 'Caste in India, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১।

২৩) রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাসঃ প্রাচীন যুগ (৯ম সংস্করণ) কলকাতা জেনারেল, ২০০৫, পৃঃ ১৪।

২৪) নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব (৪র্থ সংস্করণ) দেজ পাবলিশিং , কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ২৭-২৮।

২৫) নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্, পৃঃ ২৮-৩৭।

২৬) নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

২৭) মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

২৮) শ্রী প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, আত্ম চরিত বা পূর্ব স্মৃতি, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯৯৫, পৃঃ ১-২।

২৯) শেখর বন্দ্যপাধ্যায়, "উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতিঃ বাংলার নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭, "জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লি, ১৯৯৮, পৃঃ ১২৮।

৩০) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ২৭।

৩১) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, ফরিদপুর, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃঃ ১২।

৩২) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, Second Edition (Whit a new Postscript), Oxford University press, New Delhi, 2011, পৃঃ ৩৫।

৩৩) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, প্রাগুক্ত ,পৃঃ ৩৫৩৬-।

৩৪) ৩৪। ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

৩৫) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

৩৬) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

৩৭) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০।

৩৮) তারকচন্দ্র সরকার, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

৩৯) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৭।

৪০) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগক্ত, পৃঃ ২৮-২৯।

৪১) মহানন্দ হালদার, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা , (ষষ্ঠ সংস্করণ) ২০১২, পৃঃ ৩৬৪।

৪২) প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, আত্মচরিত বা পূর্ব স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

৪৩) Census of India 1911, Bengal, Report, chpter- XI.

৪৪) Rajni Kothari, (Edited) Caste in Indian Politics, Orient Black Swan, Hyderabad, 2008 (Reprinted) পৃঃ ২৩।

৪৫) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৬।

৪৬) Sekhar Bandyopadhyay, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫-৫৬।

৪৭) মহানন্দ হালদার, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৪-৫৫।

৪৮) সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস, মতুয়া ধর্ম এক ধর্ম বিপ্লব, কথা বিশ্বাস, মৌসুমী বিশ্বাস, ঝুমা বিশ্বাস, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ৩০।

৪৯) সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস, মতুয়া ধর্ম এক ধর্ম বিপ্লব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।

৫০) প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, আত্ম চরিত বা পূর্ব স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

৫১) বিরাট বৈরাগ্য, 'মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা' মতুয়া গবেষণা পরিষদ, হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা , ১৯৯৯, পৃঃ ৭১২।

৫২) প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, আত্ম চরিত বা পূর্ব স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬।

৫৩) মহানন্দ হালদার, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫১।

৫৪) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭২।

৫৫) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭২।

৫৬) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৪।

৫৭) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, প্রাগক্ত, পৃঃ ৮৪।

৫৮) দৈনিক স্টেটসম্যান, কলকাতা, ২৩.০২.২০০৯।

৫৯) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, প্রাগক্ত, পৃঃ ৮৬।

৬০) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, প্রাগক্ত, পৃঃ ৮৭।

৬১) Sekhar Bandyopadhyay, CastePolitics and The Raj, K.L. Sharma (ed) Rawat Publication, New ,1937-1872 Delhi, 1994, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

৬২) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯-১০০।

৬৩) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।

৬৪) ড. বিরাট বৈরাগ্য, মতুয়া সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও মতুয়া স্মরণিকার ইতিহাস, শ্রী মনোতোষ বৈরাগ্য ও শ্রী সায়ন্তন বৈরাগ্য, নৈহাটি উত্তর ২৪ পরগনা , পশ্চিমবঙ্গ, ২০২০, পৃঃ ৫৪-৫৫।

৬৫) অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাস, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ, দীপালী বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৯৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ১৬৮।

৬৬) Masuyuki Usada, Pushed Towards the Partition : Jogendranath Mondal and the Constrained Namasudra Movement' in H. Kotani(ed), Casta system, Untouchability and the Depressed, Manohar, New Delhi, 1997, পৃঃ ১৩৬।

৬৭) Masuyuki Usada, Pushed Towards the Partition : Jogendranath Mondal and the Constrained Namasudra Movement' প্রাগক্ত ,পৃঃ ১৩৭।

৬৮) মহানন্দ হালদার, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

৬৯) Masuyuki Usada, Pushed Towards the Partition : Jogendranath Mondal and the Constrained Namasudra Movement' প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮।

৭০) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৫।

৭১) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৫।

৭২) শ্রীমতী কিরণ তালুকদার, জননায়ক মুকুন্দ বিহারী মল্লিক : জীবন ও সাধনা, দেবদাস প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ৬৬।

৭৩) অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাস, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ, দীপালী বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৯৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ১৫১।

৭৪) শ্রীমতী কিরণ তালুকদার, জননায়ক মুকুন্দ বিহারী মল্লিক : জীবন ও সাধনা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

৭৫) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৭।

৭৬) Government of India, Reforms Office File No. 199/R/1932, Faridpur District Depressed Classes Association to GI, 22 Sept 1932.. WBSA

৭৭) Government of Bengal, Appoinment (Reforms), File No. IR-90, B, August, 1933. Progs, No, S-870-886. WBSA

৭৮) ৭৮। আহমদ আবুল মনসুর, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (নবম সংস্করণ), খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০০, পৃঃ ৬৩।

৭৯) আহমদ আবুল মনসুর, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৮০) Government of Bengal, Home (Constituation and Elections) File No. R.R. 3E-27 May, 1937, Prog. No.-1-13 and 10/37, WBSA

৮১) শ্রীমতী কিরণ তালুকদার, জননায়ক মুকুন্দ বিহারী মল্লিক : জীবন ও সাধনা, দেবদাস প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

৮২) শ্রীমতী কিরণ তালুকদার, জননায়ক মুকুন্দ বিহারী মল্লিক : জীবন ও সাধনা, প্রাগক্ত, পৃঃ ৭৩।

৮৩) Government of Bengal, Home (Constituation and Elections) File No- 10/37, also Sekhar Bandyopadhyay, op, cit, page 137, WBSA.

৮৪) Sekhar Bandyopadhyay, op, cit, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৭৭।

৮৫) অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাস, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯।

৮৬) অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাস, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮।

৮৭) অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাস, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৯।

৮৮) Government of Bengal, Home (Constituation and Elections) File No. R.R. 3E-27 May, 1937, Prog. No.-1-13 and 10/37, WBSA

৮৯) জগদীশচন্দ্র মন্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ (প্রথম খন্ড) চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৪৮।

৯০) জগদীশচন্দ্র মন্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ (প্রথম খন্ড) চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৪৯।

৯১) জগদীশচন্দ্র মন্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ (তৃতীয় খন্ড) চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ১৩৬।

৯২) জগদীশচন্দ্র মন্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ (তৃতীয় খন্ড) চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ১৩৭।

৯৩) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৭৪।

৯৪) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৭৭।

৯৫) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৭৬।

৯৬) রণজিত কুমার সিকদার, 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ' আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ২৮।

৯৭) প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৭।

৯৮) মহানন্দ হালদার, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

৯৯) রণজিত কুমার সিকদার, 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ' প্রাগক্ত, পৃঃ ২৯।

১০০) রণজিত কুমার সিকদার, 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ' প্রাগক্ত, পৃঃ ৩১।

১০১) অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৬।

১০২) অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ১২ মার্চ ১৯৪৭।

১০৩) প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১।

১০৪) অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৫।

১০৫) জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, (পঞ্চম খণ্ড) চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ৫৩-৫৪।

১০৬) Abhijit Dasgupta, In the Citadel of Bhadralok Politicians: The Scheduled Caste in West Bengal, Journal of Indian School of Political Economy. July-December, 2000, পৃঃ ৪৪৫-৫০।

১০৭) শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, এদেশের রাজনীতি ও বহুজন সমাজ, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ৩২৩।

১০৮) জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, (সপ্তম খণ্ড) চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ ১৪১।

১০৯) কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, ঠাকুরনগর পত্তনের ইতিহাসবর্ষ' ৩৩, নিখিল ভারত পত্রিকা, ৫ম সংখ্যা, ২ সেপ্টেম্বর অক্টোবর, ০০০৮, পৃঃ ৯।

১১০) কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, 'বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের ভুমিকা নিখিল' ২০ পৃঃ, ২০১০, বিশেষ সংখ্যা, ভারত পত্রিকা।

১১১) অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ৫ মার্চ ১৯৫১।

১১২) West Bengal Legislative Assembly Proceedings, Vol-II, No-I, June-August, P. 64-65, NLC

১১৩) Election Commission of India, General Elections Result, 1957, 1967. And West Bengal Assembly Proceedings, who's who, 1957, 1962, West Bengal Legislative Assembly, Secretariat, Calcutta, 1957 & 1962, NLC

১১৪) বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (সম্পাদিত) ভারতবর্ষঃ স্বাধীনতার পরে, ১৯৪৭-২০০০, আনন্দ পাবলিশার্স-২০০৫, পৃঃ ২৩৭-৩৮।

১১৫) যুগান্তর পত্রিকা, ৬ই মার্চ, ১৯৬৪।

১১৬) যুগান্তর পত্রিকা, ১০ এবং ১১ই জানুয়ারী, ১৯৭৯।

১১৭) কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, 'প্রতিবাদী প্রমথ রঞ্জনঃ মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয় স্বীকার, নিখিল ভারত পত্রিকা, ৩১ তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বামনগাছি, এপ্রিল-মার্চ, ২০০৯, পৃঃ ২৩৭

১১৮) মতুয়া মহাসংঘ ১৫তম সংখ্যা, ১লা চৈত্র,বঙ্গাব্দ, ১৩৯৭, পৃঃ ৪।

১১৯) আনন্দ বাজার পত্রিকা ৬ই মার্চ, ১৯৬৪।

১২০) কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, প্রাগক্ত, পৃঃ ১১।

১২১) অমল কুমার মুখোপাধ্যায়, বাঙালির রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭- ১৯৯৭), মুখার্জী অ্যান্ড কোং. প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৮।

১২২) West Bengal Legilative Assembly ProceedingsWho's Who : 1962 – 1967, Government of West Bengal Press, Calcutta, NLC.

১২৩) Jawhar Sirser, ed, Parliament Elections in West Bengal (1952-1999) W.B. Govt. Printing Press, Alipur, 1999, NLC.

১২৪) Govt. of West Bengal, West Bengal Legilative Assembly ProceedingsWho's Who : 1969, W.B. Govt. Printing Press, Alipur, 1969, NLC.
১২৫) বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৭৩-৭৪।
১২৬) অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাস, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫।
১২৭) শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, এদেশের রাজনীতি ও বহুজন সমাজ, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ vii.
১২৮) সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক) পৌণ্ড্র – মনীষা ৩য় খণ্ড, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের পক্ষে, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৪৫।
১২৯) বসন্ত কুমার মণ্ডল, সেদিনের কথা, প্রথম খণ্ড, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ণ পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৭।
১৩০) মহেন্দ্রনাথ করণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় – কুল – প্রদীপ, পুনর্মূদ্রক, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ৮৫।
১৩১) সেদিনের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭২।
১৩২) নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগউক্ত পৃঃ ২৬২।
১৩৩) H.H. Risley. প্রাগুক্ত pp. 76.
১৩৪) H.H. Risley. প্রাগুক্ত pp. 77.
১৩৫) বসন্ত কুমার মণ্ডল, সেদিনের কথা, প্রথম খণ্ড, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ণ পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৫।
১৩৬) H.H. Risley. প্রাগুক্ত pp. 77.
১৩৭) নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬২।
১৩৮) বসন্ত কুমার মণ্ডল, সেদিনের কথা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।
১৩৯) সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক) পৌণ্ড্র – মনীষা ৩য় খণ্ড, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের পক্ষে, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৪৩।
১৪০) নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।
১৪১) সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক) পৌণ্ড্র – মনীষা (২য় খণ্ড) পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের পক্ষে, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ট।
১৪২) সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক) পৌণ্ড্র – মনীষা (২য় খণ্ড) পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের পক্ষে, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ১২৭-২৮।
১৪৩) পৌণ্ড্র – মনীষা (২য় খণ্ড) প্রাগক্ত পৃঃ ১২৯।
১৪৪) বসন্ত কুমার মণ্ডল, সেদিনের কথা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।
১৪৫) পৌণ্ড্র – মনীষা (২য় খণ্ড) প্রাগক্ত পৃঃ ১৩০-৩১।

১৪৬) পৌণ্ড্র – মনীষা (২য় খণ্ড) প্রাগক্ত পৃঃ ১৩৫।
১৪৭) ড. উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ‘বঙ্গ মূলনিবাসী একটি জনগোষ্ঠী, (অনুবাদক, জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল), বঙ্গ পাঠক প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ৩৮।
১৪৮) পৌণ্ড্র – মনীষা (২য় খণ্ড) প্রাগক্ত পৃঃ ১৪১।
১৪৯) পৌণ্ড্র – মনীষা (২য় খণ্ড) প্রাগক্ত পৃঃ ১৪৩।
১৫০) বসন্ত কুমার মণ্ডল, সেদিনের কথা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩।
১৫১) সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক) পৌণ্ড্র – মনীষা ৪য় খণ্ড, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের পক্ষে, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ গ।
১৫২) পৌণ্ড্র – মনীষা ৪য় খণ্ড, পৌণ্ড্র, প্রাগক্ত, পৃঃ ঘ।
১৫৩) পৌণ্ড্র – মনীষা ৪য় খণ্ড, পৌণ্ড্র, প্রাগক্ত, পৃঃ ড।
১৫৪) পৌণ্ড্র – মনীষা ৪য় খণ্ড, পৌণ্ড্র, প্রাগক্ত, পৃঃ ত।
১৫৫) পৌণ্ড্র – মনীষা (৩য় খণ্ড) প্রাগক্ত পৃঃ ৭৭।
১৫৬) পৌণ্ড্র – মনীষা (২য় খণ্ড) প্রাগক্ত পৃঃ ৮০।
১৫৭) পৌণ্ড্র – মনীষা (২য় খণ্ড) প্রাগক্ত পৃঃ ৭৬।
১৫৮) আবুল মনসুর আহমদপৃঃ ১০৯। ,প্রাগক্ত ,
১৫৯) পৌণ্ড্র – মনীষা (২য় খণ্ড) প্রাগক্ত পৃঃ ৭১।
১৬০) আবুল মনসুর আহমদ-পৃঃ ১৩৩ ,প্রাগক্ত ,৩৫।
১৬১) আহমদ আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭।
১৬২) জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, (প্রথম খণ্ড) চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৮৮-৮৯।
১৬৩) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ১৪৮।
১৬৪) Sekhar Bandyopadhyay, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৯১।
১৬৫) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭।
১৬৬) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮।
১৬৭) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯।
১৬৮) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

১৬৯) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

১৭০) পৌণ্ড্র মণিষা, ২ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১।

১৭১) পৌণ্ড্র মণিষা, ২ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

১৭২) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯।

১৭৩) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

১৭৪) Joya Chatterjee, ‘Bengal Divided: Hindu Communilism and Partitions (1932 – 47), Cambridgre University Press, New Delhi, 2002, pp. 69.

১৭৫) Kapil Krishna Thakur, ‘Dalit of East Bengal : Before and After the Partitions; Biswajit Chatterjee and edited, Dalit Living and Dalit Visions in Eastern India, Centre for Rural Resources and Centre for Ambedkar Studies, Jadavpur University, kolokata, 2007, pp. 37-38.

১৭৬) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৪।

১৭৭) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫।

১৭৮) সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক) পৌণ্ড্র – মনীষা ৩য় খণ্ড, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের পক্ষে, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ২১৮।

১৭৯) Sekhar Bandyopadhyay, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭।

১৮০) Sekhar Bandyopadhyay, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭।

১৮১) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪।

১৮২) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৩।

১৮৩) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭-৪৮।

১৮৪) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫২-৫৩।

১৮৫) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮।

১৮৬) COUNCIL of MINISTERS 1947-2004, LOK SABHA SECRETARIAT, NEW DELHI, 2004, পৃঃ ১৬২।

১৮৭) COUNCIL of MINISTERS 1947-2004, LOK SABHA SECRETARIAT, NEW DELHI, 2004, পৃঃ ১৬২।

১৮৮) Jawhar Sirser, ed, Parliament Elections in West Bengal (1952-1999) W.B. Govt. Printing Press, Alipur, 1999, NLC.

১৮৯) Jawhar Sirser, ed, Parliament Elections in West Bengal (1952-1999) W.B. Govt. Printing Press, Alipur, 1999, NLC.

১৯০) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৬।

১৯১) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৯।

১৯২) সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪০।

১৯৩) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০০ জন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৯৪) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ১০ জন মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৯৫) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার নমঃশূদ্র জাতির ২০ জন মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৯৬) গবেষক উত্তর ২৪ পরগনার নমঃশূদ্র জাতির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রীর এবং প্রাক্তন আই.পি.এস. অধিকর্তার উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৯৭) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০০ জন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৯৮) গবেষক উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়ার নমঃশূদ্র জাতির প্রবীণ মতুয়া গবেষকের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৯৯) গবেষক মতুয়াদের বর্তমানের মতুয়া মহাসংঘের সংঘজনীর উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২০০) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০০ জন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোকসভা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণ

আমরা আমাদের গবেষণায় লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সময় ধরা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির জনসংখ্যার একটা সমতা রাখা। ভারতবর্ষে নমঃশূদ্রদের আগমনের কারণ মূলত দেশ ভাগের পরে পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমানের বাংলাদেশ) ১৯৬৪ সালের জাতি দাঙ্গা, খাদ্য সংকটের ফলে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের সময় তাঁরা ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। যেহেতু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মূলত পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসী, ফলে ভারতবর্ষে ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে ১৯৭১ সালের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের সংখ্যা নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিল। ১৯৭১ সালের নির্বাচনের সময় উক্ত দুইজাতির মানুষের সংখ্যা প্রায় সমান হয়ে যায়। এই জন্যেই আমরা আমাদের গবেষণায় সময় কাল ধরা হয়েছে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। একটি সারণি মাধ্যমে আমরা নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির জনসংখ্যা, শিক্ষার হার এবং কৃষির উপর নির্ভরতার হারের সঙ্গে রাজবংশী ও বাগদি জাতির একটা তুলনামূলক আলোচনা করে নেবে। কারণ হল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু নমঃশূদ্র এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে, তাই তাদের সরকারি চাকরির তুলনামূলক আলোচনা আমরা করব না।

সারণি ৩.১: ১৯৬১ - ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের উপরিউক্ত চারটি দলিত জাতির জনসংখ্যা

জাতি/সাল	জনসংখ্যা					
	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
সব দলিতজাতি	৬৮৯০৩১৪	৮৮১৬০২৮	১২০০০৭৬৮	১৬০৮০৬১১	১৮৪৫২৫৫৫	২১৪৬৩২৭০
রাজবংশী	১২০১৭১৭	১৩৫৩৯১৯	২২৫৮৭৬০	২৮৩৯৪৮১	৩৩৮৬৬১৭	৩৮০১৬৭৭
নমঃশূদ্র	৭২৯০৫৭	৯৮০৫২৪	১৬৯২২৩৩	২৫৮১৫৪৯	৩২১২৩৯৩	৩৫০৪৬৪২
বাগদি	৬৯৮৮৫১	১২৯১১২৭	১৮৩১৫৬৫	২৩৫৪৬০৯	২৭৪০৩৮৫	৩০৫৮২৬৫
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	৮৭৫৫২৫	৯৭৫৩৫২	১৫৩৬১৯৭	১৯৮৫২৮৩	২২১৬৫১৩	২৪৫০২৬০

সূত্রঃ ১৯৬১-৮১, তথ্য অমল কুমার দাস ও রমেন্দ্রনাথ সাহা (১৯৮৯): West Bengal Scheduled Caste and Scheduled Tribes: Facts and Information, Special Series No. 32, Bulletin of the Cultural Research Institute, Government of West Bengal থেকে এবং ১০৯১-২০০১ এর তথ্য ভারতের জনগণনা, Copact Dis, SC, ST Individual Community wise) থেকে নেওয়া। ২০১১ সালের টা নেওয়া হয়েছে, Primary Census Abstract Date, 2011, Table A-10.

উপরিউক্ত সারণি ৩.১ থেকে একথা আমরা বলতে পারি যে, ১৯৬১ সালের পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত উক্ত চারটি জাতি নিরিখে নমঃশূদ্র জাতির জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশি। এই বৃদ্ধির হার সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনার করেছি।

এবারে আমরা উক্ত চারটি জাতির স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি সম্পর্কে নিম্নে সারণির মাধ্যমে তুলে ধরব।

সারণি ৩.২: পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগদি এবং পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়ের ১৯৬১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ সালের স্বাক্ষরতার শতাংশ

জাতি/সাল	স্বাক্ষরতার শতাংশ			
	১৯৬১	১৯৯১	২০০১	২০১১
সব দলিত জাতি	১৩.৬০	৪২.২০	৫৯.০৪	৬১.১৬
রাজবংশী	১৪.৬০	৪০.৭০	৬০.১৪	৭০.৬৬
নমঃশূদ্র	২১.০০	৫৬.২০	৭১.৯৩	৭৯.৫২
বাগদি	৮.৭	৩০.০০	৪৭.৭২	৬১.৪১
পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়	২১.৬০	৫৬.১০	৭২.১০	৭৯.৭৫

সূত্রঃ ১৯৬১-৮১, তথ্য অমল কুমার দাস ও রমেন্দ্রনাথ সাহা (১৯৮৯): West Bengal Scheduled Caste and Scheduled Tribes: Facts and Information, Special Series No. 32, Bulletin of the Cultural Research Institute, Government of West Bengal থেকে এবং ১০৯১-২০০১ এর তথ্য ভারতের জনগণনা, Copact Dis, SC, ST Individual Community wise থেকে নেওয়া। ২০১১ সালের টা নেওয়া হয়েছে, Primary Census Abstract Date, 2011, Table A-10.

সারণি ৩.২ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, উক্ত চারটি জাতির মধ্যে নমঃশূদ্র জাতি স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে দ্বিতীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০০১ সালের জনগণনার হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে কোনোয়ার দলিত

জাতি ৮২.৯৬ স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে সমস্ত দলিত জাতির শীর্ষে অবস্থান করেছে, আবার ২০১১ সালে ৮.২ শতাংশ হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯০.৯৮ স্বাক্ষরতার দাড়িয়েছে।[১]

সারণি ৩.৩: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগদি এবং পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জাতির তুলনামূলক সাক্ষরতার হার (শতাংশ): ২০০১, ২০১১

জাতি/সাল	সাক্ষরতার হার (শতাংশ)					
	স্ত্রী		পুরুষ		সামগ্রিক	
	২০০১	২০১১	২০০১	২০১১	২০০১	২০১১
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ	৫৯.৬১	৭০.৫৪	৭৭.০২	৮১.৬৯	৬৮.৬৪	৭৬.২৬
সব দলিত জাতি	৪৬.৯০	৫৬.১০	৭০.৫৪	৭৩.২০	৫৯.০৪	৬৬.১৬
রাজবংশী	৬০.১৪	৬২.৫০	৭২.৩৩	৭৮.৩০	৬০.১৪	৭০.৭০
নমঃশূদ্র	৬২.৭৬	৭৩.৬২	৮০.৫৮	৮৫.১০	৭১.৯৩	৭৯.৫০
বাগদি	৩৮.৮০	৫২.৩০	৬০.৪০	৭০.৩০	৪৭.৭০	৬১.৪০
পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়	৬০.০০	৭১.৯০	৮৩.০০	৮৭.১০	৭২.১০	৭৯.৮০

সূত্রঃ Census of India, 2001, Copact Dis, SC, ST Individual Community wise, ২০১১ সালের টা নেওয়া হয়েছে, Primary Census Abstract Date, 2011, Table A-10.

এবারে আমরা নমঃশূদ্র জাতির সঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী, ও বাগদি জাতির, কৃষি জীবির সংখ্যার তুলনামূলক আলোচনা করব। তুলনাক্রমের শুরুতেই আমরা মাননীয় মোগেন্স বুক হানসেন - এর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে আলোচনা শুরু করলাম, তাঁর মতে "এক মার্কিন অর্থনীতিবিদের ধারণা, পরিপূর্ণভাবে উদারীকৃত বিশ্ববাজার হয়ে উঠবে পৃথিবীর স্বর্গ। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে উদারীকরণ করার পথে যে সমস্ত অসম ব্যবস্থা রয়েছে, তা দূর না করেই, বিশ্ববাজারকে উদারীকরণের চেষ্টায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমশই ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে, তাদের আত্মনির্ভরতার পথও বন্ধ হয়েছে।[২] এই মন্তব্যকে সমর্থন করে এ কথা বলা যেতেই পারে যে, সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র মানুষ তথা ভারতের দলিত জাতির কৃষি ক্ষেত্রের উপর বেশ প্রভাব পড়েছে। কাজেই আমরা নিম্নের সারণীর মাধ্যমে উপরিউক্ত চারটি দলিত জাতির কৃষি নির্ভরতার তুলনাক্রম দেখানোর চেষ্টা করব।

সারণি ৩.৪: পশ্চিমবঙ্গের উক্ত চারটি জাতি শতাংশ হিসাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, ২০১১

জাতি	কৃষির উপর নির্ভরশীলতার শতাংশ	
	শতাংশ/২০০১	শতাংশ/২০১১
রাজবংশী	৮০.১০	৬৩.৪৫
নমঃশূদ্র	৩৮.৩০	৪০.৮৯
বাগদি	৬৮.৪০	৬৯.৬৪
পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়	৩৬.৭০	৪৪.৬৮

সুত্রঃ Census of India, 2001, Copact Dis, SC, ST Individual, ও Community wise Primary Census Abstract Date, 2011, Table A-10.

উপরিউক্ত সারণি ৩.৪ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা বিশ্বায়নের যুগে এসে অনেকটা কমেছে। প্রসঙ্গত এমন একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, দেশ ভাগের ফলে এই জাতি ভূমিহীন হওয়ার দরুণ কৃষির উপর নির্ভরতা কমেছে। আবার এমনও হতে পারে যে কৃষিতে লাভ না হওয়ার ফলেই হয়তো নমঃশূদ্র জাতির মানুষেরা কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমেছে। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, উপরিউক্ত চারটি জাতির মধ্যে নমঃশূদ্র জাতিই ক্ষেতমজুরের সংখ্যা কম। আবার **২০১১** সালে জনগণানুসারেও উক্ত চারটি জাতের মধ্যেও কৃষির উপর নির্ভরশীলতাও কম নমঃশূদ্র জাতির। প্রসঙ্গত আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দেশ ভাগের ফলে এই জাতির মানুষ আর্থিক দিক থেকে ব্যাপক ভাবে ধাক্কা খান। কাজেই কঠোর পরিশ্রমিক জাতি কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল না থেকে কাঠের কাজ, ইমারতির কাজ দেশের অন্যান্য প্রদেশ তথা বিদেশে পাড়ি দিয়ে নিজেদের আর্থনির্ভরশীল করার দিকেই এগিয়েছে, বলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ঠাকুরনগর নিবাসী বর্তমানে ইংল্যান্ডের নাগরিক নমঃশূদ্র জাতির মানুষ বিশ্বাস বাবুর কথায় 'আমায় দেখে বহু ঠাকুরনগর বাসি বিদেশে কাজে গিয়ে কৃষি কাজ করে যা দেশে থেকে উপার্জন করতেন, তার থেকে বহুগুন বেশি অর্থ বিদেশে গিয়ে উপার্জন করছেন'। বিশ্বাস বাবু বলেন, আমি যখন ঠাকুরনগরে থাকতাম শ্রমিকের কাজ করতাম এবং আমার দিদির সঙ্গে লোকের বাড়ির বেলপাতা সংগ্রহ করে কোলকাতায় বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতাম। আর্থিক কষ্টের কারণে মুম্বাই গিয়ে হোটেলে থালাবাসন ধুতাম। মুম্বাই থেকে কিছু অর্থ উপার্জন করে ইংল্যান্ডে চলে যায়, ওখানে গিয়ে আমি সেফ এর কাজ করি। আজ আমার ইংল্যান্ডের

দুটো রেষ্টুরেন্ট প্রায় ১০০ জন সেফ ও বেয়ারা কাজ করেন, এর থেকে কর্মীরাও বেশ লাভবান হয়, আমি বেশ লাভবান হই। বর্তমানে আমার লন্ডনে বাগান বাড়ি ও ঠাকুরনগরে বিশাল বাগান বাড়ি হয়েছে।[৩] আবার ঠাকুরনগর নিবাসী নমঃশূদ্র জাতির সরকার বাবুর কথায়, আমিও বিশ্বাস দাকে দেখে বিদেশে যাই, এবং অর্থ উপার্জন করে দেশে এসে পাঁচটা রেষ্টুরেন্ট খুলেছি।[৪] শিক্ষা ও সংরক্ষণকে কাজে লাগিয়ে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ সরকারি বিভিন্ন পদাধিকারী তথা কর্মীতে নিযুক্ত হয়েও আর্থিক দিক থেকে এগিয়েছেন। সমসাময়িক সময়ে দেশে তথা বিদেশে এরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও বহুসংখ্যক মানুষ কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে বলা যেতেই পারে নমঃশূদ্র জাতি বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য দলিত জাতির চেয়ে অর্থনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে এগিয়ে। এক্ষেত্রে আমরা সরকারি বা বেসরকারি চাকরির সঠিক তথ্য না পাওয়ার দরুণ তুলে ধরতে পারলাম না।

আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে দুটি জাতির পদবী সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া। ভারতীয় সমাজে প্রত্যেক মানুষেরই পদবী থাকে যা অনেকাংশেই জাতিগত পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। এই দিক থেকে নমঃশূদ্র জাতির মানুষের কিছু পদবীও রয়েছে। সেগুলি আমরা নিম্নে তুলে ধরবো।

এই প্রসঙ্গে আমরা অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাসের নমঃশূদ্রদের পদবী সম্পর্কিত মতামত তুলে ধরব। তাঁর বিশ্লেষণে, "নমঃশূদ্র জাতির অনেকের মধ্যে **মণ্ডল** পদবী দেখা যায়। গ্রাম বাংলায় গ্রামের মোড়ল ও মাতবরের সংখ্যা বেশি ফলে গ্রামের মোড়ল হচ্ছেন মণ্ডল উপাধিধারী ব্যক্তি। মোগল আমল থেকেই মণ্ডল হচ্ছেন গ্রাম প্রধাণ। এই জাতির অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মণ্ডল উপাধি ধারী। যেমন বিশিষ্ট জননেতা বিরাট চন্দ্র মণ্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল প্রমুখ। পাট গাতির নমঃশূদ্র জমিদার মণ্ডল পরিবার বিখ্যাত। **বিশ্বাস** উপাধিও এই জাতির মধ্যে দেখা যায়। বিশ্বাস হচ্ছে যাকে বিশ্বাস করা যায়। বিশ্বাসরাও গ্রাম বাংলার মাতব্বর বা মোড়ল পর্যায়ের লোক। যেমন যশোহরের জননেতা রসিকলাল বিশ্বাস এবং গোপালগঞ্জের সাতপাড়ের গয়ালীচরণ বিশ্বাস ও গান্ধিয়াসুরের শ্যামাচরণ বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য। এই জাতির মধ্যে **মল্লিক** উপাধি দেখা যায়। মল্ল থেকে মল্লিক এসেছে। এই জাতির মল্লিক উপাধি ধারী ব্যক্তিগণ হচ্ছেন খুলনার বাগেরহাটের খাড়া সম্মন গ্রামের মুকুন্দ বিহারী

মল্লিকের পরিবার, গোপালগঞ্জের গোপীনাথপুরের পূর্ণচন্দ্র মল্লিকের পরিবার, যশোহরের উপেন্দ্রনাথ মল্লিক ও সন্তোশ কুমার মল্লিক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মজুমদার উপাধিও এই জাতির মধ্যে দেখা যায়। এটা এসেছে মাঝি থেকে। পূর্ববঙ্গে নদীবহুল এলাকায় নৌকার মাঝি থেকে মজুমদার এসেছে। গোপালগঞ্জের রাউথড়ের মজুমদার পরিবার বিখ্যাত। এই পরিবারের ড. কুমুদবন্ধু মজুমদার, জনেতা কামিনী প্রসন্ন মজুমদার, ঐ পরিবারের উদ্ধবচন্দ্র মজুমদার এবং গোপালগঞ্জের শুচিডাঙ্গার নমঃশূদ্র জমিদার দুর্গাচরণ মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালের জননেতা অপূর্ব লাল মজুমদার, গোপালগঞ্জের গান্ধিয়াসুরের বর্তমানের উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার শ্রী ভবানী মজুমদারের নামও উল্লেখযোগ্য।

সিকদার উপাধি এদের মধ্যে দেখা যায়। সিকদার কথাটির অর্থ হল কর আদায়কারী। মধ্যযুগে যারা কর আদায় করতেন, তাদের সিকদার উপাধি নবাব থেকে দেওয়া হয়। বরিশালের কুড়িয়ানার সিকদার পরিবার বিখ্যাত। ঐ পরিবারের বিশ্বেশ্বর সিকদার তালুকদার এবং উকিল রোহিণী কুমার সিকদার বিখ্যাত ছিলেন। বিশ্ববন্ধু বা ফটিক গোঁসাই সিকদার পরিবারের লোক ছিলেন। আধুনিক কালে শ্রী রণজিৎ সিকদারের নাম উল্লেখযোগ্য।

টিকেদার উপাধি এদের মধ্যে দেখা যায়। গোপালগঞ্জের গিরিশ নগরের দ্বিজেন্দ্রনাথ টিকেদার বরিশালের উকিল ছিলেন। যারা টিকা দান করতেন তারাই টিকেদার হয়েছেন। আধুনিক কালের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ বিনয়কৃষ্ণ টিকেদারের পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য।

দাস উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায় । বরিশালের চাঁদসীর বিখ্যাত ক্ষত চিকিৎসার প্রবর্তক ছিলেন ডাঃ বিষ্ণুহরি দাস। ঐ পরিবারের ডাঃ মহিনী মোহন দাস বিখ্যাত চিকিৎসক ও জননেতা ছিলেন। গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দির কমলাকান্ত দাসের পরিবার, মহাটালির দাস পরিবার, নোয়াখালীর বিশিষ্ট সমাজসেবী ও উকিল মনোরঞ্জন দাসের পরিবার উল্লেখযোগ্য।

চৌধুরী হচ্ছে নবাবের দ্বারা প্রাপ্ত উপাধি। এরা অনেকটা তালুকদারী প্রাপ্ত ব্যক্তি। ওড়াকান্দির চৌধুরী পরিবার বিখ্যাত। ঐ পরিবারের মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহিনীমোহন চৌধুরী, রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জ্যোতির্ম্ময় চৌধুরী বিখ্যাত।

ঠাকুর উপাধি এদের মধ্যে দেখা যায়। শ্রী হরিচাঁদ ও শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের বংশধরগণ ঠাকুর উপাধি ধারী। ঐ বংশের পি.আর. ঠাকুর, শ্রপতি ঠাকুর, শ্রী কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, অংশুপতি ঠাকুর, মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ বিখ্যাত।

সরকার উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। কবিগায়কদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এদের প্রত্যেকের উপাধি সরকার। গোপালগঞ্জের আনন্দ সরকার, হরিবর সরকার, মনোহর সরকার, নিশিকান্ত সরকার, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রী নিবাস সরকার, খুলনার রাজেন্দ্রনাথ সরকার, রসিক লাল সরকার, যশোহরের বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী চারুমিহির সরকার, কৃষ্ণনগরের এডভোকেট নীলকমল সরকার, কল্যাণী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য ড. সন্তোষ কুমার সরকার, ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার বিখ্যাত।

সমাদ্দার উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। বরিশালে এই উপাধি বেশি দেখা যায়। বরিশালের সোহাগদলের সমাদ্দার, আলতায় সমাদ্দার কুলীন পরিবার ছিলেন। সোহাগ দলের ষড়ানন সমাদ্দার, ড. রমণী সমাদ্দার শ্রী বিভূতি ভূষণ সমাদ্দার বিখ্যাত ছিলেন। আলতার সমাদ্দারের মধ্যে গজানন সমাদ্দার, খগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, শ্রী হরেন্দ্রনাথ সমাদ্দার বিখ্যাত ছিলেন।

মিস্ত্রী উপাধি বরিশালের নমঃশূদ্রদের মধ্যে দেখা যায়। মিস্ত্রীর কাজ থেকে এই উপাধি এসেছে। এরা নমঃশূদ্রদের মধ্যে অনেকটা কুলীন পরিবার ভুক্ত। মিস্ত্রীদের অনেকে **মিত্র, মৈত্র, মিশ্র** প্রভৃতি হয়েছেন। শ্রী মন্মথনাথ মিস্ত্রী শ্রী অগ্নিকুমার মিস্ত্রী সমাজসেবী, ও অধ্যক্ষ শ্যামল মিস্ত্রী বিখ্যাত হয়েছিলেন।

কবিরাজ উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। কবিরাজী পেশা থেকে কবিরাজ উপাধি এসেছে। অধ্যাপক ক্ষিরোধ বিহারী কবিরাজের পিতা গুরুচরণ একজন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন।

ভৌমিক উপাধিও দেখা যায়। ত্রিপুরার ক্ষিরোধ ভৌমিকের পরিবার ও হাওড়ার কাশমলির শ্রী সন্তোষ কুমার ভৌমিকের পরিবার উল্লেখযোগ্য।

রায় মজুমদার উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। নোয়াখালীর টবগাঁর বিখ্যাত নমঃশূদ্র জমিদার চিন্তাহরণ রায় মজুমদার বিখ্যাত ছিলেন।

রায় উপাধিও দেখা যায়। বরিশাল ও নোয়াখালীসহ প্রায় সব জেলাতেই এই উপাধির নমঃশূদ্রদের পাওয়া যায়। নোয়াখালীর টবগাঁর অধুনা বেহালার

নতুনপাড়া নিবাসী চিত্তরঞ্জন রায়, খুলনা অধুনা যাদবপুরের বিদ্যাসাগর কলোনীর সত্যেন্দ্রনাথ রায়, এডভোকেট নীরোদ বিহারি রায়, ঠাকুরনগরের শ্রী আদিত্য কুমার রায় উল্লেখযোগ্য।

হালদার ও হাওলাদার উপাধিও নমঃশূদ্রদের মধ্যে দেখা যায়। আচার্য্য মহান্দ হালদার, ড. পরমান্দ হালদার ড. দিলীপ হালদার প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। বরিশালে হাওলাদার উপাধি বেশি দেখা যায়। ঠাকুরনগরের শ্রী অনিল কৃষ্ণ হাওলাদার, শ্রী নিকুঞ্জ হাওলাদার বিশিষ্ট হয়েছিলেন।

মৃধা উপাধি এদের মধ্যে দেখা যায়। মৃধারা জমিদারের লাঠিয়াল ছিলেন। বরিশালের হেমন্ত কুমার মৃধা অধুনা বেহালাবাসী এবং তার পরিবার নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

কীর্ত্তনীয়া উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। কীর্ত্তন করা থেকে কীর্ত্তনীয়া উপাধি হয়েছে। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ কীর্ত্তনীয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

পোদ্দার উপাধিও পাওয়া যায়। খুলনার বড়বাড়িয়ার পোদ্দার পরিবার বেশ বিখ্যাত হয়েছিলেন।

গাইন উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। খুলনা মোল্লাহাট থানার দত্তডাঙ্গার ইশ্বর চন্দ্র গাইনের পরিবার। ঐ পরিবারের অধুনা ঠাকুরনগর নিবাসী ভবানী শঙ্কর গাইন বিখ্যাত ছিলেন।

বাইন উপাধিও গোপালগঞ্জের মধ্যে দেখা যায়। অধ্যাপক গৌরগোপাল কাব্যভূষণ বাইন উপাধি ধারী।

সিংহ উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। যশোহরের বামনহাটের ডাঃ সুধাংশু কুমার সিংহের পরিবার উল্লেখযোগ্য। তারা বর্তমান লক্ষৌ এ থাকেন। ক্যানিং-এর প্রাক্তন এম. এল. এ, ললিত সিংহ এবং অধ্যাপক আশীষ সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।

পাণ্ডে উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। খুলনার মোল্লারহাট থানার অধীনে এদের বেশী দেখা যায়। অধুনা দন্ডকারণ্যের পাখানজোড়েন শ্রী সুরেন্দ্রনাথ পান্ডের পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাগচী উপাধিও দেখা যায়। **বাগানি** থেকে বাগচী এসেছে। পলতায় ডাঃ সুধীরকুমার বাগচী, ঠাকুরনগরের সীতান্ত বাগচী, বগুলা কলেজের অধ্যাপক সুকদেব বাগচীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বর উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। গোপালগঞ্জে এই উপাধি বেশি। অধুনা ঠাকুরনগরের শ্রী অনুকুলচন্দ্র বরের নাম উল্লেখযোগ্য।

দত্ত উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। এরা পূর্বে দে'ড়ে ছিলেন। দে'ড়ে কথাটা নৌকার দাঁড় বাওয়া থেকে এসেছে। পলতার শ্রী যোগেশচন্দ্র দত্ত, নিউব্যারাকপুরের শ্রী জীবন দত্তের নাম উল্লেখ করা যায়।

সাঁতরা উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। এটা সাধারণত মেদিনীপুর ও হাওড়ার নমঃশূদ্রদের মধ্যে দেখা যায়। হাওড়ার বাগনানের শ্রী তারাপদ সাঁতরা বিখ্যাত লেখক এছাড়াও দাঁতনের অধ্যাপক নয়নচাঁদ সাঁতরাও বিখ্যাত ছিলেন।

ওঝা উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। মেদিণীপুরের ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র ওঝার নাম উল্লেখযোগ্য।

নস্কর উপাধি এদের মধ্যে দেখা যায়। নস্কর কথাটি নাবিক থেকে এসেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে এই উপাধি বেশি। কালোশশী নস্কর প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

দাস চৌধুরী এদের মধ্যে দেখা যায়। কলিকাতার চিড়িংঘাটার বিখ্যাত নমঃশূদ্র জমিদার দাস চৌধুরী পরিবার উল্লেখযোগ্য।

মুখার্জী উপাধিও নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে দেখা যায়। খুলনা অধুনা যাদবপুরের রবীন্দ্রপল্লীবাসী মুখার্জীর পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। এক মুখার্জী নায়েব এদের বাড়িতে থাকতেন। ফলে এদের পরিবারকে মুখার্জী বাড়ী বলা হতো। সেখান থেকেই এরা মুখার্জী হয়েছেন।

তালুকদার যাদের তালুকদারী ছিল তারাই এই উপাধি পেয়েছিল। এবিষয়ে খুলনার (বর্তমানে কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলোনীর) শ্রী মহেন্দ্রনাথ তালুকদারের পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। ঘোষ, বোস, সেন, বসু, গুহ, কর্মকার, অধিকারী, ঘটক, জোয়াদ্দার প্রভৃতি উপাধি এদের মধ্যে দেখা যায়।

বালা উপাধি নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে দেখা যায়। বিশেষ করে গোপালগঞ্জের মধ্যে এই উপাধি বেশি দেখা যায়। এই জাতির মধ্যে চৈত্র মাসে পাটবান বা দেল

পূজার অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বালাই গাওয়া হয়। এটা অনেকটা সন্ন্যাসী হওয়ার মতো। সেখান থেকে এদের মধ্যে এই উপাধির সৃষ্টি হয়েছে। বালা উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ফরিদপুরের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী গৌরচন্দ্র বালা, নবদ্বীপের লোকসভার সদস্য ডাঃ অসীম বালা, গোপালগঞ্জের শাম্বাকান্দি নিবাসী বর্তমানে লবনহ্রদ নিবাসী অবসর প্রাপ্ত আয়কর অফিসার শ্রী উপেন্দ্রনাথ বালার পরিবার, প্রাক্তণ সরকারি অফিসার বাসুদেব বালার পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঢালী উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। মধ্যযুগে যশোহরের রাজা প্রতাদিত্যের ও রাজা সীতারামের ঢালী সৈন্যবাহিনী প্রধানত নমঃশূদ্রদের দ্বারা গঠিত ছিল। সেজন্য এদের মধ্যে ঢালী উপাধি দেখা যায়। গোপালগঞ্জের হাতিয়াড়ার এডভোকেট মনোহর ঢালীর পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য।

সর্দ্দার উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। নমঃশূদ্রদের মধ্যে লাঠিয়াল শ্রেণীর লোক দেখা যায়। গোপালগঞ্জ ও যশোহরে এদের বেশি দেখা যায়। এদের উপাধি সর্দ্দার হয়েছে। যশোহরের নড়াইলের নারদ সর্দার, লঙ্কেশ্বর সর্দ্দার, গোপালগঞ্জের পদ্মবিলা বিখ্যাত খাজিয়া খ্যাত অনন্ত সর্দ্দারের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভক্ত উপাধি এদের মধ্যে দেখা যায়। কলিকাতার লেবুতলার শ্রী নীলকান্ত ভক্তের পরিবার উল্লেখযোগ্য।

বৈদ্য নমঃশূদ্রদের মধ্যে বৈদ্য উপাধি দেখা যায়। ফরিদপুরের উত্তর অঞ্চলে বৈদ্য, ভক্ত উপাধি দেখা যায়। বরিশালের অধুনা কলিকাতার রামলাল বাজারের ডাঃ কালিদাস বৈদ্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

সাধক বরিশালের নমঃশূদ্র মধ্যে সাধক উপাধি দেখা যায়। বরিশালের জব্দকাঠির আনন্দ সাধক এই জাতির একজন বিখ্যাত সমাজনেতা ছিলেন।

বড়াল উপাধি এদের মধ্যে যায়। বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক শ্রী মনোরঞ্জন বড়ালের নাম উল্লেখ করা যায়।

বালা থেকে বল উপাধি এসেছে। গোপালগঞ্জের কৃষ্ণপুরের রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র বল এবং বরিশালের রায় বাহাদুর ললিত কুমার বলের পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য।

বারুরী ও বাড়ই উপাধি এদের মধ্যে দেখা যায় । ফরিদপুরের দ্বারিকানাথ বারুরী অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।

শাঁখারী বা ব্যাপারী উপাধিও দেখা যায়। যারা শাঁখার কাজ করেন ও ব্যবসা করেন তাদের শাঁখারী ও ব্যাপারী উপাধি হয়েছে। বরিশালের অধুনা রামলাল বাজার নিবাসী কবি শ্রী কালাচাঁদ শাঁখারীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সুতার উপাধি বরিশালের নমঃশূদ্রদের মধ্যে দেখা যায়। বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ।

মুশিদ উপাধি দেখা যায়। পিরোজপুরের মুশিদ পরিবার বিখ্যাত। ঐ পরিবারে মুশিদ থেকে **মুন্সী** হয়েছেন। এদের মধ্যে বর্তমানে শ্যামনগরের অধিবাসী শ্রী কৃষ্ণকান্ত মুন্সীর পরিবার বিখ্যাত।

চন্দ উপাধিও দেখা যায়। চট্টগ্রামের শ্রী সতীশচন্দ্র চন্দের পরিবার বিখ্যাত।

রায়চৌধুরী উপাধিও দেখা যায়। বেহালার বিভূতি রায়চৌধুরী এডভোকেট এবং বেহালার নতুন পাড়ার শ্রী ঊষা রায়চৌধুরীর পরিবার বিখ্যাত।

যশোহর ও খুলনার কোন কোন অঞ্চলে এদের **ঘোষাল, গোলদার** উপাধি দেখা যায়। খুলনার বর্তমানে মেদিনীপুরের হলদিয়ার বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রী মৃণাল কান্তি গোলদারের নাম উল্লেখযোগ্য।

বৈরাগ্য ও বৈরাগী উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন বলে এই উপাধি এসেছে। শ্রী বিরাট বৈরাগ্য হরিচাঁদের মতুয়া ধর্ম সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন। ড. মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী বিখ্যাত লেখক।

মোহন্ত উপাধিও এদের মধ্যে দেখা যায়। এবিষয়ে ঠাকুরনগরের মণ্ডল পাড়ার ড. নন্দদুলাল মোহন্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বর্ণকার উপাধিও নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে দেখা যায়। খুলনার সাতক্ষীরার বিজয় স্বর্ণকারের পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার শ্যামবাজারে তাদের বাড়ী ও ব্যবসা আছে।

ব্রহ্ম উপাধিও দেখা যায়। এবিষয়ে বিশিষ্ট লেখক মছলন্দপুরের শান্তিনগরের কিরণচন্দ্র ব্রহ্মের পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঘোষ, গোস্বামী যশোহরের এগার খানা অঞ্চলে নমঃশূদ্রদের উপাধি এই রূপ দেখা যায়। নবদ্বীপের প্রাক্তন লোকসভার সাংসদ শ্রীমতী বিভা ঘোষ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নমঃশূদ্রদের মধ্যে **পাত্র, হাতি, কাণ্ডার** প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়।

সমাজপতি, ভাণ্ডারী উপাধিও দেখা যায়। গোপালগঞ্জের সীতারামপুর গ্রামের কেশচন্দ্র সমাজপতি বিখ্যাত বক্তা ও সমাজসেবী ছিলেন।

হাজরা, বকসী, মালাকার উপাধিও দেখা যায়।

নাগ উপাধিও দেখা যায়। বরিশালের শ্রী নিরোদ নাগ বিখ্যাত ব্যক্তি।

নমঃশূদ্র উপাধিও এদের মধ্যে রয়েছে। আসামের করিমগঞ্জের প্রাক্তন এম. এল. এ. গোপেশচন্দ্র নমঃশূদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। আসামের বিখ্যাত সমাজনেতা মোহন রায় নমঃশূদ্রের পরিবারের নামও উল্লেখযোগ্য”।[৫] লেখকের উপরি উক্ত পদবীগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, নমঃশূদ্র জাতির পদবীগুলো বেশ সামাজিক সম্মানের স্থানে রাখার পক্ষে নানাবিধ যুক্তির অবতারণ করেছেন। আবার আমরা এও দেখতে পারলাম যে, বাংলাদেশে যে সকল নমঃশূদ্রদের ভারতীয় হিন্দু সমাজে অসম্মানজনক পদবী ছিল, তারা ভারতে এসে বেশ সম্মানজনক পদবী নিজের থেকেই নামের পাশে লিখে হিন্দু সমাজের উঁচুজাতের পদবীর সমকক্ষ হওয়ার প্রয়াস করে চলেছেন। যেমন মাঝি থেকে মজুমদার, মৈত্র, মিত্র ও সদ্দার থেকে সরকার। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রশ্নমালা ও কয়েকটা মাধ্যমিক তথ্যের গ্রন্থ সংগ্রহ করার লক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার, দক্ষিণ বারাসাতের নিবাসি ধূর্জটি নস্করের বাড়ীতে যাই আমার নামের পদবী শুনে উনি আমাকে বলেছিলেন, তোমার পদবী কেন সরকার হল, তুমি তো উচ্চ জাতের পদবী নিয়েছ। নস্কর বাবু একথাও বলেন যে, নমঃশূদ্রদের পদবী হয় তো মণ্ডল ও বিশ্বাস, ওনি আমার সরকার পদবী শুনে নানান কথা বললেন। যেমন তিনি বললেন ‘আমি নস্কর নোই আমি লস্কর’।[৬] নস্কর বাবু যদি নরেশচন্দ্র দাসের বর্ণিত নমঃশূদ্রদের মুখার্জি ও সেন, মিশ্র, গোস্বামী, ব্রহ্ম পদবীগুলোর মধ্যে কোন একটা পদবী যদি আমার থাকত তা হলে ওনি আরও ভয়ংকর কথা হয়তো

বলতেন, আমাকে। আমি প্রথম ধূর্জটি নস্করের কাছ থেকে আমার সরকার পদবী কেন হল, শুনার পরে মনে প্রশ্ন জাগল যে, বাবার মুখে শুনেছিলাম আমার ঠাকুরদার নাম ছিল, ব্রজবাসী সদ্দার। বাবা এও বলতেন ঠাকুরদা খুব লাঠি খেলতে পারতেন, তাইতো তাঁর প্রাপ্ত পদবী হয় সদ্দার। পাড়া প্রতিবেশির ঠাকুমারা যখন আমাকে বলতেন, আমি নাকি ব্রজবাসী সদ্দারের ন্যায় রাগি হয়েছি। বাবাকে বলতেন ঐ ঠাকুমা আমাকে সদ্দার বলে ডাকেন, তখন বাবা বলতেন অনেক চেষ্টা করে সদ্দার পদবী থেকে বেড়িয়ে এসে পাকাপাকি ভাবে ভারতে এসে সরকার পদবী পেয়েছি, কাজেই তোমাদেরকে আমি আর সদ্দার বানাবো না, লেখা পড়া শিখে মানুষ হতে হবে। কাজেই বুঝতে পারলাম ধূর্জটি বাবু আমার পদবী নিয়ে ভূল কিছু বলেন নি।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পদবী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে নরোত্তম হালদার মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, “বাংলা পদবী প্রধানত বৃত্তিমূলক। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অধিকাংশ পদবী বিশেষ গৌরবের পরিচয় বহন করে। এই পদবীগুলির মধ্যে কোন কোনটি আবার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, কৈবর্ত, ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পদবীরূপেও বাবহৃত হয়”।[৭] উপরে উল্লেখিত লেখকের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পদবী সংক্রান্ত মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে যাদের পদবীগুলো ভারতীয় হিন্দু সমাজের উঁচুজাতের পদবীর সঙ্গে সমতুল্য করে নামের পাশে ব্যবহার করে থাকেন, তারা আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নিম্নমানের পদবীধারিদের থেকে সামাজিক দিক থেকে নিজেদের উচ্চ সামাজিক সম্মানের অধিকারি বলে মনে করেন। আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময় তা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। এছাড়াও পৌণ্ড্রদের জাতিগত সামাজিক ইতিহাস থেকেও জানতে পারি।

এবারে আমরা সংক্ষেপে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পদবী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করব। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পদবী নিয়ে নরোত্তম হালদার বিশ্লেষণ করেছেন। এই ভাবে **“অধিকারী** – অধ্যক্ষ, বেদান্ত শাস্ত্রবেত্তা, দখলিকার, দলপতি। **আড়ি** – শিকারী, যে আড়ি পেতে অর্থাৎ আড়াল থেকে শিকার করে। **আঢ়ী বা আড়ী** – সমৃদ্ধ, ধনী; ‘আঢ্য’ শব্দজ। **কবি**- কবিতা রচনাকারী, কবিগানকারী। **কবিরাজ** – আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। **কয়াল** – শস্য পরিমাপকারী। কর- করণ, কারক, কর্ম-সম্পাদক। **করণ** – কার্যের প্রধান সাধক, কারক, লেখক; লিপি ব্যবসায়ী; উড়িষ্যায় করণ নামে অভিহিত (“লেখু লেখু করণ”- উড়িয়া প্রবাদ)। **কাঁটাল** – কাঁটাল ব্যবসায়ী, কাঁটাল রপ্তানিকারী। **কাণ্ডার** – কাণ্ডারী বা কর্ণধার। **কামার** –

কর্মকার বা লৌহশিল্পী। **কালসা** – কালসহ অর্থাৎ সময় সুযোগের অপেক্ষাকারী, দীর্ঘকাল স্থায়ী, বুনিয়াদী। **কীর্তন** – কীর্তনীয়া, কথক। **খাঁ** – সম্মানসূচক উপাধি (আরবী 'খাদা'-শব্দজ), জ্ঞানী, শিক্ষিত বা পণ্ডিত। **খামারু** – খামার বা শস্য প্রাঙ্গণের মালিক। **গায়েন** – গায়ক, পাঁচালি গায়ক। **গারু** – কর্নধার; 'গাবর' শব্দজ। **গিরি** – পর্বতোপম, সম্ভ্রান্ত, উচ্চবংশীয়, পরিব্রাজকগণের উপাধি। **গোলদার** – গোলা বা শস্য ভাণ্ডারের মালিক। **গোস্বামী বা গোঁসাই** – ধর্মোপদেষ্ট, প্রসিদ্ধ প্রভুবংশীয়। **ঘরামি** – গৃহনির্মান শিল্পী। **চাকলাদার** – চাকলার অধিপতি বা জমিদার, 'চাকলা' অর্থে কয়েকটি পরগনার সমষ্টি। **চৌধুরী** – চতুঃশক্তিধর সামন্ত (রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিক), রাজা। **চাটুই** – ছাটামারায় দক্ষ লাঠিয়াল। **জাতুয়া** – খাঁটি জাতের অর্থাৎ সদবংশজাত। **জানা** - অবগতকারী, বিধানদাতা। **জালানি** – অগ্নি প্রদানকারী, অত্যাচারী। **জোদ্দার** – জোতের মালিক বা জমিদারের অধীন জোতস্বত্বভোগী। **জোয়ারদার** – জোয়ার বা মাইলো ব্যবসায়ী। **ডাকুয়া** – লোক ডাকার কর্মচারী। **ঢালী** – ঢালধারী যোদ্ধা। **ঢেঁকি** – ঢেঁকি নিয়ে লড়াইকারী বলীয়ান অথবা ঢেঁকিতে ধানভাঙ্গার পেশাদার। **তরফদার** – তালুকদার বা জমিদার। **তাঁতী** – তন্তুবায়, বস্ত্র নির্মাতা। **তুরকী** – তুরগী বা অশ্বরোহী সৈন্য। **তেলী** – তৈল ব্যবসায়ী। **থাণ্ডার** – থানদার বা থানাদার শব্দজ; স্থান তদারককারী অথবা পাহারাদার।

দপ্তরী – দপ্তরখানার রক্ষক। **দরবার** – দরবারী বা সভাসদ। **দাশ** – ব্রহ্মজ্ঞানী; 'দাশ' ধাতু নিষ্পন্ন। **দাস** – সেবক, 'দস' ও 'দস্র' ধাতু নিষ্পন্ন অর্থ 'মহাবলী' ও 'বিধবংসকারী'। **দাসাধিকারী** – বৈষ্ণব দলপতি। **দেব** – পূজ্য বা রাজা। **দেবশর্মা** – দেবতার আশ্রিত। **ধাড়া** – বড় বা শ্রেষ্ঠ। **ধানুকা** – ধনুর্ধারী যোদ্ধা। **নস্কর** – নিষ্করভোগী সামন্তবংশীয়। **নাইয়া** – নাবিক। **নায়ক** – নেতা। **ন্যায়বান** – ন্যায় পরায়ন। **পণ্ডিত** – আচার্য, ধর্মপূজিক। **পয়াৎ** - পয়া বা সলক্ষণযুক্ত অথবা জলদানকারী। **পর্বত** – উচ্চ বংশজাত। **পাইক** – পদাতিক সৈন্য। **পাইন** – পানুয়া বা পান ব্যবসায়ী। পাটারী – পাটোয়ারী বা পাট ব্যবসায়ী। **পাত্র** – মন্ত্রী। **পুরকাইত** – পুরকায়স্থ বা শ্রেষ্ঠ নাগরিক। **পেয়াদ** – রাজদূত। **পোদ্দার** – বন্ধকী কারবারি ও মুদ্রার হিসাব রক্ষক। **প্রধান** – শ্রেষ্ঠ বংশীয়। **প্রামানিক** – প্রমাণসিদ্ধ বা পণ্ডিত। **বকসী** – বেতনভোগী কর্মচারী। **বণিক** – ব্যবসায়ী। **বন্দ্যোপাধ্যায়** – নমস্য অধ্যাপক। বর – শ্রেষ্ঠ। **বর্গী** – বেতনভোগী অশ্বারোহী সৈন্যদল, মারাঠী 'বারগীর' শব্দজ। **বর্মন** – 'বর্ম' শব্দজ; রক্ষীকারী, যিনি বর্মের ন্যায় দেশকে রক্ষা করেন। **বাওয়ালী** – সুন্দরবনের পথপ্রদর্শক, ব্যাঘ্র নিয়য়ন্ত্রণকারী অথবা বাউলে। **বাগ** – বাগিচার মালিক। **বাগানী** – উদ্যানকারী।

বাঘ – ব্যাঘ্র নিধনকারী অথবা বাঘের ন্যায় প্রতাপশালী। **বাছাড়** – বাছাইকারক, নির্বাচক। **বাপুলী** – স্নেহভাজন। **বাড়ুই** – বর্ধিত বা বাড়ন্ত। **বায়েন** – সঙ্গতকারী। **বারুই ও বারুরী** – তাম্বুল বিক্রয়কারী; 'বারুজীবী' শব্দজ। **বিজলী** – ধনুর্ধারী বা রণজয়ী। **বিশ্বাস** – বিশ্বাসের পাত্র বা বিশ্বস্ত। **বৈদ্য** – চিকিৎসক। **বৈরাগী** – সংসারে উদাসীন, বৈষ্ণব। **ভূঞ্যা বা ভৌমিক** – ভুম্যধিকারী।

মজুমদার – রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাব রক্ষক। **মণি** – রত্ন বা গুণদান । **মণিয়ান** – গুণবান বা সম্মানার্হ। **মণ্ডল** – মোড়ল বা প্রধান। **মঙ্গলী** – সুন্দরবনের লবন প্রস্তুতকারী। **মহাত্ম** – মহাপ্রাণ। **মাইতি** – মহান্তি বা দলপতি। **মাজি বা মাঝি** – কর্ণধার। **মাত্তা বা মাতা** – 'মহাত্ম' শব্দের অপভ্রংশ; মহাপ্রাণ। **মাল** – 'মল্ল' শব্দের; যোদ্ধা। **মালিক** – কর্তা। **মালী** – মাল্যকার, উদ্যানরক্ষক। **মির্দ্ধা বা মিদ্দা** – পাইলট বা নাবিক। **মিস্ত্রী**- কারিগর। **মুখোপাধ্যায়** – প্রধান অধ্যাপক। **মৃধা** – যুদ্ধকারী; মৃধা = যুদ্ধ। **মৈত্র** – মিত্র সম্বন্ধীয়। **মৌলে** – সুন্দরবনে মধু আহরণকারী। **রঞ্জিত** – মনোরঞ্জনকারী। **রণজিৎ** - যুদ্ধজয়ী। **রপ্তান** – রপ্তানিকারক, বণিক। **রায়** – রাজা, বিধানকারী। **রায়চৌধুরী** – চতুঃশক্তিধর রাজা। **রুদ্র** – তেজস্বী। **লস্কল** – সৈন্য বা জাহাজের নাবিক। **শা** – শাহ্ বা অধিপতি। **শাঁখারী** – শঙ্খবণিক। **শানা** – শন ব্যবসায়ী। **শার্দুল** – ব্যাঘ্র সদৃশ প্রতাপশালী। **শিউলি** – খেজুর, তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছ থেকে রস আহরণকারী ও গুড় প্রস্তুতকারী। **শিকারী** – মৃগয়াকারী। **শীল** – সচ্চরিত্র। **সরকার** – প্রভু। **সরদার** – দলপতি। **সাগর** – সমুদ্রচারী (সগর বংশজাত?)। **সাধুখাঁ** – জ্ঞানী, সজ্জন। **সানা** – 'সেনা' শব্দজ; সৈন্য। **সাঁফুই** – পরিচ্ছন্ন, খাঁটি বা নির্দোষ। **সিংহ ও সিনহা** – মহাপ্রতাপশালী। **হাজরা বা হাজারী** – সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক। **হাতি** – দীর্ঘদেহী ও বলিষ্ঠ। **হালদার**- হাওলাদার বা 'হাবিলদার' শব্দজ; সৈন্যাধ্যক্ষ।

বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখিত পদবী সমূহ প্রচলিত আছে। সকল সম্প্রদায়ের মতো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণেরও বৃত্তির পরিবর্তন ঘটায় কোন কোন ক্ষেত্রে পদবীর সঙ্গে বর্তমান বৃত্তির সামঞ্জস্য নেই; কিন্তু অধিকাংশ পদবীতে **'কুলতন্ত্র'** বর্ণিত পৌণ্ড্রগণের ছয়টি লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই পদবী থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণের **শাসনকার্য, তেজস্বিতা, পান্ডিত্য, ধর্মপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, নৌবিদ্যা, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিকিৎসা** ও **কর্মদক্ষতা** বিশেষ গৌরবের পরিচয় মেলে"।[৮] লেখকের উল্লেখিত উপরি উক্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পদবীগুলো ভারতের হিন্দু সমাজের বেশ সম্মানজনক পদবীর সঙ্গে সমতুল্য

স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পদবীগুলো নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হল, উক্ত জাতি দু'টির সংখ্যাধিক্য সংরক্ষিত আসন থেকে যে সকল জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের অনেকের পদবী ভারতীয় হিন্দু সমাজের উচু জাতির পদবীর সঙ্গে বেশ মিল পাওয়া যাবে ।

এবারে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের স্তম্ভ সংসদ ও লোকসভার গঠনের ইতিহাস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরে খসড়া সংবিধান রচনার সময় দেশের আলাপ আলোচনা ও ভোটাভোটির মধ্যে দিয়ে এবং নানান তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্তম্ভ নির্বাচিত সংসদ বা আইনসভা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে সুদূর ইতিহাস ও বৈদেশিক আইনের ভূমিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সংযোজিত হয়েছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার ভারতের যতদিন আইনমাফিক ভালো সরকার গঠন হবে না, ততদিন ধরে আধিপত্যবাদ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। এই আধিপত্যবাদ ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকার শুধুমাত্র জরুরীকালীন ভিত্তিতে ভারতে ব্যবহার করা হবে বলে উল্লেখ করেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ আইন প্রয়োগ থেকে সরে যাওয়ার কথা থাকলেও ভারতের লিখিত সংবিধান না থাকার দরুণ ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত থেকে যায়। কাজেই ভারতের প্রথম সার্বভৌম সাংবিধানিক কাঠামো গঠনের আইনসভার বৈঠক বসে ১৪ ও ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে, ১৯৩৫ এর ভরত শাসন আইনের ৮ নং স্বাধীনতা ধারানুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সরকারিভাবে।[৯] সাংবিধানিক কাঠামোর গঠনগত কার্যকতার নাম ও খসড়া সংবিধান কমিটির গঠন সম্পর্কে। এক্ষেত্রে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে জি. ভি. মাভালাঙ্কার কে ২০ আগস্ট ১৯৪৭ সালে সভাপতিত্ব করে খসড়া সংবিধান কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১০] সাংবিধানিক কমিটিতে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ আইন কতটা গৃহীত হবে এবং তা কি ভাবে ব্যবহার করা হবে, সে সম্পর্কে বিবরণ তৈরি করার সময় মাভালাঙ্কার নির্বাচিত অধ্যক্ষ ও সভাপতির ক্ষমতার উল্লেখ করেন ২৯ আগস্ট ১৯৪৭ সালে। এই বিবরণীতে পৃথক নির্বাচনী কাঠামোকে পরিস্কার ভাবে ভেঙ্গে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।[১১]

ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ আইনের সংশোধন করে সাংবিধানিক কাঠামোয় কমিটি ক্ষমতায়ন করে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি হন এবং অধ্যক্ষের দায়িত্বে জি. ভি.

মাভালাঙ্কার ও খসড়া কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আসেন ড. বি. আর. আম্বেদকর।[১২] এই কমিটির বিভিন্ন তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংসদ কাঠামো গঠনের।[১৩] অবশেষে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরে পূর্ণসদস্যের পদপ্রাপ্ত সংসদ কাঠামোর গঠন সাংবিধানিক আইনের দ্বারা স্বীকৃতি পায়।[১৪]

ভারতের সংবিধানে ৭৯ নং ধারানুসারে সংসদের গঠনগত কাঠামো দুইকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার প্রধান শাসক হিসাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এই দুইকক্ষ হল রাজ্যসভা (উচ্চ কক্ষ) এবং লোকসভা (নিম্ন কক্ষ)।[১৫] ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও কার্যকালের সময় সম্পর্কে ৫৪ (এ), (বি), ৫৫ (১), (২) ও ৫৬ (১) ধারানুসারে রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচনি ব্যবস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন। অর্থাৎ প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাচিত লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যদের ভোটের দ্বারা ৫ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন।[১৬] আইনসভার দুইকক্ষেই রাষ্ট্রপতির ৮৬ ও ৮৭ নং ধারানুসারে বিশেষ কিছু ক্ষমতার কথা উল্লেখ আসছে। যেমন তিনি লোকসভা ও রাজ্যসভার স্বাগত ভাষণ দিয়ে অধিবেশন শুরু করান। দুইকক্ষের কোন কক্ষেই তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সব সময় তিনি রাজ্যসভা ও লোকসভার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং প্রয়োজন অনুসারে লোকসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির ছাড়া ভারতের আইনসভা কার্যকর করতে পারে না।[১৭] কোন বিল নিয়ে যদি সংসদের দুইকক্ষে বিতর্ক তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সমাধান কল্পে ১০৮ (৩) ধারানুসারে রাজ্যসভা ও লোকসভার আসন গ্রহণ করতে পারেন।[১৮] তিনি ১১২ (১) নং ধারানুসারে প্রত্যেক বছর সরকারের কাছ থেকে বাজেট অধিবেশনের আগে অর্থনৈতিক বিবৃতি পেয়ে থাকেন সাংবিধানিক আইনানুসারে।[১৯] সংবিধানের ১৫১ (১), ২৮১, ৩২৩ (১), ৩৩৮ (২), ৩৪০ (৩) এবং ৩৫০ বি(২) নং ধারাগুলি অনুসারে Auditor General, Finance Commission, Union Public Service Commission, Special Officer for Scheduled Cste and Scheduled Tribes and Backward Classes Commission এই সংস্থাগুলি সাংবিধানিক আইনানুসারে পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেসম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সংস্থাগুলির নিকট থেকে তথ্য পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে উক্ত সংস্থাগুলি সাংবিধানিক আইনানুসারে না চললে ভারতের রাষ্ট্রপতি লোকসভার নেতা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুসারে নতুন আধিকারিক নিযুক্ত করে থাকেন।[২০] রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি ১২ জন মনোনীত সদস্য প্রেরণ করতে পারেন ৮০(১০)এ, এবং(৩) নং ধারানুসারে। মনোনীত

সদস্যদের বিশেষ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সামাজিক সেবা দেওয়ার উপর যাদের কার্যকর ভূমিকা থাকেন, সেই সকল বিশিষ্ট মানুষদের তিনি মনোনীত করে রাজ্যসভায় পাঠান।[২১] কিন্তু আমরা রাজ্যসভার দলিল-দস্তাবেজ থেকে জানতে পারি যে, পশ্চিমবঙ্গের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির কোন মানুষই এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য হিসাবে রাজ্যসভায় যেতে পারেন নি।

আমরা আমাদের গবেষণায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজ্যসভার সাংসদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধরিনি। কাজেই আমরা রাজ্যসভার গঠন কাঠামো সম্পর্কে আলোচনায় না গিয়ে লোকসভা গঠন কাঠামো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করব।

ভারতের সংসদের নিম্নকক্ষের লোকসভার সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত হন ১৮ বছরের পর থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিকদের ভোটদানের মাধ্যমে। ৩২৬ নং ধারানুসারে জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, নারীপুরুষ সকল প্রাপ্ত বয়সক নাগরিক গণ ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে পারবে।[২২] সংবিধানের ৮১(১) নং ধারানুসারে সমস্ত রাজ্য থেকে সর্বাধিক ৫৩০ জন সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসেন। আর কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য থেকে সর্বাধিক ২০ জন সদস্যা নির্বাচিত হতে পারেন। নির্বাচিত সকল সদস্য পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।[২৩] ভারতে রাষ্ট্রপতি দুই জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করতে পারেন। ৮১(২), (এ) নং ধারানুসারে লোকসভার সদস্য সংখ্যা সর্বাধিক ৫৫২ জন হতে পারবে। জনসংখ্যার অনুপাতে রাজ্যগুলির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।[২৪] ১৯৭১ সালের জনগণনার পর থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে লোকসভার আসনের মধ্যে সংখ্যাগত ভাবে তপসিলি জাতি (৮৪) ও তপসিলি উপজাতির জন্য (৪৭), সংবিধানের ৮১(৩) নং ধারা অনুসারে ১৩১ টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, যা পরিবর্তন আনা যাবে না।[২৫] বাস্তবে ১০ বছরের জন্য উক্ত আসন গুলি সংরক্ষণ রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় যে ৩৩০ ও ৩৩৪ নং সংবিধান সংশোধনী ধারানুসারে বাড়তে বাড়তে ২০১৪ সাল পর্যন্ত রয়েই গেছে।[২৬] ১৯৫০ সালে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৫০০ জন রাখার কথা সংবিধানে উল্লেখিত ছিল। বর্তমানে ৫৪৩ জন নির্বাচিত হন এবং ২ জন রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য নিয়ে মোট ৫৪৫ জন। ২৫ বছরের যেকোনো ভারতীয় নাগরিক লোকসভার সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। তবে ১১১ নং ধারানুসারে নাগরিকদের কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সদস্যদের

সহযোগে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে একজন অধ্যক্ষ, সহ অধ্যক্ষ, মহাসচিব, লোকসভার প্রধান নেতা (প্রধানমন্ত্রী) ও তাঁর মন্ত্রীসভা, বিরোধী দলের নেতা নিয়ে লোকসভা পরিচালিত হয়। সংবিধানের ৭৮, ৮১, ৯৩, ৯৪, ৯৮ নং ধারানুসারে।[২৭]

৮১ ও ১৭০ অনুচ্ছেদ ধারা অনুসারে শেষ প্রকাশিত জনসংখ্যা অনুযায়ী রাজ্যভিত্তিক লোকসভার সাংসদ ও বিধায়ক সংখ্যা স্থির হবে বলে উল্লেখ আছে।[২৮] উক্ত ধারা দুটি অনুসারে ১৯৫২ সালের প্রথম ১৯৬২ সালের দ্বিতীয় সীমানা পুনর্বিন্যাস আইনানুসারে ভারতীয় জনগণনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভা সাংসদ ও রাজ্যগুলির বিধায়কদের কেন্দ্রগুলির সীমানার পুনর্বিন্যাসের জন্য গঠিত হয় সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশন। সীমানা পুনর্বিন্যাস কাজটি সাধারণত প্রতি জনগণনার পর হওয়ার কথা সাংবিধানিক আইনানুসারে। কিন্তু ১৯৭৬ সালে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচির প্রভাব এড়াতে একটি বিশেষ সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা ২০০০ সাল পর্যন্ত, এই কাজটি স্থগিত করা হয়েছিল।[২৯]

এই গবেষণায় লোকসভায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণের নির্বাচনগুলো হল, ১৯৭১ সালের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯ এবং ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন ধরে আলোচনা করা হবে। প্রথমে আমরা লোকসভা নির্বাচনে ও পরের অংশে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ক্ষেত্রে ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০১, ২০১১, এবং ২০১৬ সালের নির্বাচনগুলো ধরে আলোচনা করব। এবারে আমরা নিম্নে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে উক্ত দু'টি জাতির প্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোকপাত করব। ১৯৬২ সালের সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৪০ টি নির্বাচনীক্ষেত্র রাখা হয়, তার মধ্যে ৮ টি নির্বাচনীক্ষেত্র তপসিলি জাতির জন্য সাংবিধানিক আইনানুসারে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। ৮ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্রের মধ্যে নদীয়া ও চব্বিশ পরগনামধ্যে ৩ টি নির্বাচনীক্ষেত্র সংরক্ষিত হিসাবে পড়ে। চব্বিশ পরগনার ২ টি আসনই বর্তমানের দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পড়েছিল আর বর্তমানের উত্তর ২৪ পরগনায় কোন সংরক্ষিত আসন ছিলনা।[৩০] এই না থাকার কারণ সম্পর্কে আমরা পরে উল্লেখ করব।

যাই হোক আমাদের গবেষণার জেলা ভিত্তিক লোকসভায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে নমঃশূদ্রদের নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সারণি ৩.৫: নির্বাচনক্ষেত্রঃ **১১.** নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বিভা ঘোষ	সি.পি. আই (এম)	১৭৬৫৪৩	৪৬.৮৮
২। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১৬৫৯৪৩	৪৪.০৬
৩। বিজয় কৃষ্ণ সরকার	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (প্রতিষ্ঠান)	২০১১১	৫.৩৪
৪। রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	বাংলা কংগ্রেস	১৩৯৯৫	৩.৭২
মোট ভোটার, ৫৭৬০০৫	ভোট পরে, ৩৯১৬৫৯	বৈধ ভোট হয়, ৩৭৬৫৯২	ভোটিং শতাংশ, ৬৮.০০

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1971 to the Fifth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1973, Page. 192.

১৯৭১ সালের নবদ্বীপ লোকসভা নির্বাচনক্ষেত্রতে চারজন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। কিন্তু আমাদের বলে রাখা প্রয়োজন যে বিভা ঘোষ পদবী থাকা সত্ত্বেও তিনি পূর্ববাংলার যশোর জেলার নমঃশূদ্র পরিবারের মানুষ। এছাড়াও নদীয়ার কৃষ্ণনগর নির্বাচনীক্ষেত্র থেকে নিরসিংহ প্রসাদ সরকার বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৩১] উক্ত নির্বাচনে নমঃশূদ্র জাতির পাঁচজন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। এই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অমানবিক অত্যাচারের শিকার পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দুরা। এই হিন্দুদের বেশির ভাগ মানুষ হলেন নমঃশূদ্র জাতির। বলা যেতে পারে কার্যত গণহত্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের। ফলে তাদের সঙ্গে বহু মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বাধ্য হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। **১৯৭১** সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুর সংখ্যা হয়ে যায় প্রায় এক কোটি। কাজেই পঞ্চম লোকসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্রদের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংখ্যা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় থেকে অনেকটা কম হয়। এর কারণ হল, নমঃশূদ্র যেহেতু উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করার ক্ষেত্রেও তাদের কিন্তু ভোটাধিকার ছিল না। ভোটাধিকার না থাকা সত্ত্বেও উদ্বাস্তু নমঃশূদ্ররা রাজনৈতিক মিছিল ও মিটিং এ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির থেকে অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতেন, ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায়।

এবারে আমরা পঞ্চম লোকসভা নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করব।

সারণি ৩.৬: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৪. জয়নগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। শক্তি কুমার সরকার	ভারতীয় জাতীয় কংগেস	১৫৮৯৪৩	৪১.৬১
২। নির্মল কুমার সিনহা	সি. পি. আই. (এম)	৮৪৭০৭	২২.১৮
৩। চিত্তরঞ্জন রায়	এস. ইউ. সি. আই	৭৬৪২৩	২০.০১
৪। সন্তোষ কয়াল	আর. এস. পি	৪১০০১	১০.৭৩
৫। রনবীর বর্মন	নির্দল	১৪৩০৩	৩.৭৩
৬। হারিপদ মণ্ডল	বাংলা কংগ্রেস	৬৬০৪	১.৭৩
মোট ভোটার, ৫৬১১১৯	ভোট পরে, ৩৯৩৬৯৬	বৈধ ভোট হয়, ৩৮১৯৮৩	ভোটিং শতাংশ, ৭০.১৬

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1971 to the Fifth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1973, Page. ১৯২-৯৩।

সারণি ৩.৭: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৫. মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। মধুরজ্যা হালদার	সি. পি. আই. (এম)	১১১৬৫৬	২৭.০২
২। বিমালেন্দু সেখর নস্কর	ভারতীয় জাতীয় কংগেস	১১০০৭১	২৬.৬৪
৩। কংসারি হালদার	সি. পি. আই	৯১৬৮৮	২২.১৯
৪। আশিস কুমার সিংহ	বাংলা কংগ্রেস	৬৩৬৫১	১৫.৪০
৫। পরেশ কয়াল	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (প্রতিষ্ঠান)	৩৬১২৯	৮.৭৪
মোট ভোটার, ৫৭৭৬৫৯	ভোট পরে, ৪৩১৩২৫	বৈধ ভোট হয়, ৪১৩১৯৫	ভোটিং শতাংশ, ৭৪.৬৭

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1971 to the Fifth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1973, Page. ১৯২-৯৩।

জয়নগর ও মথুরাপুর নির্বাচনীক্ষেত্র দুটিতে মোট ১১ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ১১ জন প্রার্থীই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। কিন্তু

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীর নির্মল কুমার সিনহা পদবী বাংলার তথাকথিত উচ্চজাতির পদবী । তা সত্ত্বেও সরকারি নথি থেকে জানা যায় তিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। পঞ্চম লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার নির্বাচনীক্ষেত্র থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (প্রতিষ্ঠান) পক্ষ থেকে শুধাংসু ভূষণ দাস ও আলিপুর নির্বাচনীক্ষেত্র থেকে সি. পি. আই (এম) পক্ষ থেকে কমল সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৩২] এই নির্বাচনে মোট ১৩ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। যা নমঃশূদ্র জাতির থেকে প্রায় তিনগুন বেশি। কাজেই আমরা বলতে পারি যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অধিকাংশ মানুষের বসতি বর্তমানের দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হওয়ার দরুণ তাদের নমঃশূদ্র জাতির মত উদ্বাস্তু সমস্যায় পড়তে হয়নি। সেদিক থেকে উক্ত নির্বাচনে সংসদীয় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পৌণ্ড্রদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নমঃশূদ্রদের থেকে অনেক এগিয়ে।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের উল্লেখ করে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ নামে বিশ্বরাজনীতিতে পরিচিতি পায়। পাকিস্তান বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধার নায়ক মুজিবর রহমানকে মুক্তি দেয়। কাজেই ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় আসেন। এই সময় ভারত সরকার ভয়াবহ উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান কল্পে প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুকে দ্রুত বাংলাদেশের তাদের ঘরে ফিরিয়ে দেয়।[৩৩] বিশেষ করে কয়েকবছরের মধ্যেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া নমঃশূদ্রদের বেশির ভাগ মানুষ আবার বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। ফলে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে সংখ্যায় বেশি হয়ে যায়। কিন্তু ভোটদানের ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্ররা সংখ্যায় অধিক হয়নি।

এবারে আমরা ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে করব।

“১৯৭৩ সালের গঠিত তৃতীয় ডিলিমিটেশন কমিশন ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার জন্য ৪২ টি আসন বরাদ্দ করেছিল”।[৩৪] ১৯৭৭ সালের ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৪২ টি নির্বাচনীক্ষেত্রের মধ্যে ৮ টি নির্বাচনীক্ষেত্র তপসিলি জাতির জন্য সাংবিধানিক আইনানুসারে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। ৮ টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে নদীয়া ও চব্বিশ পরগনামধ্যে ৩ টি নির্বাচনীক্ষেত্র সংরক্ষিত হিসাবে পরে। চব্বিশ পরগনার ২

টি আসনই বর্তমানের দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পড়েছিল আর বর্তমানের উত্তর ২৪ পরগনায় কোন সংরক্ষিত আসন ছিলনা।[৩৫] যাই হোক আমাদের গবেষণার জেলা ভিত্তিক ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে নমঃশূদ্রদের নিয়ে নিম্নে আলোচনা করব।

সারণি ৩.৮: নির্বাচনক্ষেত্রঃ **১২.** নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বিভা ঘোষ (গোস্বামী)	সি.পি. আই (এম)	১৯৩৭১৪	৫৩.৬৮
২। নিতাইপদ সরকার	সি. পি. আই	১০৬৪২৮	২৯.৪৯
৩। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর	নির্দল	৫২৯৬২	১৪.৬৮
৪। হরিপদ বিশ্বাস	নির্দল	৬৩৪৪	১.৭৬
৫। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ বর্মন	নির্দল	১৪০৬	০.৩৯
মোট ভোটার, ৬৩৫৪৫৬	ভোট পরে, ৩৭১৯৩৩	বৈধ ভোট হয়, ৩৬০৮৫	ভোটিং শতাংশ, ৫৮.৫৩

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1977 to the Sixth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1978, পৃঃ ১৯৩।

ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে উক্ত জেলাগুলোই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ৪ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ বর্মন অংশগ্রহণ করেন।[৩৬] নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মতুয়াদের প্রাণ পুরুষ প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ১৯৭১ সালের নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি নির্দল প্রার্থী হয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং পরাজিত হন। পি. আর. ঠাকুর নির্দল প্রার্থী হওয়া সম্পর্কে মতুয়া গবেষক মনোশান্ত বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন, “প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর তাঁর নিজের সমর্থনকারী নিম্নবর্নের তপশিলী জাতি, নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের উন্নয়ন ও স্বাভাবিক সামাজিক স্রোতে ফিরিয়ে আনার বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বের সমাদর পাননি। এই অবস্থায় ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন”।[৩৭] পি.আর. ঠাকুরের রাজনৈতিক অবসর নেওয়া সম্পর্কে আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৬৭ সালে তিনি যখন বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হন তখন থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে মনের অমিল ঘটতে থাকে। যদিও ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তা দেখে তিনি পুনরায়

জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। আর এই সময় দেশের জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি টালমাটল থাকার কারণেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী বামপন্থী রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ছিলেন জাতিভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী তাঁর পক্ষে বামপন্থীদের সঙ্গে মিলিত ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন করা সম্ভব ছিলনা বলে মনে করা যেতেই পারে। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, বামপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল, তারা শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী কাজেই তারা ভারতে জাতি-ভিত্তিক বৈষম্য সমাধানে ততটা আগ্রহী ছিল না। বামপন্থীরা মনে করতেন শ্রেণী না থাকলে জাতিবিভেদ ও ভারতের সমাজে থাকবে না। কিন্তু দেখা যায়, ভারতীয় রাজনীতিতে ও সমাজে জাতিভেদ ও শ্রেণী এক নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা রিক্সাচালক ভর্ট্টচার্য্যর কন্যার সঙ্গে কোটি পতি ডোমের ছেলের বিয়ে সামাজিক ভাবে রিস্কাচালক কখনেই দেবেন না। এই হল আমাদের দেশের শ্রেণী ও জাতিভেদের মধ্যে পার্থক্য। যা বামপন্থী দলগুলো কখনই নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা হিসাবে জাতিভেদ বিলুপ্ত করার তেমন কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন করেনি।

প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উপর থেকে আস্থা হারানো সম্পর্কে নিম্নে আমরা ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট কয়েকটি ঘটনা ও পরিস্থিতি তুলে ধরব।

১। ভারতীয় সংবিধানের ৩৫২ ধারা আনুসারে যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল জনগণ তা প্রথম দিকে মেনে নিয়েছিল। এর কারণ হল ভরতে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার কথা শ্রীমতী গান্ধী বার বার জনগণের সামনে তুলে ধরেন। ফলে জনগণ মনে করলেন এই জরুরি অবস্থাতা সাময়িক সময়ের জন্য, পরে আবার নির্বাচন হবে ও সরকার গঠিত হবে সাংবিধানিক আইনানুসারে। কিন্তু জনমনে এই প্রশ্ন ছিলনা যে, এই জরুরি অবস্থার মাধ্যমে কংগ্রেসের একনায়কতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়ার এক প্রয়াস।[৩৮] জনগণ যখন বুঝতে পারলেন যে, এই জরুরি অবস্থার জন্যেই ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরবে তখন থেকেই জনমানসে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি তথা কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ফলে কংগ্রেসের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এর পূর্ণ সদ্ব্যহার করতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও বাংলার সাধারণ মানুষকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

২। ১৯৭৩ সালের কুখ্যাত তৈল – ধাক্কা, যখন অশোধিত তেলের বিশ্বমূল্য চার গুণ বেড়ে গেল। ফলে পেট্রোলিয়াম – জাত পণ্যের ও সারের মূল্য বিপুল হারে বাড়ল। কাজেই বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার প্রচণ্ড টান পড়ল, বাজেটের ঘাটতি আরও বাড়ল, অর্থনৈতিক মন্দা আরও ঘনীভূত হল। ফলে এইসমস্ত কারণের সম্মিলিত পরিণামের ফলে জিনিসপত্রের দাম একটানা বেড়েই চলল। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে উক্ত সমস্ত দ্রব্যের দাম বাড়ে ২২% হারে। কাজেই এই মুল্যবৃদ্ধি দরিদ্র আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ব্যাপক আঘাত করে। আবার এর পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্যের ঘাটতি চলতেই থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভুখা দাঙ্গা বেধে যায়।[৩৯] এই সময় দেশের জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধীরা সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরাবস্থা তুলে ধরলেন জনমানসের সামনে। কাজেই শ্রীমতী গান্ধির গরিবি হাটাও নীতিকে কংগ্রেস বিরোবী রাজনৈতিক দলগুলো ভুলপ্রমানে করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পরেন। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরাও উক্ত পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগে দরিদ্র ও উদ্বাস্তু এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্ঠা করেন। এবং বামেরা ১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে উক্ত শ্রেণীর বিপুল সমর্থনও পায়।

৩। আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়, বিশেষ করে ১৯৭৪-৭৫ এ। ধর্মঘট, ছাত্র বিক্ষোভ এবং জনসাধারণের মিছিল অনেক সময় সহিংস হয়ে উঠল। অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় একটানা বন্ধ থাকার কারণে ছাত্র সমাজ তথা জনমানসেও শ্রীমতী গান্ধি ও তাঁর কংগ্রেস দলের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়।[৪০] এর মধ্যে উত্তর প্রদেশের প্রভিনশিয়াল আর্মস কনস্ট্যাবুলারিতে বিদ্রোহ তৈরি হয়। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। কাজেই সেনাবাহিনী ও আর্মস ফোর্সের মধ্যে সংঘর্ষে প্রায় ৪৫ জন আর্মস কনস্টেবল ও সেনার মৃত্যু হয়। এর প্রভাব সারা দেশের পুলিশ ও সেনার মধ্যে কংগ্রেস সম্পর্কে বিরূপ ধারণা তৈরি হয়। ফলে সমাজের তিনটি প্রধান অংশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল। এটা এমন একটা বড় ঘটনা যা আগে ঘটেনি। বলা যেতে পারে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সরে যায় মুল্যবৃদ্ধি আর দুর্নীতির দরুন। ধনী চাষিরা সরে গেল ভূমি সংস্কারের ভয়ে। আর পুঁজিপতিরা ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলে গেল সমাজতন্ত্রের কথাবার্তা শুনে, এবং ব্যাঙ্ক আর কয়লা শিল্প জাতীয়করণ ও একচেটিয়া- বিরোধীতার ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে। গরিবরা অবশ্য কংগ্রেসকে সমর্থন করতে লাগল, যদিও উত্তরোত্তর নিষ্ক্রিয়ভাবে।[৪১] দারিদ্র শ্রেণী কংগ্রেসকে নিষ্ক্রিয়ভাবে সমর্থন করার পশ্চাতের কারণ হল ধনী কৃষক ও পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য। এই

সময় ভারতের রজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সাধারণ মানুষ গ্রামের কর্তা বা মোড়লের কথা মত কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে অংশগ্রহণ করতেন।

৪। ১৯৭৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সঞ্জয় গান্ধির নেতৃত্বাধীন যুব কংগ্রেসের গুরুত্ব মূল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংগঠনের চেয়ে বেশি হয়ে ওঠাই প্রবীণ নেতাদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়।[৪২] এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব জনগণের সামনে চলে আসে। তবে জরুরি অবস্থার জনপ্রিয়তা হারনোর একটা বড় কারণ হল সঞ্জয় গান্ধির উক্ত রাজনৈতিক অভ্যুত্থান। এই সময় সরকারে বা কংগ্রেসে কোথাও সঞ্জয় গান্ধির পদ ছিল না, অথচ তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা ক্ষমতা যা সংবিধান বহির্ভূত বলে অন্যান্য নেতৃত্বরা সমালোচনা করেন। এই সমস্ত নানা বিধ জটিলতার দিকে লক্ষ্য দিয়েই প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

৫। জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর আন্দোলনে ভারতীয় জীবন ও রাজনীতি থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্যই তার উদ্ভব, কার্যত যে দুর্নীতির উৎসমুখ ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি। আর গণতন্ত্রকে রক্ষা করা, যা শ্রীমতী গান্ধির স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর রাজনীতির ও প্রশাসনের ধাক্কায় বিপন্ন হয়ে পড়েছিল বলে জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রায় সবসময় অভিযোগ করতেন যে শ্রীমতী গান্ধি সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নিজের মতন করতে চাইছেন, তিনি ক্ষমতার ক্ষুধা মেটানোর জন্য সোভিয়েত মদতে এক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু করতে চাইছেন।[৪৩] জয়প্রকাশ নারায়ণ এই সময় সারা ভারতে ইন্দিরা গান্ধি ও কংগ্রেসের নামে উক্ত সকল মন্তব্যগুলো জনগণের সামনে ব্যাপক ভাবে প্রচার চালান। যার প্রভাব আমাদের রাজ্যেও পড়েছিল বিশেষ করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত একটি সংরক্ষিত আসনে জয়ও পায় ভারতীয় লোক দল।

নিম্নে ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৩.৯: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৫. জয়নগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। শক্তি কুমার সরকার	ভারতীয় লোক দল	১৮০৫৮৭	৪৮.৯২
২। নির্মল কান্তি মণ্ডল	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১১৯৯৫০	৩২.৪৯
৩। প্রবোধ পুরকাইত	এস. ইউ. সি. আই	৬৮৬৪৬	১৮.৫৯
মোট ভোটার, ৬২৬০৫০	ভোট পরে, ৩৮০২১৩	বৈধ ভোট হয়, ৩৬৯১৮৩	ভোটিং শতাংশ, ৬০.৭৩

সারণি ৩.১০: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৬. মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। মুকুন্দ কুমার মণ্ডল	সি. পি. আই (এম)	১৮৮২২৭	৪৮.৫৭
২। পুর্নেন্দু সেখর নস্কর	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১৪৬৬৩৫	৩৭.৮৪
৩। রেনুপদ হালদার	এস. ইউ. সি. আই	৪৪৮৩৭	১১.৫৭
৪। মাখন চন্দ্র বৈদ্য	নির্দল	৫১৩৭	১.৩৩
৫। অজিত কুমার রায়	নির্দল	২৬৮২	০.৬৩
মোট ভোটার, ৬০১৮৮৫	ভোট পরে, ৩৯৭৪৮৫	বৈধ ভোট হয়, ৩৮৭৫১৮	ভোটিং শতাংশ, ৬৬.০৪

সূত্রঃ নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৫ ও ১৬ নেওয়া হয়েছে, Statistical Report on General Elections.1977 to the Sixth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1978, পৃঃ ১৯৩।

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৯ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা উত্তর পূর্ব সাধারণ কেন্দ্র থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা উপেন্দ্রনাথ হালদার অংশগ্রহণ করেন।[৪৪] উপরিউক্ত নির্বাচনেও নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা প্রায় দ্বিগুণ প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত নির্বাচনে নমঃশূদ্রদের পিছিয়ে থাকার মূল কারণ হল, তাদের উদ্বাস্তু হয়ে থাকার কারণে ভোটাধিকার না থাকার জন্য। কিন্তু ঐ কথা আবারও উল্লেখ করতে হয় যে, সংসদীয় নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ না পেলেও সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক মিছিল ও মিটিং এদের অংশগ্রহণ আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে অনেক বেশি ছিল।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে নদীয়া ও ২৪ পরগনার ৩ টি সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই.এম. জয় পায় ২ টি আসনে, আর ভারতীয় লোক দল ১ টি আসনে জয় পায়। এই নির্বাচনে বি. এল. ডি ২৯৫ টি, সি. পি. আই ৭ টি, সি. পি. আই. এম. ২২ টি, আই. এন. সি. ১৫৪ টি এবং এন. সি. ও. ৩ টি আসনে জয় পায়।[৪৫] মূলত কংগ্রেস ভারতীয় লোক দলের কাছে মুখথুবড়ে পড়েছিল। যদিও জনতা সরকার আর জনতা পার্টির মধ্যে উপদলীয় সংঘাত খুব তীব্র হয়ে ওঠে ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি নাগাদ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিংহকে ১৯৭৮ সালের ৩০ জুন মন্ত্রীসভা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল বলে। আবার ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে অর্থমন্ত্রী রূপে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হলে সোশ্যালিস্টদের সাহায্য নিয়ে তিনি পার্টি আর সরকারকে টুকরো টুকরো করে দেন। এই সময়

জনসঙ্ঘের সদস্যরা জনতা পার্টি এবং আর.এস.এস.-র দ্বৈত সদস্যপদ ত্যাগ করতে রাজী না হওয়ায় সোশ্যালিস্টরা জনতা পার্টি আর জনতা সরকার থেকে পদত্যাগ করে। কাজেই সংখ্যালঘু হয়ে পরায় মোরারজি দেশাই-র সরকার ১৫ জুলাই পদত্যাগ করল। এর এক সপ্তাহ পরে চরণ সিংহ কংগ্রেসের সহযোগিতা সরকার গঠন করেন। কিন্তু ১৯৭৯ সালের ২০ অগাস্ট আস্থা ভোটের একদিন আগে ইন্দিরা গান্ধি চরণ সিংহের ওপর থেকে তাঁর সমর্থন তুলে নিলেন। এই সমর্থন প্রত্যাহার করার পিছনে ইন্দিরা গান্ধীর দাবী ছিল, চরণ সিংহ তাঁর বিচারে উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিশেষ আদালতগুলো তুলে দিন, কিন্তু চরণ সিংহ রাজি হলেন না। কাজেই চরণ সিংহের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে মধ্যবর্তীকালীন লোকসভা নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন।[৪৬] কাজেই ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে সপ্তম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নে আমরা ১৯৮০ সালের সপ্তম নির্বাচনে নদীয়া ও ২৪ পরগনার সংরক্ষিত আসনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করব।

রণি ৩.১১: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১২. নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বিভা ঘোষ গোস্বামী	সি.পি.আই.এম.	৩০১২৯৬	৫৪.৬৯
২। আনন্দ মোহন বিশ্বাস	আই.এন.সি (আই)	২১৭৮৩১	৩৯.৫৪
৩। নিলকমল সরকার	জে.এন.পি	১৯৬১৮	৩.৫৬
৪। কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস	আর.পি.আই	৪৯০১	০.৮৯
৫। সুশীল কুমার রায়	আই.এন.সি (ইউ)	৪৫১৩	০.৮২
৬। অমূল্য কুমার বিশ্বাস	জে.এন.পি. (এস)	২৭১০	০.৪৯
মোট ভোটার, ৭১৮৪৪৯	ভোট পরে, ৫৬২৪৯২	বৈধ ভোট হয়, ৫৫০৮৬৯	ভোটিং শতাংশ, ৭৮.২৯

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections, 1980 to the Ssventh Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1981, পৃঃ ২৩৬।

১৯৮০ সালের নির্বাচনে নদীয়া ও ২৪ পরগনাজেলার ৩ টি সংরক্ষিত আসন থেকে মোট ৬ জন নমঃশূদ্র প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে কোন প্রার্থীই জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু এই নির্বাচনে আনন্দ মোহন বিশ্বাস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (ইন্দিরা) টিকিটে প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নবদ্বীপ কেন্দ্র

থেকে সি. পি. আই. এমের বিভা ঘোষ গোস্বামী নির্বাচনে জয় লাভ করে।[৪৭] আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিভা ঘোষ গোস্বামী নমঃশূদ্র হলেও তিনি মতুয়া ছিলেন না। এই নির্বাচনে পি. আর. ঠাকুর নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন না, বলে আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কাজেই মরিচঝাপি বিপর্যয়ের কারণে নমঃশূদ্ররা অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসের হয়ে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মিছিল- মিটিং এ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করে। যেটা কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে এইরূপ অংশগ্রহণ করেন নি।

সারণি ৩.১২: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৫ জয়নগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সনৎ কুমার মণ্ডল	আর.এস.পি	২৩৬০৪৪	৪৫.৭২
২। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	আই.এন.সি. (আই)	১৮৭৫১৫	৩৬.৩২
৩। রাজারাম রায় মণ্ডল	এস.ইউ.সি	৮২৬৪৫	১৬.১০
৪। শক্তিকুমার সরকার	জে.এন.পি.	১০০৫৮	১.৯৫
মোট ভোটার, ৬৯৫৪৬৮	ভোট পরে, ৫২৮৩৩৩	বৈধ ভোট হয়, ৫১৬২৬২	ভোটিং শতাংশ, ৭৫.৯৭

সারণি ৩.১৩: নির্বাচনক্ষেত্রঃ ১৬ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। মুকুন্দরাম মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	২৬২৯১৭	৫১.৬১
২। বিমলেন্দু শেখর নস্কর	আই .এন.সি. (আই)	১৮৫০৭৫	৩৬.৩৩
৩। রেনুপদ হালদার	এস.ইউ.সি	৪৬৯২৭	৯.২১
৪। বৃন্দাবন গায়েন	জে.এন.পি	১১১৪৮	২.১৯
৫। মাখন চন্দ্র বৈদ্য	নির্দল	৩৩৫৮	০.৬৬
মোট ভোটার, ৬৭৪৫৭৭	ভোট পরে, ৫১৮৫৭৭	বৈধ ভোট হয়, ৫০৯৪২৫	ভোটিং শতাংশ, ৭৬.৮৭

সূত্রঃ নির্বাচনক্ষেত্র - **১৫, ১৬,** Statistical Report on General Elections.1980 to the Seventh Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1981, পৃঃ ২৩৭।

জয়নগর ও মথুরাপুর সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকেই মোট ৯ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত দুটি কেন্দ্র থেকেই বামপন্থীরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমরা দেখতে পেলাম সংরক্ষিত ৩ টি আসন থেকেই বামপন্থীরা

নির্বাচিত হয়েছেন।[৪৮] এই প্রসঙ্গে আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থী দলের বিপুল জয়ের ফলেই ১৯৮০-র লোকসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্ররা ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মূলত জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটের দিকে নজর না দিয়ে রাজ্যের ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের হয়েই অধিকভাবে সংসদীয় রাজনৈতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন বলে আমরা বলতে পারি। এই নির্বাচনে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশগ্রহণের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিল। আবার একটা বিষয় উল্লেখ করা যায় যে, নমঃশূদ্র অধ্যুষিত নবদ্বীপ কেন্দ্রতে অন্যান্য তপশিলি জাতির কোন প্রার্থীই অংশগ্রহণ করেননি। অন্যদিকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত জয়নগর ও মথুরাপুর কেন্দ্রতেও পৌণ্ড্র ছাড়া অন্য কোন তপশিলি জাতির প্রার্থী অংশগ্রহণ করেননি। কাজেই আমরা বলতে পারি যে তপশিলিদের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিই নদীয়া এবং ২৪ পরগনাথেকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল।[৪৯] কাজেই সংসদীয় নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে জাতি সামাজিক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ বেশি থাকেন, তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশগ্রহণেও অধিক সংখ্যায় থাকে বলে নির্বাচনী তথ্য প্রমাণ থেকে আমরা পেয়ে থাকি।

১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনে সি.পি.আই. ১০ টি, সি.পি.আই.(এম) ৩৭ টি, আই.এন.সি (আই). ৩৫৩ টি, আই.এন.সি. (ইউ) ১৩ টি, জে.এন.পি. ৩১ টি, সে.এন.পি.(এস), ৪১ টি আসনে জয় পায়। আর বাকী আসন গুলোতে রাজ্য ও আঞ্চলিক দল গুলো জয় পেয়েছিল।[৫০] শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। অন্যদিকে নির্বাচনের পরে জনতা দল আবার ভাঙল ১৯৮০ দশকের শেষে পুরনো জনসঙঘ নেতারা বেড়িয়ে এসে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠন করলেন। জগজীবন রাম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (ইউ) তে যোগদান করেন। কাজেই এই সময় ইন্দিরা গান্ধির কংগ্রেস ব্যাপক সফলতা পায়। বিরোধী দলগুলোর কাছ থেকে কেন্দ্র সরকার কোনও ধাক্কা খায়নি, তবু ইন্দিরা গান্ধি তাঁর দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কতকগুলি সমস্যার মুখে পরেন। ১৯৮০ সালের ২৩ জুন সঞ্জয় গান্ধি বিমান চালাবার সময় মারা যান। এতে শ্রীমতী গান্ধি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং সঞ্জয় গান্ধির জায়গা ভরাট করার চেষ্টা করেন তাঁর বড় ছেলে রাজীব গান্ধিকে দিয়ে। রাজীবকে রাজনীতিতে নিয়ে আসা হয়, সাংসদ হিসাবে জেতানো হয়, তারপর ১৯৮৩ সালে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে বসানো হয়। ইতিমধ্যেই সাম্প্রদায়িক, ভাষাগত, এবং জাতপাত সংক্রান্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে যার ফলে দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা ১৯৮০ থেকে

১৯৮৪ পর্যন্ত এবং তার পরেও চলতে থাকে, এমনকী দক্ষিণ ভারতকেও গ্রাস করতে শুরু করে । ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধির দু'জন শিখ নিরাপত্তার রক্ষীর গুলিতে মুত্যু হয় এবং কংগ্রেস সংসদীয় কমিটি তৎক্ষণাৎ তাঁর ৪০ বছর বয়সি পুত্র রাজীব গান্ধিকে প্রাধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করেন।[৫১] শ্রীমতী গান্ধির মুত্যুর পরে ১৯৮৪ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অষ্টম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই এই লোকসভা নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের কাছে বিরাট বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়। জাতিগত, ভাষাগত ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হবে, এবং সরকার গঠন করে দেশের গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তির পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে।

রাজীব গান্ধির নেতৃত্বে ভারতীয় দরিদ্র জনগণের রাজনৈতিক ও শিক্ষা এবং নারিরদের স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এনে পঞ্চায়েতের যাবতীয় সংস্থার নির্বাচিত আসনের শতকরা ৩০ ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন। এছাড়াও সুপারিশ করা করা হয় যে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের শতকরা ৫০ ভাগ হবেন মহিলা। ১৯৮৯ সালের মে মাসে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা করে সম্মতি জানালেন। তখন রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে সভা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এর আগে কোন সরকার কখনও গণতন্ত্র আর উন্নয়ন বিষয়ে তৃণমূল স্তর থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি স্তরের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতামত নিয়ে একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে এত যত্ন সহকারে বিবেচনা করে দেখেনি বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। আবার অন্যদিকে গ্রামের গরিবদের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত প্রকল্প 'জওহর রোজগার যোজনা'। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের প্রতিটি গরিব পরিবারের অন্তত একজন করে সদস্য যাতে বছরে ৫০- ১০০ দিন কাজ পায় তাঁর বন্দোবস্ত করা। যে নতুন শিক্ষানীতি আনা হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্যেও ছিল গ্রাম ও গ্রামের গরিব মানুষ। এই শিক্ষানীতির তিনটি প্রধান অঙ্গ ছিল স্বাক্ষরতা অভিযান, অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, দুরশিক্ষা এবং নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।[৫২] এই নীতিগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য হল রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে গেলে ভারতীয় গ্রামের গরিব মানুষের নুন্নতম শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সাবলম্বী থাকা প্রয়োজন। আর আমরা প্রায় সকলেই কমবেশি জানি যে দলিত/তপশিলি জাতির অধিকাংশ মানুষের বসবাস গ্রামেই।

সে যাইহোক এবারে আমরা নিম্নে ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে নদীয়া, উত্ত ২৪ পরগনাএবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংরক্ষিত আসনে এবং সাধারণ আসনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রার্থীদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৩.১৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২ নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। অসীম বালা	সি.পি.আই.এম	৪৬৯০৬২	৫১.৮৬
২। আনন্দ মোহন বিশ্বাস	আই.এন.সি	৪১৬৩৯৯	৪৬.০৩
৩। তুষার বিশ্বাস	বি.এস. পি	৮৬৭২	০.৯৬
৪। মধুসূদন বালা	নির্দল	৫২৪০	০.৫৮
৫ বিপদ ভঞ্জন রায়	নির্দল	৪৩৫৭	০.৪৮
৬। বিরেন্দ্রনাথ পোদ্দার	নির্দল	৭৯৭	০.০৯
মোট ভোটার, ১০৭৪৬০৭	ভোট পরে, ৯১৮০৬৩	বৈধ্য ভোট হয়, ৯০৪৫২৭	ভোটিং শতাংশ, ৮৫.৪৩

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1989 to the Ninth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1990, পৃঃ ২৮৩।

এই নির্বাচনে নবদ্বীপ সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে যে ৬ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৬ জন প্রার্থীই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। এছাড়াও জয়নগর সংরক্ষিত আসনে থেকে জগদীশ কীর্তনিয়া অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং সাধারণ আসন থেকে যে সকল নমঃশূদ্ররা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হলেন, কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে পতিত প্রবণ বিশ্বাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৪১৯১), ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ২২৬১)। বারাসাত কেন্দ্র থেকে শশাধর বিশ্বাস (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৭৫৪৭), প্রতুল রায় (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১১৪২০)। বাসিরহাট কেন্দ্র থেকে বিশ্বপতি বিশ্বাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৫৪২)। ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে পরিমল কান্তি রায় (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৭৪৮৫)। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে মোট ১৩ জন নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৫৩] নবদ্বীপ সংরক্ষিত আসনে সি.পি.আই.এম. প্রার্থীই জয়ী হয়েছিলেন। কাজেই বলা যেতে পারে বামেরা নমঃশূদ্রদের ভোট ধরে রাখতে পেরেছিল।

সারণি ৩.১৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ জয়নগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সনৎ কুমার মণ্ডল	আর.এস.পি	৩৩৭৬১১	৪৫.৩৫
২। অর্ধেন্দু শেখর নস্কর	আই.এন.সি	২৭৩৮০৪	৩৬.৭৮
৩। রাজারাম মণ্ডল	নির্দল	১১৪৪৩০	১৫.৩৭
৪। অনাদি নস্কর	বি.জে.পি	১৪০৫৫	১.৮৯
৫। রাধা গোবিন্দ মণ্ডল	নির্দল	১৯২৫	০.২৬
৬। সবিতা নস্কর	বি.এস.পি	১৫০৩	০.২০
৭। জগদীশ কীর্তনিয়া	এ.এম.বি	১০৫৭	০.১৪
মোট ভোটার, ৯৩২১৬৮	ভোট পরে, ৭৫৮২৪২	বৈধ ভোট হয়, ৭৪৪৩৮৫	ভোটিং শতাংশ, ৮১.৩৪

সারণি ৩.১৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৬ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	সি.পি.আই.এম	৩৫৯৯৪১	৪৯.৩৩
২। মনোরঞ্জন হালদার	আই.এন.সি	৩৩৭৩০৯	৪৬.২৩
৩। সমীর কুমার নাইয়া	নির্দল	৩২৪৩৪	৪.৪৪
মোট ভোটার, ৮৭৫১৮৪	ভোট পরে, ৭৩৯৫৯৬	বৈধ ভোট হয়, ৭২৯৬৮৪	ভোটিং শতাংশ, ৮৪.৫১

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ ও ১৬, Statistical Report on General Elections.1989 to the Ninth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1990, পৃঃ ২৮৪।

জয়নগর ও মথুরাপুর সংরক্ষিত কেন্দ্র দুটিতে মোট ৯ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৯ জনের মধ্যে ১ জন নমঃশূদ্র ও ১ কৈবত জাতির মানুষ আর ৭ জনই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। এছাড়াও সাধারণ আসন থেকে যে সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হলেন, বারাসাত কেন্দ্র থেকে বিশ্বেশ্বর মণ্ডল (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ১৪৭২)। বসিরহাট কেন্দ্র থেকে দীপক কুমার মণ্ডল (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৫৪৯)। এই নির্বাচনে মোট ৯ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৫৪] এই নির্বাচনে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে অংশগ্রহণে ৪ জন এগিয়ে থাকলেও নির্বাচিত প্রার্থীর দিক থেকে ১ জনে পিছিয়েছিল। নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নমঃশূদ্রদের ৪ জন প্রার্থী এগিয়ে থাকার মূল কারণ হল, কাশীরামের নেতৃত্বে বহুজন সমাজ পার্টি হয়ে সামাজিক

আন্দোলনে সচেতন নমঃশূদ্ররা অধিক সংখ্যায় রাজনৈতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। আবার জয়নগর ও মথুরাপুর কেন্দ্র দুটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত হওয়ার কারণে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়ে ছিলেন।

১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বি.জে.পি. জয় পায় ৮৫ টি, সি.পি.আই. ১২ টি, সি.পি.আই.এম. ৩৩ টি, আই.সি.এস (এস.সি.এস), ১ টি, আই.এন.সি. ১৯৭ টি, জে.ডি. ১৪৩ টি, জে.এস.পি. (জে.পি.) শূন্য, এল.কে.ডি (বি), শূন্য, রাজ্য স্তরের দল পায় ২৭ টি, আঞ্চলিক দল ১৯ টি, নির্দল ১২ টি আসনে জয় পেয়েছিল।[৫৫] নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়া দরুন ১৯৭ টি আসনে নিয়ে রাজীব গান্ধি সরকার গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট করে দিলেন যে কংগ্রেস সরকার গড়তে আগ্রহী নয়। বামপন্থী দলগুলো ও বি.জে.পি তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করল যে জাতীয় ফ্রন্ট সরকারকে তারা বাইরে থেকে সমর্থন দেবেন। এই ভাবেই স্বাধীনতা উত্তর ভারতে দ্বিতীয় বার অ-কংগ্রেস সরকারের কর্মভার জাতীয় ফ্রন্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে এগিয়ে এলো। সরকার গঠনের সূচনাপর্বটি খুব মসৃণ হল না। কারণ চন্দ্রশেখর ও ভি.পি. সিংহ দু'জনেই প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবিদার হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে দেবী লাল বললেন, তাঁকে উপ- প্রাধানমন্ত্রীর পদ দিতেই হবে। বলা যেতে পারে নির্বাচন শেষ হওয়া মাত্রই এঁদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী উচ্চাশা অহং, মতাদর্শগত ইচ্ছাগুলো সব জনগণের সামনে প্রকাশ্যে উঠে এলো। বেশ কঠিন অবস্থার মধ্যেই ভি.পি. সিংহ ২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কেবল উপ-প্রধানমন্ত্রী দেবী লাল। পরস্পরের প্রতি যে রাজনৈতিক বিশ্বাসটা থাকার দরকার ছিল তা তাদের মধ্যে না থাকার দরুন অল্পকিছু দিনের মধ্যেই বিরোধিতার সম্পর্কের দিকে চলে যায়।[৫৬] এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৯০ সালের ৭ আগস্ট ভি.পি. সিংহ সংসদে করলেন জনতা সরকার (১৯৭৭-৭৯) নিয়োজিত মণ্ডল কমিশনের কার্যকর করা হবে। ঘোষণা অনুসারে ও.বি.সি. দের জন্য সরকারি চাকুরি ও সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৭% সংরক্ষিত রাখা হয়। আগে থেকেই তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতিদের জন্য ২২.৫% সংরক্ষিত ছিল। কাজেই মোট সংরক্ষিত হয়ে দাঁড়াল ৪৯.৫% , যা সমাজের অগ্রগতি ও উৎকর্ষ শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রের উৎকর্ষতা ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দেওয়ায় ভি.পি. সিংহের সম্পর্কে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যাপক হারে দেখা দেয়।[৫৭] ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ভি.পি.সিংহের সরকার পরে যায়। কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে চন্দ্রশেখর সরকারের কার্যভার গ্রহণ করেন ১০ নভেম্বর ১৯৯০ সালে। ১৯৯১ সালের ৫ মার্চ কংগ্রেস সমর্থন তুলে নেওয়ায় চন্দ্রশেখরের

সরকার পড়ে যায়। এই সময় ভারতীয় নির্বাচন কমিশন ১৯ মে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন। একদফা নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে ১৯ মে মাদ্রাজের শ্রিপেরুম্বুদুর নামক জায়গায় রাজীব গান্ধীর বক্তৃতার শেষে এক মানব বোমার আঘাতে তাঁর দেহ ছিন্নবিন্ন হয়ে যায়।[৫৮] এবারে আমরা নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনাও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংরক্ষিত আসন ও সাধারণ আসনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ১৯৯১ সালের লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে আলচনা করব।

সারণি ৩.১৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২ নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। অসীম বালা	সি.পি.আই.এম	৪১৮৩৭৪	৪৬.৬৬
২। অপূর্ব লাল মজুমদার	আই.এন.সি	৩৫১৭৯৭	৩৯.২৪
৩। হরিপদ বিশ্বাস	বি.জে.পি	১০৯৪৯২	১২.২১
৪। শম্ভুনাথ দাস	নির্দল	৭১১৩	০.৭৯
৫। সত্যরঞ্জন রায়	বি.এস.পি	৬০৯০	০.৬৮
৬। কিরণ মণ্ডল	নির্দল	২৪৫৫	০.২৭
৭। নদীরচাঁদ মণ্ডল	নির্দল	১২৮৯	০.১৪
মোট ভোটার, ১০৯৪২১৫	ভোট পরে, ৯১২১৯৯	বৈধ ভোট হয়, ৮৯৬৬১০	ভোটিং শতাংশ, ৮৩.৩৭

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1991 to the Tenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1992, পৃঃ ৩০৫।

দশম লোকসভা নির্বাচনে নবদ্বীপ সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে মোট ৭ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ৭ জন প্রার্থীই ছিলেন নমঃশূদ্র জাতির। এছাড়াও সাধারণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে যে সকল নমঃশূদ্র প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হলেন, কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে শ্রীমন্ত মজুমদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ২৬৬২), ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৪৯৭)। বারাসাত কেন্দ্র থেকে নকুল মল্লিক (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৭৬৮৪), প্রদীপ পোদ্দার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ২০৫৭)। বসিরহাট কেন্দ্র থেকে অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৩৮৩)। ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে পরিমল কান্তি রায় (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৫৭০৮), সত্যনারায়ণ সরকার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৮৭৪)।[৫৯] মোট ১৪ জন নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী সংসদীয় রাজনৈতিক নির্বাচনে

প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। দশম নির্বাচনে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত নবদ্বীপ আসনে সি.পি.আই.(এম) প্রার্থী জয় পেয়েছিল।

সারণি ৩.১৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ জয়নগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সনৎ কুমার মণ্ডল	আর.এস.পি	৩৩৮৪০৮	৪৬.০১
২। নারায়ণ নস্কর	আই.এন.সি	২০৬১০৩	২৮.০২
৩। তরুন নস্কর	নির্দল	১০৮১৫২	১৪.৭০
৪। প্রদ্যোত নস্কর	বি.জে.পি	৮১২৯৩	১১.০৫
৫। ক্ষিতীশ চন্দ্র হালদার	নির্দল	১৫৮৩	০.২২
মোট ভোটার, ৯৫৬৩৫৬	ভোট পরে, ৭৫৪৩৫০	বৈধ ভোট হয়, ৭৩৫৫৩৯	ভোটিং শতাংশ, ৭৮.৮৮

সারণি ৩.১৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৬ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	সি.পি.আই.এম	৩৪২৭০৮	৪৭.১০
২। মনোরঞ্জন হালদার	আই.এন.সি	৩২২৯৬২	৪৪.৩৮
৩। অনাদি নস্কর	বি.জে.পি	৩৪৩৪৪	৪.৭২
৪। সমীর শেখর নাইয়া	নির্দল	২৭৬৬৩	৩.৮০
মোট ভোটার, ৯০২৮৫২	ভোট পরে, ৭৩৭৭৯৫	বৈধ ভোট হয়, ৭২৭৬৭৭	ভোটিং শতাংশ, ৮১.৭২

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ ও ১৬, Statistical Report on General Elections.1991 to the Tenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1992, পৃঃ ৩০৫-৬।

জয়নগর ও মথুরাপুর সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে মোট ৯ জন প্রার্থী দশম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ জন প্রার্থী কৈবত আর ৮ জনই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী ছিলেন। এই নির্বাচনে সাধারণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রার্থীই প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেননি।[৬০] উক্ত সংরক্ষিত ৩ টি আসনেই জয় পায় বামপন্থীরা। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রদের থেকে নমঃশূদ্ররা ৬ জন প্রার্থীতে এগিয়েছিলেন। নির্বাচিত প্রার্থীর দিক থেকে পৌণ্ড্ররা নমঃশূদ্রদের থেকে দ্বিগুন এগিয়েছিল। এই নির্বাচনে নমঃশূদ্রদের থেকে বেশ কয়েকজন বি.এস.পির প্রার্থী পাওয়া গেলেও পৌণ্ড্রদের মধ্যে থেকে কোন প্রার্থীই পাওয়া যায়নি। কাজেই আমরা বলতে পারি যে দশম

লোকসভা নির্বাচনে জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের হয়ে পৌণ্ড্রদের থেকে নমঃশূদ্ররা অধিক সচেতন ছিলেন।

১৯৯১ সালের দশম লোকসভা নির্বাচনে বি.জে.পি. ১২০ টি আসনে জয় পায়, সি.পি.আই, পায় ১৪ টি, সি.পি.আই.এম. পায় ৩৫ টি, আই.সি.এস (এস.সি.এস) ১ টি আই.এন.সি. ২৩২ টি, জে.পি. পায় ৫ টি, রাজ্য স্তরে দল পায় ৫০ টি, ও আঞ্চলিক দল পায় ৪ টি, এবং ১ টি আসনে জয় পায় নির্দল।[৬১] এই নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার জন্যে সরকার গঠনে জটিলতা তৈরি হয়। রাজীব হত্যার ঘটনা সহানুভূতির যে-জোয়ার আনল তাতে ভেসে কংগ্রেস ২৩২ টি আসন লাভ করে সংসদে বৃহত্তম একক পার্টির মর্যাদা পায়। ২১ জুন নরসিংহ রাও যে-সরকার গঠন করলেন, প্রথমে তা ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু ক্রমে তা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিল।[৬২] রাও সরকারের আমলে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনসূচক অর্থনৈতিক সংস্কার হাতে নেওয়া। এই সরকারের শাসনকালের প্রথম বছরেই জাতিভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িকতা জনিত উত্তাপ অনেকাংশেই প্রশমিত করে, পাঞ্জাবে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে ও কাশ্মিরে এবং আসমে পরিস্থিতি উন্নতি ঘটাতে মোটামুটি ভাবে সফল হয়। আবার অন্যদিকে উত্তর প্রদেশের বাবরি মসজিদের ধবংস রোধে এবং তার পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের দাঙ্গা রোধে নরসিংহ রাও সরকার ব্যর্থ হয় বলেই আমরা ধরে নিতে পারি।

১৯৯৮ সালের নির্বাচনে দলগত আসন পায়, বি.জে.পি. ১৮২ টি, বি.এস.পি. ৫ টি, সি.পি.আই. ৯ টি, সি.পি.আই.এম. ৩২ টি, আই.এন.সি. ১৪১ টি, জে.ডি. ৬ টি, এস.এ.পি. ১২ টি, রাজ্য স্তরের দল পায়, ১০১ টি, আঞ্চলিক দল পায় ৪৯ টি, এবং নির্দল ৬ টি আসনে জয় পেয়েছিল।[৬৩] বি.জে.পি নিজের মাত্র ১৮২ আসন নিয়ে অটলবিহারী বাজপেয়ী নেতৃত্বে সরকার গঠন করেন। পরে অবশ্য টি. ডি. পি, এ. আই. এ. ডি. এম. কে. ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রমুখ সেকিউলার পার্টির সমর্থন পেয়েছিল কিছু দিনের জন্য। বাজপেয়ী সরকারের জোট সঙ্গীর সংখ্যা অধিক থাকার দরুণ সুস্থিতি ব্যাহত হয়। জয়ললিতা সমর্থন তুলে নিলে ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে জোট সরকার আস্থা ভোটে হেরে যায়। কংগ্রেস সরকার গড়তে পারল না। অবশেষে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর – অক্টোবরের নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত বি.জে.পি সরকার তদারিকি সরকার হিসেবে কাজ চালায়।[৬৪] এবারে আমরা নিম্নে ১৯৯৯ সালের ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪

পরগনার সংরক্ষিত আসন ও সাধারণ আসনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৩.২০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২ নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। আনন্দ মোহন বিশ্বাস	এ.আই.টি.সি	৪৫৯৩১৯	৪৫.৮৪
২। অসীম বালা	সি.পি.আই.এম	৪২০১৮৪	৪১.৯৩
৩। শশাঙ্ক শেখর বিশ্বাস	আই.এন.সি	১০৮৪৬৪	১০.৮২
৪। সুশীল কুমার সরকার	বি.এস.পি	৮৭৭৫	০.৮৮
৫। জীবন কবিরাজ	সি.পি.আই (এম.এল) এল	৩৫৩২	০.৩৫
৬। মধুসূদন মণ্ডল	নির্দল	১১৪৯	০.১১
৭। সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল	নির্দল	৩৩৪	০.০৩
৮। দীনবন্ধু বিশ্বাস	নির্দল	৩২৭	০.০৩
মোট ভোটার, ১৩২০৩৫৮	ভোট পরে, ১০১৪৩৭৯	বৈধ ভোট হয়, ১০০২০৮৪	ভোটিং শতাংশ, ৭৬.৮৩

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections. 1999 to the Thirteenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1999, পৃঃ ২৫৫-৫৬।

ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে বি.জে.পি ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের আগেই জোট করে অংশগ্রহণ করেছিল। নবদ্বীপ সংরক্ষিত আসন থেকে ৮ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। জীবন কবিরাজ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাড়া বাকী ৭ জনই নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী ছিলেন। এছাড়াও সাধারণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে যে সকল নমঃশূদ্ররা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে অমল কুমার মণ্ডল (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ২৪৯৭)। বারাসাত কেন্দ্র থেকে মনোজ হাওলাদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৮৮৭৪)। ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে পরিমল কান্তি রায় (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৩৪৯৮)।[৬৫] এই নির্বাচনে মোট ১০ জন নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন পরে নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে কোন অবামপন্থী রাজনৈতিক দলের প্রার্থী জয় পেয়েছিলেন।

সারণি ৩.২১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ জয়নগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সনৎ কুমার মণ্ডল	আর.এস.পি	৩৯৬৩৮৩	৪৯.৩৯
২। কৃষ্ণপদ মজুমদার	বি.জে.পি	২৮৪০৮২	৩৫.৪০
৩। রেনুপদ হালদার	নির্দল	৭৪০১৬	৯.২২
৪। জগৎপদ সাঁপুই	আই.এন.সি	৪৬১৭৩	৫.৭৫
৫। বিবেক সোর্ণকার	নির্দল	১৪৪৬	০.১৮
৬। সুভাষ মণ্ডল	নির্দল	৪২৯	০.০৫
মোট ভোটার, ১১১৬৮৫৮	ভোট পরে, ৮১৫৯১৫	বৈধ ভোট হয়, ৮০২৫২৯	ভোটিং শতাংশ, ৭৩.০৫

সারণি ৩.২২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৬ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	সি.পি.আই.এম	৩৮২৯৬২	৪৬.৭৮
২। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	এ.আই.টি.সি	৩৩১২৩৭	৪০.৪৬
৩। মনোরঞ্জন হালদার	আই.এন.সি	৮৯৭১৯	১০.৯৬
৪। প্রহ্লদ কুমার পুরকাইত	নির্দল	১৪৬৯১	১.৭৯
মোট ভোটার, ১০৭৬৭৩০	ভোট পরে, ৮২৮৮৮৬	বৈধ ভোট হয়, ৮১৮৬০৯	ভোটিং শতাংশ, ৭৬.৯৮

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ ও ১৬, Statistical Report on General Elections. 1999 to the Thirteenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1999, পৃঃ ২৫৬।

জয়নগর ও মথুরাপুর সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে ১১ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিবেক শঙ্কর মালো জাতি ছাড়া ১০ জন প্রার্থীই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী ছিলেন। এছাড়াও সাধারণ কেন্দ্র থেকে যে দু'জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে বিতান মণ্ডল (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৮১4), বেচু মণ্ডল (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৫৭২)।[৬৬] এই নির্বাচনেও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচিত প্রার্থীর ক্ষেত্রেও নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়েছিলেন। তবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি অধ্যুষিত দুটি আসনে বামেরা জয় পেলেও নমঃশূদ্র অধ্যুষিত নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস জয় পেয়েছিল। এই নির্বাচনে তপসিলিদের ভোট বামেদের থেকে অবামপন্থীদের কতটা গিয়েছিল সে সম্পর্কে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ

করেছেন। এই ভাবে, "পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির নির্বাচনী রেকর্ড দেখলে বোঝা যায় তারা স্বাভাবিক ভাবে বামপন্থীদেরই ভোট কিন্তু ১৯৯৯ সালের পর থেকে তারা বামপন্থীদের থেকে সরে আসতে শুরু করে। এই নির্বাচনে বি.জে.পি. এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল যৌথভাবে ৪৫ শতাংশ, কংগ্রেস ৭ শতাংশ এবং বামপন্থীরা ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এই সময় নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের ভোটের একটা বড় অংশ বামপন্থীরা হারায়।[৬৭] এর পর থেকে নমঃশূদ্রদের ভোটের বড় অংশ বি.জে.পি তথা তৃণমূলের দিকে চলে যেতে থাকে। তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে ৮ টি আসনে জয় পেয়েছিল।

১৯৯৯ সালের ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে ভারতের দল অনুযায়ী বি.জে.পি. পায় ১৮২ টি, বি.এস.পি. পায় ১৪ টি, সি.পি.আই. পায় ৪ টি, সি.পি.আই.এম. পায় ৩৩ টি, আই.এন.সি. পায় ১১৪ টি, জে.ডি. (এস) পায় ১ টি, জে.ডি. (ইউ). পায় ২১ টি, রাজ্য স্তরের দল পায় ১৫৮ টি, আঞ্চলিক দল পায় ১০ টি, নির্দল ৬ টি আসনে জয় পেয়েছিল।[৬৮] নির্বাচনে বি.জেপি. ও তার জোটসঙ্গীদের আসন সংখ্যা বেড়ে হল ২৯৬, যদিও বি.জে.পির নিজের আসনসংখ্যা বাড়ল না। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এক নতুন সরকার গঠিত হয়। এই সরকার পাঁচ বছর স্থায়ী সরকার হয়েছিল। "The period after 1999 witnessed the tempering of the political chaos and accommodation of contending issues of the previous decade. Thus, the issues of Hindu nationalism (Mandir issue) and social justice (Mandal) ceased to be the centre of political contestation since 1999 Lok Sabha elections. Overall, the post- Congress polity has come to stay. ... Finally, in the backdrop of the social churning, the basic pattern of social cleavages has remained stable in relation to political preferences-while BJP has failed to gain much among Scheduled Caste, Scheduled Tribes, and the Muslims, the Congress by far failed to gain among OBCs. The bulk of the OBC vote went to various state parties."[৬৯]

২০০৪ সালের চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে আমরা নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনাএবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংরক্ষিত আসন ও সাধারণ আসনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ নিয়ে আলচনা করব।

সারণি ৩.২৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২ নবদ্বীপ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট
১। অলোকেশ দাস	সি.পি.আই.এম	৫৬০১৭৬
২। নীলিমা নাগ মল্লিক	এ.আই.টি.সি	৫৫০১৮৫
৩। নৃপেন্দ্রনাথ হাউলাদার	আই.এন.সি	২৪২৬৮
৪। সতিশ বিশ্বাস	বি.এস.পি	১৫৭১৯
৫। বাসুদেব বাছার	নির্দল	১১১৩৯
৬। পরিমল ঢালি	নির্দল	৮৩১৮
৭। গোপাল বিশ্বাস	নির্দল	৩৭১০
৮। পরমেশ চন্দ্র বিশ্বাস	নির্দল	২২১৯
৯। অমিতেষ বিশ্বাস	নির্দল	২০৩৭
	মোট	বৈধ ভোট হয়, ১১৭৭৭৭১

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections. 2004 to the 14th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2004, পৃঃ ৩৩৬-৩৮।

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে ৯ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাসুদেব বাছার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আর ৮ জনই নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী। এছাড়াও যে সকল নমঃশূদ্ররা সাধারণ কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, বারাসাত কেন্দ্র থেকে দুলাল চন্দ্র দাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ২৪৩৬৭), অঞ্জন অধিকারী (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৬০৩১)। ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে চপলা মজুমদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৬৪৭৩)।[৭০] এই নির্বাচনে জয়নগর সংরক্ষিত আসন থেকে ২ জন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ছিলেন। এই জাতির মোট অংশগ্রহণ কারী প্রার্থী ছিলেন ১৩ জন।

সারণি ৩.২৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ জয়নগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট
১। সনৎ কুমার মণ্ডল	আর.এস.পি	৪৫০০৪৩
২। অসিত বরন ঠাকুর	বি.জে.পি	২১৯৪৪২
৩। তরুণ কান্তি নস্কর	নির্দল	৯০৭৯৮
৪। সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস	আর.পি.আই	২১৭১১
৫। সনৎ কুমার ঢালি	নির্দল	১৪৩৪০
৬। মেঘনাথ হালদার	বি.এস.পি	৯৯২০
	মোট	বৈধ ভোট হয়, ৮০৬৩৩৪

সারণি ৩.২৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৬ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট
১। বাসুদেব বর্মন	সি.পি.আই.এম	৪৪০৮৬২
২। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	এ.আই.টি.সি	৩৫৮৮৩৪
৩। মনোরঞ্জন হালদার	আই.এন.সি	৭১৭০০
৪। প্রহ্লাদ কুমার পুরকাইত	নির্দল	৭১৭০০
৫। কংসারি মণ্ডল	বি.এস.পি	১২৬০১
৬। মিহির কুমার নস্কর	নির্দল	৭৭৬১
	মোট	বৈধ ভোট হয়, ৯০৭৭৮৫

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৫ ও ১৬, Statistical Report on General Elections. 2004 to the 14th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2004, পৃঃ ৩৩৭।

জয়নগর ও মথুরাপুর সংরক্ষিত কেন্দ্র দুটি থেকে মোট ১২ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১২ জনের মধ্যে ২ জন নমঃশূদ্র জাতির আর ১০ জন প্রার্থীই ছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে ডাঃ ধীরেন মণ্ডল (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৩৬৬৪)।[৭১] নবদ্বীপ সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে ১ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০০৪ সালের নির্বাচনে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় জাতির মোট ১২ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। এই নির্বাচনে উক্ত তিনটি আসনে বামপন্থীদের দখলে ছিল। নমঃশূদ্ররা সংসদীয় রাজনৈতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের দিক থেকে ১ জন প্রার্থীতে এগিয়েছিলেন। আর নির্বাচিত প্রার্থীর দিক থেকে পৌণ্ড্ররা নমঃশূদ্রদের থেকে দ্বিগুন ছিল। এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জী ছাড়া আর কোন প্রার্থীই জয়ী হতে পারেননি।

২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলগত ফলাফল হল, বি.জে.পি পায় ১৩৮ টি, বি.এস.পি. ১৯ টি, সি.পি.আই. ১০ টি, সি.পি.আই.এম. ৪৩ টি, আই.এন.সি. ১৪৫ টি, এন.সি.পি. ৯ টি, রাজ্য স্তরের দল পায় ১৫৯ টি, আঞ্চলিক দল পায় ১৫ টি, এবং নির্দল ৫ টি আসনে জয় পেয়েছিল।[৭২] নির্বাচন শেষে কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী মনমোহন সিংহ কে প্রধানমন্ত্রী করেন United Progressive Alliance (UPA) সহযোগিতায়। সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে বামপন্থীরা ইউ.পি.এ.তে যোগদান করেন। বামেরা মন্ত্রী না হলেও সোমনাথ চ্যাটার্জী অধ্যক্ষ হিসেবে সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৭৩] ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ২০০৭ সালের পারমাণবিক চুক্তিকে কেন্দ্র করে ভারতের

অভ্যন্তরীণ জটিলতা তৈরি হয়। ইউ.পি.এ. সরকারের থেকে বামপন্থীরা চুক্তির বিরোধিতা করে সমর্থন তুলে নেয়। কাজেই সরকার অন্যান্য আঞ্চলিক দলের সাহায্য নিয়ে ২০০৮ সালের জুলাই মাসে আস্থাভোটে জয়ী হয়। এর পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের পতন শুরু হয়। এবারে আমরা নিম্নে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উক্ত তিনটি জেলায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করব।

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা চতুর্থ ডিলিমিটেশন নিয়ে সংক্ষেপে আলচনা করে নেব। “২০০৫ সালের ৮ আগস্ট ডিলিমিটেশন কমিশন যে খসড়া লোকসভার ও বিধানসভার আসনবিন্যাসের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সেই খসড়া প্রতিবেদনকে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস সি.পি.আই.এম. দলের দ্বারা প্রস্তুত ‘নীল নকশা’ বলে অভিহিত করে, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী এবং কমিশনের অ্যাসোসিয়েট সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক দীপক ঘোষ লোকসভা এবং বিধানসভার আসনবিন্যাসের ক্ষেত্রে জেরী ম্যান্ডারিং অর্থাৎ সুবিধামত আসনবিন্যাসের অভিযোগ তোলেন”।[৭৪] যাইহোক ২০০৮ সালের ডিলিমিটেশনের আসনবিন্যাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার আসন ৪২ টিই থাকে, তপসিলিদের আসন বেড়ে ৮ থেকে ১০ হয়, এবং তপশিলি উপজাতিদের আসন ২ টিই থাকে। এছাড়াও কিছু আসনের নামের পরিবর্তন হয়।[৭৫]

এবারে আমরা ২০০৯ সালের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনাএবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংরক্ষিত আসন ও সাধারণ আসনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ নিয়ে আলচনা করব।

সারণি ৩.২৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩ রাণাঘাট (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুচারু রঞ্জন হালদার	এ.আই.টি.সি	৫৭৫০৫৮	৫০.১৩
২। বাসুদেব বর্মন	সি.পি.আই.এম	৪৭৩২৩৫	৪১.২৫
৩। সুকুমার রায়	বি.জে.পি	৫৭৮৪৪	৫.০৪
৪। সতিশ চন্দ্র বিশ্বাস	বি.এস.পি	১৯৩৪৭	১.৬৯
৫। মন্মথ বিশ্বাস	নির্দল	১২১৫৯	১.০৬
৬। নদীয়ার চাঁদ মণ্ডল	নির্দল	৯৫৮৫	০.৮৪
	মোট বৈধ ভোট হয়,	১১৪৭২২৮	

সারণি ৩.২৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪ বনগাঁ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	এ.আই.টি.সি	৫৪৬৫৯৬	৫০.৬৯
২। অসীম বালা	সি.পি.আই.এম	৪৫৩৭৭০	৪২.০৮
৩। কৃষ্ণপদ মজুমদার	বি.জে.পি	৪২৬১০	৩.৯৫
৪। প্রনিতা রায়	বি.এস.পি	১৭১৭৮	১.৫৯
৫। নিশিকান্ত বিশ্বাস	নির্দল	৭৫৫০	০.৭০
৬। সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস	আর.পি.আই.(এ)	৫৯৭৪	০.৫৫
৭। প্রবীর কুমার সরকার	এল.জে.পি	৪৫৫৭	০.৪২
	মোট বৈধ ভোট হয়,	১০৭৮২৩৫	

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩ ও ১৪, Statistical Report on General Elections. 2009 to the 15th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2009, Constituency Wise Detailed Results।

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে রাণাঘাট ও বনগাঁ সংরক্ষিত কেন্দ্র দুটি থেকে মোট ১৩ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৩ জনের মধ্যে বাসুদেব বর্মন ও গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি, আর ১১ জন প্রার্থীই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। এছাড়াও সাধারণ আসন থেকে যে সকল নমঃশূদ্ররা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে দেবব্রত মজুমদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১০৭৩৩)। বারাসাত কেন্দ্র থেকে অরুন কুমার বিশ্বাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৮৩৮১), কুমারী কমলা দাস (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৭৫২৭)।[৭৬] এই নির্বাচনে মোট ১৩ জন নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। জয়ী দুই প্রার্থীই তৃণমূল কংগ্রেসের। জাতিতে একজন নমঃশূদ্র আরেকজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। দুটি কেন্দ্র নমঃশূদ্র অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও বনগাঁ কেন্দ্রতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাজেই বলা যেতে পারে জাতিগত ভেদ দূরে রেখে এই নির্বাচনে নমঃশূদ্ররা তৃণমূল কংগ্রেসকেই রাজনৈতিক ভাবে ভোট দেয়।

সারণি ৩.২৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৯ জয়নগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। ড. তরুণ মণ্ডল	নির্দল	৪৪৬২০০	৪৮.৭২
২। নিমাই বর্মন	আর.এস.পি	৩৯২৪৯৫	৪২.৮৬
৩। নিরোধ চন্দ্র হালদার	বি.জে.পি	২৪৬০৮	২.৬৯
৪। তরঙ্গ মণ্ডল	এ.ইউ.ডি.এফ	১৭০৮৭	১.৮৭
৫। শ্যামল নস্কর	নির্দল	১০৮০৯	১.১৮

৬। অরবিন্দ হালদার	বি.এস.পি	৯২০৯	১.০১
৭। শঙ্কর হালদার	নির্দল	৮৮৫৫	০.৯৭
৮। তাপস তরফদার	আর.ডি.এম.পি	৬৫৭৩	০.৭২
	মোট বৈধ ভোট হয়,	৯১৫৮৩৬	

সারণি ৩.২৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ২০ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। চৌধুরী মোহন জাঁতুয়া	এ.আই.টি.সি	৫৬৫৫০৫	৫৩.৯৫
২। অনিমেষ নস্কর	সি.পি.আই.এম	৪৩৫৫৪২	৪১.৫৫
৩। বিনয় কুমার বিশ্বাস	বি.জে.পি	২৭৪৩২	২.৬২
৪। বিরেশ চন্দ্র মণ্ডল	নির্দল	৭৬২১	০.৭৩
৫। সচীন্দ্রনাথ নস্কর	বি.এস.পি	৫১৬৫	০.৪৯
৬। প্রনব কুমার জাটুয়া	নির্দল	৪৯৪২	০.৪৭
৭। প্রদীপ মণ্ডল	আর.ডি.এম.পি	২০২১	০.১৯
	মোট বৈধ ভোট হয়,	১০৪৮২২৮	

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৯ ও ২০, Statistical Report on General Elections. 2009 to the 15th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2009, Constituency Wise Detailed Results।

জয়নগর ও মথুরাপুর সংরক্ষিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি অধ্যুষিত কেন্দ্র থেকে মোট ১৫ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং ১৫ জনই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ ছিলেন। সাধারণ কেন্দ্র বসিরহাট থেকে ছিলেন রণজিৎ গায়েন (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ১৩৯৩০)।[৭৭] পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে মোট ১৮ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই নির্বাচনে পৌণ্ড্ররা নমঃশূদ্রদের থেকে নির্বাচিত ২ জনে আর অংশগ্রহণের ৫ জনে উভয় দিক থেকেই এগিয়েছিলেন।

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলগত ফলাফল হল, ইউ.পি.এ. ২৬২ টি, কংগ্রেসের ২০৬ টি, তৃণমূল কংগ্রেস ১৯ টি, এন.ডি.এ. ১৫৯ টি, বি.জে.পির ১১৬ টি, জনতা দল ২০ টি, বামপন্থীরা ২৮ টি, আর বাকী আসন পায় রাজ্যস্তরের দল, আঞ্চলিক দল এবং নির্দল।[৭৮] দ্বিতীয় বার ইউ.পি.এ. সরকার গঠন করে এবং ডাঃ মনমোহন সিংহ দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন।

এবারে আমরা ২০১৪ সালের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনাএবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংরক্ষিত আসন ও সাধারণ আসনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ নিয়ে আলচনা করব।

সারণি ৩.৩০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩ রাণাঘাট (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট
১। তাপস মণ্ডল	এ.আই.টি.সি	৫৯০৪৫১
২। অর্চনা বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৩৮৮৬৪৪
৩। সুপ্রভাত বিশ্বাস	বি.জে.পি	২৩৩৬৭০
৪। প্রতাপ কান্তি রায়	আই.এন.সি	৯২২১৮
৫। উৎপলা বিশ্বাস	বি.এস.পি	৯১১৬
৬। সুভাষ চন্দ্র সরকার	নির্দল	৮৬৫৮
৭। পরেশ হালদার	এস.সি.ইউ.আই	৭৯৫২
৮। নদীয়ার চাঁদ মণ্ডল	আর.পি.আই.(এ)	৩৯৯২
৯। চৈতন্য বাড়ই	এন.এস.বি.পি.	৩৮২৯
	মোট বৈধ ভোট	১৩৩৮৫৩০

সারণি ৩.৩১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪ বনগাঁ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট
১। কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর	এ.আই.টি.সি.	৫৫১২১৩
২। দেবেশ দাস	সি.পি.আই.এম	৪০৪৬১২
৩। কে.ডি. বিশ্বাস	বি.জে.পি.	২৪৪৭৮৩
৪। ইলা মণ্ডল	আই.এন.সি	৪৩৮৬৬
৫। চন্দন মল্লিক	বি.এস.পি	৯২০৭
৬। প্রনিতা মণ্ডল	নির্দল	৮৭৩৮
৭। স্বপন মণ্ডল	এস.ইউ.সি.আই	৩৫৮৯
৮। তারাপদ বিশ্বাস	এ.এম.বি	২৮৪৮
৯। শ্যাম প্রসাদ মণ্ডল	পি.ডি.এস	২৬২৪
১০। শরৎ চন্দ্র মণ্ডল	আর.এ.এইচ.এম	১১৭২
১১। পিনাকী রঞ্জন ভারতী	টি.আর.এম.আর.পি.পি.আই	১০৭১
	মোট বৈধ ভোট	১২৭৩৭২৩

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩ ও ১8, Statistical Report on General Elections. 2014 to the 16th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of

India, New Delhi, 2014, Detalls for Assemby Segments of Pariamentary Constituencies।

রাণাঘাট ও বনগাঁ সংরক্ষিত দুটি কেন্দ্র থেকে মোট ২০ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। পিনাকী রঞ্জন ভারতী ছাড়া ১৯ জন প্রার্থীই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। এছাড়াও সাধারণ আসন থেকে যে সকল নমঃশূদ্ররা ২০1৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে হরষিত বিশ্বাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৬১৬৮)। বারাসাত কেন্দ্র থেকে সুকুমার বালা (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১২১৭৮)। বসিরহাট কেন্দ্র থেকে গোপাল দাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৭০১৬), অজয় কুমার বাইন (এস.ইউ.সি.আই. প্রাপ্ত ভোট, ৬৫৩২), চন্দন মল্লিক (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৮০৮৮)। ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে তাপস সরকার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৬৩৯৯), মিহির বিশ্বাস (এ.এ.এ.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৭৮৭)।[৭৯] এই নির্বাচনে ২৬ জন নমঃশূদ্র প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সারণি ৩.৩২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৯ জয়নগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট
১। প্রতিমা মণ্ডল	এ.আই.টি.সি.	৪৯৪৭৪৬
২। সুভাষ নস্কর	আর.এস.পি	৩৮৬৩৬২
৩। ডঃ তরুণ মণ্ডল	এস.ইউ.সি.আই	১১৭৪৫৪
৪। কৃষ্ণপদ মজুমদার	বি.জে.পি	১১৩২০৬
৫। অর্নব রায়	আই.এন.সি	৩৮৪৯৩
৬। তরঙ্গ মণ্ডল	এ.আই.ইউ.ডি.এফ	১৩৩৩৩
৭। মানিকলাল সরদার	আর.এ.জে.এস.পি	৫৯০৮
৮। সুভাষ নস্কর	নির্দল	৫১৬১
৯। অনন্যা সরকার	বি.এস.পি	২৯০৯
১০। ডঃ রবিন নস্কর	বি.এম.ইউ.পি	২৬৫৭
	মোট বৈধ ভোট	১১৮০২২৯

সারণি ৩.৩৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ২০ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট
১। চৌধুরী মোহন জাঁতুয়া	এ.আই.টি.সি	৬২৭৭৬১
২। রিঙ্কু নস্কর	সি.পি.আই.এম	৪৮৯৩২৫
৩। তপন নস্কর	বি.জে.পি	৬৫৯৬৫
৪। শ্রী মনোরঞ্জন হালদার	আই.এন.সি	৪৭২৭৭

৫। পূর্ন চন্দ্র নাইয়া	এস.ইউ.সি.আই	১০১৯১
৬। মন্টু রাম হালদার	ডব্লু.পি.ও.আই	৪৬৭৪
৭। সৌমেন সরদার	বি.এস.পি	৪৩৬৪
৮। রবীন্দ্রনাথ মিস্ত্রী	পি.ডি.এস	৩২১২
৯। অবনীন্দ্র নাথ বৈদ্য	নির্দল	২০৮৮
১০। নন্দদুলাল মণ্ডল	আর.জে.এন.পি	১৩৫৭
	মোট বৈধ ভোট	১২৫৬২১৪

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৯ ও ২০, Statistical Report on General Elections. 2014 to the 16th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2014, Detalls for Assemby Segments of Pariamentary Constituencies।

জয়নগর ও মথুরাপুর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত সংরক্ষিত দুটি কেন্দ্র থেকে অষ্টদশ লোকসভা নির্বাচনে ২০ জন অংশগ্রহণকারী প্রার্থীই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে দিলীপ কুমার মণ্ডল (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ২৮৯২), বেছু মণ্ডল (নির্দল প্রাপ্ত ভোট, ৩৬০৭)।[৮০] এই নির্বাচনে মোট ২২ জন প্রার্থী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। নির্বাচনে অংশগ্রহণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় থেকে নমঃশূদ্ররা ৪ জন প্রার্থীতে এগিয়েছিল। আর নির্বাচিত প্রার্থীর দিক থেকে ১৯৭১ সালের থেকে ২০১৪ সালে এসে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমান সংখ্যায় হয়।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলগত ফলাফল হল, বি.জে.পি. পায় ২৮২ টি, কংগ্রেস পায় ৪৪ টি, বি.এস.পি. পায় ০ টি, তৃণমূল কংগ্রেস পায় ৩৪ টি, সমাজবাদী পার্টি পায় ৫ টি, এ.আই.ডি.এম.কে. পায় ৩৭ টি, সি.পি.আই.এম. পায় ৯টি, টি.ডি.পি পায় ১৬ টি, আর বাকী আসন পায় রাজ্যস্তরের দল, আঞ্চলিক দল এবং নির্দল।[৮১] এই নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার কাছে ইউ.পি.এ. জোট ও কংগ্রেস সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্থ হয়। এন.ডি.এ. জোট নরেন্দ্র মোদীকে প্রাধানমন্ত্রী করেন। বিগত তিন দশক ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিভিত্তিক একাধিক রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটেছে। এদের মধ্যে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি যেমন রয়েছে তেমনি যাদব নির্ভর মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি বা জাঠ নির্ভর অজিত সিংহের লোক দল, বিহারে লালু প্রসাদ যাদবের আরজেডি, নীতিশ কুমারের জেডিইউ, ঝাড়খন্ডের শিবু সোরেনের ঝাড়খন্ড পার্টির মতো দলগুলি এবারে মোদী হাওয়ায় আসন বা প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে তাদের নিজ নিজ সমর্থকদের সমর্থন ধরে রাখতে পারেনি।

বিভিন্ন নির্বাচনে বার বার প্রমাণিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশে দলিত ভোটের দৌলতে মায়াবতীর অন্তত পক্ষে ১৫টি আসন নিশ্চিত ছিল। এবারের ফলাফল থেকে স্পষ্ট দলিতদের একটি বড়ো অংশই বিজেপিকে সমর্থন করেছে। যাদব ভোট ব্যাংক যে উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে সরে গেছে বা আদিবাসী ভোট ব্যাংক যে শিবু সোরেনের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি নির্বাচনের ফলাফলের সেই দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। বিহারে নীতিশ কুমারের কুর্মী ভোট ব্যাংক বা লালু প্রসাদের যাদব ভোট ব্যাংকের উপর এবার যে বিজেপি থাবা বসিয়েছে বিহারের ফলাফল থেকে তা স্পষ্ট। তবে জাতের রাজনীতির সমীকরণের চূড়ান্ত উত্তরণ ঘটল কিনা আগামী দিনে সেটা বোঝা যাবে। কিন্তু এবারের লোকসভা নির্বাচনে অন্তত জাতপাতের রাজনীতির যে প্রভাব নির্বাচনী রাজনীতিতে অনেকটাই মুছে গেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।[৮২]

সারা ভারতের মতো মোদী ঝড় রাজ্যেও আছড়ে পড়েছে। দার্জিলিং বাদে আসানসোলের আসনটি বিজেপি নিজের শক্তিতে জয় লাভ করেছে। মালদা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তর এবং কলকাতা দক্ষিণে বিজেপি দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৯৬টি আসনে বিজেপি ২০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পেয়েছিল।

এবারে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করব।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনানুসারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভাকে দুটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছিল। ক) লেজিসলেটিভ কাউন্সিল খ) লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ২৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত অ্যাসেম্বলিরা মেয়াদ করা হয় সর্বাধিক পাঁচ বছর। অপরদিকে কাউন্সিলের গঠনগত কাঠামো করা হয় স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যা ৬৩ জনের কম রাখা হত না এবং সর্বাধিক ৬৫ জনের বেশি রাখা হত না। কাজেই আইনানুসারে প্রতি তিন বছর অন্তর কাউন্সিলের এক – তৃতীয়াংশ সদস্যদের অবসর নিতে হত।[৮৩] কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের দিন ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার আগে থেকেই বঙ্গপ্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কাজেই বঙ্গপ্রদেশের একাংশের নাম হয়, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যাংশের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। ৯০ টি কেন্দ্রের বিধায়ক ও দুই জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা। ২১ নভেম্বর ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত

অনুসারে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হন। এছাড়াও এই মন্ত্রীসভায় ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র নস্কর, জ্যোতি বসু সহ অন্যান্য নেতৃত্ববর্গ।[৮৪] এর পরে দেশের স্বাধীন সার্বভৌম সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকে যতবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলো সাংবিধানিক আইনানুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের ১৬৮(১) এ, বি, ও ১৬৮(২) ধারা অনুযায়ী দ্বিকক্ষীয় বিধানসভা অনুমোদিত হয়। সাংবিধানিক আইনানুসারে ১৯৫২ সালের ৫ জুন ৫১ সদস্যবিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ গঠিত হয়। ২ জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য নিয়ে বিধানসভায় মোট সদস্যসংখ্যা হয় ২৪০। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভার নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। ১৮ জুন ১৯৫২ সালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকারের প্রথম অধিবেশন বসে।[৮৫] সংবিধানের ১৬৯ (১,২,৩) ধারানুসারে ১৯৬৯ সালের ২১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিধান পরিষদ অবলুপ্তি করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাংবিধানিক সংশোধনী আইনানুসারে ১৯৬৯ সালের ১ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ অবলুপ্তি হয়।[৮৬] কাজেই এই সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিকক্ষ বিধানসভা থেকে এক কক্ষবিষ্টি বিধানসভায় পরিণত হয়।

ভারতীয় সংবিধানের ৮১ ও ১৭০ অনুচ্ছেদ ধারা অনুসারে ১৯৬২ সালের দ্বিতীয় সীমানা পুনর্বিন্যাস আইনানুসারে ভারতীয় জনগণনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভা সাংসদ ও বিধায়কদের কেন্দ্রগুলির সীমানার পুনর্বিন্যাসের কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচিতক্ষেত্র সংখ্যা হয় ২৮০।[৮৭]

এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণের সময় ধরা হবে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। কিন্তু আমরা আমাদের গবেষণার প্রয়োজনীয় অনুসারে ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০২, ২০১১, ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করব। প্রথমে নমঃশূদ্র জাতি নিয়ে পরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১৯৭১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মোট ২৭৯ টি নির্বাচনীক্ষেত্রের নির্বাচন হয়। এর মধ্যে ৫৫ টি ও ১৬ টি নির্বাচনীক্ষেত্র তপসিলি জাতি ও

তপসিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।[৮৮] যে ৫৫ টি বিধানসভা কেন্দ্র তপসিলিদের জন্য সংরক্ষণ ছিল তার মধ্যে নদীয়া ও চব্বিশ পরগনায় ছিল ১৬ টি বিধানসভা কেন্দ্র।[৮৯]

নিম্নে আমরা নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৬ টি বিধানসভা নির্বাচনীক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৩.৩৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৬৭ নাকাশিপাড়া (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল	নির্দল	১০৮২৬	২৬.৬৩
২। নীল কমল সরকার	নির্দল	৮৪১৪	২০.৬৯
৩। হরেন্দ্র বৈদ্য	সি. পি. আই. এম	৮১৪৭	২০.০৩
৪। মনিন্দ্র চদ্র মণ্ডল	বাংলা কংগ্রেস	৬৫১৭	১৬.০৩
৫। হরিসাধান বর্মন	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	৪০৬৯	১০.০১
৬। গুনেশ্বর মৈত্র	সি. পি. আই	২৬৮৮	৬.৬১
মোট ভোটার, ৭৩০২১	ভোট পরে, ৪৩৯৬৩	বৈধ ভোট হয়, ৪০৬৫৯	ভোটিং শতাংশ, ৬০.২১

সারণি ৩.৩৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭২ হাঁসখালি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। আনন্দ মোহন বিশ্বাস	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	২৩৬৫৮	৪৫.৪৭
২। জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	সি.পি.আই. এম	১৮৬৩৮	৩৫.৮২
৩। চারুমিহির সরকার	বাংলা কংগ্রেস	৪৫৭৪	৮.৭৯
৪। রমেন্দ্রনাথ দাস	সি.পি.আই	৪২০৬	৮.০৮
৫। সুবিনল ঘোষাল	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	৯৫২	১.৮৩
মোট ভোটার, ৭৭৫২০	ভোট পরে, ৫৪৬২০	বৈধ ভোট হয়, ৫২০২৮	ভোটিং শতাংশ, ৭০.৪৬

সারণি ৩.৩৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৫ রাণাঘাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নরেশচন্দ্র বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	১৮৫৫৮	৩৭.৬০
২। সুশিল কুমার রায়	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১৬২৭৪	৩২.৯৮
৩। নিতাইপদ সরকার	সি. পি. আই	১৩২৮২	২৬.৯১
৪। সন্তোষ কুমার মণ্ডল	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	৮৮৮	১.৮০
৫। প্রিতাবিস সিখদার	বাংলা কংগ্রেস	৩৪৯	০.৭০
মোট ভোটার, ৭৩৯২২	ভোট পরে, ৫১৮৫৭	বৈধ ভোট হয়, ৪৯৩৫১	ভোটিং শতাংশ, ৭০.১৫

সারণি ৩.৩৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৮ বাগদা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। অপূর্ব লাল মজুমদার	ফরওর্ড ব্লাক	১৯৮২১	৪৮.৮৯
২. কান্তি চন্দ্র বিশ্বাস	সি. পি. আই. এম	১৪৫৮১	৩৫.৯১
৩. মৃণালিনী বিশ্বাস	বাংলা কংগেস	৫৬০৮	১৩.৮১
৪. শশধর বিশ্বাস	ভারতীয় জনসংঘ	৫৬৫	১.৩৯
মোট ভোটার, ৬৩৪৪৫	ভোট পরে, ৪৩৭৫৩	বৈধ ভোট হয়, ৪০৬০৫	ভোটিং শতাংশ, ৬৮.৯৭

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র- ৬৭, ৭২, ৭৫, ৭৮, Statistical Report on General Electon, 1971 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1973, পৃঃ ৩০৪-৫।

উপরিক্ত ৪ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্রতে মোট ২০ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ১৯ জনই নমঃশূদ্র একজন মাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের দলের পক্ষ থেকে।[৯০]

নিম্নে ১৯৭১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে ২৪ পরগনার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অধ্যুষিত সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্র গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সারণি ৩.৩৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৩ রাজারহাট (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। খাগেন্দ্র নাথ মণ্ডল	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৩৬৬৫৮	৪৬.৮৭
২। রবীন্দ্র নাথ মণ্ডল	সি. পি. আই. এম	২১৯৬৮	৩৮.৬২
৩। বিজয় লাল মজুমদার	ফরওর্ড ব্লক	৩৭৪৩	৬.৫৮
৪। শচীন্দ্র নাথ রায়	নির্দল	৩৩৯৩	৫.৯৭
৫। উৎপালেন্দু রায়	বাংলা কংগ্রেস	১১১৫	১.৯৬
মোট ভোটার, ৮৯৮১৯	ভোট পরে, ৫৯৭৯৭	বৈধ ভোট হয়, ৫৬৮৭৭	ভোটিং শতাংশ, ৬৬.৫৮

সারণি ৩.৩৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯০ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গোপাল চন্দ্র গায়েন	সি.পি.আই.এম	১২৫৫৪	২৭.২৮
২। পঞ্চানন মণ্ডল	জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	১১৪৯৭	২৪.০৬
৩। বিনোদ বিহারী গায়েন	সি.পি. আই	১০৬১৮	২৩.০৭
৪। আদিত্য মণ্ডল	নির্দল	১০৪৮৪	২২.৭৮

৫। তপপদ মণ্ডল	নির্দল	৫০৮	১.১০
৬। অবনী ভূষন মণ্ডল	নির্দল	৩৬৩	০.৭৯
মোট ভোটার, ৭০৭০০	ভোট পরে, ৪৯৪৭৩	বৈধ ভোট হয়, ৪৬০২৪	ভোটিং শতাংশ, ৬৮.৯৭

সারণি ৩.৪০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯১ গোসাবা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গণেশ চন্দ্র মণ্ডল	আর. এস. পি	২৩৫৭১	২৭.২৮
২। পরেশ চন্দ্র বৈদ্য	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	২২৬৬৩	৪২.০৬
৩। কলিপাতরু বর্মন	সি.পি.আই.এম	৫৪৮২	১০.১৭
৪। কমলপদ মণ্ডল	বি. বি. সি	৬৫৩	১.২১
৫। কৃষ্ণপদ মালি	বাংলা কংগ্রেস	৫৮৪	১.০৮
৬। রমন নাথ পাত্র	এস. ইউ. সি. আই	৫৮৪	১.০৮
৭। চন্দ্রকান্ত সরকার	নির্দল	৩৪৬	০.৬৪
মোট ভোটার, ৭৩৬৮৯	ভোট পরে, ৫৫৩৬৯	বৈধ ভোট হয়, ৫৩৮৮৩	ভোটিং শতাংশ, ৭৫.১৪

সারণি ৩.৪১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৩ হারোয়া (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গঙ্গাধর প্রমানিক	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১৭১০৬	৪৩.৪৩
২। জগন্ননাথ সরদার	সি.পি.আই.এম	১৪২৫৩	২৫৪৪
৩। শনিপদ মণ্ডল	সি.পি.আই	৩৫৪১	৮.৯৯
৪। প্রসান্ত কুমার মণ্ডল	নির্দল	৩৪০৩	৮.৬৪
৫। ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার	বাংলা কংগ্রেস	১৪৯৫	৩.৮০
৬। সমত কুমার মণ্ডল	জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	৩৩০	০.৮৪
মোট ভোটার, ৬৯২৪৯	ভোট পরে, ৪১৬২০	বৈধ ভোট হয়, ৩৯৩৮৭	ভোটিং শতাংশ, ৬০.১০

সারণি ৩.৪২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৫ ক্যানিং (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	২০০১৫	৩৬.৯৬
২। চিত্তরঞ্জন মৃধা	সি.পি.আই.এম	১৯৮৬২	৩৬.৬৮
৩। দুলাল চন্দ্র মণ্ডল	এস.ইউ.সি.আই	১১৯৪৪	২২.০৬
৪। চন্দ্রকান্ত রায়	বাংলা কংগ্রেস	১৮০৮	৩.৩৪
৫। সুরেশ হালদার	নির্দল	৫১৯	০.৯৬
মোট ভোটার, ৮৪১৫৪	ভোট পরে, ৫৬৪৩৭	বৈধ ভোট হয়, ৫৪১৪৮	ভোটিং শতাংশ, ৬৭.০৬

সারণি ৩.৪৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৬ কুলতলি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। প্রবোধ পুরকাইত	এস.ইউ.সি.আই	২৬৭০৫	৪৪.২২
২। অরবিন্দু নস্কর	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	২৫৩৬৪	৪২.০০
৩। গঙ্গাধর নস্কর	সি.পি.আই.এম	৭৭২৩	১২.৭৯
৪। ভরতচন্দ্র হালদার	জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	৩৭৪	০.৩৮
৫। বিশ্বরতি রায় মণ্ডল	বাংলা কংগ্রেস	২৩০	০.৩৮
মোট ভোটার, ৮৭৫২৭	ভোট পরে, ৬২০১৪	বৈধ ভোট হয়, ৬০৩৯৬	ভোটিং শতাংশ, ৮৫.৭০

সারণি ৩.৪৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ বারুইপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বিমল মিস্ত্রী	সি. পি. আই.এম	১৯৭১১	৩৬.১২
২. রামকান্ত মণ্ডল	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১৯২৬৫	৩৫.৩০
৩। প্রমথ সরদার	নির্দল	৮৫৭৮	১৫.৭২
৪। রঞ্জন কুমার মণ্ডল	এস.এস.পি	৬১৬৪	১১.৩০
৫। জিতেন হালদার	বাংলা কংগ্রেস	৮৫৩	১.৫৬
মোট ভোটার, ৭৮১০৪	ভোট পরে, ৫৭২৯৩	বৈধ ভোট হয়, ৫৪৫৭১	ভোটিং শতাংশ, ৭৫.৩৫

সারণি ৩.৪৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৯ সোনারপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গঙ্গাধর নস্কর	সি.পি.আই.এম	৩০০০৭	৫৪.২১
২। অমেন্দ্রনাথ নস্কর	সি.পি.আই	১৪০৪৩	২৫.৩৬
৩। গৌরহরি সরদার	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১০৮৭৫	১৯.৬৫
৪। বিকাশ চন্দ্র মণ্ডল	জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	৪৩৪	০.৭৮
মোট ভোটার, ৮২৪৪১	ভোট পরে, ৫৮৩২৫	বৈধ ভোট হয়, ৫৫৩৫২	ভোটিং শতাংশ, ৭৫.৭০

সারণি ৩.৪৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৮ বিষ্ণুপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রাম কৃষ্ণ বর	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	২২৭৫৭	৪৬.৫৮
২। সুন্দর কুমার নস্কর	সি.পি.আই.এম	২১৯৭১	৪৪.৯৭
৩। স্বিজাফর মণ্ডল	নির্দল	২৯২০	৫.৯৮
৪। সমির কুমার মণ্ডল	এস.এস.পি	৬১৫	১.২৬
৫। বিষ্ণুপদ বিশ্বাস	জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	৫৯১	১.২১
মোট ভোটার, ৭২৪৪৭	ভোট পরে, ৫০৫২২	বৈধ ভোট হয়, ৪৮৮৫৪	ভোটিং শতাংশ, ৬৯.৭৪

সারণি ৩.৪৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১১ মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	সি.পি.আই.এম	২৩৮৬৩	৩৯.৭৮
২। মনরঞ্জন হালদার	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	২২২১৬	৩৭.০৪
৩। মদন মোহন নস্কর	নির্দল	৯৯৫৫	১৬.৬০
৪। অনুকুল বর	এস. ইউ. সি. আই	৩৩৪৫	৫.৫৮
৫। সাধান চন্দ্র মণ্ডল	জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	৬০২	১.০০
মোট ভোটার, ৮২২৯১	ভোট পরে, ৬২৮৭৮	বৈধ ভোট হয়, ৫৯৯৮১	ভোটিং শতাংশ, ৭৬.৪১

সারণি ৩.৪৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১৩ কুলপি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। মুকুন্দ রাম মণ্ডল	সি. পি. আই.এম	১১৭৫২	২৪.৩৬
২। সন্তোষ কুমার মণ্ডল	জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	৯৮০০	২০.৩১
৩। মুরারি মোহন হালদার	বাংলা কংগ্রেস	৯৭৫৮	২০.২৩
৪। শশাঙ্ক সেখর নাইয়া	এস. ইউ. সি. আই	৮৫৫৯	১৭.৭৪
৫। কার্তিক মণ্ডল	নির্দল	৭৬২০	১৫.৭৯
৬। মাখন চন্দ্র বৈদ্য	নির্দল	৭৫৫	১.৫৬
মোট ভোটার, ৭৫৯৩০	ভোট পরে, ৫২৩২১	বৈধ ভোট হয়, ৪৮২৪৪	ভোটিং শতাংশ, ৬৯.৬৯

সারণি ৩.৪৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১৪ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রেনুপদ হালদার	এস.ইউ.সি.আই	২৪৪০৩	৪১.৮১
২। বিরেন্দ্র নাথ হালদার	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১৭৮৭৫	২০.৩১
৩। ঋষিকেশ হালদার	বাংলা কংগ্রেস	৫৪৫৬	৯.৩৫
৪। বলাই রায়	নির্দল	৫৪২৯	৯.৩০
৫। সুভাষ চন্দ্র রায়	সি.পি.আই.এম	২৯৫৫	৫.০৬
৬। অনাদি মোহন তান্তি	জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান	১৫৫১	২.৬৬
৭। নিরাপদ হালদার	নির্দল	৬৯৫	১.১৯
মোট ভোটার, ৮৪৯৩০	ভোট পরে, ৬১৫৭১	বৈধ ভোট হয়, ৫৮৩৬৪	ভোটিং শতাংশ, ৬৯.৬৯

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র - ৮৩, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০৮, ১১১, ১১৩, ১১৪, Statistical Report on General Electon, 1971 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1973, পৃঃ ৩০৬-১১।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অধ্যুষিত ১২ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্র গুলোতে মোট ৬২ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ৬২ জনের মধ্যে ৫ জন হলেন নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী আর ৫৭ জনই হলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ।[৯১] বেলাঘাটা সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে ৩ জন ও সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র পাথরপ্রতিম থেকে ৩ জন, কাকদ্বীপ থেকে ১ জন, সাগর থেকে ১ জন, নাকাশিপাড়া থেকে ১ জন মোট ৯ জন। ১৯৭১ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে উপরিউক্ত জেলা দুটি থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন ৬৬ জন। আর নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী সাধারণ ও সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ কেন্দ্র থেকে তেহট্ট ১ জন, গাইঘাটা ১ জন, বীজপুর ২ জন, নৈহাটী ১ জন, টিটাগড় ১ জন।[৯২] এই তথ্য থেকে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, উপরিউক্ত নির্বাচনে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দ্বিগুণের অধিক প্রার্থী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পাওয়ার কারণেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে ২ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় ইন্দ্রিরা গান্ধী এই সময় মনে করলেন রাজ্যগুলির ক্ষমতার চাবিকাটি তাঁর হাতে থাকা চাই। এই মর্মে ইন্দ্রিরা

গান্ধী যুক্তি দেখান যে, উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, রাজ্যগুলোই তো তার অধিকাংশের রূপায়ণের মাধ্যম। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই তাই ইন্দিরা গান্ধী ২৮ জুন ১৯৭১ সালে জাতীয় জরুরী আইনের মাধ্যমে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগ করিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন। যা চলে ১৯ মার্চ ১৯৭২ সাল পর্যন্ত।[৯৩] স্বাধীন বাংলাদেশের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত হিন্দুরা শরণার্থী হিসাবে চলে আসে। তাদের কে ইন্দ্রিরা গান্ধী যথাযথ সহযোগিতা করার জন্য ও পাকিস্তানকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য গান্ধীর জনপ্রিয়তা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।[৯৪] এই সময় পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্রদের সংখ্যা মোট তপসিলি জাতির মধ্যে ১১.১০ শতাংশ হয়ে যায়।[৯৫] কাজেই ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাষ্ট্রপতি শাসন ওঠে গেলে পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, ওড়িশা ছাড়াও অন্য সব রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন করা হয়। দেখা যায় যে, ১৯৭২ সালের নির্বাচনে সবকটি রাজ্যেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আবার জিতল।[৯৬] এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সত্যব্রত দত্ত উল্লেখ করেছেন, "৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বির্তক চলছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মৌলনীতির বিরোধী বলে এর বিলুপ্তিরও দাবি করেছেন রাজনীতিবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা। রাজনৈতিক প্রয়োজনে দলীয় স্বার্থে এই ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে অনেকবার। ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার মধ্যে দিয়ে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়"।[৯৭]

যাই হোক এবারে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নদীয়া এবং ২৪ পরগনায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করব।

সারণি ৩.৫০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৬৭ নাকাশিপাড়া (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নীল কমল সরকার	আই. এন. সি	২০৭৫৩	৫৪.৯৯
২। বিনয় ভূষন মজুমদার	সি.পি.আই.এম	১৩৮০৮	৩৬.৫৮
৩। গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল	এম.ইউ.এল	২৮২১	৭.৪৭
৪। কামিনিকুমার দাস	নির্দল	৩৬১	০.৯৬
মোট ভোটার, ৭৪৭৭৮	ভোট পরে, ৩৯০৩৮	বৈধ ভোট হয়, ৩৭৭৪৩	ভোটিং শতাংশ, ৫২.২১

সারণি ৩.৫১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭২ হাঁসখালি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। আনন্দমোহন বিশ্বাস	আই.এন.সি	৩৩৮২৯	৬৮.৪৮
২। মুকুন্দ বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	১৫৫৬৯	৩১.৫২
মোট ভোটার, ৭৯০১৫	ভোট পরে, ৫০৭৪৪	বৈধ ভোট হয়, ৪৯৩৯৮	ভোটিং শতাংশ, ৬৪.২২

সারণি ৩.৫২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৫ রাণাঘাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নিতাইপদ সরকার	সি.পি.আই	৩০৮৯২	৬৫.৯১
২। নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	১৪৭৯৫	৩২.৩৯
৩। সন্তোষ কুমার মণ্ডল	এন.সি.ও	৭৭৬	১.৭০
মোট ভোটার , ৭৩৬৯৩	ভোট পরে, ৪৬৭৯১	বৈধ ভোট হয় , ৪৫৬৭৫	ভোটিং শতাংশ, ৬৩.৪৯

সারণি ৩.৫৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৮ বাগদা (তপসিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। অপূর্ব লাল মজুমদার	নির্দল	২৪৭৬৯	৬৩.৩২
২। কান্তি চন্দ্র বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	১৪৩৪৭	৩৬.৬৮
মোট ভোটার , ৬৫১৮৫	ভোট পরে, ৩৯৯১৮	বৈধ ভোট হয় , ৩৯১১৬	ভোটিং শতাংশ , ৬১.২৪

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র- ৬৭, ৭২, ৭৫, ৭৮, Statistical Report on General Electon, 1972 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1973, পৃঃ ৩০১-৩।

এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নমঃশূদ্র অধ্যুষিত উক্ত চারটি কেন্দ্র থেকে মোট ১১ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১১ জন প্রার্থীই নমঃশূদ্র জাতির। নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পায় ২ টি আসন আর সি.পি.আই ও নির্দল পায় ১ টি করে আসন।[৯৮] এবারে আমরা নিম্নে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উক্ত বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৩.৫৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৩ রাজারহাট (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল	আই.এন.সি	৩২২৮২	৫৫.৩৫
২. রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	সি.পি.আই	২৬০৩৭	৪৪.৬৫
মোট ভোটার, ৯১৮৭৪	ভোট পরে, ৫৯৫৪১	বৈধ ভোট হয় , ৫৮৩১৯	ভোটিং শতাংশ, ৬৪.৮১

সারণি ৩.৫৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯০ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। অনিল কৃষ্ণ মণ্ডল	সি.পি.আই	১৫৪৩৬	৩৫.৭১
২। গোপাল চন্দ্র গায়েন	সি.পি.আই.এম	১৫০৩৩	৩৪.৭৮
৩। আদিত্য মণ্ডল	নির্দল	১১৬১৪	২৬.৮৭
৪। তারাপদ মণ্ডল	এন.সি.ও	১১৪০	২.৬৪
মোট ভোটার, ৭১১৪৯	ভোট পরে, ৪৪৭১৯	বৈধ ভোট হয়, ৪৩২২৩	ভোটিং শতাংশ, ৬২.৮৫

সারণি ৩.৫৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯১ গোসাবা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। পরেশ বৈদ্য	আই.এন.সি	২৬৮৬৭	৫৩.০৫
২। গণেশ মণ্ডল	আর.এস.পি	২১৮৮৮	৪৩.২২
৩। তরঙ্গ মণ্ডল	আর.পি.আই	১৩০৮	২.৫৮
৪। গিরিন্দ্রনাথ মণ্ডল	এন.সি.ও	৫৭৮	১.১৪
মোট ভোটার, ৭৫৬৩৫	ভোট পরে, ৫১৭৬৯	বৈধ্য ভোট হয়, ৫০৬৪১	ভোটিং শতাংশ, ৬৮.৪৭

সারণি ৩.৫৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৩ হারোয়া (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গঙ্গাধর প্ররামানিক	আই.এন.সি	২১২৩৯	৫৪.২২
২। জ্ঞানেন্দ্র নাথ সরদার	সি.পি.আই.এম	১৭৯৩৫	৪৫.৭৮
মোট ভোটার , ৭০৮০৬	ভোট পরে, ৪০১১৩	বৈধ ভোট হয় , ৩৯১৭৪	ভোটিং শতাংশ , ৫৬.৬৫

সারণি ৩.৫৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৫ ক্যানিং (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	আই.এন.সি	৩০৬৭৬	৫৭.২৫
২। নির্মল কুমার সিনহা	সি.অই.আই.এম	২২৪১৬	৪১.৮৩
৩। বিভূতি ভূষন সরদার	পি.বি.আই	৪৯০	০.৯১
মোট ভোটার, ৮৫৮০২	ভোট পরে, ৫৪৭৭১	বৈধ ভোট হয়, ৫৩৫৮২	ভোটিং শতাংশ, ৬৩.৮৩

সারণি ৩.৫৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৬ কুলতলি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। অরবিন্দ নস্কর	আই.এন.সি	৩২৯৬৮	৫৪.৭৮
২। প্রবোধ পুরকাইত	এস.ইউ.সি	২৭২১৭	৪৫.২২
মোট ভোটার, ৯৫০৯৫	ভোট পরে, ৬১৫০৭	বৈধ ভোট হয়, ৬০১৮৫	ভোটিং শতাংশ, ৬৪.৬৮

সারণি ৩.৬০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ বারুইপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। ললিত গায়েন	আই.এন.সি	৩০৫৭৯	৫৫.১৫
২। বিমল মিস্ত্রি	সি.পি.আই.এম	২২৮৭৮	৪১.২৬
৩। প্রমথ সরদার	এম.ইউ.এল	১৬২৯	২.৯৪
৪। কলাসসি মণ্ডল	পি.বি.আই	৩৫৭	০.৬৪
মোট ভোটার, ৮১৯৮৯	ভোট পরে, ৫৬৮৯০	বৈধ ভোট হয়, ৫৫৪৪৩	ভোটিং শতাংশ, ৬৯.৩৯

সারণি ৩.৬১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৯ সোনারপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। কংসারি হালদার	সি.পি.আই	৩০৭০০	৫৬.১৪
২। গঙ্গাধর নস্কর	সি.পি.আই.এম	২৩৩২৮	৪২.৬৬
৩। অবিনাস হালদার	আর.পি.আই	৪৬৩	০.৮৫
৪। বিষ্ণুপদ বিশ্বাস	নির্দল	১৮৯	০.৩৫
মোট ভোটার, ৮৩৫২৯	ভোট পরে, ৫৬২৮৯	বৈধ ভোট হয়, ৫৪৬৮০	ভোটিং শতাংশ, ৬৭.৩৯

সারণি ৩.৬২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৮ বিষ্ণুপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রামকৃষ্ণ বর	আই.এন.সি	২৯৩৯০	৫৮.৬২
২। সুন্দর কুমার নস্কর	সি.পি.আই.এম	২৪৭৪৭	৪১.৩৮
মোট ভোটার, ৭৪৯৩৩	ভোট পরে, ৫১২৮৮	বৈধ ভোট হয়, ৫০১৪০	ভোটিং শতাংশ, ৬৮.৪৫

সারণি ৩.৬৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১১ মগরাহাট (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। মনরঞ্জন হালদার	আই.এন.সি	৩৪৫৩৩	৫৬.৮৮
২। রাধিকা রঞ্জন প্রমানিক	সি.পি.আই.এম	২৫৯০২	৪২.৬৬
৩। নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	নির্দল	২৮১	০.৪৬
মোট ভোটার, ৮৭৪৮০	ভোট পরে, ৬২৪১২	বৈধ্য ভোট হয়, ৬০৭১৬	ভোটিং শতাংশ, ৭১.৩৪

সারণি ৩.৬৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১৩ কুলপি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সন্তোষ কুমার মণ্ডল	আই.এন.সি	৩১০৬৭	৬৪.৭৬
২। শশাঙ্ক সেখর নাইয়া	এস.ইউ.সি	১৫৫৫৫	৩২.৪২
৩। রমেশ হালদার	এন.সি.ও	১২১৮	২.৫৪
৪। মাখন চন্দ্র বৈদ্য	নির্দল	১৩৫	০.২৮
মোট ভোটার, ৭৬৪৭৬	ভোট পরে, ৪৯০৫৮	বৈধ ভোট হয়, ৪৭৯৭৫	ভোটিং শতাংশ, ৬৪.১৫

সারণি ৩.৬৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১৪ মথুরাপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বিরেন্দ্রনাথ হালদার	আই.এন.সি	৩২৫৬২	৫৬.৮৬
২। রেনুপদ হালদার	এস.ইউ.সি	২৩৫৬৪	৪১.১৫
৩। মাখন চন্দ্র বৈদ্য	নির্দল	১০৪১	১.৮২
৪। কালিপদ বুনিয়া	নির্দল	৯৫	০.১৭
মোট ভোটার, ৮৮৫৭৯	ভোট পরে, ৫৮৫৬৬	বৈধ ভোট হয়, ৫৭২৬২	ভোটিং শতাংশ, ৬৬.১২

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র- ৮৩, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০৮, ১১১, ১১৩, ১১৪, Statistical Report on General Electon, 1972 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1973, পৃঃ ৩০৩-৭।

উপরিউক্ত ১২ টি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে মোট ৩৮ জন প্রার্থী ১৯৭২ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী ১২ টি আসনেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির জনবিন্যাস সমস্ত দলিত জাতি থেকে সর্বাধিক।[৯৬] কাজেই ৩৭ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী আর ১ জন নমঃশূদ্র জাতির প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।৯৭ এই নির্বাচনে

১২ টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ১০ টি আর, সি.পি.আই পায় ২ টি আসন।[১০০] নদীয়া ও চব্বিশ পরগনাজেলা থেকে মোট নমঃশূদ্র প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন ১৪ জন নৈহাটি কেন্দ্র থেকে ভোলানাথ বৈদ্য, সোনারপুর কেন্দ্র থেকে বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, বেলেঘাটা থেকে সুমন্ত হিরা । আর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণের মোট প্রার্থী ১৯৭২ সালের নির্বাচনে মোট ৪১ জন সাধারণ আসন থেকে ৩ জন, যেমন সাগর কেন্দ্র থেকে প্রভঞ্জন কুমার মণ্ডল, বজবজ থেকে ক্ষিতি ভূষণ রায় বর্মন, মগরাহাট থেকে শুভেন্দু মণ্ডল ও সংরক্ষিত বেলেঘাটা থেকে অর্ধেন্দু সেখর নস্কর।[১০১] এই নির্বাচনে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্ররা প্রায় তিনগুন বেশি প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭২ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে সরকার গঠন করেন। নমঃশূদ্র নেতা অপূর্বলাল মজুমদার নির্বাচনের পরেই কংগ্রেসে যোগদান করে রায় মন্ত্রীসভার অধ্যক্ষ হিসাবে মনোনীত হন।[১০২] কাজেই আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, অপূর্বলাল মজুমদার গুরুচাঁদ ঠাকুরের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের কথা মনে রেখেই কি দল ত্যাগ করলেন।

যাই হোক সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের আমলে (১৯৭২-১৯৭৭) তপসিলি জাতির নেতৃত্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে থাকলেও ১৯৬০ সালে পরে উদ্বাস্তু সমস্যা, দন্ডকারণ্য পরিকল্পনা বিরোধী আন্দোলন, খাদ্য সমস্যা বিধান রায়ের আমলে তৈরি হওয়া ‘জমিদার উচ্ছেদ বিল’ (১৯৫৩) এর নানা ত্রুটি জনগণের সামনে প্রচার করে বামপন্থী দলগুলি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসার ভিত তৈরি করতে থাকেন। আমাদের রাজ্যের বর্ণ বৈষম্যের ক্ষেত্রে সি.পি.আই.এম. তথা বামপন্থীদের তাত্ত্বিক নেতা বি.টি. রণদিভে উল্লেখিত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে তপসিলি জাতির সমস্যাকে বামপন্থীরা উৎপাদনের সম্পর্কের সঙ্গে শোষিত শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের সঙ্গে একত্রিত করে আন্দোলনের পথে ধাবিত হয়।[১০৩] যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ দলিত শ্রমজীবী ক্ষেত মজুর ও ছোট কৃষক হওয়ার কারণেই উচ্চবর্ণের জমিদার, জোতদার, বৃহৎ কৃষক এবং সামাজিক ভাবে সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়াই তারা মহাজনী ও বর্গা ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ভেদাভেদ টিকিয়ে রেখে শোষণ করে বলে, বামপন্থীরা প্রচার করে দলিত ভোট নিজেদের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। বামপন্থী আর্দশের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে জাতিভেদ কাঠামোকে দূরীকরণ এবং সামাজিক সংস্কারকে পৃথকভাবে গুরুত্ব না দিয়ে জাতি বা বর্ণকে

গণতান্ত্রিক ও শ্রেণী সংগ্রামের অংশ হিসাবে দেখা হয়।[১০৪] কাজেই এই সময় থেকেই বেশির ভাগ দলিত নেতৃত্ব বামপন্থী আন্দোলনের দিকে চলে যায়। সেদিক নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্ররা বামপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে পরেন।

এপ্রসঙ্গে আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন মধ্যরাতে ইন্দ্রিরা গান্ধী সংবিধানের ৩৫২ নং ধারার বলে সারাদেশে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। কাজেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রায় স্তব্ধ করে দেন।[১০৫] এই পর্বে রাজ্য শাসন করত কংগ্রেস, হয় স্বনামে, না হয় রাষ্ট্রপতি শাসনের বকলমে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থী এবং গ্রামের গরিব মানুষের আন্দোলনের উপর যে মাত্রায় রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলে তা থেকেই জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। যার ফলে সি.পি.আই.এম তথা বামপন্থীদের জনপ্রিয়তা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ব্যাপক বেড়ে যায়।[১০৬] ফলে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা উঠে গেলে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের ১৯৭৩ সালে গঠিত তৃতীয় ডিলিমিলেশন কমিশনের প্রস্তাবের উল্লেখ করতে হবে। এই সীমানা বিন্যাসের প্রস্তাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আসন বেড়ে দাড়ায় ২৯৪ টি এর মধ্যে ৫৯ টি তপসিলি জাতির এবং ১৭ টি আসন তপসিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল।[১০৭] বিধানসভার আসনবিন্যাসের ফলে ৫৯ টি নির্বাচিনীক্ষেত্রের মধ্যে ১৭ টি নির্বাচনীক্ষেত্র নদীয়া ও চব্বিশ পরগনাজেলার মধ্যে পরে।[১০৮] আবার ১৭ টি আসনের মধ্যে ১৩ টি আসন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত আসন। আর বাকী ৪ টি আসন নমঃশূদ্র অধ্যুষিত কেন্দ্রের আসন।[১০৯] উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী বিধানসভা নির্বাচনীক্ষেত্রের সীমানা পরিবর্তনের সাথে নামেরও পরিবর্তন এসেছিল।

নিম্নে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থীদের ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার অংশগ্রহণ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করব।

সারণি ৩.৬৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৪ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	২৩৬৩৫	৫৩.৪০
২। অমূল্য কুমার বিশ্বাস	জে.এন.পি	১৩১৩১	২৯.৬৭

৩। শ্রীমঙ্গল বিশ্বাস	আই.এন.সি	৬৪৯৭	১৪.৬৮
৪। রামপদ মল্লিক	নির্দল	৩৮৫	০.৮৭
৫। সুধির কুমার পোদ্দার	নির্দল	৩৭৭	০.৮৫
৬। নির্মল কান্তি বিশ্বাস	নির্দল	২৩৫	০.৫৩
মোট ভোটার, ৬৮৪৩০	ভোট পরে, ৪৫০৬৪	বৈধ ভোট হয়, ৪৪২৬০	ভোটিং শতাংশ, ৬৫.৮৫

সারণি ৩.৬৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৯ হাসখালি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুকুমার মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	২৫৮৬১	৪৪.৮৩
২। আনন্দমোহন বিশ্বাস	আই.এন.সি	২০০৬০	৩৪.৭৭
৩। সুকদেব বাগচী	জে.এন.পি	১০৮৫৫	১৮.৮২
৪। নিখল রঞ্জন	নির্দল	৬৫২	১.৫৮
মোট ভোটার, ৮৪২২৩	ভোট পরে, ৫৮৬৩৬	বৈধ ভোট হয়, ৫৭৬৮৮	ভোটিং শতাংশ, ৬৯.৬২

সারণি ৩.৬৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮০ রাণাঘাট পূর্ব (তপসিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সতিশ চন্দ্র বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	২৮৭৮৬	৪৮.৯৮
২। সুশীল কুমার রায়	আই.এন.সি	১৬১৩৩	২৭.৪৫
৩। নিতাইপদ সরকার	সি.পি.আই	৭৩৯৩	১২.৫৮
৪। দেবেন্দ্র সরকার	নির্দল	৫৮০৪	৪.৪৮
৫। কৃষ্ণনেন্দু বিশ্বাস	নির্দল	৬৫২	০.৫৫
মোট ভোটার, ৯১৪০৮	ভোট পরে, ৫৯৬৭২	বৈধ ভোট হয়, ৫৮৭৬৮	ভোটিং শতাংশ, ৬৫.২৮

সারণি ৩.৬৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৪ বাগদা (তপসিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। কমলাক্ষ্মী বিশ্বাস	এফ.বি.এল	২৫০৪৯	৪৪.৮৫
২। অপূর্ব লালা মজুমদার	নির্দল	২৪৯৬৬	৪৪.৭০
৩। সুনীল কুমার মণ্ডল	জে.এন.পি	৫৬১৯	১০.০৬
৪। উপেন্দ্রনাথ হালদার	নির্দল	২১৩	০.৩৮
মোট ভোটার, ৭৭০৪৩	ভোট পরে, ৫৬৫৮২	বৈধ্য ভোট হয়, ৫৫৮৪৭	ভোটিং শতাংশ, ৭৩.৪৪

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র- ৭৪, ৭৯, ৮০, ৮৪, Statistical Report on General Electon, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1977, পৃঃ ৩২২-২৪

উপরিক্ত চারটি কেন্দ্রে ১৯ জন প্রার্থীই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। চারটি আসনের মধ্যে ৩ টি আসন পায় সি.পি.আই.এম. আর একটি আসন পায় পায় এফ.বি.এল।[১১০] নিম্নে আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থীদের ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করব।

সারণি ৩.৭০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯১ রাজারহাট (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	২৮৪৯৫	৫৫.০৪
২। অমলেন্দু সেখর নস্কর	আই.এন.সি	১২১২৬	২৩.৪২
৩। অশ্বিনী প্রমানিক	জে.এন.পি	১০৮৭৪	২১.০০
৪। ললিত কুমার প্রমানিক	নির্দল	২৭৭	০.৫৪
মোট ভোটার, ৮৭২৮৪	ভোট পরে, ৫২৬৬৮	বৈধ ভোট হয়, ৫১৭৭২	ভোটিং শতাংশ, ৬০.২৪

সারণি ৩.৭১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৭ হারোয়া (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। ক্ষিতি রঞ্জন মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	২৪৩১০	৫৮.৫২
২। ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার	জে.এন.পি	৮৫২০	২০.৫১
৩। চিত্তারঞ্জন মণ্ডল	আই.এন.সি	৮০২৭	১৯.৩২
৪। সনৎ সিনহা	নির্দল	৬৮৫	১.৬৫
মোট ভোটার, ৮৭৪৮২	ভোট পরে, ৪২৪০৪	বৈধ ভোট হয়, ৪১৫৪২	ভোটিং শতাংশ, ৪৮.৪৭

সারণি ৩.৭২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ সন্দেশখালি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৩২৯০৭	৬০.৬১
২। রণজিৎ কুমার দাস	আই.এন.সি	১১২৬০	২০.৭৪
৩। অনন্ত কুমার বৈদ্য	জে.এন.পি	৮৪৯৯	১৫.৬৬
৪। চন্দ্রকান্ত সরকার	নির্দল	৭৭১	১.৪২
৫। বিভূতি ভূষণ মণ্ডল	নির্দল	৪৪৪	০.৮২
৬। অভিমুন্য দাস	নির্দল	২৮৫	০.৫২
৭। সুনীল কুমার নায়ক	নির্দল	১২৩	০.২৩
মোট ভোটার, ৯১৯১৭	ভোট পরে, ৫৫২৮৪	বৈধ ভোট হয়, ৫৪২৮৯	ভোটিং শতাংশ, ৬০.১৫

সারণি ৩.৭৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৯ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুধাশু মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	২৩৪৭৫	৪৩.৯৩
২। অমল কৃষ্ণ মিস্ত্রি	জে.এন.পি	১০৯৮৯	২০.৫৬
৩। শঙ্কর রায়	আই.এন.সি	১০৮৮৩	২০.৩৭
৪। অনিল কৃষ্ণ মণ্ডল	সি.পি.আই	৭৭০১	১৪.৪১
৫। হরি চন্দন দাস	নির্দল	৩৮৮	০.৭৩
মোট ভোটার, ৮৬২৭৫	ভোট পরে, ৫৪৩৩৩	বৈধ ভোট হয়, ৫৩৪৩৬	ভোটিং শতাংশ, ৬২.৯৮

সারণি ৩.৭৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০০ গোসাবা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গণেশ চন্দ্র মণ্ডল	আর.এস.পি	২৪৩০০	৪৮.২০
২। পরেশ বৈদ্য	আই.এন.সি	১৬৫৩০	৩২.৭৯
৩। অসিত রঞ্জন মৃধা	জে.এন.পি	৯২৮৫	১৮.৪২
৪। দূর্গাপদ সাপুই	নির্দল	৩০০	০.৬০
মোট ভোটার, ৮১৭৬৯	ভোট পরে, ৫১১৬৬	বৈধ্য ভোট হয়, ৫০৪১৫	ভোটিং শতাংশ, ৫৭.৬২

সারণি ৩.৭৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০১ বাসন্তি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। কালিপদ বর্মন	আর.এস.পি	২৪৬৯৫	৫২. ২৯
২। চিত্তরঞ্জন নস্কর	আই.এন.সি	১১৭৬৫	২৪.৯১
৩। পরেশ কয়াল	জে.এন.পি	৭৯০৮	১৬.৭৫
৪। গুনাসিন্দু সরদার	নির্দল	২৩৫৯	৫.০০
৫। অর্ধেন্দু সেখর মণ্ডল	নির্দল	৪০৫	০.৮৬
৬। মুক্তরাম সরদার	নির্দল	৯১	০.১৯
মোট ভোটার, ৯৪২৯৪	ভোট পরে, ৪৭৯৬২	বৈধ ভোট হয়, ৪৭২২৩	ভোটিং শতাংশ, ৫০.৫৬

সারণি ৩.৭৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০২ কুলতলি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। প্রবোধ পুরকাইত	এস. ইউ. সি	২৪০৮৮	৪৬.৮৩
২। অনাদি তাতি	জে.এন.পি	১৪৭৫০	২৮.৬৮
৩। অরবিন্দ নস্কর	আই.এন. সি	৮৭২৬	১৬.৯৭
৪। গঙ্গাধর নস্কর	সি.পি.আই.এম	৩৮৬৬	৭.৫২
মোট ভোটার, ৯৭০৭৫	ভোট পরে, ৫২৩২৩	বৈধ ভোট হয়, ৫১৪২৮	ভোটং শতাংশ, ৫৩.৯০

সারণি ৩.৭৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৫ ক্যানিং পশ্চিম (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। চিত্তরঞ্জন মৃধা	সি.পি.আই.এম	২০৬৭৫	৩৫.৩৯
২। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	আই.এন.সি	১৬০১০	২৭.৪০
৩। দশরত মণ্ডল	এস.ইউ.সি	৯২২০	১৫.৭৮
৪। নারায়ণ চন্দ্র নস্কর	নির্দল	৮৬০৫	১৪.৭৩
৫। কুমুদ রঞ্জন মণ্ডল	জে.এন.পি	৩৯১২	৬.৭০
মোট ভোটার, ১০১১৪৭	ভোট পরে, ৫৯৫৮৫	বৈধ ভোট হয়, ৫৮৪২২	ভোটং শতাংশ, ৫৮.৯১

সারণি ৩.৭৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৯ সোনারপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গঙ্গাধর নস্কর	সি.পি.আই.এম	৩৬১৩৮	৬৮.৭৩
২। গৌরহরি সরদার	আই.এন.সি	১০৩২৯	১৯.৬৪
৩। অনিতা বিশ্বাস	জে.এন.পি	৫৪১৫	১০.৩০
৪। চন্ডিচরণ বিশ্বাস	নির্দল	৪২৫	০.৮১
৫। দূর্গাদাস মণ্ডল	নির্দল	১৭০	০.৩২
৬। দেবেন সরকার	নির্দল	১০৪	০.২০
মোট ভোটার, ৯১৮২২	ভোট পরে, ৫৩৪৮৭	বৈধ ভোট হয়, ৫২৫৮১	ভোটং শতাংশ, ৫৮.২৫

সারণি ৩.৭৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১০ বিষ্ণুপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুন্দর নস্কর	সি.পি.আই.এম	২৫৬৩১	৬৩.৭৭
২। রামকৃষ্ণ বর	আই.এন.সি	১০৪৯০	২৬.১০
৩। হারানন্দ হালদার	জে.এন.অই	৪০৭২	১০.১৩
মোট ভোটার, ৭০০০৩	ভোট পরে, ৪০৮৮৯	বৈধ ভোট হয়, ৪০১৯৩	ভোটং শতাংশ, ৫৮.৪১

সারণি ৩.৮০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২১ মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	সি.পি.আই.এম	৩৫৩৪৯	৬০.৭৯
২। মনোরঞ্জন হলদার	আই.এন.সি	১৭৭৫০	৩০.৫৩
৩। আজিত কুমার রায়	জে.এন.পি	৪৮৩৭	৮.৩২
৪। মানিক চন্দ্র হালদার	নির্দল	২১০	০.৩৬
মোট ভোটার, ৯৩৯৮১	ভোট পরে, ৫৯২৭৯	বৈধ ভোট হয়, ৫৮১৪৬	ভোটং শতাংশ, ৬৩.০৮

রণি ৩.৮১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২২ মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রেনুপদ হালদার	এস.ইউ.সি	১৯১৫১	৩৪.৯৫
২। সুভাষ চন্দ্র রায়	সি.পি.আই.এম	১৩৫৫৬	২৪.৭৪
৩। বৃন্দাবন গায়েন	জে.এন.পি	১২৭০১	২৩.১৮
৪। সচিন রায়	আই.এন.সি	৭২৪৩	১৩.২২
৫। অসিত রঞ্জন মণ্ডল	নির্দল	১১১৯	২.০৪
৬। সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস	নির্দল	৪৭০	০.৮৬
৭। বৈদ্যনাথ মণ্ডল	নির্দল	৩৮৫	০.৭০
৮। দূর্গা চরণ মণ্ডল	নির্দল	১৭২	০.৩১
মোট ভোটার, ৯১৭২৭	ভোট পরে, ৫৫৫১৫	বৈধ ভোট হয়, ৫৪৭৯৭	ভোটং শতাংশ, ৬০.৫২

সারণি ৩.৮২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৪ কুলপি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। কৃষ্ণধন হালদার	সি.পি.আই.এম	২১৮৪৪	৪৪.৯৯
২। সন্তোষ কুমার মণ্ডল	আই.এন.সি	১৪৩৬০	২৯.৫৮
৩। নলিনিকান্ত হালদার	জে.এন.পি	১২৩৪৫	২৫.৪৩
মোট ভোটার, ৮৬১৭০	ভোট পরে, ৪৯৩৩৫	বৈধ ভোট হয়, ৪৮৫৪৯	ভোটং শতাংশ, ৫৭.২৫

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র- **৯১, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৯, ১১০, ১২১, ১২২, ১২৪**, Statistical Report on General Electon, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1977, পৃঃ ৩২৫-৩০

উপরিউক্ত ১৩ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্র থেকে মোট ৬৩ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ৬৩ জনের মধ্যে ৬১ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আর ২ জন মাত্র নমঃশূদ্র জাতির প্রতিনিধি।[১১১] উক্ত ১৩ টি আসনের মধ্যে সি.পি.আই.এম জয়লাভ করে ৯ টি আসনে, এস.ইউ.সি পায় ২ টি আসনে ও আর.এস.পি পায় ২ টি আসন।[১১২] এছাড়াও সাধারণ নির্বাচনীক্ষেত্র থেকে পৌণ্ড্র জাতির ৪ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তাঁরা হলেন জয়নগর কেন্দ্র থেকে দেবপ্রসাদ সরকার (এস.ইউ. আই), বজবজ কেন্দ্র থেকে ক্ষিতি ভূষণ রায় বর্মন (সি.পি.আই.এম), ফলতা কেন্দ্র থেকে নিমাই চন্দ্র দাস (সি.পি.আই.এম) সাগর কেন্দ্র থেকে প্রভরঞ্জন মণ্ডল।[১১৩] নমঃশূদ্র যে সমস্ত সাধারণ কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলে সেগুলি হল, গাইঘাটা কেন্দ্র থেকে কান্তিচন্দ্র বিশ্বাস (সি.পি.আই.এম) ও প্রবীর কুমার মজুমদার (জে.এন.পি), রাধাপদ বিশ্বাস (আই.এন.সি) এবং পরমান্দ হালদার (নির্দল)। বনগাঁ কেন্দ্র থেকে কৃষ্ণ দুলাল বিশ্বাস (সি.পি.আই), নৈহাটি কেন্দ্র থেকে ধিলান সরকার (জে.এন.পি) বিজপুর কেন্দ্র থেকে জগদীশ চন্দ্র দাস (সি.পি.আই.এম)। তা সত্ত্বেও নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্ররা তিনগুণের বেশি প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। ভোটের শতকরা হারও নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রদের আসন গুলোতে বেশি পরে।[১১৪] এথেকে বলা যেতে পারে যে, এই নির্বাচনেও পৌণ্ড্রদের অংশগ্রহণ অনেকটা বেশিছিল।

১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামপন্থী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই সময় দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার আগ্রহপ্রকাশ করেন। কাজেই সতীশ চন্দ্র মণ্ডল এবং রাইচরণ বাড়ৈ এর নেতৃত্বে 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি' সাংগঠনিক ভাবে প্রচার চালায়। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রায় ৩০-৩৫ হাজার উদ্বাস্তু ২৪ পরগনার সুন্দরবনে 'মরিচঝাঁপি' দ্বীপে আশ্রয় নেয়।[১১৫] এই উদ্বাস্তুদের অধিকাংশ নমঃশূদ্র ও সামান্য সংখ্যক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। নমঃশূদ্র জাতির মানুষেরা 'মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে বড় একটা সংখ্যার মানুষের মনে বামপন্থী সরকারের উপর একটা বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ তৈরি হয়। এই সম্পর্কে আমরা এর পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

যাই হোক নিম্নে আমরা ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৭ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্রতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করবো।

সারণি ৩.৮৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৪ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নয়ন চন্দ্র সরকার	সি পি আই এম	৪৭৯৫৭	৫৯.৯৬
২। মৃনাল কান্তি বিশ্বাস	আই এন সি	২৬০৯৯	৩২.৬৩
৩। শ্রীপতি রঞ্জন চৌধুরি	নির্দল	১৯৯৬	২.৫০
৪। সুপ্রভাত বিশ্বাস	বি জে পি	১৯১১	২.৩৯
৫। বলেন হলদার	নির্দল	১১৪০	১.৪৩
৬। বিকাশ বিশ্বাস	নির্দল	৬৮৩	০৮৫
৭। অরুন মণ্ডল	নির্দল	২০২	০.২৫
মোট ভোটার, ১০০৪৪১	ভোট পরে, ৮১০৯৯	বৈধ ভোট হয়, ৭৯৯৮৮	ভোটিং শতাংশ, ৮৪.৭৫

সারণি ৩.৮৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৯ হাঁসখালি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুকুমার মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	৫২২৫২	৫২.৬৬
২। শশাঙ্ক সেখর বিশ্বাস	আই এন সি	৩৬৭৭৩	৩৭.০৬
৩। আনন্দ মোহন বিশ্বাস	নির্দল	৮২১৫	৮.২৮
৪। সত্যরঞ্জন বিশ্বাস	নির্দল	১৯৭৭	১.৯৯
মোট ভোটার, ১২৫৭১৪	ভোট পরে, ১০০৫২১	বৈধ ভোট হয়, ৯৯২১৭	ভোটিং শতাংশ, ৭৯.৯৬

সারণি ৩.৮৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮০ রাণাঘাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৫৩৯৯	৫৫.৪১
২। রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	আই এন সি	৪০৪৯৯	৪১.৫৬
৩। শ্রীমঙ্গল বিশ্বাস	নির্দল	২৬২২	২.৬৯
৪। বিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস	নির্দল	৩২৭	০.৩৪
মোট ভোটার, ১২৯৩২৫	ভোট পরে, ৯৮৮২৮	বৈধ ভোট হয়, ৯৭৪৪৭	ভোটিং শতাংশ, ৭৬.৪২

সারণি ৩.৮৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৪ বাগদা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। অপূর্ব লাল মজুমদার	আই এন সি	৪৪৫১৭	৪৯.১৬
২। কমলাক্ষী বিশ্বাস	এফ বি এল	৪৩৯৩১	৪৮.৫১
৩। প্রদ্যুত বিশ্বাস	নির্দল	৯২৬	১.০২
৪। আশুতোষ মজুমদার	নির্দল	৭৪০	০.৮২
৫। চারুমিহির সরকার	নির্দল	২৭৭	০.৩১
৬। সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস	নির্দল	১৬৫	০.১৮
মোট ভোটার, ১০৪১৯৩	ভোট পরে, ৯১২৪৭	বৈধ ভোট হয়, ৯০৫৫৬	ভোটিং শতাংশ, ৮৭.৫৭

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র- ৭৪, ৭৯, ৮০, ৮৪, Statistical Report on General Electon, 1987 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1987, পৃঃ ৩২২-২৩।

উপরিউক্ত ৪ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীকেন্দ্র থেকে মোট ২১ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এই ২১ জনের মধ্যে ২১ জনই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। এঁদের মধ্যে কোন মহিলা প্রার্থী ছিল না। তবে দেখা গেছে যে, আর.পি.আই-র প্রার্থী না পাওয়া গেলেও বি.জে.পির হয়ে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ প্রার্থী হয়েছিলেন।[১১৬] উপরিউক্ত ৪ টি সংরক্ষিত আসন থেকে ৩ টি জয় পায় সি.পি.আই.এম এবং ১ টি আসনে জয় পায় আই.এন.সি।

সারণি ৩.৮৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯১ রাজারহাট (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	৫৯০২৯	৫৩.৯২
২। বিশ্বানন্দ নস্কর	আই এন সি	৪৭২৬০	৪৩.১৭
৩। রণজিৎ নস্কর	নির্দল	২১৮০	১.৯৯
৪। পঞ্চানন বর্মন	নির্দল	৭৮৯	০.৭২
৫। চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস	নির্দল	২১১	০.১৯
মোট ভোটার, ১৩৮৮১৫	ভোট পরে, ১১১৩২১	বৈধ ভোট হয়, ১০০৯৬৭	ভোটিং শতাংশ, ৮০.১৯

সারণি ৩.৮৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৭ হারোয়া (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। ক্ষিতি রঞ্জন মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	৪৯৯২৯	৫১.৬৯
২। লক্ষ্মীরঞ্জন মণ্ডল	আই এন সি	৪৪০৪৯	৪৫.৬০
৩। সুবোধ কুমার টিকাদার	নির্দল	২০৯৪	২.১৭
৪। রামকৃষ্ণ সরদার	নির্দল	৫২৩	০.৫৪
মোট ভোটার, ১২২৭৫৭	ভোট পরে, ৯৮৫০০	বৈধ ভোট হয়, ৯৬৫৯৫	ভোটিং শতাংশ, ৮০.২৪

সারণি ৩.৮৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৪ সন্দেশখালি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম.	৫৪২১৭	৫৭.৩৫
২। রণজিৎ কুমার দাস	আই এন সি	৩৮২০৯	৪০.৪২
৩। অভিমান্য দাস	নির্দল	১৫৯০	১.৬৮
৪। জগদীশ চন্দ্র কির্ত্তনীয়	নির্দল	৫১৯	০.৫৫
মোট ভোটার, ১২০২৩৫	ভোট পরে, ৯৬৫১৯	বৈধ ভোট হয়, ৯৪৫৩৫	ভোটিং শতাংশ, ৮০.২৪

সারণি ৩.৯০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৯ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুধাংশু মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	৪৯৭৪০	৫৪.১০
২। অদিত্য মণ্ডল	আই এন সি	৩৭৭৫০	৪১.০৬
৩। রণজিৎ গায়েন	নির্দল	৪০৩৭	৪.৩৯
৪। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	নির্দল	৪১৪	০.৪৫
মোট ভোটার, ১১৩৩১৭	ভোট পরে, ৯৩৪৩১	বৈধ ভোট হয়, ৯১৯৪১	ভোটিং শতাংশ, ৮২.৪৫

সারণি ৩.৯১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০০ গোসাবা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গণেশ চন্দ্র মণ্ডল	আর এস পি	৪২১১১	৫৪.২৯
২। প্রমিলা বিশ্বাস	আই এন সি	৩৩০৫২	৪২.৫১
৩। তাপস সরকার	এস ইউ সি আই	২০৩০	২.৬১
৪। মহাদেব রায় মণ্ডল	নির্দল	৫৫৩	০.৭১
মোট ভোটার, ৯৭৫৮৮	ভোট পরে, ৭৮৯৮৫	বৈধ ভোট হয়, ৭৭৭৪৬	ভোটিং শতাংশ, ৮০.৯৪

সারণি ৩.৯২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০১ বাসন্তী (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুভাষ নস্কর	আর এস পি	৫০৬৭৪	৫৫.২৯
২। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার	আই এন সি	৩৮৭৩৫	৪২.২৬
৩। নিমাই মণ্ডল	এস ইউ সি আই	১৫৯৯	১.৭৪
৪। পরেশ ওঝা	নির্দল	৫৯৫	০.৬৫
৫। চন্দ্রকান্ত সরকার	নির্দল	৫১	০.০৫
মোট ভোটার, ১২৬৪৪০	ভোট পরে, ৯৩৪৪৬	বৈধ ভোট হয়, ৯১৬৫৪	ভোটিং শতাংশ, ৭৩.৯১

সারণি ৩.৯৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০২ কুলতলি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। প্রবোধ পুরকাইত	এস ইউ সি আই	৪৫৭৯০	৫০.৩৪
২। অরবিন্দ নস্কর	আই এন সি	৩৩৯৪৯	৩৭.৩২
৩। বিমল মৃধা	সি.পি.আই.এম	১১০৩৮	১২.১৩
৪। সত্যরঞ্জন হালদার	নির্দল	১৮৪	০.২০
মোট ভোটার, ৮৭৫১৮৪	ভোট পরে, ৯২৩৬৬	বৈধ ভোট হয়, ৯০৯৬১	ভোটিং শতাংশ, ৭৯.৬৭

সারণি ৩.৯৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৫ ক্যানিং (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	আই এন সি	৪৪৩৬২	৪৫.৬১
২। চিত্তরঞ্জন মৃধা	সি.পি.আই.এম	৪৩৮৫৬	৪৫.০৯
৩। রণজিৎ গায়েন	এস ইউ সি আই	৮৫৬০	৮.৮০
৪। দূর্গা নস্কর	নির্দল	৪১০	০.৪২
৫। খগেন্দ্রনাথ রয়	নির্দল	৮৬	০.০৯
মোট ভোটার, ১২৭৩১৫	ভোট পরে, ৯৯০৭৯	বৈধ ভোট হয়, ৯৭২৭৪	ভোটিং শতাংশ, ৮২.৭৭

সারণি ৩.৯৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৯ সোনারপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। ভদ্রেশ্বর মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	৬৫৭২৮	৬০.৩০
২। সুভারঞ্জন সরদার	আই এন সি	৪১৮১৭	৩৮.৩৬
৩। ভূষণ মণ্ডল	নির্দল	৮৩৮	০.৭৭
৪। অঞ্জলি মণ্ডল	নির্দল	৬১৮	০.৫৭
মোট ভোটার, ১৪৬৯৩৮	ভোট পরে, ১১১১২৪	বৈধ ভোট হয়, ১০৯০০১	ভোটিং শতাংশ, ৭৫.৬৩

সারণি ৩.৯৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১০ বিষ্ণুপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুন্দর নস্কর	সি.পি.আই.এম	৪৩৫৭৮	৫৮.৪৭
২। অর্দ্ধেন্দু সেখর নস্কর	আই এন সি	৩০২৬৭	৪০.৬১
৩। রণজিৎ কুমার মণ্ডল	নির্দল	৬৮০	০.৯১
মোট ভোটার, ৯৩৪৮৬	ভোট পরে, ৭৬০১২	বৈধ ভোট হয়, ৭৪৫২০	ভোটিং শতাংশ, ৮১.৩১

সারণি ৩.৯৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২১ মগরাহাট (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রাধিকা রঞ্জন প্রমানিক	সি.পি.আই.এম	৫১০৮২	৫৬.৫২
২। মনোরঞ্জন হালদার	আই এন সি	৩৮৫৭১	৪২.৬৮
৩। বিনয় মণ্ডল	নির্দল	৭২৪	০.৮০
মোট ভোটার, ১১৩৬৫১	ভোট পরে, ৯১৯০২	বৈধ ভোট হয়, ৯০৩৭৭	ভোটিং শতাংশ, ৮০.৯১

সারণি ৩.৯৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২২ মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুভাষ রায়	সি.পি.আই.এম	৪০৭০৮	৪৫.৫৩
২। দূর্গা চরণ মণ্ডল	আই এন সি	৩৩৭১০	৩৭.৭১
৩। রেনুপদ হালদার	এস ইউ সি আই	১৩৮৬২	১৫.৫১
৪। দূর্গাপদ হালদার	নির্দল	৯১১	১.০২
৫। মাখন চন্দ্র বৈদ্য	নির্দল	২১১	০.২৪
মোট ভোটার, ১১৭০২০	ভোট পরে, ৯০৭৩২	বৈধ ভোট হয়, ৮৯৪০২	ভোটিং শতাংশ, ৭৭.৫৪

সারণি ৩.৯৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৪ কুলপি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। কৃষ্ণাধন হালদার	সি.পি.আই.এম	৩৯০০২	৫১.৯৩
২। কৃত্তীবাস সরদার	আই এন সি	৩১৩৭৭	৪১.৭৭
৩। সমির সেখর নাইয়া	এস ইউ সি আই	২৬৪৯	৩.৫৩
৪। সুজিত রায়	এম ইউ এল	১৭৮১	২.৩৭
৫। পঞ্চানন হালদার	নির্দল	৩০১	০.৪০
মোট ভোটার, ১০৬৬৮৩	ভোট পরে, ৭৬২৬২	বৈধ ভোট হয়, ৭৫১১০	ভোটিং শতাংশ, ৭১.৪৮

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র- ৯১, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৯, ১১০, ১২১, ১২২, ১২৪, Statistical Report on General Electon, 1987 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1987, পৃঃ ৩২৫-৩০

উপরের ১৩ টি নির্বাচনীক্ষেত্রতে মোট ৫৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ৫৫ জনের মধ্যে ৮ জন ছিলেন নমঃশূদ্র আর ৪৭ জনই ছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। তবে নমঃশূদ্রদের মধ্যে ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী না থাকলেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মধ্যে থেকে ১ জন মহিলা প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত কেন্দ্র থেকে কোন বি.জে.পির প্রার্থী এই নির্বাচনে ছিল না। এই নির্বাচনে ১৩ টি সংরক্ষিত আসন থেকে সি.পি.আই.এম জয়লাভ করে ৯ টি আসন, আর.এস.পি. ২ টি আসন জয়লাভ করে, এস.ইউ.সি ১ টি ও আই.এন.সি ১ টি জয়লাভ করে।[১১৭] এই নির্বাচনে নমঃশূদ্র প্রার্থীরা যে সকল সাধারণ নির্বাচনীকেন্দ্র থেকে অংশগ্রহণ করেছিল সেগুলি হল, নাকাশিপাড়া কেন্দ্র থেকে নীলকমল সরকার ও নিরাপদ বিশ্বাস (নির্দল)। হরিণঘাটা কেন্দ্র এন.কে. বিশ্বাস (নির্দল)। বনগাঁ কেন্দ্র থেকে অজিত বিশ্বাস ও পরমানন্দ হালদার (নির্দল)। গাইঘাটা কেন্দ্র থেকে কান্তি বিশ্বাস (সি.পি.আই.এম) জয়ী হন, রাধাপদ বিশ্বাস (আই.এন.সি), গোপাল মণ্ডল (নির্দল)। আশোকনগর কেন্দ্র থেকে ক্ষুদিরাম মণ্ডল (এল.কে.ডি), নিশিকান্ত হালদার (নির্দল)। আমডাঙ্গা কেন্দ্র থেকে দুলাল বিশ্বাস (নির্দল)। বিজপুর কেন্দ্র থেকে জগদীশ চন্দ্র দাস (সি.পি.আই.এম) জয়ী হন। বাদুরিয়া কেন্দ্র থেকে দীপক কুমার সরকার (নির্দল)। স্বরূপনগর কেন্দ্র থেকে কৃষ্ণপ্রসাদ সরদার (নির্দল)। জগতদল কেন্দ্র থেকে ননীগোপাল সরকার (আই.এন.সি) নীহাররঞ্জন সরকার (জে.এন.পি)। সাধারণ আসন থেকে মোট ১৬ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ১৬ জনের মধ্যে থেকে ২ জন সি.পি.আই.এম প্রার্থী নির্বাচিত হন।[১১৮] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা যে সকল সাধারণ নির্বাচনীকেন্দ্র থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেগুলি হল, হাসনাবাদ কেন্দ্র থেকে পরমেশ্বর মণ্ডল (নির্দল)। জয়নগর কেন্দ্র থেকে দেবপ্রসাদ সরকার (এস.ইউ.সি) জয়ী হন। বজবজ কেন্দ্র থেকে ক্ষিতি ভূষণ রায় বর্মন (সি.পি.আই.এম) জয়ী হন। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে হরিপদ নস্কর ও মনোরঞ্জন কয়াল (নির্দল)। কাকদ্বীপ কেন্দ্র থেকে শক্তিপদ প্রামানিক (নির্দল)। সাগর কেন্দ্র থেকে প্রভরঞ্জন মণ্ডল (সি.পি.আই.এম) জয়ী হন। সাধারণ কেন্দ্র থেকে মোট ৮ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ৮ জনের মধ্যে ৩ জন জয়ী হন।[১১৯] নদীয়া, ২৪ পরগনাজেলা

থেকে নমঃশূদ্র জাতির মোট ৭ জন প্রার্থী জয়ী হন আর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মোট ১৫ জন প্রার্থী জয়ী হন। জয়ী প্রার্থীর নিরিখে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নমঃশূদ্রদের থেকে প্রায় দ্বিগুণের বেশি। নির্বাচনে নমঃশূদ্রদের থেকে ৪৫ জন প্রার্থী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ৫৫ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন।[১২০] বলা যেতে পারে যে, নির্বাচিত এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অনেকটা এগিয়েছিল।

১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বামপন্থী দলগুলোকে প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি প্রার্থীকে সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে জয়ী করেছিলেন। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে তৃতীয় বার বামপন্থী সরকার গঠিত হয়।

এবারে আমরা নিম্নে ২০০১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৭ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্রতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৩.১০০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৪ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুশীল বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৫৩৩৯৫	৪৪.৮২
২। বিধান চন্দ্র পোদ্দার	এ.আই.টি.সি	৫২৮৫৪	৪৪.৩৭
৩। সুভাত বিশ্বাস	বি.জে.পি	৭৯৭১	৬.৬৯
৪। অখিল বৈদ্য	বি.এস.পি.	২৬৫৪	২.২৩
৫। হারাধন সিকদার	এন.সি.পি	২২৫৩	১.৮৯
মোট ভোটার, ১৪৮১৬৭	ভোট পর, ১১৯১৩৭	বৈধ ভোট হয়, ১১৯১২৭	ভোটিং শতাংশ, ৮০.৪১

সারণি ৩.১০১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৭৯ হাঁসখালি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নয়ন সরকার	সি.পি.আই.এম	৭২৩৩৪	৪৫.৮০
২। অবির রঞ্জন বিশ্বাস	এ.আই. টি.সি	৬৯৮১৩	৪৪.২০
৩। শশাঙ্ক শেখর বিশ্বাস	এন.সি.পি	৫৭৫৪	৩.৬৪
৪। বিশ্বনাথ বিশ্বাস	বি.জে.পি	৩৯৮৮	২.৫২
৫। সতিশ চন্দ্র বিশ্বাস	বি.এস.পি	৩৮১৩	২.৪১
৬। মধুসূদন মণ্ডল	নির্দল	১২৩০	০.৭৮
৭। দীনবন্ধু বিশ্বাস	নির্দল	৪৭৩	০.৩০

৮। অধির বিশ্বাস	পি.ডি.এস	২৯৯	০.১৯
৯। অমৃত সরকার	নির্দল	২৪৪	০.১৫
মোট ভোটার, ১৮৭৭৮২	ভোট পর, ১৫৮০৫০	বৈধ ভোট হয়, ১৫৭৯৪৮	ভোটিং শতাংশ, ৮৭.১৭

সারণি ৩.১০২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮০ রাণাঘাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। অসীম বালা	সি.পি.আই.এম	৭৫৯৭৩	৪৫.৩৩
২। ডাঃ রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	এ.আই.টি.সি	৭১৬৩০	৪২.৭৪
৩। রতন সাহা	বি.জে.পি	১৩৩১৩	৭.৯৪
৪। মন্মনাথ বিশ্বাস	বি.এস.পি	২৪৬৬	১.৪৭
৫। শ্যামাপদ মণ্ডল	পি. ডি. এস	১৬৫৮	০.৯৯
৬। শিবু মণ্ডল	নির্দল	১২৫২	০.৭৫
৭। নির্মল বিশ্বাস	নির্দল	৮৬৮	০.৫২
৮। বিদ্যুৎ অধিকারী	নির্দল	৪৪৩	০.২৬
মোট ভোটার, ২০৫৮৮৯	ভোট পরে, ১৬৭৬৮২	বৈধ ভোট হয়, ১৬৭৬০৩	ভোটিং শতাংশ, ৮১.৪৪

সারণি ৩.১০৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৪ বাগদা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। কমলাক্ষী বিশ্বাস	এফ.বি. এল	৬১৯৩৬	৪৫.৬৫
২। দুলাল চন্দ্র বর	এ.আই. টি. সি	৬১৬৯৯	৪৫.৪৮
৩। আনন্দ বিশ্বাস	বি.জে.পি	৮২৮৮	৬.১১
৪। চন্দন মল্লিক	বি.এস.পি	১৭১৫	১.২৬
৫। বিশ্বপতি বিশ্বাস	এন.সি.পি	৮১৩	০.৬৩
৬। শুবেন্দু মণ্ডল	নির্দল	৩৯০	০.২৯
৭। কমলাক্ষী বিশ্বাস	নির্দল	৩৫১	০.২৬
৮। নির্মানেন্দু বিশ্বাস	নির্দল	২৬৮	০.২০
৯। ননিগোপাল সমদ্দার	নির্দল	২০৬	০.১৫
মোট ভোটার, ১৫৮৯৩০	ভোট পর, ১৩৫৬৭৫	বৈধ্য ভোট হয়, ১৩৫৬৬৬	ভোটিং শতাংশ, ৮৫.৩৭

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র- ৭৪, ৭৯, ৮০, ৮৪, Statistical Report on General Elections, 2001 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2001, পৃঃ ৩২৮-৩০।

উপরিউক্ত ৪ টি সংরক্ষিত বিধানসভাক্ষেত্র মোট ৩১ জন প্রার্থী ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৪ টি নির্বাচনীক্ষেত্র থেকে ৩ টি আসনে জয় পায় সি.পি.আই.এম. এবং ১ টি আসনে জয় পায় এফ.বি.এল। এ.আই. টি. সি ৪ টি সংরক্ষিত আসনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল।[১২১] নির্বাচনে উক্ত ৩১ জন প্রার্থীই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির যে সকল প্রার্থীরা সাধারণ নির্বাচনীক্ষেত্র থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, পলাশিপাড়া কেন্দ্র থেকে আনন্দ মোহন সরকার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৭৭০)। নাকাশিপাড়া কেন্দ্র থেকে মিলন মজুমদার (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ২৫০০)। কৃষ্ণনগর পূর্ব কেন্দ্র থেকে রাধানাথ বিশ্বাস (সি.পি.আই.এম.প্রাপ্ত ভোট, ৫৫১৪৮)। রাণাঘাট পশ্চিম কেন্দ্র থেকে (জ্যোর্তিময়ী সিকদার (সি.পি.আই.এম.প্রাপ্ত ভোট, ৫৫১৪৮), দীপক বিশ্বাস (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ৬৩৬)। চাকদা কেন্দ্র থেকে সুশীল কুমার সরকার (বি.এস.পি.প্রাপ্ত ভোট, ৪০৪৬)। হরিণঘাটা কেন্দ্র থেকে শরবেন্দু বিশ্বাস (এ.আই. টি. সি. প্রাপ্ত ভোট, ৬৫৬২৮), ঠাকুর কুমার বিশ্বাস (বি.এস.পি.প্রাপ্ত ভোট, ৩৫২৮), শেফালি হালদার (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ১২৯৯), পরেশ মণ্ডল (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ৯২৫)। বনগাঁ কেন্দ্র থেকে কিশোর বিশ্বাস (বি.জে.পি.প্রাপ্ত ভোট, ৪৫৪৬), কল্যান মল্লিক (বি.এস.পি.প্রাপ্ত ভোট, ৩২৬৮), অসীম বিশ্বাস (এ.এম.বি. ১১৮৬)। গাইঘাটা কেন্দ্র থেকে মন্মথনাথ রায় (সি.পি.আই.এম.প্রাপ্ত ভোট, ৭৩৯৬২), মিতালী বিশ্বাস (বি.এস.পি.প্রাপ্ত ভোট, ২০০৭), রবীন বিশ্বাস (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ১০০২), সমীর সরকার (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ৭৬১), পীযুষ রায় (পি.ডি.এস.প্রাপ্ত ভোট, ৪৬৫), অজয় বিশ্বাস (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ৩০৭)। হাবড়া কেন্দ্র থেকে স্বপন হালদার (বি.এস.পি.প্রাপ্ত ভোট, ১৫৩৬), সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস (আর.পি.আই.প্রাপ্ত ভোট, ৫৬৪)। বারাসাত কেন্দ্র থেকে মনোজ হাওলাদার (বি.এস.পি.প্রাপ্ত ভোট, ৩৩২২)। অশোকনগর কেন্দ্র থেকে অরূপ বিশ্বাস (বি.এস.পি.প্রাপ্ত ভোট, ২৪৩৫)। বিজপুর কেন্দ্র থেকে জগদীশ চন্দ্র দাস (এ.আই. টি. সি. প্রাপ্ত ভোট, ১০২২৪০, জয়ী প্রার্থী), শিখারাণী বিশ্বাস (বি.এস.পি,প্রাপ্ত ভোট, ৯০৮) রাজমঙ্গল ঠাকুর (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ৬১০)। জগদ্দল কেন্দ্র থেকে হরিপদ বিশ্বাস (এফ.বি.এল,প্রাপ্ত ভোট, ৭০১৪৩, জয়ী প্রার্থী), সুনির্মল সরকার (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ১৪০৬), আরতি সরকার (নির্দল, ১১৫৯)। খড়দাহ কেন্দ্র থেকে জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (বি.এস.পি.প্রাপ্ত ভোট, ১৮১৪)।[১২২] সাধারণ কেন্দ্র থেকে মোট ৩১ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৩১ জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে ২ জন প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন।

সারণি ৩.১০৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯১ রাজারহাট (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। তন্ময় মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৯৬৩৯৪	৪৬.৯৩
২। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	৯৫২৪৬	৪৬.৩৭
৩। ডাঃ তপতি মণ্ডল	বি.জে.পি	৯৮০১	৪.৭৭
৪। স্বাপন বিশ্বাস	নির্দল	২২১৫	১.০৮
৫। বিরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	নির্দল	১৭৪১	০.৮৫
মোট ভোটার, ২৬৪৪১৯	ভোট পরে, ২০৫৪২০	বৈধ ভোট হয়, ২০৫৩৯৭	ভোটিং শতাংশ, ৭৫.২৫

সারণি ৩.১০৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৭ হারোয়া (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। ক্ষিতি রঞ্জন মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	৭৮৭৪৯	৫৮.৪১
২। লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল	আই.এন.সি	৪৩৪৮৯	৩২.২৬
৩। মহাদেব চন্দ্র পাত্র	বি.জে.পি	১২৫৮৮	৯.৩৪
মোট ভোটার, ১৬৫৮৩৯	ভোট পর, ১৩৪৮৭০	বৈধ্য ভোট হয়, ১৩৪৮২৬	ভোটিং শতাংশ, ৮১.৩৩

সারণি ৩.১০৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ সন্দেশখালি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। কান্তি বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৬৫২১৪	৫৪.৫৩
২। রঞ্জন কুমার দাস	এ.আই. টি. সি	৩৮১১০	৩১.৮৭
৩। মন্মনাথ বাচ্ছার	বি.জে.পি	১৬২৬৩	১৩.৬০
মোট ভোটার, ১৫০২৬১	ভোট পরে, ১১৯৫৯৯	বৈধ ভোট হয়, ১১৯৫৮৭	ভোটিং শতাংশ, ৭৯.৫৯

সারণি ৩.১০৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৯ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নৃপেন গায়েন	সি.পি.আই.এম	৬২৪৪১	৫৪.৫৩
২। সৌরেন্দ্র মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৪৪১৮৬	৩৮.২৬
৩। ব্যোম শঙ্কর গায়েন	বি.জে.পি	৮৮৭০	৭.৬৮
মোট ভোটার, ১৪৫৪৩৩	ভোট পরে, ১১৫৫১৭	বৈধ ভোট হয়, ১১৫৪৯৭	ভোটিং শতাংশ, ৭৯.৪৩

সারণি ৩.১০৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০০ গোসাবা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গণেশ মণ্ডল	আর.এস.পি	৫৫৩৩৩	৫১.৯৩
২। সুজিত প্রামানিক	এ.আই. টি. সি.	৪০১৬১	৩৭.৬৯
৩। সতিশ মল্লিক	বি.জে.পি	৬৯২৫	৬.৫০
৪। নির্মল সরকার	নির্দল	১৯২৩	১.৮০
৫। হরিপদ মণ্ডল	বি.এস.পি	১১৯৯	১.১৩
৬। শ্রীমন্ত রায়	পি. ডি. এস	১০২১	০.৯৬
মোট ভোটার, ১৪৩০৯৪	ভোট পর, ১০৬৫৬২	বৈধ ভোট হয়, ১০৬৫৬২	ভোটিং শতাংশ, ৭৪.৪৭

সারণি ৩.১০৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০১ বাসন্তী (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুভাষ নস্কর	আর.এস.পি	৮১১৭৭	৫৯.১৭
২। জয়ন্ত নস্কর	এ.আই. টি. সি	৫০৮২৯	৩৭.০৫
৩। রামকৃষ্ণ প্রমানিক	বি.জে.পি	৪০৫৯	২.৯৬
৪। দিলিপ সরদার	এন. সি. পি	১১২৪	০.৮২
মোট ভোটার, ১৭৮৭১৩	ভোট পরে, ১৩৭১৯৪	বৈধ ভোট হয়, ১৩৭১৮৯	ভোটিং শতাংশ, ৭৬.৭৭

সারণি ৩.১১০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০২ কুলতলি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। প্রবোধ পুরকাইত	নির্দল	৬০০২৯	৪৬.৮৭
২। রামশঙ্কর হালদার	সি.পি.আই.এম	৫৫৭৬১	৪৩.৫৪
৩। ভগীরথ গায়েন	আই.এন.সি	৬৯২৫	৫.৪১
৪। অনুকুলচন্দ্র নস্কর	বি.জে.পি	৩৯২৯	৩.০৭
৫। ডাঃ শ্যামসুন্দর মণ্ডল	বি.এস.পি	১৪৩০	১.১২
মোট ভোটার, ১৬৬৪৬২	ভোট পরে, ১২৮০৭৬	বৈধ্য ভোট হয়, ১২৮০৭৪	ভোটিং শতাংশ, ৭৬.৯৪

সারণি ৩.১১১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৫ ক্যানিং পশ্চিম (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	এ.আই. টি. সি	৬০৫৮১	৪৪.৯১
২। বিমল মিস্ত্রি	সি.পি.আই.এম	৫৫৬২৩	৪১.২৭
৩। বাদল সরদার	নির্দল	৮২৪৬	৬.১১

৪। মনোজ মণ্ডল	বি.জে.পি	৫৬০১	৪.১৫
৫। নরত্তম রায়	নির্দল	৩০১৪	২.২৩
৬। ধীমান চন্দ্র সরদার	পি.ডি.এস	৯৮৬	০.৭৩
৭। মনোরঞ্জন হালদার	বি.এস.পি	৮৪৮	০.৬৩
মোট ভোটার, ১৮৬৩৮৫	ভোট পরে, ১৩৪৯০০	বৈধ্য ভোট হয়, ১৩৪৮৯৯	ভোটিং শতাংশ, ৭২.৩৮

সারণি ৩.১১২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১০৯ সোনারপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নির্নল চন্দ্র মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৯৯৮৯৩	৪৯.০৭
২। আভা মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	৯১৮২৯	৪৫.১১
৩। অলোক কুমার মণ্ডল	বি.জে.পি	৫৯৭৭	২.৯৪
৪। দিলিপ নস্কর	নির্দল	১৬১৬	০.৭৯
৫। রবীন্দ্রনাথ মিস্ত্রি	পি.ডি.এস	১৫৮৭	০.৭৮
৬। উৎপল সিখারি	নির্দল	১১১০	০.৫৫
৭। চিন্ময় জোদ্দার	নির্দল	৯৫৪	০.৪৭
৮। অরুন কুমার মণ্ডল	নির্দল	৬০৫	০.৩০
মোট ভোটার, ২৭৪২৭২	ভোট পরে, ২০৩৬৩১	বৈধ্য ভোট হয়, ২০৩৫৭১	ভোটিং শতাংশ, ৭৪.২৪

সারণি ৩.১১৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১১০ বিষ্ণুপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। দিলিপ মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৫৪১৬৭	৫০.৬৩
২। আনন্দ বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৪৭৫৮৬	৪৪.৭১
৩। সুবির নস্কর	বি.জে.পি	২৬৯৮	২.৫২
৪। গোপিনাথ নস্কর	পি.ডি.এস	১৬১৮	১.৫১
৫। সমর বিশ্বাস	এন.সি.পি	৯১৩	০.৮৫

সারণি ৩.১১৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২১ মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বাঁশরি মোহন কাঞ্জি	সি.পি.আই.এম	৫৭৬৮০	৪৭.৫৯
২। নমিতা সাহা	এ.আই. টি. সি	৫৬৪০০	৪৬.৫৪
৩। কার্তিক সরদার	বি.জে.পি	৩৭৪৪	৩.০৯
৪। দিবাকর নস্কর	পি.ডি.এস	২২৯৫	১.৮৯
৫। গোপাল মণ্ডল	এন.সি.পি	১০৭৭	০.৮৯
মোট ভোটার, ১৬৪৪১৬	ভোট পরে, ১২২০৩০	বৈধ্য ভোট হয়, ১২১১৯৬	ভোটিং শতাংশ, ৭৪.২২

সারণি ৩.১১৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২২ মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। চৌধুরী মোহন জাঠুয়া	এ.আই. টি. সি	৫৯৪৯২	৪৯.১০
২। নিকুঞ্জ পাইক	সি.পি.আই.এম	৫২৬১৮	৪৩.৪৩
৩। প্রলাদকুমার পুরকাইত	নির্দল	৩৯৮৫	৩.২৯
৪। বিধান বৈদ্য	বি.জে.পি	২৭৮৪	২.৩০
৫। ডাঃ তপনকুমার সরদার	এন.সি.পি	৯৮৫	০.৮১
৬। নলিনিকান্ত হালদার	পি.ডি.এস	৫৫৮	০.৪৬
৭। ভাস্কর হালদার	বি.এস.পি	৪৯৩	০.৪১
৮। কমলকৃষ্ণ সরদার	নির্দল	২৪৭	০.২০
মোট ভোটার , ১৬৩৩৩৭	ভোট পরে, ১২১৮৬০	বৈধ্য ভোট হয় , ১২১১৬২	ভোটিং শতাংশ, ৭৪.৬১

সারণি ৩.১১৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৪ কুলপি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। জগরঞ্জন হালদার	এ.আই. টি. সি	৫১০৪৫	৪৯.০৩
২। শকুন্তলা পাইক	সি.পি.আই.এম	৪৬৯৬৬	৪৫.১১
৩। কৃত্তিবাস সরদার	এস.পি	২৬৮২	২.৫৮
৪। সুভাষ সাহা	বি.জে.পি	২১৭২	২.০৯
৫। ভোলানাথ মণ্ডল	নির্দল	১২৪৪	১.১৯
মোট ভোটার, ১৪২৫৯৬	ভোট পরে, ১০৪১১৩	বৈধ্য ভোট হয় , ১০৪১০৯	ভোটিং শতাংশ, ৭৩.০১

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র -৯১, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৯, ১১০, ১২১, ১২২, ১২৪, Statistical Report on General Elections, 2001 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2001, পৃঃ ৩৩১-৩৭।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি অধ্যুষিত ১৩ টি সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে মোট ৬৭ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। উক্ত ১৩ টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে সি.পি.আই.এম. জয় পায় ৪ টি আসনে, এ.আই. টি. সি জয় পায় ৬ টি আসনে, ও আর.এস.পি জয় পায় ২ টি আসনে এবং ১ টি আসনে জয় পায় নির্দল।[১২৩] নির্বাচনে অংশগ্রহণ কারী ৬৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৯ জন প্রার্থীই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আর কান্তি বিশ্বাস সহ ৮ জনই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। এছাড়াও সাধারণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে যে সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রার্থীরা ২০০১ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, বসিরহাট কেন্দ্র থেকে নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল (বি.জে.পি.

প্রাপ্ত ভোট, ১০৯৯৬)। হাসনাবাদ কেন্দ্র থেকে পরিতোষ হালদার (বি.জে.পি.প্রাপ্ত ভোট, ৪৭৩৪)। জয়নগর কেন্দ্র থেকে দেবপ্রসাদ সরকার (নির্দল।প্রাপ্ত ভোট, ৪৯৫৩৪, জয়ী প্রার্থী), গৌরাঙ্গ সরকার (এ.আই. টি. সি. প্রাপ্ত ভোট, ২৩৬৬২), শঙ্কর সরকার (বি.জে.পি,প্রাপ্ত ভোট, ১২৪৮৭), সুশীল কুমার সরকার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ১৩৩০), ধনঞ্জয় সিনহা (পি.ডি. এস. প্রাপ্ত ভোট, ১১৩৫), পিন্টু কুমার সাপুই (বি.এস.পি.প্রাপ্ত ভোট, ৬৪৭)। বারুইপুর কেন্দ্র থেকে অজিত নস্কর (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ৫০৭)। ফলতা কেন্দ্র থেকে মলিনা মিস্ত্রি (সি.পি.আই.এম. ৪১৫৫৯), বিতান মণ্ডল (বি.জে.পি.প্রাপ্ত ভোট, ২৯০৮), সুকদেব প্রমানিক (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ১৪১৭)। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে ঋষি হালদার (সি.পি.আই.এম.প্রাপ্ত ভোট, ৫০৬৪৮, জয়ী প্রার্থী), অজিত মণ্ডল (বি.জে.পি.প্রাপ্ত ভোট, ৫০১২)। মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্র থেকে গৌতম মণ্ডল (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ৮৪৬)। মথুরাপুর কেন্দ্র থেকে সহাদেব নস্কর (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ৮২২২), চিত্তরঞ্জন মণ্ডল (নির্দল,প্রাপ্ত ভোট, ৭৩৫)। সাগর কেন্দ্র থেকে বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা (এ.আই. টি. সি. প্রাপ্ত ভোট, ৭০০৮৬, জয়ী প্রার্থী), প্রভরঞ্জন মণ্ডল (সি.পি.আই.এম.প্রাপ্ত ভোট, ৬৯৫১২)।[১২৪] সাধারণ নির্বাচনীক্ষেত্রতে মোট ১৮ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮ জনের মধ্যে ৩ জন প্রার্থী জয় পেয়েছিলেন।

২০০১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সংরক্ষিত এবং সাধারণ আসনে ৩ টি জেলা থেকে নমঃশূদ্ররা ৭ টি আসনে জয় পেয়েছিল। আর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ১৫ টি আসনে জয় পেয়েছিল। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যায় নমঃশূদ্র থেকে দ্বিগুণ বেশি ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের। আবার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণে পৌণ্ড্রদের সংখ্যা ছিল ৭৭ জন এবং নমঃশূদ্রদের ছিল ৬২ জন। এক্ষেত্রেও নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্ররা অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন।

আমরা দেখতে পেলাম ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত ১৩ টি সংরক্ষিত আসনের প্রায় সবগুলো আসন সি.পি.আই.এম. তথা বামপন্থী দলের দখলে ছিল। কিন্তু ২০০২ সালের নির্বাচনে ১৩ টি আসনের মধ্যে ৬ টি আসনে জয় পেয়েছিল নবগঠিত তৃণমূল কংগ্রেস। কাজেই বলা যেতে পারে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল ভাবে সমর্থন করেন। নমঃশূদ্রদের মধ্যে থেকে তেমন ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি।

২০০৫ সালের ৮ আগস্ট ডিলিমিটেশন কমিশন যে খসড়া লোকসভা ও বিধানসভার আসনবিন্যাসের প্রতিবেদন প্রকাশ করে সেই খসড়া প্রতিবেদনকে রাজ্যের বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধিতা করায় ২০০৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে আসনবিন্যাস কার্যকর না করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হয়।[১২৫] যাইহোক আমরা নিম্নে ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনাও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৭ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্রতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করব।

চতুর্থ ডিলিমিটেশনের পর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় জেলাভিত্তিক আসনবিন্যাসের ফলে নদীয়া জেলায় তপসিলি সংরক্ষিত আসন হয় ৫ টি ,উত্তর ২৪ পরগনায় হয় ৭ টি আর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সংরক্ষিত আসন ৯ টি থাকে। ৩ টি জেলায় মোট তপসিলি জাতির সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বেড়ে হয় ২১ টি। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আসনবিন্যাস কার্যকর করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হয়।[১২৬] যাইহোক আমরা নিম্নে ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া -উত্তর ২৪ পরগনার ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২১ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্রতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৩.১১৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৮ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুশীল বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	৯৬৫৫০	৫২.১৭
২। বরুন বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৭৫৬১৬	৪০.৮৬
৩। বিপুল চন্দ্র সেন	বি.জে.পি	৫৭১৮	৩.০৯
৪। রাজনাথ সরকার	বি.এস.পি	৩৪৮৫	১.৮৮
৫। নিশীথ রায়	নির্দল	২১৬৫	১.১৭
৬। বিপ্লব কুমার গোলদার	এচ.এস.বি.পি.	১৫৪১	০.৮৩
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৮৫০৭৫	ভোটিং শতাংশ, ৯২.৮৭

সারণি ৩.১১৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৯ রাণাঘাট উত্তর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সমীর কুমার পোদ্দার	এ.আই. টি. সি	৯৩৮৩৮	৫৫.০৩
২। অর্চনা বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৬২৬৪৪	৩৬.৭৪
৩। বাসুদেব মজুমদার	বি.জে.পি	৬২৪৩	৩.৬৬

৪। ননিগোপাল রায়	বি.এস.পি	৪৫৭৮	২.৬৮
৫। সুভাষ চন্দ্র সরকার	নির্দল	১৯৬৭	১.১৫
৬। অনুভা সিকদার মল্লিক	এন.এস.বি.পি	১২৩৭	০.৭৩
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৭০৫০৫	ভোটিং শতাংশ, ৮৪.৭৫

সারণি ৩.১১৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯০ রাণাঘাট দক্ষিণ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। আবীর রঞ্জন বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	৯৯৪৩২	৫১.২৩
২ অলোক কুমার দাস	সি.পি.আই.এম	৭৯৩৯৩	৪১.১৩
৩। বিনয় ভূষণ রায়	বি.জে.পি	৮৯৩৪	৪.৬০
৪। প্রশান্ত বিশ্বাস	বি.এস.পি	২৯৫১	১.৫২
৫। চৈতন্য বাড়ই	এন.এস.বি.অই	২৯৪২	১.৫২
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৯৪০৮৩	ভোটিং শতাংশ, ৮৭.২৬

সারণি ৩.১২০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯২ কল্যাণী (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। ডাঃ রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	৯২৩২২	৫১.৫৬
২। জ্যোৎস্না সরকার সিকদার	সি.পি.আই.এম	৭৬৬৩২	৪২.৭৯
৩। দিলিপ ভারতী	বি.জে.পি	৪৪৭৮	২.৫০
৪। মিঠু পোদ্দার	পি.ডি.এস	২৯৯৫	১.৬৭
৫। প্রনিতা রায়	বি.এস.পি	২৬৮১	১.৫০
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৭৯১০৮	ভোটিং শতাংশ, ৯০.১১

সারণি ৩.১২১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৩ হরিণঘাটা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নীলিমা নাগ মল্লিক	এ.আই. টি. সি	৮৩৩৬৬	৪৯.৪৫
২। বিশ্বজিৎ পাল	সি.পি.আই.এম	৭০৩৬৩	৪১.৭৪
৩। বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস	বি.জে.পি	৮৭৮০	৫.২১
৪। শ্যামাপ্রসাদ মণ্ডল	পি.ডি.এস	৩৮১০	২.২৬
৫। বিদ্যুৎ মল্লিক	বি.এস.পি	২২৬১	১.৩৪
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৬৮৫৮০	ভোটিং শতাংশ, ৮৯.৭৬

সারণি ৩.১২২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৪ বাগদা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	৯১৮২১	৫২.৯১
২। মৃণাল কান্তি সিকদার	এ.আই.এফ.বি	৭০৮৬৫	৪০.৮৪
৩। চন্দন মল্লিক	বি.এস.পি	৪৪১৪	২.৫৪
৪। অরবিন্দ বিশ্বাস	বি.জে.পি	৪৩০৬	২.৪৮
৫। প্রনিতা মণ্ডল	নির্দল	১২১২	০.৭০
৬। ধিরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	এন.এস.বি.পি	৯১৩	০.৫৩
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৭৩৫৩১	ভোটিং শতাংশ, ৮৫.২২

সারণি ৩.১২৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৫ বনগাঁ উত্তর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বিশ্বজিৎ দাস	এ.আই. টি. সি	৮৯২৬৫	৫৪.৫৫
২। ডাঃ বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৬৫৬৪৫	৪০.১২
৩। হরিচন্দ্র বিশ্বাস	বি.জে.পি	৫১৪৯	৩.১৫
৪। গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস	বি.এস.পি	১৮২৮	১.১২
৫। পিনাকী রঞ্জন ভারতী	টি. আর.এম.পি.পি.আই	৯৯৫	০.৬১
৬। গোবিন্দ মণ্ডল	এন.এস.বি.পি	৭৫৯	০.৪৬
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৬৩৬৪১	ভোটিং শতাংশ, ৮৬.৩৭

সারণি ৩.১২৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৬ বনগাঁ দক্ষিণ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুরজিত কুমার বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	৮৭৬৭৭	৫৩.৭১
২। অনুজ বারণ সরকার	সি.পি.আই.এম	৬৫৭৮৮	৪০.৩০
৩। অরুন হালদার	বি.জে.পি	৫২৪১	৩.২১
৪। হিমাংশু বিশ্বাস	সি.পি.আই.এল.এম	২৫৬১	১.৫৭
৫। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস	বি.এস.পি	১৯৬১	১.২০
		বৈধ্য ভোট হয় , ১৬৩২৩০	ভোটিং শতাংশ, ৮৬.৩৪

সারণি ৩.১২৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৭ গাইঘাটা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর	এ.আই. টি. সি	৯১৪৮৭	৫৫.৫৮
২। মনোজ কান্তি বিশ্বাস	সি.পি.আই	৬৬০৪০	৪০.১২
৩। সুখরঞ্জন বেপারি	বি.জে.পি	৩৪৪০	২.০৯
৪। মহেন্দ্র গাইন	বি.এস.পি	১৪৩৬	০.৮৭
৫। সুমন লাহা	নির্দল	১২৪৯	০.৭৬
৬। তিকেন্দ্রজিৎ ভারতী	নির্দল	৯৪৬	০.৫৭
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৬৪৫৯৮	ভোটিং শতাংশ, ৮৮.৪১

সারণি ৩.১২৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ স্বরূপনগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বিনা মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৮৩৬৪১	৪৮.৯৪
২। শিভ প্রসাদ দাস	সি.পি.আই.এম	৭৬২২৭	৪৪.৬০
৩। রাখল হালদার	বি.জে.পি	৫৬৮২	৩.৩২
৪। সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস	আর.পি.আই.(এ)	৪০৬৩	২.৩৮
৫। রেনুকা সরকার	বি.এস.পি	১২৮৬	০.৭৫
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৭০৮৯৯	ভোটিং শতাংশ, ৮৭.১৯

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র – ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, Statistical Report on General Electon, 2011 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2011, পৃঃ ৩৪২-৪৫।

উপরিউক্ত ১০ টি নমঃশূদ্র অধ্যুষিত সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্রতে মোট ৫৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৫৫ জনে মধ্যে ৫২ জন নমঃশূদ্র ২ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ১ জন অন্য দলিত জাতির সদস্য ছিলেন। ১০ টি সংরক্ষিত আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জয় পায়। ৯ টি আসনে নমঃশূদ্র জাতি বীণা মণ্ডল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ।[১২৭] ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় উক্ত সংরক্ষিত আসনগুলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয়ের কারণ সম্পর্কে পরে আলোচনা করব।

এছাড়াও সাধারণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে যে সকল নমঃশূদ্ররা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন। করিমপুর কেন্দ্র থেকে স্বপন কুমার বিশ্বাস

(বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ২৬২৮)। তেহট্ট কেন্দ্র থেকে তপন বালা (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ২৪৫৮)। পলাশিপাড়া কেন্দ্র থেকে রতিকান্ত ঠাকুর (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ২৪৮০)। কালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে সুশীল চন্দ্র মণ্ডল (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১২৫৯)। নাকাশিপাড়া কেন্দ্র থেকে অনিল বাড়ই (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ২৯৯৩), পঙ্কজ সরকার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ২৭৯৫)। চাপড়া কেন্দ্র থেকে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৭০৭৮)। কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে রমেন বিশ্বাস (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৫৯৬৭), বিরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১৫০৮)। কৃষ্ণনগর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে মহাদেব সরকার (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৪৩৯৮), অমল মজুমদার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৩৩৪৭), মুকুন্দ লাল সরকার (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১২৩০)। চাকদা কেন্দ্র থেকে আশুতোষ সরকার ((বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ৩২৭৮)। বাদুরিয়া কেন্দ্র থেকে গোপাল (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ২৬২৮)। হাবড়া কেন্দ্র থেকে কমলেন্দু বালা (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ২০০১), সত্যেন রায় (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ১২৮৮), অমর কৃষ্ণ মণ্ডল (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৮৭৭)। অশোকনগর কেন্দ্র থেকে তারকেশ্বর মণ্ডল (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ২৬২৮), তাপস রায় (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ১৩৪৪)। আমডাঙ্গা কেন্দ্র থেকে ডাঃ অশোক কুমার গোলদার ((বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১৮৮৫)। বিজপুর কেন্দ্র থকে কমলাকান্ত চৌধুরী (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৪৮৪১), শরৎ চন্দ্র বিশ্বাস (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১৯৮২)। নৈহাটি কেন্দ্র থেকে বিশ্বজিৎ সরকার (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ৯৪৬)। ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে সুশান্ত বাড়ই (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ৬৩৭)। জগদ্দল কেন্দ্র থেকে বিমল কৃষ্ণ রায় (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ২৬৫৭)। নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে স্বপন হালদার (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৭৫৯৪), কৃষ্ণচন্দ্র সরকার (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ৮৮৪)। ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে তাপস সরকার (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১৮৪৩)। খড়দাহ কেন্দ্র থেকে অনাদি বিশ্বাস (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৩৬৭৩), সম্পা বিশ্বাস (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১৮১৩)। দমদম কেন্দ্র থেকে নরেশচন্দ্র বাড়ুই (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ২১৪৪)। পানিহাটি কেন্দ্র থেকে ভাস্কর রায় (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১১৩৪)। বারাসাত কেন্দ্র থেকে তপন সরকার (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ২৩০২)। হারোয়া কেন্দ্র থেকে দিলিপ বৈরাগ্য (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১৮২৮)। বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে অমিতোষ কুমার মণ্ডল ((বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ৩৫৭২)। বসিরহাট উত্তর কেন্দ্র থেকে প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস ((বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১৮২৯)। মধ্যমগ্রাম কেন্দ্র থেকে জয়দেব বিশ্বাস (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ৪২৩৬)। ফলতা কেন্দ্র থেকে চিত্তরঞ্জন মল্লিক (বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ১৮৩৯)। যাদবপুর কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী

(বি.এস.পি, প্রাপ্ত ভোট, ৬৯৩), প্রসেনজিৎ রায় (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৩৮৯)।[১২৮] এই নির্বাচনে সাধারণ কেন্দ্র থেকে নমঃশূদ্র জাতির ৩৬ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশের রাজনৈতিক দল ছিল বহুজন সমাজ পার্টি। যদিও অধিকাংশ প্রার্থীই সামান্য ভোট পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে নমঃশূদ্র মধ্যে একটা সামান্য অংশের মানুষের বি.এস.পির উপর সমর্থন ছিল।

এবারে ৩৪ বছরের বাম রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বেড়িয়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং এস ইউ সি আই জোট কে নমঃশূদ্র জাতি বিপুল সমর্থন করার মূল কারণ কী ছিল তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। সিঙ্গুর টাটাদের কারখানা ও নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। কাজেই বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে নিম্নবর্ণের মানুষের সমর্থনও কমতে থাকে। এই সময় মমতা ব্যানার্জী মতুয়াদের মন জয় করার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বনগাঁ বিধানসভার উপনির্বাচনে সৌগত রায়ের জয়ের ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের অবদান ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৮ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে মমতা ব্যানার্জী কয়েকবার, বেশির ভাগ নমঃশূদ্রদের ধর্মীয় পীঠস্থান ঠাকুরনগরে গিয়ে মতুয়া মহাসংঘের বড়মা বীণাপাণি দেবীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। এবং তিনি তাঁর এম.পি. তহবিল থেকে মতুয়াদের কামনা পুকুর (সাগর) ৩২ লক্ষ টাকা দিয়ে সংস্কারের জন্যে অনুদান দেন।[১২৯] আবার ৫ই ডিসেম্বর মমতা ব্যানার্জী বনগাঁতে 'হরিচাঁদ গুরুচাঁদ স্টেডিয়াম'র শিলান্যাস করতে গিয়ে রেলের যে হাসপাতাল বনগাঁতে ছিল সেটা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় এবং আধুনিক মানের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তিনি ঘোষণা করেন। উক্ত স্টেডিয়ামের জন্য মমতা ব্যানার্জী ১৬ কোটি টাকা অনুমোদনের কথাও ঘোষণা করেন। তার প্রধান বক্তব্য ছিল ,'বনগাঁ পূণ্যভূমি এ জায়গা আমাকে কখনও খালি হাতে ফেরায়নি'।[১৩০] প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ১৯৮৪ সালে মতুয়া মহাসংঘকে যে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন তা ২০০৯ সালের শেষের দিকে মতুয়া মহাসংঘ ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে যোগ সাধনের মাধ্যমে পুনরায় মহাসংঘ রাজনৈতিক সংস্পর্শে চলে আসে। কাজেই বীণাপাণি দেবীর সঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর একনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। ২০০৯ সালে মমতা ব্যানার্জী রেলমন্ত্রী হন এবং সিঙ্গুর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মতলায় তার ২৬ দিনের অনশনের সময় বীণাপাণি দেবী মমতার অনশন মঞ্চে তাকে

শুভেচ্ছা জানিয়ে আসেন।[১৩১] মমতা ব্যানার্জী এই সময় মতুয়া সদস্য হওয়ার জন্য লিখিত ভাবে আবেদন করেন এবং ২০০৯ সালের ৫ ই ডিসেম্বর বীণাপাণি দেবী মতুয়া মহাসংঘের আজীবন সদস্য সচিত্র পরিচয় পত্র তার হাতে তুলে দেন। সেদিন মমতা ব্যানার্জী বলেছিলেন, 'আজীবন সদস্য বড়মার পা ছুয়ে প্রণাম যখন করেছি, সারাজীবন মতুয়াদের সঙ্গেই থাকব'। আমার ক্ষমতা সীমিত কিন্তু ভবিষ্যতে কোনও দিন যদি সেই সুযোগ আসে তাহলে ওদের সার্বিক উন্নয়নের চেষ্টা করব'।[১৩২] ফলত ২০১০ সালের মার্চ মাসে মমতা ব্যানার্জী মতুয়া মহাসংঘের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে বড়মা তাকে মনোনীত করেন। ফলে নমঃশূদ্র তথা মতুয়ারা মমতার উপর অনেক বেশি আস্থাশীল হয় উঠেন।

বামেরাও মতুয়াদের মন পাওয়ার জন্য ২০০৮ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী ও প্রতিশ্রুতি এবং অনুদানের মধ্যে দিয়ে নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী তথা অন্যান্য দলিত জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে প্রভাব রাখার চেষ্টা করেন। বামপন্থীদের শ্রেণী সংগ্রামের নেতৃত্বরা বুঝতে পারেন যে, মতুয়াদের নেতৃত্বে জাতি চেতনার, দাবি-দাওয়া নিয়ে ঐক্যবদ্ধ দলিত মঞ্চ সংগঠিত হয়েছে এবং বামপন্থী রাজনীতি থেকে দলিতরা সরে গেছে। ২০০৮ সালের ১৪ অক্টোবর মতুয়া সম্মেলনে গিয়ে বিমান বসু বলেন, সারাদেশে নমঃশূদ্র তথ মতুয়ারা যে অসহায় অবস্থায় রয়েছে তা নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি। তিনি বলেন, আমি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাই না কিন্তু মতুয়া সম্মেলনে এসেছি। মতুয়াদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অবহেলিত। সমাজের চতুর্বর্ণের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন দাবীতে সংঘবদ্ধ হয়েছে। আমি তা সমর্থন করি'।[১৩৩] এই সম্মেলনে এসে বিমান বাবু হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে মালা পরিয়ে দুহাত জোর করে প্রণামও করেন।

২০০৯ সালের ২৫ মার্চ সুভাষ চক্রবর্তী ঠাকুর নগর মতুয়া মেলায় গিয়ে বড়মা বীণাপাণি দেবীকে প্রণাম করে বলেন মতুয়া মেলাকে রাজ্য সরকারি মেলা হিসাবে কার্যকর হবে। সুভাষ বাবুর সঙ্গে ত্রিপুরার মন্ত্রী অনিল সরকারও উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু অনিল বাবু নমঃশূদ্র জাতির মানুষ তাই সুভাষ চক্রবর্তী, অনিল সরকার সঙ্গে নিয়ে আসেন মতুয়াদের মন জয় করতে। এমন কথা বলা যেতেই পারে। আবার ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক হরিপদ বিশ্বাস ঠাকুর নগর মতুয়াদের বৃদ্ধাশ্রম গঠনের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান করেন। এই বৃদ্ধাশ্রমে সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিখরচায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার কথা

বলেন।[১৩৪] এই সময় রাজ্যের বামপন্থী সরকার বাবাসাহেব আম্বেদকর পুরস্কার দলিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য চালু করেন। এছাড়াও হরিগুরুচাঁদ পুরস্কার চালু করে নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের মহাসংঘের প্রধান কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির মন পেতে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু 'পঞ্চানন পুরস্কার' বাগদি জাতির জন্য কোন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি।[১৩৫] পৌন্ড্রক্ষত্রিয় ও বামপন্থীরা মতুয়াদের জন্য হরিচাঁদ গুরুচাঁদ কলেজের শিলান্যাস করেন গাইঘাটাতে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব রাজারহাট নিউটাইনে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ রিচার্স ফাউন্ডেশনের জন্য জমি প্রদান করেও মতুয়াদের ভোট ব্যাঙ্ক ২০১১ সালের বিধানসভার নির্বাচনে ধরে রাখতে পারেনি। নমঃশূদ্র জাতির উদ্বাস্তুদের উপর ১৯৭৮-৭৯ সালে মরিচঝাঁপিতে বাম সরকারের পুলিশ প্রশাসন যে অত্যাচার করেছিল বলে মতুয়ারা মনে করেন, কাজেই বামেদের উপরিউক্ত কোন প্রতিশ্রুতি তাদেরকে আর পুনরায় বামপন্থীদের উপর বিশ্বাস বা সমর্থন করতে চাইলো না। নমঃশূদ্ররা তখন থেকেই বামপন্থী সরকারের উপর মনে মনে বেশ বিরূপ ছিলেন, তাই তারা মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বামেদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। তাইতো ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্ররা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুলভাবে সমর্থন করে।

বিশেষ করে বড়মার নেতৃত্বেই নমঃশূদ্র তথা মতুয়ারা তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল সমর্থন করে বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে।

সারণি ৩.১২৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২২ মিনাখাঁ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। ঊষা রানী মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৭৩৫৩৩	৪৮.৬৬
২। দিলিপ রায়	সি.পি.আই.এম	৬৬৩৯৭	৪৩.৯৪
৩। ভবেশ পাত্র	বি.জে.পি	৮৩২৩	৫.৫১
৪। অজিত প্রমানিক	২৮৪৯	১.৮৯	১.৮৯
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৫১১০২	ভোটিং শতাংশ, ৯১.৮২

সারণি ৩.১২৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৬ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। আনন্দময় মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	৭২৭৪১	৪৫.৭৫
২। দেবেশ মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৭১৭২৬	৪৫.১১

৩। রতিকান্ত বাউলিয়া	বি.জে.পি	৭৫৩৩	৪.৭৪
৪। পরিমল মিস্ত্রি	নির্দল	২৩৬৮	১.৪৯
৫। অলিপদ পাইক	বি.এস.পি	১৮৪৬	১.১৬
৬। সুনীল মণ্ডল	পি.ডি.সি.আই	১৭২৭	১.০৯
৭। নির্মল কুমার বিশ্বাস	আর.জে.এন.পি	১০৪৬	০.৬৬
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৫৮৯৮৭	ভোটিং শতাংশ, ৮৫.৯৩

সারণি ৩.১২৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৭ গোসাবা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। জয়ন্ত নস্কর	এ.আই. টি. সি	৭৮৮৪০	৫১.০০
২। সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	আর.এস.পি	৬৮১৫৮	৪৪.০৯
৩। সুকুমার মণ্ডল	বি.জে.পি	৪০৭৪	২.৬৪
৪। মুকুন্দ কুমার দাস	পি.ডি.এস	২১১২	১.৩৭
৫। রথিন সরকার	বি.এস.পি	১৪০২	০.৯১
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৫৪৫৮৬	ভোটিং শতাংশ, ৮৫.৯৩

সারণি ৩.১৩০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৮ বাসন্তী (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুভাষ নস্কর	আর.এস.পি	৭২৮৭১	৪৯.০৭
২। অর্নব রায়	আই.এন.সি	৬৬৬৩৬	৪৪.৮৭
৩। অমল কান্তি রায়	বি.জে.পি	৫৬৭৬	৩.৮২
৪। সমীর দাস	নির্দল	৩৩৩৩	২.২৪
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৪৮৫১৬	ভোটিং শতাংশ, ৮১.২৪

সারণি ৩.১৩১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৯ কুলতলি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রামশঙ্কর হালদার	সি.পি.আই.এম	৮১২৯৭	৪৮.৬০
২। জয়কৃষ্ণ হালদার	এস.ইউ.সি.আই	৭৬৪২৩	৪৫.৭৩
৩। সুজিত পাটয়ারি	আই.এন.সি	৩২৭৭	১.৯৬
৪। সঞ্জয় মণ্ডল	নির্দল	২১৭৭	১.৩০
৫। নীলকান্ত মণ্ডল	বি.জে.পি	২১৫৯	১.২৯
৬। খুসিলাল মণ্ডল	বি.এস.পি	৯৪৮	০.৫৭
৭। শক্তিনাথ হালদার	নির্দল	৯২২	০.৫৫
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৬৭২৬৪	ভোটিং শতাংশ, ৮৮.৯৯

সারণি ৩.১৩২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৫ মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। জয়দেব হালদার	এ.আই. টি. সি	৮৩৫২৪	৫৩.৬৫
২। ডাঃ শরৎচন্দ্র হালদার	সি.পি.আই.এম	৬৪৮৮৩	৪১.৬৮
৩। গৌতম নস্কর	বি.জে.পি	৩২০৯	২.০৬
৪। সৌমেন সরদার	বি.এস.পি	১৬৭০	১.০৭
৫। বাপ্পা দাস	পি.ডি.এস	১২৬৩	০.৮১
৬। প্রনব কুমার পাইক	পি.ডি.সি.আই	১১৩৬	০.৭৩
		বৈধ্য ভোট হয় , ১৫৫৬৮৫	ভোটিং শতাংশ, ৮৫.৯৩

সারণি ৩.১৩৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৬ জয়নগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। তরুন কান্তি নস্কর	এস.ইউ.সি.আই	৭১৫৬৬	৪৯.৩৮
২। শ্যামল হালদার	সি.পি.আই.এম	৪৪৭৯৭৬	৩১.০৩
৩। মনোরঞ্জন হালদার	আই.এন.সি	১৩৮২৯	৯.৫৪
৪। উৎপল কুমার মণ্ডল	বি.জে.পি	৯৬৯৪	৬.৬৯
৫। সঞ্জয় কুমার রায়	পি.ডি.সি.আই	২৯৮৫	২.০৬
৬। সনৎ হালদার	নির্দল	১৮৯০	১.৩০
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৪৪৯৪০	ভোটিং শতাংশ, ৮২.৮৮

সারণি ৩.১৩৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৭ বারুইপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নির্মলচন্দ্র মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৮৩৬৩৬	৫২.১৯
২। বিমল মিস্ত্রি	সি.পি.আই.এম	৬৫১৫৭	৪০.৬৬
৩। তপন নস্কর	বি.জে.পি	৫৪৩২	৩.৩৯
৪। সুকুমার মণ্ডল	বি.এস.পি	১৭২১	১.০৭
৫। শিবদাস নস্কর	নির্দল	১৬২৭	১.০২
৬। প্রমোদ মণ্ডল	নির্দল	১৪২৯	০.৮৯
৭। রবীন্দ্রনাথ মিস্ত্রি	পি.ডি.এস	১২৩৯	০.৭৭
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৬০২৪১	ভোটিং শতাংশ, ৮৪.৭৭

সারণি ৩.১৩৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। শ্যামল মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৮১৭৩৬	৫৩.৩৫
২। জয়দেব পুরকাইত	সি.পি.আই.এম	৬২১২২	৪০.৫৫
৩। মনোজিৎ মণ্ডল	বি.জে.পি	৬১০৮	৩.৯৯
৪। অজিতকুমার মজুমদার	বি.এস.পি	৩২৩৬	২.১১
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৫৩২০২	ভোটিং শতাংশ, ৮৬.১৪

সারণি ৩.১৩৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪১ মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নমিতা সাহা	এ.আই. টি. সি	৭৫২১৭	৪৯.৬৮
২। চন্দন সাহা	সি.পি.আই.এম	৬৬৪৪১৪	৪৩.৮৭
৩। রতন কুমার সরদার	বি.জে.পি	৪৪৭৬	২.৯৬
৪। তরঙ্গ কুমার সরদার	পি.ডি.সি.আই	২৬২১	১.৭৩
৫। স্বপন মণ্ডল	নির্দল	১৪১৯	০.৯৪
৬। নমিতা মিস্ত্রি	নির্দল	৬৪০	০.৬৯
৭। অলোক কুমার	আই.জে.এল	৬১০	০.৪০
মোট		বৈধ্য ভোট হয় , ১৫১৩৯৭	ভোটিং শতাংশ , ৮৫.২৭

সারণি ৩.১৩৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪৬ বিষ্ণুপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। দিলিপ মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৯৫৯১২	৫৩.৯২
২। সুধিন সিনহা	সি.পি.আই.এম	৭০৮৬২	৩৯.৮৩
৩। শেখর নস্কর	বি.জে.পি	৫৭৪৫	৩.২৩
৪। প্রভাত কিরণ মণ্ডল	নির্দল	৩৬৩৬	২.০৪
৫। গোপিনাথ নস্কর	পি.ডি.এস	১৭৩৫	০.৯৮
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৭৭৮৯০	ভোটিং শতাংশ, ৮৪.৪৭

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র – **১২২, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১, ১৪৬**, Statistical Report on General Electon, 2011 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2011, পৃঃ ৩৫০-৫৬।

উপরিউক্ত ১১ টি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্র থেকে মোট ৬২ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ৬২ জন অংশগ্রহণ কারী প্রার্থীর মধ্যে ৬ জন নমঃশূদ্র ও ১ জন বাগদি এবং ২ জন কৈতব (নমিতা সাহা জয়ী প্রার্থী) জাতির প্রার্থী ছিলেন, আর ৫৩ জন প্রার্থীই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ।[১৩৬] ১১ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস মোট জয় পায় ৮ টিতে, ২ টি আসনে জয় পায় সি.পি.আই.এম. এবং ১ টি আসনে জয় পায় আর.এস.পি।

২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনাথেকে যে সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সাধারণ কেন্দ্র থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হলেন, নাকাশিপাড়া কেন্দ্র থেকে সুশীল বর্মন (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১২২১৭)। রাজারহাট নিউ টাউন কেন্দ্র থেকে বাসুদেব নস্কর (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৮৩৪)। রাজারহাট গোপালপুর কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল (সি.পি.আই.এম. প্রাপ্ত ভোট, ৫৪১০৪)। পাথরপ্রতিমা কেন্দ্র থেকে যজ্ঞেশ্বর দাস (সি.পি.আই.এম. প্রাপ্ত ভোট, ৮০৬৪৯)। সাগর কেন্দ্র থেকে দিলিপ প্রামানিক (জে.ডি.ইউ, প্রাপ্ত ভোট, ১২১৬), ডাঃ গোঁড়াচাঁদ (আই. জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৮৫৩)। কুলপি কেন্দ্র থেকে জগরঞ্জন হালদার (এ.আই. টি. সি. প্রাপ্ত ভোট, ৭৬৩৯২, জয়ী প্রার্থী), শকুন্তলা পাইক (সি.পি.আই.এম. প্রাপ্ত ভোট, ৫৮৪১৪)। রায়দিগি কেন্দ্র থেকে দুলাল চন্দ্র ঘরামী (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১২৪৫)। ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে ঘনশ্যাম মণ্ডল (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৩৫০৩)। বারুইপুর পশ্চিম কেন্দ্র থেকে কনক কান্তি পাইক (সি.পি.আই.এম. প্রাপ্ত ভোট, ৫৫৯২১), অজিত মণ্ডল (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৩৩০), মুকুল মণ্ডল (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ১০৫৮)। মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্র থেকে অমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৩১৮), শরবিন্দু হালদার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৬৫৬)। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে দীপক হালদার (এ.আই. টি. সি. প্রাপ্ত ভোট, ৮৭৬৪৫, জয়ী প্রার্থী)। সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে সুব্রত হালদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১০৮১), প্রশান্ত মজুমদার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৭১৩)। সোনারপুর উত্তর কেন্দ্র থেকে শ্যামল নস্কর ((সি.পি.আই.এম. প্রাপ্ত ভোট, ৬৩৮১৭), দেবাশীষ পুরকাইত (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৩৬১৮), রঞ্জন কুমার হালদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১২৯০), শ্যামল নস্কর (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ১২৭৬)। মহেশতলা কেন্দ্র থেকে রমণী নস্কর (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৭৯৭১), মনোরঞ্জন নস্কর (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৮০৭)।[১৩৭] সাধারণ কেন্দ্র থেকে মোট ২২ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ২ জন জয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেস দলের হয়ে।

২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মোট ১৩ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী জয়ী হয়েছিল।

উক্ত নির্বাচনে নমঃশূদ্রদের মধ্যে থেকে ৯ জন জয়ী হয়েছিলেন, আর ১৩ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রার্থী জয়ী হন। অন্যদিকে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র মোট ছিলেন ৯৪ জন প্রার্থী এবং ৭৬ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। নমঃশূদ্র জাতি থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়ে থাকলেও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নমঃশূদ্রদের থেকে পিছিয়ে ছিলেন।

২০০৮ সালের পর থেকে বামপন্থী দলগুলো পশ্চিমবঙ্গে তাদের রাজনৈতিক সমর্থন হারাতে শুরু করে। ২০০৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস দল আমেরিকার সাথে পরমানু চুক্তি স্বাক্ষর করার দরুণ বামপন্থী দলগুলো বিরোধিতা করে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ভেঙ্গে দিয়ে বেড়িয়ে আসেন। এর ফলেই পশ্চিমবঙ্গে থেকে বামপন্থীদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। এই সময় বামপন্থীরা বলেন 'কৃষি আমাদের ভিত্তি আর শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। এই নীতি পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে বিরোধী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে, ভাঙ্গর, ফলতা, সোনারপুর, বারুইপুর জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজ্যের মানুষরা কোণঠাসা করে দেয়। কাজেই ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ও জাতীয় কংগ্রেস এবং এস.ইউ.সি.আই এর জোট সরকার গঠন করে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামপন্থী সরকারের পতন ঘটিয়ে। নমঃশূদ্র তথা মতুয়া এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও রাজবংশী জাতির মধ্যে থেকে তৃণমূল কংগ্রেস একক ভাবে ৩৭ টি আসন জয় লাভ করে। মমতা ব্যানার্জী তার রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমর্থনও পূর্নমাত্রায় পায়। নবগঠিত মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভায় নমঃশূদ্রদের থেকে মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর, উপেন বিশ্বাস এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে শ্যামল মণ্ডলকে মন্ত্রী করা হয়।

আমরা এবারে নিম্নে ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২১ টি সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্রতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৩.১৩৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৮ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সত্যজিৎ বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	১১৪৬২৬	৫৩.৭২
২। মৃণাল বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৭০৬৯৮	৩৩.১৩
৩। সুজিত কুমার বিশ্বাস	বি.জে.পি	১৭৭৪১	৮.৩১
৪। নিত্য গোপাল মণ্ডল	আই.এন.সি	৪১৭৫	১.৯৬
৫। রণজিৎ সরকার	বি.এস.পি	২১৯৭	১.০৩
৬। বিপ্লব কুমার গোলদার	এন.ডি.পি. ও. আই	১২৪৫	০.৫৮
৭। অপূর্ব বিশ্বাস	এস.ইউ.সি.আই	৯১৫	০.৪৩
		বৈধ্য ভোট হয়, ২১৩৩৯২	ভোটিং শতাংশ, ৮৪.৭৬

সারণি ৩.১৩৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৮৯ রাণাঘাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সমীর কুমার পোদ্দার	এ.আই. টি. সি	৯৩২১৫	৪৮.১৩
২। বাবুসোনা সরকার	সি.পি.আই.এম	৭৮১৪৩	৪০.৪০
৩। নিখিল রঞ্জন সরকার	বি.জে.পি	১৫৪৬৭	৭.৯৯
৪। প্রদীপ কুমার সরকার	বি.এস.পি	২৩০১	১.১৯
৫। জগদীশ মণ্ডল	এস.ইউ.সি.আই	১৪৯৬	০.৭৭
৬। দেবারতি বিশ্বাস	এন.ডি.পি. ও. আই	১৩১১	০.৬৮
		বৈধ্য ভোট হয় , ১৯৩৬৭৮	ভোটিং শতাংশ , ৮১.১০

সারণি ৩.১৪০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯০ রাণাঘাট দক্ষিণ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রমা বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	১০৪১৫৯	৪৭.৫১
২। আবির রঞ্জন বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	৮৬৯০৬	৩৯.৬৪
৩। সুমিত রঞ্জন হালদার	বি.জে.পি	১৮১১৪	৮.২৬
৪। প্রশান্ত বিশ্বাস	বি.এস.পি	২৪০৭	১.১০
৫। তুষার বিশ্বাস	নির্দল	১৪৯০	০.৬৮
৬। মন্মথ বিশ্বাস	এন.ডি.পি. ও. আই	১০৫০	০.৪৮
৭। বিভূতি মণ্ডল	নির্দল	৭৯০	০.৩৬
৮। তপন হালদার	নির্দল	৬৫৯	০.৩০
		বৈধ্য ভোট হয়, ২১৯২১৫	ভোটিং শতাংশ, ৮৫.০৩

সারণি ৩.১৪১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯২ কল্যাণী (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। ডাঃ রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	৯৫৭৯৫	৫০.৪৭
২। অলোকেশ বিশ্বাস	সি.পি.আই.এম	৬৯৭০০	৩৬.৭৩
৩। ডাঃ রণজিৎ ক বিশ্বাস	বি.জে.পি	১৫৭১০	৮.২৮
৪। বিপ্লব মজুমদার	এস.এইচ.এস	২৩৫৫	১.২৪
৫। তুষার কান্তি বিশ্বাস	বি.এস.পি	২৩১৯	১.২২
৬। সমরেশ বিশ্বাস	পি.ডি.এস	১০৫৮	০.৫৬
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৮৯৭৮৮	ভোটিং শতাংশ, ৮১.৭৫

সারণি ৩.১৪২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৩ হরিঘাটা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নীলিমা নাগ মল্লিক	এ.আই. টি. সি	৯৪৫৩০	৪৯.৪০
২। অজয় দাস	সি.পি.আই.এম	৭৩১৮১	৩৮.২৪
৩। সুরেশ সিকদার	বি.জে.পি	১৫৭৯৩	৮.২৪
৪। জগদীশ চন্দ্র হালদার	এস.এইচ.এস	১৯১০	১.০২
৫। বিদ্যুৎ মল্লিক	বি.এস.পি	১৫৮৮	০.৮৩
৬। মাধব বিশ্বাস	পি.ডি.এস	১৫৭০	০.৮২
৭। প্রবোধ কুমার সরকার	এস.ইউ.সি.আই	৮৩০	০.৪৪
মোট		বৈধ্য ভোট হয়, ১৯১৩৫৯	ভোটিং শতাংশ, ৮৭.২৬

সারণি ৩.১৪৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৪ বাগদা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। দুলাল চন্দ্র বর	আই.এন.সি	১০২০২৬	৪৯.৬৪
২। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	৮৯৭৯০	৪৩.৬৮
৩। বিভা মজুমদার	বি.জে.পি	৮৯৯৬	৪.৩৮
৪। বিকাশ বিশ্বাস	বি.এস.পি	১৫৩৮	০.৭৫
৫। হরিশচন্দ্র মণ্ডল	নির্দল	৭৯২	০.৩৯
৬। হীরক গোলদার	জি.এম.এম	৫৮১	০.২৮
৭। গৌতম মালো	আর.পি.আই. (এ)	৪৯৮	০.২৪
		বৈধ্য ভোট হয়, ২০৫৫৪৬	ভোটিং শতাংশ, ৯.৬৫

সারণি ৩.১৪৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৫ বনগাঁ উত্তর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	৯৫৮২২	৫০.৫৯
২। সুশান্ত বওয়ালি	এ.আই.এফ.বি	৬২৬৩০	৩৩.০৭
৩। কে.ডি. বিশ্বাস	বি.জে.পি	২১২৬২	১১.২৩
৪। সুনিত মল্লিক	বি.এস.পি	৪৮৪০	২.৫৬
৫। জুড়ন চন্দ্র পাণ্ডে	আর.পি.আই (এ)	১২৯০	০.৬৮
৬। শ্যামসুন্দর হালদার	এস.ইউ.সি.আই	৮৩৩	০.৪৪
৭। পিনাকী রঞ্জন ভারতী	টি.আর.এম.আর.পি.পি.আই	৫৩৭	০.২৮
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৮৯৩৯৬	ভোটিং শতাংশ, ৮২.৪০

সারণি ৩.১৪৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৬ বনগাঁ দক্ষিণ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। সুরজিত কুমার বিশ্বাস	এ.আই. টি. সি	৯২৩৭৯	৪৯.২০
২। রমেন্দ্রনাথ আউধ্যা	সি.পি.আই.এম	৬৫৪৭৫	৩৪.৮৭
৩। স্বপন মজুমদার	বি.জে.পি	২৪৩৮৪	১২.৯৯
৪। প্রদীপ কুমার সরকার	বি.এস.পি	১৬১৬	০.৮৬
৫। দীপঙ্কর মণ্ডল	এ.এম.বি	১৪৮৬	০.৭৯
৬। প্রাণবল্লভ পাঠক	সি.পি.আই (এম.এল) এল	৯২৫	০.৪৯
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৮৭৭৭৫	ভোটিং শতাংশ, ৮৩.৪৫

সারণি ৩.১৪৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৭ গাইঘাটা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। পুলিন বিহারী রায়	এ.আই. টি. সি	৯৩৮১২	৪৮.৬২
২। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (বি)	সি.পি.আই	৬৪২৪০	৩৩.২৯
৩। শঙ্কর ঠাকুর	বি.জে.পি	২৮৭৯৬	১৪.৯২
৪। অনিল বৈরাগ্য	বি.এস.পি	১৫৮৭	০.৮২
৫। নন্দিতা মণ্ডল	নির্দল	১৩৮৮	০.৭২
৬। ননিবালা বিশ্বাস দাস	এস.ইউ.সি.আই	৯১৭	০.৪৮
৭। বিকাশ বিশ্বাস	নির্দল	৭০৭	০.৩৭
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৯২৯৪৯	ভোটিং শতাংশ, ৮৬.০২

সারণি ৩.১৪৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ৯৮ স্বরূপনগর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বীণা মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৯৩৮০৭	৪৮.৫৬
২। ধীমান সরকার	সি.পি.আই.এম	৮১৮৬৬	৪২.৩৮
৩। মিহির কুমার বাগচি	বি.জে.পি	১২৮৬৬	৬.৬৬
৪। শিবানী হালদার	এস.ইউ.সি.আই	১৬১৮	০.৮৪
৫। সন্তোষ কুমার বিশ্বাস	বি.এস.পি	১০৮৮	০.৫৬
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৯৩১৬১	ভোটিং শতাংশ, ৮৫.৮৬

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র- ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, Statistical Report on General Elections, 201 6to the Legislative Assembly of West Bengal ,Election Commission of India, New Delhi, 2016, the Legislative Assembly of West Bengal Detailed Results, থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতের নির্বাচন কমিশন নোটাতে ভোট দান করার অধিকার সকল ভোটার নাগরিকদের ক্ষেত্রেই প্রদান করেন। কাজেই উপরিউক্ত ১০ টি নির্বাচনীক্ষেত্রতে বেশির ভাগ আসনে বি.এস.পি, এস. ইউ.সি. আই, আর.পি.আই.এ, ও নির্দল প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট থেকে নোটাতে বেশি ভোট পরে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, দলিত সংরক্ষিত কেন্দ্র গুলোতেও জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সমর্থন না করে নমঃশূদ্ররা রাজ্যের সাধারণ রাজনৈতিক দলের সমর্থনে বিপুল ভোট দেন। উক্ত ১০ টি কেন্দ্র থেকে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয় পায় ৮ টি আসনে, সি.পি.আই.এম. ও জাতীয় কংগ্রেস জোট জয় পায় ২ টি আসনে। বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে বীণা মণ্ডল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির আর ৯ জন প্রার্থীই নমঃশূদ্র জাতির। ১০ টি নির্বাচনীক্ষেত্র থেকে মোট ৬৬ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ৬৬ জনের মধ্যে ২ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ২ জন মালো, ১ জন বাগদি ও ১ জন কৈবত আর ৬০ জন অংশগ্রহণ কারী প্রার্থীই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ।[১৩৮] উক্ত সংরক্ষিত আসনগুলোই ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী নমঃশূদ্রদের বসবাস অধিক এবং শিক্ষা, কর্মনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য দলিত জাতির থেকে ভালো থাকার দরুণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নমঃশূদ্র অধিকভাবে এগিয়ে যায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ কেন্দ্র থেকে যে সকল নমঃশূদ্ররা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হলেন, জিতেন্দ্রনাথ হালদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৭৬৯)। তেহট্ট কেন্দ্র থেকে অরবিন্দ বিশ্বাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৯১৮)। পলাশিপাড়া কেন্দ্র থেকে (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৫৭৬)। কালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে বিপ্লব রায় (এস.এইচ.এস. প্রাপ্ত ভোট, ১০৭৫), সুনীল মণ্ডল (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৮৯০)। নাকাশিপাড়া কেন্দ্র থেকে স্বপন মণ্ডল (এ.এম.বি. প্রাপ্ত ভোট, ১৭৩২), শিপাঙ্কর হালদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৪৭৬)। চাপড়া কেন্দ্র থেকে সমরেশ বিশ্বাস (এস.এইচ.এস. প্রাপ্ত ভোট, ৪০৮১)। কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে অশোক চন্দ্র দাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৭৬৯)। নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে উৎপল বিশ্বাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৯১৪)। কৃষ্ণনগর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে মহাদেব সরকার (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ২২৮৫০), সুদেব সরকার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৮৪২)। রাণাঘাট উত্তর পশ্চিম কেন্দ্র থেকে অমল সরকার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৪৮০)। চাকদাহ কেন্দ্র থেকে প্রদীপ কুমার সরকার (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৬২৯৪), ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৭৬৯)। বাদুরিয়া কেন্দ্র থেকে গোপাল দাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১১৬৬)। হাবড়া কেন্দ্র থেকে কমলেন্দু বালা (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৩৫৯)। অশোকনগর কেন্দ্র থেকে তারকেশ্বর হাওলাদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৫৮২), অজিত কুমার সরকার (আর.পি.আই.এ. প্রাপ্ত ভোট ১৩৩৯)। বিজপুর কেন্দ্র থেকে কৃষ্ণগোপাল মাঝি (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১০০১)। নৈহাটি কেন্দ্র থেকে হরিপদ বিশ্বাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৮৫৬), আনন্দ সরকার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৩৪০)। জগদ্দল কেন্দ্র থেকে হরিপদ বিশ্বাস (এ.আই.এফ.বি, প্রাপ্ত ভোট, ৪৯৬৬৭)। ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে তাপস সরকার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৩৮৪)। খড়দহ কেন্দ্র থেকে সমর দাস (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৫৬৮)। দমদম উত্তর কেন্দ্র থেকে সোভা হাওলাদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৯৪৭)। পানিহাটি কেন্দ্র থেকে দীপক কুমার কুণ্ডু (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৪৯০৫), জগদীশ রায় (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৭৯৭)। রাজারহাট নিউ টাউন কেন্দ্র থেকে ভাস্কর রায় (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৯৯৮)। বারাসাত কেন্দ্র থেকে ডাঃ বীথিকা মণ্ডল (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ২২৫৩৭), সুনীল চন্দ্র রায় (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ২৮২৭)। সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে মনোরঞ্জন জদ্দার (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৫৭৩৫)। বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে দিলিপ বৈরাগ্য (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১১৩৩), অজয় কুমার বাইন (এস.ইউ.সি.আই. প্রাপ্ত ভোট, ১০৮১)।[১৩৯] এই নির্বাচনে মোট ৩৪ জন নমঃশূদ্র প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। যদিও সংখ্যাগত দিক থেকে বি.এস.পির প্রার্থীর সংখ্যা বেশিছিল কিন্তু

প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা অনেক কম। এই নির্বাচনে মোট ৯৪ জন নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সারণি ৩.১৪৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২২ মিনাখাঁ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। ঊষা রানী মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	১০৩২১০	৫৫.৭৬
২। দীনবন্ধু মণ্ডল	সি.পি.আই.এম	৬০৬১২	৩২.৭৫
৩। জয়ন্ত মণ্ডল	বি.জে.পি.	১৩৫৬৬	৭.৩৩
৪। কৃষ্ণ কিরণ দাস	বি.এস.পি	৩৯৯৫	২.১৬
মোট		বৈধ্য ভোট হয়, ১৮৫১০১	ভোটিং শতাংশ, ৮৮.৫৬

সারণি ৩.১৪৯: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৬ হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। দেবেশ মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৯৪৭৫৩	৫৩.০০
২। আনন্দময় মণ্ডল	সি.পি.আই	৬৪৪৪৯	৩৬.০৫
৩। লাবন্য মণ্ডল	বি.জে.পি	১৪৩২৭	৮.০১
৪। রণজিৎ গায়েন	নির্দল	১৯২১	১.০৪
৫। নিতিশ কুমার বিশ্বাস	বি.এস.পি	১৪৬৭	০.৮২

সারণি ৩.১৫০: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৭ গোসাবা (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। জয়ন্ত নস্কর	এ.আই. টি. সি	৯০৭১৬	৫০.৫২
২। উত্তম কুমার সাহা	আর.এস.পি	৭১০৪৫	৩৯.৫৬
৩। সঞ্জয় কুমার নায়েক	বি.জে.পি.	১১৫০৪	৬.৪১
৪। দিলিপ মণ্ডল	এস.ইউ.সি.আই	১০৫০	০.৫৮
৫। দীনবন্ধু মণ্ডল	এল.জে.পি	৯৭৭	০.৫৪
৬। হরিপদ মণ্ডল	বি.এস.পি	৭৭৬	০.৪৩
৭। তুষার কান্তি মণ্ডল	এম.পি. ও. আই	৪০১	০.২২
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৭৯৫৭৮	ভোটিং শতাংশ, ৮৪.৭৫

সারণি ৩.১৫১: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৮ বাসন্তী (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	এ.আই. টি. সি	৯০৫২২	৪৯.৮৭
২। সুভাষ নস্কর	আর.এস.পি	৭৩৯১৫	৪০.৭২
৩। পঙ্কজ রায়	বি.জে.পি	১০৩৭৩	৫.৭১
৪। হিমাংশু কয়াল	এম.পি. ও. আই	১১৪১	০.৬৩
৫। তরঙ্গ মণ্ডল	নির্দল	১০৬৯	০.৫৯
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৮১৫০৭	ভোটিং শতাংশ, ৮০.৬১

সারণি ৩.১৫২: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১২৯ কুলতলি (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। রাম শঙ্কর হালদার	সি.পি.আই.এম	৭৩৯৩২	৩৭.৩৭
২। গোপাল মাঝি	এ.আই. টি. সি	৬২২১২	৩১.৪৪
৩। জয়কৃষ্ণ হালদার	এস.ইউ.সি.আই	৪৮০৫৮	২৪.২৯
৪। কিরণ নস্কর	বি.জে.পি	১০৩৭৬	৫.২৬
৫। তপন বৈরাগী	নির্দল	৬৯১	০.৩৫
৬। পল্লব দাস	এল.জে.পি	৫৩৫	০.২৭
৭। ভূতনাথ সরদার	বি.এম.ইউ.পি	৫০৩	০.২৫
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৯৭৮৫৯	ভোটিং শতাংশ, ৮৫.৯৬

সারণি ৩.১৫৩: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৫ মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। জয়দেব হালদার	এ.আই. টি. সি	৯৪৩৩৯	৫২.৭২
২। ডাঃ শরৎচন্দ্র হালদার	সি.পি.আই.এম	৬৯৪০০	৩৮.৭৮
৩। ছন্দিতা মজুমদার	বি.জে.পি	৮৬৫৩	৪.৮৪
৪। শিশির কুমার মণ্ডল	এস.ইউ.সি.আই	১৮৪৮	১.০৩
৫। বাপ্পা দাস	পি.ডি.এস	৯৫১	০.৫৩
৬। তাপস কুমার হালদার	বি.এস.পি	৮১০	০.৪৫
৭। গণেশ হালদার	এল.জে.পি	৭৮৮	০.৪৪
৮। সুদীপ হালদার	নির্দল	৬৯২	০.৩৯
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৭৮৯৪১	ভোটিং শতাংশ, ৮৬.৬২

সারণি ৩.১৫৪: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৬ জয়নর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। বিশ্বানাথ দাস	এ.আই. টি. সি	৬৪৫৮২	৩৬.২৩
২। সুজিত পাটওয়ারি	আই.এন.সি	৪৯৫৩১	২৭.৭৮
৩। তরুন কান্তি নস্কর	এস.ইউ.সি.আই	৩৯৩৯৭	২২.১০
৪। উৎপল কুমার মণ্ডল	বি.জে.পি	১৮০৫৫	১০.১৩
৫। তরুন নস্কর	নির্দল	১৪১৭	০.৭৯
৬। দিলিপ সরদার	নির্দল	১২৫৭	০.৭১
৭। অমূল্য কুমার সরদার	বি.এস.পি	৮৪১	০.৪৭
৮। শঙ্করদেব মণ্ডল	নির্দল	৭১৮	০.৪০
৯। মানবেন্দ্রনাথ মণ্ডল	বি.এম.ইউ.পি	৪৯২	০.২৮
১০। তরঙ্গ মণ্ডল	নির্দল	৪৩১	০.২৪
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৭৮২৬৯	ভোটিং শতাংশ, ৮৪.৩৮

সারণি ৩.১৫৫: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৭ বারুইপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নির্মল চন্দ্র মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৯২৩১৩	৪৮.০৯
২। সুজিয় মিস্ত্রি	সি.পি.আই.এম	৭১৯৫১	৩৭.৪৮
৩। অমূল্য কুমার নস্কর	বি.জে.পি	১২৭৩৮	৬.৬৪
৪। অজয় সাহা	এস.ইউ.সি.আই	৯২৩০	৪.৮১
৫। বমল কৃষ্ণ মণ্ডল	বি.এস.পি	১৬৫৩	০.৮৬
৬। চিন্ময় নস্কর	নির্দল	১৩৬৪	০.৭১
৭। অলোক সরদার	নির্দল	৬৯১	০.৩৬
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৯১৯৬৬	ভোটিং শতাংশ, ৬.২৪

সারণি ৩.১৫৬: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। শ্যামল মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	৯৩৪৯৮	৪৯.০৮
২। অর্নব রায়	আই.এন.সি	৭৪৭৭২	৩৯.২৫
৩। মনোজিত মণ্ডল	বি.জে.পি	১২৬৬৪	৬.৬৫
৪। রামপ্রসাদ মিস্ত্রি	এস.ইউ.সি.আই	৩৯৮০	২.০৯
৫। স্বদেশ সাপুই	বি.এস.পি	১৮২৭	০.৯৬
৬। দেবাশিস সানী	নির্দল	১৩১৫	০.৬৯
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৯০৫১৭	ভোটিং শতাংশ, ৮৬.২৪

সারণি ৩.১৫৭: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪১ মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। নমিতা সাহা	এ.আই. টি. সি	৮৯৪৮৬	৪৮.৭০
২। চন্দন সাহা	সি.পি.আই.এম	৭৯৯২৬	৪৩.৫০
৩। চন্দন কুমার নস্কর	বি.জে.পি	৯৪৬০	৫.১৫
৪। রবিরাম নস্কর	বি.এস.পি	১৩৭১	০.৭৫
৫। সঞ্জয় মণ্ডল	এস.ইউ.সি.আই	১১৩৩	০.৬২
৬। প্রিতম মণ্ডল	নির্দল	৮৭৭	০.৪৮
		বৈধ্য ভোট হয়, ১৮৩৭৪৪	ভোটিং শতাংশ, ৮৬.৬৬

সারণি ৩.১৫৮: নির্বাচনীক্ষেত্রঃ ১৪৬ বিষ্ণুপুর (তপশিলি জাতি)

প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১। দিলিপ মণ্ডল	এ.আই. টি. সি	১০৭১২৯	৫২.৩৬
২। অলোক সরদার	সি.পি.আই.এম	৭৬৪৯৯	৩৭.৩৯
৩। শ্যাপ্রসাদ হালদার	বি.জে.পি	১৪২৬৪	৬.৯৭
৪। দীপঙ্কর গায়েন	বি.এস.পি	১৫৯৪	০.৭৮
৫। সমর কুমার বিশ্বাস	নির্দল	১৫০২	০.৭৩
৬। উত্তম কুমার হালদার	পি.ডি.এস	১২০৩	০.৫৯
		বৈধ্য ভোট হয়, ২০৪৫৯৩	ভোটিং শতাংশ, ৮২.২৪

সূত্রঃ নির্বাচনীক্ষেত্র- ১২২, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১, ১৪৬, Statistical Report on General Elections, 201 6to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2016, the Legislative Assembly of West Bengal Detailed Results, থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে উক্ত নির্বাচনে নোটাতে ভোট নেওয়ার নাগরিকদের বৈধ্য অধিকার দেওয়া হয়। যাইহোক উপরিউক্ত ১১ টি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংরক্ষিত আসনেও জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে নোটাতে অনেক বেশি ভোট পরে। ফলত বলা যেতেই পারে জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর উপর পৌণ্ড্ররা নমঃশূদ্ররা আস্থা না রেখে সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আস্থা রেখেই নির্বাচিত হয়েছেন। ১১ টি সংরক্ষিত আসনে ১০ টি জয় পায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগেস আর ১ টি আসনে জয় সি.পি.আই.এম. ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জোট। ১১ জন জয়ী প্রার্থীর মধ্যে নমিতা সাহা ব্যতি ১০ জন

পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়জাতির মানুষ। উক্ত ১১ টি আসনে মোট ৭১ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। ৭১ জনের মধ্যে ৬ জন নমঃশূদ্র, ৫ জন কৈবত, ১ জন ধোপা আর ৫৯ জনই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ।[১৪০]

যে সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সাধারণ আসন থেকে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হলেন, হারোয়া কেন্দ্র থেকে মন্মথ বাছার (বি.জে.পি প্রাপ্ত ভোট, ১১০৭৮)। সাগর কেন্দ্র থেকে অসীম কুমার মণ্ডল (সি.পি.আই.এম. প্রাপ্ত ভোট, ৯৪৭৪১), অশোক বর্মন (এল.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৩৫৩)। কুলপি কেন্দ্র থেকে জগরঞ্জন হালদার (এ.আই. টি. সি. প্রাপ্ত ভোট, ৮৪০৩৬, জয়ী প্রার্থী), নবেন্দু সুন্দর সরকার (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৮৪৩৪), ডাঃ অরূপ কুমার হালদার (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৩২৪)। রায়দিঘি কেন্দ্র থেকে গুনাসিন্ধু হালদার (এস.ইউ.সি.আই. প্রাপ্ত ভোট, ৭৭০৩), পুরনেন্দু শেখর মণ্ডল (নির্দল)। বারুইপুর পশ্চিম কেন্দ্র থেকে গোপিনাথ মণ্ডল (এস.ইউ.সি.আই. প্রাপ্ত ভোট, ১১৩৬), মুকুল মণ্ডল (নির্দল, ১০১৩), দেবব্রত মণ্ডল (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৬৩১)। ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্র থেকে দিলিপ কুমার হালদার (এ.আই. টি.সি. প্রাপ্ত ভোট, ৯৬৮৩৩, জয়ী প্রার্থী), সুজিত সরদার (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৪০৬)। ফলতা কেন্দ্র থেকে অতুল কুমার পুরকাইত (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৫১৮)। সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে অশিতাভ্র মণ্ডল (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ১৬৪৯), শম্ভু মণ্ডল (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ১০৯১)। মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্র থেকে শম্ভুনাথ কাঞ্জি (নির্দল, প্রাপ্ত ভোট, ৯৩৫)। ভাঙ্গর কেন্দ্র থেকে অবনী কুমার মণ্ডল (বি.জে.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৯৫৬৩)। যাদবপুর কেন্দ্র থেকে সুভাষ চন্দ্র নস্কর (বি.এস.পি. প্রাপ্ত ভোট, ৮০৩)। সোনারপুর উত্তর কেন্দ্র থেকে অজিত বাউল (বি.এস.পি প্রাপ্ত ভোট, ১৭৭০), কার্তিক নস্কর (এম.পি.ও.আই. প্রাপ্ত ভোট, ৭৮৭)।[১৪১] সাধারণ আসন থেকে মোট ২১ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ২১ জনের মধ্যে কুলপি ও ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে ২ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনাও দক্ষিণ ২৪ পরগনাথেকে নমঃশূদ্ররা ৯ টি আসনে জয়ী হয়েছিল এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মোট ১৩ টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন। জয়ী প্রার্থীর দিক থেকে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ৪ টি আসনে এগিয়েছিল। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ২১ টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে নমঃশূদ্রদের ৭ জন ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ১০ জন তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন । আবার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অংশগ্রহণ কারী প্রার্থীদের সংখ্যা নমঃশূদ্রদের মোট ৯৪ জন আর

পৌণ্ড্রদের ৮২ জন ছিল। কাজেই ২০১১ ও ২০১৬ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণের দিক থেকে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে এগিয়েছিল।

২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে ৬৮ টি তপসিলি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ৪৯ টি আসনে জয় পায়। আর বামপন্থী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জোটশক্তি যথাক্রমে ১১ ও ৮ টি আসনে জয় পেয়েছিল।[১৪২] উক্ত ফলাফলের দিক থেকে বিচার করলে অতিসহজেই অনুধাবন করা যায় যে ৩৪ বছরের তপসিলি ভোট ব্যাঙ্ক যে ভাবে বামেদের সমর্থনে ছিল তা এই নির্বাচনে সম্পূর্ণ বিপরীতে চলে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে যুক্ত হয়। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনার সংরক্ষিত নির্বাচনীক্ষেত্র গুলোতেও তৃণমূল কংগ্রেস তার জয়ের ধারা ধরে রাখতে পেরেছিল।

মূল্যায়ন

আমরা দেখতে পেলাম ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯ এবং ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে কোন প্রার্থীই জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের টিকিটে নির্বাচিত হতে পারেন নি। নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনাএবং দক্ষিণ ২৪ পরগনাজাতিগত সংরক্ষিত আসন ও সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম ১৯৭১ সালে থেকে ১৯৯৯, ২০০৯ সাল পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নমঃশূদ্রদের থেকে অনেকটা এগিয়েছিল। ১৯৮৯, ১৯৯১, ২০০৪ ও ২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে থেকে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে এগিয়েছিল। আবার নির্বাচিত জয়ী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯৯, ২০০৪ এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অনেক বেশি সংখ্যায় এগিয়েছিল। নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়ে থাকার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অধিকাংশ মানুষই দুই ২৪ পরগনায় স্থায়ী বসবাসরত নাগরিক এবং সংরক্ষিত আসন গুলোও পৌণ্ড্র অধ্যুষীত দুই ২৪ পরগনায় অধিক ছিল। ২০১৪ সালের নির্বাচনে এসে দেখা গেল নমঃশূদ্র অধ্যুষিত ২ টি সংরক্ষিত কেন্দ্র আর ২ টি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত কেন্দ্র, কাজেই উত্তর আচরণ বাদের তত্ত্বানুসারে গণতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনৈতিক নির্বাচনে ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সব রাজনৈতিক দলই জাতিগত বসবাসরত সংখ্যার উপর নির্ভর করে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রার্থী দিয়ে থাকেন। ফলে রাণাঘাট ও

বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে রাজ্যের ও দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নমঃশূদ্র জাতির মানুষদের প্রার্থী করেন, ঠিক আবার মথুরাপুর ও জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র দুটিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষদের প্রার্থী করেন। এছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নমঃশূদ্র জাতির অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনাও দক্ষিণ ২৪ পরগনা তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে এবং নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার না থাকার কারণে এদের ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অংশগ্রহণ করা একটা বড় বাঁধা ছিল। কাজেই ২০০৩ সালের ভারত সরকারের নাগরিকত্ব বিল কার্যকর না হওয়ার জন্য নমঃশূদ্রের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে এসে ভারতের ভোটাধিকার পেয়ে যায়, ফলে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে সংসদীয় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে এগিয়ে যায়। আবার আরও একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নমঃশূদ্ররা মতুয়া মহাসংঘের নেতৃত্বে সংবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে সংখ্যায় বেশি অংশগ্রহণ করে থাকেন।[১৪৩] শুরুতে যদিও মতুয়া মহাসংঘের নীতি ছিল অরাজনৈতিক তবে ২০০৯ সালের পরে তা রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। ফলে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে মতুয়া মহাসংঘ তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক মিছিল ও মিটিংয়ে অংশগ্রহণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে অনেকটা এগিয়ে যায়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ি দুটি রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে নমঃশূদ্রদের প্রধান রাজনৈতিক দল বি.জে.পি ও তৃণমূল কংগ্রেসের হয়েই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। বনগাঁ লোকসভার কেন্দ্রের সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের হঠাৎ মৃত্যুতে মতুয়া মহাসংঘ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মমতা ঠাকুরের নেতৃতাধীন মতুয়া মহাসংঘ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক দলের পক্ষ নিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের নেতৃতাধীন মতুয়া মহাসংঘ বি.জে.পির রাজনৈতিক দলের পক্ষ নিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। দেখা যায় নমঃশূদ্রদের অনেক আগে থেকেই একটা রাজনৈতিক সচেতন ছিল।[১৪৪] কাজেই সচেতন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ঠাকুর বাড়ীর দুটি রাজনৈতিক শিবিরে অংশগ্রহণ করার ফলে নাগরিকত্ব লাভের আশায় আগের থেকে বেশি সংখ্যায় মানুষ সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসংঘের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক মানুষ সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে ক্ষেত্রে সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন করতে থাকেন।[১৪৫] যদিও নমঃশূদ্রদের পৌণ্ড্রদের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটা ওতটা সংবদ্ধ ছিল না। কাজেই সংসদীয় রাজনীতিতে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অংশগ্রহণ তেমন একটা দেখা যায় না। আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্র-ছাত্রদের মধ্যে পৌণ্ড্র জাতির সামাজি ও রাজনৈতিক অবহেলিত হওয়া ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে, তাদের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিভূমি গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রেরনা দিয়ে চলেছে।[১৪৬] আমরা দেখতে পেলাম উপরিউক্ত যেকটা লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন, এক্ষেত্রে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সংখ্যায় অনেকটা এগিয়ে।

এবাবে আমরা মূল্যায়ন করব ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০১, ২০১১ ও ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণ নিয়ে।

আমরা দেখতে পেলাম উপরিউক্ত নির্বাচন গুলোতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে কোন প্রার্থীই জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের (যেমন বি.এস.পি. ও আর.পি.আই) টিকিটে নির্বাচিত হতে পারেন নি। নদীয়া, দুই ২৪ পরগনায় জাতিগত সংরক্ষিত আসন ও সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০১ সাল পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নমঃশূদ্রদের থেকে অনেকটা এগিয়েছিল। শুধুমাত্র ২০১১ ও ২০১৬ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে থেকে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে এগিয়েছিল। আবার নির্বাচিত জয়ী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০১ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অনেক বেশি সংখ্যায় এগিয়েছিল। নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়ে থাকার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অধিকাংশ মানুষই দুই ২৪ পরগনায় স্থায়ী বসবাসরত নাগররিক এবং সংরক্ষিত আসন গুলোও পৌণ্ড্র অধ্যুষীত দুই ২৪ পরগনায় অধিক ছিল। ২০১১ সালের নির্বাচনে এসে দেখা গেল নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে ১০ টি সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্র আর ১১ টি বিধানসভা কেন্দ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে ছিল। এছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে নমঃশূদ্রদের

অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশ থেকে এসে নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনাও দক্ষিণ ২৪ পরগনা তে ছরিয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে এবং নাগরিকত্ব এদের ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করা একটা বড় বাঁধা ছিল, যার কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কাজেই ২০১১ সালের পর থেকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও সামাজিক আন্দোলনের মধে দিয়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে এগিয়ে যায়।

তবে আমরা উল্লেখ করব নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সাধারণ পেশার এবং বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ২০০ জন মানুষের উপর প্রশ্নমালা তৈরি করে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি। রাজনৈতিক কর্মী থেকে সাধারণ পেশার মানুষ সকলেই বলেছেন, উক্ত জাতি দুটির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক নেতা-নেত্রীর গুরুত্ব তেমন কোন বৃদ্ধি পায়নি। এদের সকলের বক্তব্য থেকেই উঠে এসেছে, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, জগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও হেমচন্দ্র নস্কারের মতো নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি থেকে এখন পর্যন্ত তেমন গনজননেতা উঠতে পারেন নি।[১৪৭] যেমন বামফ্রন্ট থেকে রাজ্যস্তরের দলের সিদ্ধান্ত নেওয়া কোর কমিটির কমিটির কোন নেতা ছিল না, আবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন নেতা বা নেত্রী উক্ত জাতির থেকে নেই।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি দুটি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশী দলিত জাতি ছাড়া অন্যান্য দলিত জাতির তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে। তবে আমরা জাতিগত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রভূমি নিয়ে গবেষণা করায় বেশ জ্ঞান অর্জন করতে পারলাম।

নির্দেশিকা

১) Census of India, 2001, Primary Sensus Abstract, Vol.13, 2nd Edition. Primary Census Abstract Date, 2011, Table A-10.

২) মোহেনস বুক হানসেন, ডবলু টি ও কৃষিচুক্তি উন্নয়নশীল দেশে তার প্রভাব, অমিয় কুমার বাগচী (সম্পাদিত) বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা (দ্বিতীয় খন্ড) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩ (পুনরায়) পৃঃ ৭৯।

৩) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ, ঠাকুরনগর নিবাসীর থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ, ঠাকুরনগর নিবাসীর থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫) অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাঙ্গলাদেশ, দীপালী বুক হাউস,কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ২২০-২৬।

৬) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির গবেষক, দক্ষিণ বারাসাতের নিবাসীর থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৭) সনৎকুমার নস্কর, (সম্পাদক), পৌণ্ড্র – মনীষা (৪র্থ খন্ড), পৌণ্ড্র মহাসঙঘ, কলকাতা,২০১৫, পৃঃ ২২১।

৮) সনৎকুমার নস্কর, (সম্পাদক), পৌণ্ড্র – মনীষা (৪র্থ খন্ড), পৌণ্ড্র মহাসঙঘ, কলকাতা,২০১৫, পৃঃ ২২১-২২৩।

৯) Subhash C. Kashyap, 'Our Parliament' An Introduction to the Parliament of India, National Book Trust, New Delhi, (Reprints) 2011, পৃঃ ১৯।

১০) Subhash C. Kashyap, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

১১) B.L. Shankar, Valerian Rodrigues, The Indian Parliament A Democracy At Work, Oxford University Press, New Delhi, 2011, পৃঃ ৩৮।

১২) Subhash C. Kashyap, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

১৩) Constituent Assembly Debates, Vol. VII, পৃঃ ৩২-৩৩।

১৪) Subhash C. Kashyap, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

১৫) The Constitution of India, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, প্রগুক্ত, পৃঃ ২৬-২৮।

১৬) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৪১-৪২।

১৭) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৫১।

১৮) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৫৪।

১৯) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৭৫, ৮৮, ২০০, ২১৩, ২১৮, ২২৪।

২০) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৮।

২১) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ২০৯-১১।

২২) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৯।

২৩) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৯।

২৪) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৯।

২৫) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ২০৬।

২৬) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৭, ৪৩-৪৪, ৪৫।

২৭) The Constitution of India, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৯, ৮২।

২৮) Election Commission of India, 5 January 2007, Arkaive

২৯) Statistical Report on General Elections.1971 to the Fifth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1973, পৃঃ **১৯০-৯৭**।

৩০) Statistical Report on General Elections.1971 to the Fifth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ **১৯২**।

৩১) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, আনন্দ, কলকাতা, পুনরঃ ২০১৯, পৃঃ ২৮৬।

৩২) Statistical Report on General Elections.1971 to the Fifth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ **১৯৩**।

৩৩) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯।

৩৪) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নির্বাচন ক্ষেত্র সীমানা পুনর্নির্ধারণ গঠন কর্মপদ্ধতি ও প্রভাব, মিত্রম, কলকাতা ২০০৯, পৃঃ ৬৬।

৩৫) Statistical Report on General Elections.1977 to the Sixth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1978, পৃঃ **১৯১-৯৭**।

৩৬) Statistical Report on General Elections.1977 to the Sixth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ **১৯৩**।

৩৭) মনোশান্ত বিশ্বাস, বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ২৯৭।

৩৮) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৫।

৩৯) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৩-৯৪।

৪০) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৪।

৪১) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৪।

৪২) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩।

৪৩) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৭-৯৮।

৪৪) Statistical Report on General Elections.1977 to the Sixth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৯৪।

৪৫) Statistical Report on General Elections.1977 to the Sixth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

৪৬) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৫-১৬।

৪৭) Statistical Report on General Elections.1980 to the Seventh Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1981, পৃঃ ২৩৬।

৪৮) Statistical Report on General Elections.1980 to the Seventh Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬-৩৭।

৪৯) Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), W.B. Government Printing Press, Alipur, 1999, NLC. থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।

৫০) Statistical Report on General Elections.1980 to the Seventh Lok Shabha, Volume-I, প্রাগক্ত, পৃঃ ৮৩।

৫১) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৭-১৯।

৫২) S.S. Gill, The Dynasty : A Political Biography of the Premier Ruling Family of Modern India, Harper Collins, London, 1996, পৃঃ ৪০১-৩।

৫৩) Statistical Report on General Elections.1989 to the Ninth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts &

Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1990, পৃঃ ২৮৩-৮৫। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), প্রাগুক্ত, থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।

৫৪) Statistical Report on General Elections.1989 to the Ninth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগক্ত, পৃঃ ২৮৪-৮৫। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), প্রাগুক্ত, থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।

৫৫) Statistical Report on General Elections.1989 to the Ninth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

৫৬) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪২-৪৩।

৫৭) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৪।

৫৮) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৭-৪৮।

৫৯) Statistical Report on General Elections.1991 to the Tenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1992, পৃঃ ৩০৫-৬। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), প্রাগুক্ত, থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।

৬০) Statistical Report on General Elections.1991 to the Tenth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৫-৬। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), প্রাগুক্ত, থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।

৬১) Statistical Report on General Elections.1991 to the Tenth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

৬২) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৮।

৬৩) Statistical Report on General Elections. 1998 to the 12th Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।

৬৪) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৯।

৬৫) Statistical Report on General Elections. 1999 to the Thirteenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1999, পৃঃ ২৫৫-৫৭।

৬৬) Statistical Report on General Elections. 1999 to the Thirteenth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৬।

৬৭) Sekhar Bandyopadhyay, Postscript : The Namasudra in Post- Partition West Bengal, in his Caste Protest ana Identity in colonial India: The Namasudras of Bengal, 1872-1947, Oxford University Press, New Delhi, 2011, (2nd edition), পৃঃ ২৭০।

৬৮) Statistical Report on General Elections. 1999 to the Thirteenth Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।

৬৯) Suhas Palshikar, K.C. Suri, Yogendra Yadav (edited), Party Competition in Indian States : Electoral Politics in Post- Congress Polity, Oxford University Press, New Delhi, 2014, পৃঃ ৪-৬।

৭০) Statistical Report on General Elections. 2004 to the 14th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2004, পৃঃ ৩৩৬-৩৮।

৭১) Statistical Report on General Elections. 2004 to the 14th Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৭।

৭২) Statistical Report on General Elections. 2004 to the 14th Lok Shabha, Volume-I, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।

৭৩) Ratul Datta (Compiled & Edited), Bengal Vote in Lok Sabha Election (Since I ndependence), Deys, Kolkata, 2016, পৃঃ ৪০।

৭৪) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নির্বাচন ক্ষেত্র সীমানা পুনর্নির্ধারণ গঠন কর্মপদ্ধতি ও প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

৭৫) Ratul Datta (Compiled & Edited), Bengal Vote in Lok Sabha Election (Since I ndependence), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২২।

৭৬) Statistical Report on General Elections. 2009 to the 15th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2009, Constituency Wise Detailed Results।

৭৭) Statistical Report on General Elections. 2009 to the 15th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2009, Constituency Wise Detailed Results।

৭৮) Suhas Palshikar, K.C. Suri, Yogendra Yadav (edited), Party Competition in Indian States : Electoral Politics in Post- Congress Polity, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯-৫২।

৭৯) Statistical Report on General Elections. 2014 to the 16th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2014, Detalls for Assemby Segments of Pariamentary Constituencies।

৮০) Statistical Report on General Elections. 2014 to the 16th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2014, Detalls for Assemby Segments of Pariamentary Constituencies।

৮১) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, লোকসভা নির্বাচন ২০১৪ বাংলার জনাদেশ, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৩৩।

৮২) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, লোকসভা নির্বাচন ২০১৪ বাংলার জনাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫-১৬।

৮৩) Ratul Datta, (Compiled & Edited) Bengal Vote in Assembly Election (Since Independence), Deys, Kolkata, 2019, পৃঃ ১০।

৮৪) সত্যব্রত দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪।

৮৫) Ratul Datta, (Compiled & Edited) Bengal Vote in Assembly Election (Since Independence), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০

৮৬) Ratul Datta, (Compiled & Edited) Bengal Vote in Assembly Election (Since Independence), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

৮৭) Ratul Datta, (Compiled & Edited) Bengal Vote in Assembly Election (Since Independence), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

৮৮) Statistical Report on General Elections, 1971to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1973, পৃঃ ৪।

৮৯) Statistical Report on General Elections, 1971to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৪-১১।

৯০) Statistical Report on General Elections, 1971to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৪-৫। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who: 1971, Government Printing Press. Alipure,1972, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

৯১) Statistical Report on General Elections, 1971to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩-১৫।। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1971, Government Printing Press. Alipure,1972, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

৯২) Statistical Report on General Elections, 1971to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০২-১৫।। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1971, Government Printing Press. Alipure,1972, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

৯৩) বিপন চন্দ্র ,মৃদুল মুখার্জি ,আদিত্য মুখার্জি ,প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯১।

৯৪) মনোশান্ত বিশ্বাস, বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৪-১১।

৯৫) সন্তোষ রাণা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

৯৬) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগক্ত, পৃঃ ২৯১।

৯৭) সত্যব্রত দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪০।

৯৮) Statistical Report on General Elections, 1972to the Legislative Assembly of West Bengal ,Election Commission of India ,New Delhi ,1973 ,পৃঃ ৩০১-৩। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1972, Government Printing Press. Alipure,1972, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

৯৯) সন্তোষ রাণা, কুমার রাণা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯-৬০।

১০০) Dilip Banerjee, Election Recorder, Book Front Publication Forum, Calcutta, 1990, পৃঃ ২৪৯-৫৩।

১০১) Statistical Report on General Elections, 1977to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগুক্ত , পৃঃ ৩০৩-৭।

১০২) Dilip Banerjee, Election Recorder, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯-৫৩।

১০৩) দলিত কন্ঠ, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগন, পৃঃ ৭-৮

১০৪) বি.টি. রনদিভে, জাত-বর্ণ এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ৭-১০।

১০৫) বি.ট. রনদিভে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

১০৬) সত্যব্রত দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪১।

১০৭) বিপন চন্দ্র, মৃদুল মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগক্ত, পৃঃ ৩৭৪।

১০৮) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ,নির্বাচন ক্ষেত্র সীমানা পুনর্নির্ধারণ গঠন কর্মপদ্ধতি ও প্রভাব ,মিত্রম ,কলকাতা ২০০৯, পৃঃ ৬৬।

১০৯) Statistical Report on General Elections, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, পৃঃ ৩১০-৫৭।

১১০) Dilip Banerjee, Election Recorder, প্রাগক্ত, পৃঃ ২৯০-৯৭।

১১১) Statistical Report on General Elections, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগক্ত, পৃঃ ৩২৫-৩০। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1977, Government Printing Press. Alipure,1977, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১১২) Dilip Banerjee, Election Recorder, প্রাগক্ত, পৃঃ ২৯০-৯৭।

১১৩) Statistical Report on General Elections, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগক্ত, পৃঃ ৩২৫-৩০। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1977, Government Printing Press. Alipure,1977, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১১৪) Dilip Banerjee, Election Recorder, প্রাগক্ত, পৃঃ ২৯০-৯৭।

১১৫) Statistical Report on General Elections, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৫-৩০। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1977, Government Printing Press. Alipure,1977, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১১৬) আনন্দ বাজার পত্রিকা ,২৬শে এপ্রিল, ১৯৭৮।

১১৭) Statistical Report on General Elections, 1987to the Legislative Assembly of West Bengal ,Election Commission of India ,New Delhi ,পৃঃ ৩২১-৩০। West Bengal Assembly Election Result, 1987, Election Commission of India,1987. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 1987, Government Printing Press, Alipur, 1987, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১১৮) Statistical Report on General Elections, 1987to the Legislative Assembly of West Bengal প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৫-৩০।

১১৯) Statistical Report on General Elections, 1987to the Legislative Assembly of West Bengal ,প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৫-৩১।West Bengal Assembly Election Result, 1987, Election Commission of India,1987. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 1987, Government Printing Press, Alipur, 1987, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১২০) Dilip Banerjee, Election Recorder, A Analytical Reference, Star Publishing House, Calcutta,2012, পৃঃ ৫৭৯-৫৮৪।

১২১) Statistical Report on General Elections, 2001to the Legislative Assembly of West Bengal ,Election Commission of India ,New Delhi ,2001প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০-৩৩ ।

১২২) West Bengal Assembly Election Result, 2001, Election Commission of India, 2001. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 2001, Govt. Printing Press, Alipur, 2001, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এবং Statistical Report on General Elections, 2001 to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৭-৩৮, নির্বাচনী কেন্দ্রের থেকে সংখ্যাগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১২৩) Statistical Report on General Elections, 2001to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩১-৩৭।

১২৪) West Bengal Assembly Election Result, 2001, Election Commission of India, 2001. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 2001, Govt. Printing Press, Alipur, 2001, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এবং Statistical Report on General Elections, 2001 to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৭-৩৮ , নির্বাচনী কেন্দ্রের থেকে সংখ্যাগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১২৫) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নির্বাচন ক্ষেত্র সীমানা পুনরনির্ধারণ গঠন কর্মপদ্ধতি ও প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯

১২৬) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নির্বাচন ক্ষেত্র সীমানা পুনরনির্ধারণ গঠন কর্মপদ্ধতি ও প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬।

১২৭) West Bengal Assembly Election Result, 2011, Election Commission of India, 2011. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 2011, Govt. Printing Press, Alipur, 2011, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১২৮) West Bengal Assembly Election Result, 2011,প্রাগক্ত. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। Statistical Report on General Elections, 2011to the Legislative Assembly of West

Bengal, প্রাগক্ত ,পৃঃ ৩৪০-৫৮ ,থেকে নির্বাচনী কেন্দ্রের সংখ্যাগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১২৯) বর্তমান পত্রিকা ,২৪ মার্চ, ২০০৯।

১৩০) আনন্দ বাজার পত্রিকা ,৬ই ডিসেম্বর, ২০০৯।

১৩১) সীমান্ত মৈত্র -বনগাঁয় কল্পতরু মমতা ,আনন্দ বাজার পত্রিকা। ৬ই ডিসেম্বর ২০০৯।

১৩২) আজকাল পত্রিকা ,১৫ই মার্চ, ২০১০।

১৩৩) আনন্দ বাজার পত্রিকা ,১৫ আগস্ট, ২০০৮।

১৩৪) বর্তমান পত্রিকা। ২৫ মার্চ ,২০০৯।

১৩৫) আনন্দ বাজার পত্রিকা ,২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

১৩৬) West Bengal Assembly Election Result, 2011,প্রাগক্ত. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। Statistical Report on General Elections, 2011to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগক্ত ,পৃঃ ৩৫০-৫৬ ,থেকে নির্বাচনী কেন্দ্রের সংখ্যাগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১৩৭) West Bengal Assembly Election Result, 2011,প্রাগক্ত. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। Statistical Report on General Elections, 2011to the Legislative Assembly of West Bengal, প্রাগক্ত ,পৃঃ ৩৪১-৫৯ ,থেকে নির্বাচনী কেন্দ্রের সংখ্যাগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১৩৮) West Bengal Assembly Election Result, 2016, Election Commission of India, 2016. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 2016, Govt. Printing Press, Alipur, 2016, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১৩৯) West Bengal Assembly Election Result, 2016,প্রাগক্ত. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। Statistical Report on General Elections, 20016 to the Legislative Assembly of West Bengal, 2016 the Legislative Assembly of West Bengal Detailed Results, প্রাগক্ত, থেকে নির্বাচনী কেন্দ্রের সংখ্যাগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১৪০) West Bengal Assembly Election Result, 2016, Election Commission of India, 2016. List of Member's of the West

Bengal Legistature, Who's Who : 2016, Govt. Printing Press, Alipur, 2016, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১৪১) West Bengal Assembly Election Result, 2016,প্রাগক্ত. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। Statistical Report on General Elections, 20016 to the Legislative Assembly of West Bengal, 2016 the Legislative Assembly of West Bengal Detailed Results, প্রাগক্ত, থেকে নির্বাচনী কেন্দ্রের সংখ্যাগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

১৪২) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ২০১৬ বাংলার বিধান, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ২৬।

১৪৩) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়াদের সংঘজনীর থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৪৪) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নমঃশূদ্র জাতির গবেষক, ঠাকুরনগর নিবাসীর থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৪৫) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসংঘের নেতৃত্বদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৪৬) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের নেতৃত্বদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৪৭) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাজেলার থেকে ২০০ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষের থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লোকসভা ও বিধানসভায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভূমিকা

ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের নিম্ন কক্ষের নাম হল লোকসভা আর উচ্চ কক্ষের নাম হল রাজ্যসভা। লোকসভার সাংসদগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। কাজেই তাঁদের জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকতেই হয়। ভারতবর্ষের সাংবিধানিক ধারানুসারে জাতিভিত্তিক সাংসদগণের নির্বাচিত হওয়ার জন্য কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষিত আছে। এখানে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর থাকার কারণে সকল রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিরা উত্তর আচরণ বাদের নির্বাচনের কৌশল অনুসরণ করে যে সংরক্ষিত লোকসভা কেন্দ্রে যে জাতির ভোটার সংখ্যা বেশি, সেই জাতি থেকেই অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই প্রার্থী করে থাকেন। তবে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে কয়েকজন সংরক্ষিত নির্বাচিত সাংসদের থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে, শাসক দল অনেক সময় নিজেদের রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে সংখ্যাধিক্য জাতির থেকে নির্বাচনী প্রতিনিধির নমিনেশন না দিয়ে অন্য কোন সংরক্ষিত জাতি থেকে নির্বাচনী প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নমিনেশন দিয়ে থাকেন। ফলে মাঝেমধ্যেই শাসক দলের টিকিট পাওয়া নিয়ে সংরক্ষিত জাতি গুলোর মধ্যে রাজনৈতিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতিগত বিভাজনও জনসম্মুখে চলে আসে।

ভারতীয় সংবিধানের ধারা অনুসারে রাজ্যসভার সাংসদগণ জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের সরাসরি ভূমিকা নেই। ফলে সরকারি বিভিন্ন দলিল ও নথি থেকে আমরা দেখতে পাই যে রাজ্যসভার সাংসদের নির্বাচন করেন রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশলে, এই ক্ষেত্রে জাতিগত সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয় না। ফলে রাজ্যসভায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সাংসদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। কাজেই নিম্নে আমরা নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সাংসদের লোকসভায় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৪.১: ১৯৭১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। বিভা ঘোষ	নবদ্বীপ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। শক্তি কুমার সরকার	জয়নগর (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। মধুরজ্যা হালদার	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1971 to the Sixth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1973, পৃঃ ১৯৩। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), W.B. Government Printing Press, Alipur, 1999, NLC. থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।[১]

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পদবী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কাজেই উপরিউক্ত তিন জন সাংসদের পদবী ক্ষেত্রে জাতি দু'টির বেশির মানুষের পদবী থেকে বিভা ঘোষ, তার পদবী একটু উচ্চজাতির পদবী গ্রহণ করেছেন। এনাদের মধ্যে বিভা ঘোষ নিজ জাতির পদবী থেকে বেড়িয়ে এসেছেন এবং তিনি দলিতদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতাও করেন নি। কাজেই তাঁর কাছ থেকে নমঃশূদ্র জাতি তথা অন্যান্য দলিত জাতি বিশেষ কোন জাতিগত উন্নতির জন্য লোকসভায় বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। বিভা ঘোষ লোকসভায় যে কয়েকটা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল সি.পি.আই. (এম) দলের তখনকার গতানুগতিক শ্রেণীগত স্বার্থের বিষয় নিয়ে কথা বলেন। বিভা ঘোষ দলের অনুশাসনের বাইরে বেড়িয়ে নমঃশূদ্রদের জন্য আলাদা কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিয়ে কোন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন নি। মধুজ্যা হালদারও সি.পি.আই (এম) দলের সদস্য

হওয়ার দরুন তাঁর পক্ষেও নিজ জাতির ও দলিত জাতির বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিয়ে লোকসভায় কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি। আবার কেন্দ্রীয় শাসক দলের সাংসদ থাকার কারণেও কংগ্রেসের দলের নীতির বাইরে বেড়িয়ে নিজজাতির বিশেষ উন্নয়ন তথা অন্যান্য দলিত জাতির হয়ে কোন বিতর্কে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেননি।[২] দেখা যায় যে, এই সময় পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্রদের থেকে কোন সাংসদই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন না। কাজেই তাদের পক্ষে জাতিগত উন্নয়নের বিশেষ কোন ভূমিকাও আমরা লক্ষ্য করতে পারি না। জাতীয় জরুরী অবস্থা জারী হওয়ার দরুন জাতিগত রাজনৈতিক তেমন ভাবে প্রাধান্য না পাওয়ার কারণেই এই সময়ে পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র জাতির সাসংদগণ জাতীয় রাজনীতি নিয়েই বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন।

সারণি ৪.২: ১৯৭৭ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। বিভা ঘোষ গোস্বামী	নবদ্বীপ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। শক্তি কুমার সরকার	জয়নগর (সংরক্ষিত)	ভারতীয় লোক দল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। মুকুন্দ কুমার মণ্ডল	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1977 to the Sixth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1978, পৃঃ ১৯৩। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), W.B. Government Printing Press, Alipur, 1999, NLC. থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর,।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে অকংগ্রেসি সরকার গঠন হওয়ার দরুন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সাংসদরা লোকসভায় বিতর্কে বেশ স্বাধীন ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই সময় জনতা দলের প্রধানমন্ত্রী মোরাজি দেসাই বাধ্যতামূলক ভাবে ১৯৭৯ সালে বিন্দেরশ্বরী মণ্ডলের নেতৃত্বে আর্থসামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলিকে চিহ্নিত করার নিমিত্তে মণ্ডল কমিশন গঠন করে দেন। যদিও সংবিধানে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য আলাদা কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুপারিশ রাখা ছিল না, তবে তাদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে, তাদের জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করার পথ খুলে দেয়।[৩] সেই সাংবিধানিক নির্দেশ মোতাবেক প্রথমে পঞ্চাশের দশকে কাকা কালেলকার কমিশন ও পরে ১৯৭৯ সালে মণ্ডল কমিশন (যেটি ১৯৮০-তে তার বিপোর্ট জমা দেয়) গঠিত হয়। ৮০-এর দশক থেকে ভারতে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিরগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান দেখা যায়। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট সেই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির মধ্যে দলিত জাতির ন্যায় জাতি চেতনা ও জাতিগত সংহতি বেড়ে যায়। আর সেই সঙ্গে নির্বাচনী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তাদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির আনুগত্য পাওয়ার লক্ষ্যে মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতার পাশাপাশি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিরা আঞ্চলিক দলগুলির মাধ্যমে তাদের অবস্থান পোক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়।[৪] আর এই সময় থেকেই দলিতদের বেশকিছু নেতা-নেত্রী অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কাশীরাম। কাশীরামের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হয়ে ছিল অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি ও দলিত জাতির যৌথ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতা দখল করা। এই সময় দলিত নেতা কাশীরাম সারা ভারতের দলিত নেতা-নেত্রী তথা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পিছিয়ে পড়া জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের নিমিত্তে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো থেকে বেড়িয়ে আসার আহ্বান করেন। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখতে পাই অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি ও দলিত জাতির অনেক নির্বাচিত সাংসদরা কাশীরামের রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের পথে সামিল হননি। পশ্চিমবঙ্গের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির তিন জন সাংসদের কেউ প্রকাশ্যে কাশীরামের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে লোকসভার বিতর্কে কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি।[৫] এমন কি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির স্বার্থেও উক্ত সাংসদরা তেমন কোন ভূমিকা

রাখতে পারেনি, যদিও এই সময় কেন্দ্র অকংগ্রেসি জোট সরকার ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও।

সারণি ৪.৩: ১৯৮০ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। বিভা ঘোষ গোস্বামী	নবদ্বীপ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। সনৎ কুমার মণ্ডল	জয়নগর (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। মুকুন্দ কুমার মণ্ডল	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections. 1980 to the Ssventh Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1981, পৃঃ ২৩৬। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), W.B. Government Printing Press, Alipur, 1999, NLC. থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কেন্দ্রে এই সময় আবার কংগ্রসের সরকার গঠিত হয়। কাজেই কেন্দ্রের নতুন সরকারের ঘোষিত নীতির কার্যকর করার লক্ষ্যে যে সকল বিতর্ক লোকসভায় আলোচিত হয়, সেই সকল বিতর্কগুলোতে উপরি উক্ত তিন জন সাংসদ'র মধ্যে কমবেশি অংশগ্রহণ করেন এবং খানিকটা ভূমিকা রাখতে পারেন। যেমন বিদেশি পুঁজির আহ্বান এবং সবুজ বিপ্লবকে কার্যকর করার নীতি নির্ধারনের বিতর্কে এদের ভূমিকা থাকলেও দলিত জাতি তথা নিজ নিজ জাতির উন্নয়নের স্বার্থের ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা লোকসভায় রাখতে পারেননি।[৬] ভারতীয় সংসদে সার্বিক জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সকল পরিকল্পনা ১৯৬০ এর দশকে লোকসভায় বিতর্কের মাধ্যমে নেওয়া হয়, বিশেষ করে

দারিদ্র্য দূরীকরণের নানান কর্মসূচির মাধ্যমে যথা - 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, কিছু পরিমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত এবং রেশন ব্যবস্থা সত্তরের দশকের পর থেকে গরিব রাজ্যগুলো বিশেষ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত তিন জন বামপন্থী সাংসদরা লোকসভার বিতর্কে কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারেন।[৭] কারণ হল বামপন্থীদের ঘোষিত নীতি ছিল দরিদ্র শ্রেণীর হয়ে সওয়াল করা, এঁরা জাতিগত বিভেদ মোচনের থেকে শ্রেণীগত বিভেদ মোচনে অধিক গুরুত্ব দেয়। আর এই গুরুত্ব দেওয়ার ফলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সাংসদরা লোকসভায় জাতিগত সুযোগ সুবিধা উত্থাপনের ক্ষেত্রে নিরুপায় ছিলেন।

আবার আঞ্চলিক অসাম্য কমানোর নীতিকে জাতীয় কংগ্রেসের সরকারের সাংসদগণ প্রাধান্য না দিলেও বামপন্থী সাংসদগণ প্রাধান্য দেওয়ায় বিশেষ করে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুগণ খানিক সুবিধা পায়। যা বিভা ঘোষ গোস্বামীর লোকসভা বিতর্কের কয়েকটা অংগ্রহণের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি।[৮] কাজেই যখন থেকে সেচপ্রকল্পে বিনিয়োগ এবং কৃষি-বিকাশের জন্য ভর্তুকি ও ষাটের দশকের পর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি বেশ সারাফেলে ছিল দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে, যার ফলে পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র জাতির কৃষকরাও উপকৃত হয় বলে বামপন্থী সাংসদরা নিজেদের আন্দোলনের ভূমিকা বলে জনগণের সামনে ভোটের রাজনীতিতে প্রচার করেন। কিন্তু তারা লোকসভায় কি আদেও সওয়াল করতে সফল হয়েছিলেন কিনা, সে প্রশ্ন আমাদের নিকট থেকেই যায়। এই সময়ে শুরু হওয়া 'সবুজ বিপ্লব' ও গ্রামীণ পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত নতুনত্বের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত হয় পাঞ্জাব, হরিয়ানা আর উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে, অর্থাৎ সেইসব জায়গায় যেখানে সেচের জল ইতিমধ্যেই সহজলভ্য ছিল কিংবা অনায়াসেই সহজলভ্য করে তুলা যেতে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক চাষিদের বসবাসরত অঞ্চলে উক্ত সুবিধাগুলো কৃষকেরা পায় নি। ফলে কৃষিকাজেও আঞ্চলিক প্রভাব বেড়ে যায়। তবে 'সবুজ বিপ্লবের' প্রযুক্তি সত্তরের দশকে অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল এবং রাজস্থানের কিছু কিছু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আশির দশকে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং অসমেও প্রসারিত হয়।[৯] কাজেই আঞ্চলিক অসাম্য কিছুটা কমে যায়। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সাংসদরা এই সময় নিজ জাতির আলাদা করে কোন প্রশ্ন লোকসভায় উত্থাপন না করতে পারলেও অন্যান্য বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলোর সাঙ্গে তাদের রাজনৈতিক দলের আতাতের ফলে বৃহত্তর সরকার বিরোধী বিতর্কে সওয়াল করতে পেরেছিল।

সারণি ৪.৪: ১৯৮৪ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। বিভা ঘোষ গোস্বামী	নবদ্বীপ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। সনৎ কুমার মণ্ডল	জয়নগর (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। মনোরঞ্জন হালদার	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1984 to the Eight Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1985, পৃঃ ২৩৬। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), W.B. Government Printing Press, Alipur, 1999, NLC. থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৮৫ সালের ৩১ শে অক্টোবর রাত্রিতে ইন্দিরা গান্ধির বড় ছেলে রাজীব গান্ধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে লোকসভায় বেশ কিছু নতুন আইন পাশের লক্ষ্যে বিতর্ক সভার আয়োজন হয়। যেমন ১৯৮৫ সালে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে দলত্যাগ বিরোধী আইন পাশ হয়। যৌতুক ঘটিত অপরাধের জন্য শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে একটি আইন পাশ হয় ১৯৮৬ সালে। পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারটির ক্ষেত্রে মায়ের মতন রাজীব গান্ধি খুব প্রিয় ছিল। কাজেই তিনি গঙ্গা নদী পরিস্কার রাখার নিমিত্তে বেশ বড় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এবং তিনি নারীদের জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার খসরা প্রস্তুত করার জন্য ১৯৮৮ সালে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত দপ্তরকে নির্দেশ দেন। এর কারণ ছিল পঞ্চায়েতের যাবতীয় সংস্থার নির্বাচিত আসনের শতকরা ৩০ ভাগ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা। পরে প্রস্তাবটি পঞ্চায়েত রাজ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে আরও সুপারিশ করা হয় যে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের

শতকরা ৫০ ভাগ হবেন মহিলা।[১০] উক্ত আইনগুলো নিয়ে লোকসভায় যে সকল বিতর্কের অধিবেশন হয়েছে, সেগুলির বেশির ভাগ ভারতের প্রান্তিক মানুষের ও মহিলাদের স্বপক্ষেই ছিল। কাজেই বিরোধী সাংসদেরা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেননি। ফলে পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্রদের লোকসভার সাংসদের ভূমিকা ছিল না বলেই চলে।[১১] আবার দেখা গেছে ১৯৮৭ সালের ১৬ শে এপ্রিল ভি. পি. সিংহের পদত্যাগের কয়েক দিন পরে লোকসভায় বোফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে বিরোধীরা শোরগোল শুরু করেন। বোফর্স নিয়ে প্রথমে অভিযোগগুলো শোনা গিয়েছিল সুইডিশ রেডিওতে। ঐ সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ভারতীয় মুদ্রার ৬০ কোটি টাকার সমান অর্থ ঘুষ হিসাবে নিয়েছিল ভারতীয় কর্মকর্তারা ও কিছু সংখ্যক কংগ্রেস দলের সদস্যরা। সুইডেনের যে বোফর্স কোম্পানি ৪১০ টি হাউইটজার কামানের অর্ডার পাওয়ার উদ্দেশ্যে। উক্ত কামানের আরেকজন কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল একটি ফরাসি কামান কোম্পানি। পরবর্তীকালে অভিযোগগুলো ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে বেশভাবে প্রচারিত হতে থাকে। বিরোধীরা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে উক্ত কামান কেনার নিয়মকে আর্থিক কেলেঙ্কারি বলে বিরাট আকারে প্রচার করতে শুরু করেন। লোকসভা অধিবেশনে বিরোধীদের বড় একটা অভিযোগ করলেন, রাজীব ও তাঁর পরিবার উক্ত ঘুষের টাকা নিয়েছেন। এই অবস্থা এতটাই অচল হয়ে দাঁড়ায়, কাজেই রাজীব গান্ধি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিতে বাধ্য হলেন, যে তিনি এবং তাঁর পরিবার উক্ত ঘুষ কাণ্ডে জড়িত নন।[১২] প্রকাশ্যে রাজীব গান্ধি বিবৃতি দেওয়ার ফলেই রাষ্ট্রপতি গিয়ানি জৈল সিংহের রাজীবের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়। ভারতের সাংবিধানিক নিয়মানুসারে প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নিয়মিত দেখা করে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত করা, কিন্তু রাজীব গান্ধি কাজটি ঠিকমতো করতেন না। কাজেই পাঞ্জাব আর মিজোরামের চুক্তির ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শ করেননি। ফলে রাষ্ট্রপতি জৈল সিংহ রাজীবের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিলেন। এর উপরে আবার সামনে ছিল দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভবনা। সব মিলিয়ে ১৯৮৭ সালে মাঝামাঝি সময়ে জৈল সিংহ রাজীবকে বরখাস্ত করার এক বড় চক্রান্তের সামনে চলে আসেন। এই সময় বিরোধী নেতারা, এবং বেশ কিছু বিক্ষুব্দ্ধ কংগ্রেসি রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিলেন তিনি যেন রাজীবকে দুর্নীতির দায়ে, অথবা রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করবার সাংবিধানিক শর্ত পূরণ না করায় ব্যর্থতার কারণে বরখাস্ত করা হোক। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, জৈল সিংহ প্রায় রাজী হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভি পি সিংহ যিনি ছিলেন রাজীবের বিকল্প, তিনি এই রাজনৈতিক খেলায় নামতে রাজী হলেন না। কাজেই এই সময় সাংবিধানিক বিপর্যয়ের হাত থেকে

কংগ্রেসের সরকার রেহাই পেয়েছিল।[১৩] উক্ত রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে লোকসভায় যে কয়েকটা অধিবেশন হয়েছিল, সেগুলিতে উপরি উক্ত দুই জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও একজন নমঃশূদ্র সাংসদ থাকা সত্ত্বেও নিজ নিজ জাতির তথা দলিত জাতির হয়ে কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি।

সারণি ৪.৫: ১৯৮৯ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। অসীম বালা	নবদ্বীপ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। সনৎ কুমার মণ্ডল	জয়নগর (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1989 to the Ninth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1990, পৃঃ ২৮৩-৮৪। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৮৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার কারণে জাতীয় ফ্রন্ট সরকার (১৯৮৯-৯০) গঠন করে। কাজেই রাজীব গান্ধি স্পষ্ট করে দিলেন, এই মর্মে যে কংগ্রেস সরকার গড়তে আগ্রহী নয়। বি.জে.পি. আর বামপন্থী দলগুলো তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে যে তারা জাতীয় ফ্রন্ট সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন জোগাবে। এই পর্যন্ত স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের দ্বিতীয় অ-কংগ্রেস সরকারের কর্মভার গ্রহণের ক্ষেত্র ভূমি তৈরি হয়। কাজেই উক্ত জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের সূচনাপর্বটি বেশ মসৃণ হল না। এর কারণ হল চন্দ্রশেখর আর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ দু'জনেই প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবিদার মনে করে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুমন্তব্য লিপ্ত হয়ে পড়েন। আবার অন্যদিকে দেবী লাল দাবি করেন, তাঁকে যেন কমপক্ষে উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদটা দিতেই হবে। কারণ হিসাবে

উল্লেখ্য, নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের পরস্পরবিরোধীতা, উচ্চাশা, অতিকায় অহংকার, মতাদর্শগত অমিল, ইত্যাদি বিষয়ে জনসম্মুখে প্রকাশ্যে উঠে এলো। কাজেই একটা ডামাডোল রাজনৈতিক সরকার গঠিত হল, ২ রা ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে ভি.পি. সিংহের শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে। ফলত পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের যে-অভাব কিছু দিনের মধ্যেই তা সংঘাতে পরিণত হয়ে পড়ে।[14] কাজেই দেখা গেছে যে, বাইরে থেকে বামপন্থী দল জাতীয় ফ্রন্টকে সমর্থন করার কারণে প্রকাশ্যে লোকসভায় তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিতর্কে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সাংসদরা উক্ত ডামাডোলের মধ্যে লোকসভায় ভূমিকা রাখতে পারেননি, বললেই চলে।

তবে এই সময় লোকসভার বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ জটিলতায় পরিণত হয়। জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে সৃষ্ট মতপার্থক্য দেবী লালের নেতৃত্বে দিল্লিতে যখন বৃহৎ আকারে কৃষক সমাবেশের ডাক দিয়ে ভি. পি. সিংহকে তাঁর শক্তি কতটা সেটাই দেখানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত সমাবেশের শক্তি দেখে ভি. পি. সিংহ জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার নিমিত্তে তিনি তাঁর শাসনকালের সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি নিয়ে ছিলেন। ৭ অগাস্ট তিনি সংসদে ঘোষণা করলেন, এই মর্মে যে জনতা সরকার (১৯৭৭-৭৯) নিয়োজিত মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদনটি, যাকে ইন্দিরা গান্ধি ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কাজেই এবার তা কার্যকর হবে। উক্ত মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিলে, সরকারি চাকরির ও সরকারি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান গুলোতে চাকরিতে শতকরা ২৭ শতাংশ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য সংরক্ষিত রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল। এই সংরক্ষণ কার্যকর হওয়ার ফলে সরকারি চাকরিতে মোট ৪৯.৫ শতাংশ সংরক্ষিত হয়ে দাঁড়াল, কেননা আগে থেকেই তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতির জন্য ২২.৫ শতাংশ চাকরিতে সংরক্ষিত ছিল। প্রতিবেদনে আরও সুপারিশ করা হল যে, দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও উপরি উক্ত সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করতে হবে।[15] এই ক্ষেত্রে যে সকল মানুষ যারা নীতিগত দিক থেকে উক্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত, তাঁরাও এমন আকস্মিক ও নিয়মহারা পদ্ধতিতে এটিকে কার্যকর হতে দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিংহের ঘোষণার এই ধরনটা উত্তরোত্তর বেশ বিতর্কে পরিণত হয়ে পড়ে। উক্ত সংরক্ষণের ঘোষণার আগে তিনি এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠদের সঙ্গেও আলোচনা করেননি বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। আবার অন্যদিকে বামপন্থী দলগুলো আর বি.জে.পি প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিংহের আন-পার্লামেন্টরীয় মনোভাবের জন্য

বিমর্ষ পড়ল যে, এই সম্পর্কে ঘোষণা করা আগে তারা টেরও পেলেন না। প্রাক্তন বামপন্থী সাংসদ অসীম বালার মতে, আমরা তো জাতি-ভিত্তিক উক্ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত দেওয়ার কোন সুযোগই পায় নি। কারণ হল, আমাদের দলের সিদ্ধান্তের বাইরে বেড়িয়ে এসে কোন মতামত আমরা দিতে পারি না। তবুও আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি যে, উক্ত সংরক্ষণ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য প্রয়োজন কতটা ছিল, তা আজও বুঝতে পারলাম না। অসীম বালা যেহেতু নিজে একজন সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তিনি জাতিতে নমঃশূদ্র ও বামপন্থী দলের সাংসদ থাকার দরুন তাঁর উক্ত মতামতটা দেওয়াই স্বাভাবিক। তবে দেখা গেছে যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা নমঃশূদ্র জাতির সাংসদরা যে যে দলের টিকিটে জয়ী হন তারা লোকসভার বিতর্কে দলের নির্দেশ মতন কাজ করে থাকেন, কাজেই কখনও নিজেদের জাতির হয়ে তেমন কোন কাজ করতে পারেননি।

স্বাভাবিক ভাবেই বলা যেতে পারে যে মণ্ডল কমিশনের ঘোষণা সবচেয়ে খারাপ দিক হল, জাতি-ভিত্তিক ভারতীয় সমাজে আরও বেশি সামাজিক বিভেদ তৈরি হয়। কাজেই সংবিধানকে সামনে রেখে সামাজিক ন্যায়স্থাপনের নামে তা জাতের বিরুদ্ধে জাতকে লেলিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করার কাজে নেমে পড়েন কিছুসংখ্যা জাতি-ভিত্তিক নেতৃত্বগণ। এর ফলে পার্লামেন্টীয় রাজনীতির বাইরেও জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির চিত্রটা ব্যাপকহারে প্রকাশ্যে চলে আসে। যেহেতু আগে থেকে তপসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণ ছিল, তাই উক্ত সংরক্ষণ দেওয়ার কারণেও দলিত জাতির উপরে ভয়ংকর সামাজিক আঘাত নেমে আসে। কাজেই অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির মানুষেরা কিন্তু মণ্ডল কমিশন ঘোষণা হওয়ার কারণে দলিতদের সামাজিক আঘাত পায়নি। আবার আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামাজিক ন্যায়ের বিচারে সামাজিক উন্নয়নের সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোর মান পড়ে যাওয়া একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। কারণ হল ৪৯.৫% সংরক্ষিত থাকলে কি করে মানবোন্নয়ের দিকে এগিয়ে যাবে, তা নিয়ে প্রশ্নও থেকেই যায়। এই মণ্ডল কমিশনের ঘোষণা নিয়ে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনা তৈরি হয়, তা ১ অক্টোবর ১৯৯০ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মণ্ডল প্রতিবেদন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তখনকার মত স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু উক্ত স্থগিতাদেশ নিয়ে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির নেতৃত্বগণ জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তোলেন। কাজেই এই সময় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সাংসদরা লোকসভায় ভূমিকার কোন ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশিত হয়নি।

সারণি ৪.৬: ১৯৯১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। অসীম বালা	নবদ্বীপ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। সনৎ কুমার মণ্ডল	জয়নগর (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections.1991 to the Tenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1992, পৃঃ ৩০৫-৬। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), W.B. Government Printing Press, Alipur, 1999, NLC. থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৯১ সালের ১৯ শে মে থেকে লোকসভা নির্বাচন শুরু হবে বলে, ভারতের নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করলেন। কাজেই জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচারে নেমে পড়লেন, বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেসের প্রচারের প্রধানমুখ হয়ে ওঠেন রাজীব গান্ধি। এই সময় রাজীব গান্ধির জনপ্রিয়তা জনমানষে বেশ প্রতিফলিত হতে থাকেন। ফলে মনে করা হয় যে, এই নির্বাচনে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন রাজীব গান্ধি। এইরূপ একটা নির্বাচনী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যখন তৈরি হয় ঠিক তখনই এক প্রস্থ নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেই ইন্দিরা গান্ধির পরিবারের ওপর আবারও নেমে এলো চরম মৃত্যুর আঘাত। রাজীব গান্ধির নির্বাচনী প্রচারের সময় মানব বোমার আঘাতে তাঁর শরীর খণ্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। রাজীব গান্ধির হত্যার ঘটনায় ভারতের আপামোর জনগণের কাছ থেকে বিরাট সহানুভূতি পায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। কাজেই ২৩২ টি

আসন পেয়ে সংসদে বৃহত্তম একক রাজনৈতিক দলের মর্যাদা অর্জন করে কংগ্রেস। ১৯৯১ সালের ২১ শে জুন নরসিংহ রাও এর নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হলে, তা প্রথমে ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু সময়ের নিরিখে তা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[১৬] নরসিংহ রাও এর সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ করেছিল। এর সরকারের বড় ভূমিকা রাখতে পেরেছিল পরিবর্তনসূচক অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি হাতে নেয়ার। কাজেই এই সময় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র সাংসদের লোকসভার অধিবেষনের যেসকল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়ে, সেগুলতে এদের আলাদা কোন ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। রাও সরকারের সময় জাত-ভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক অশান্তি অনেকটা কমে যায়। পাঞ্জাব, আসাম ও কাশ্মীর সমস্যাগুলো সমাধান কল্পে লোকসভায় যে বিতর্কগুলো আয়োজন করা হয়, সেক্ষেত্রে মতামত জ্ঞাপন করতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সাংসদরা ভূমিকা রাখে।[১৭] রাও সরকারের নতুন নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হয়, ভারতের বিদেশনীতি পালনের ক্ষেত্রে ৯০এর দশক বেশ জটিল হয়ে দাঁড়ায়। কেননা ৯০ এর দশকের শুরুতেই সৌভিয়েত ইউনিয়নের পতন, ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান এবং উদারীকরণের অর্থনৈতিক কৌশলের ও বিশ্বায়নের ব্যাপক আধিপত্যের কারণে ভারতের বিদেশনীতির এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাড়িয়েছিল। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান ও অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের প্রভাব ১৯৯১ সালে একই সঙ্গে পরে। ফলে উক্ত প্রভাবের পরিণতি বেশ একটা আলাদা হয়নি ভারতের ক্ষেত্রে। আমেরিকা সহ পাশ্চাত্য দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটাকে নতুন করে সাজিয়ে নিতে হয়, অনেকটা বাধ্য হয়েই। এই সময় ভারতের প্রয়োজন হয় বৈদেশিক পুঁজির, তথ্য প্রযুক্তির ও রপ্তানির জন্য চায় মুক্ত বাজার। এক্ষেত্রে অধিক উল্লেখ্যের বিষয় হল ভারতের বিপদের দিনের সবচেয়ে বড় ত্রাতা সৌভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ঘটনা। কাজেই বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক জগতে ভারত কত তাড়াতাড়ি ভালোভাবে উক্ত নতুন কৌশলকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত নিজের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে, তারই ওপর ভারতের ৯০ এর দশকের অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক সাফল্য – ব্যর্থতা নির্ভর হয়ে পড়েছিল।[১৮] কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে আজকের দুনিয়াতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপরে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক প্রভাব সেই সকল দেশের থাকে যাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর শক্তি সর্বাধিক বেশি থাকে তাদের। 'যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আজকের পৃথিবীতে এককভাবে সবচেয়ে লক্ষণীয় প্রবণতা কোনটি, তাহলে বলতে হবে, রাজনৈতিক সংগ্রামের পিছনে ফেলে অর্থনৈতিক সংগ্রামই প্রধান হয়ে উঠেছে'।[১৯] কাজেই বলা যেতে পারে যে, এই সময় ভারতের লোকসভায়

যে সকল বিতর্কগুলোর আয়োজন করা হয়েছিল, অধিকাংশ ছিল অর্থনৈতিক বিষয়ের উপরেই, এক্ষেত্রে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সাংসদদের লোকসভায় হ্যাঁ সূচক বাক্য প্রয়োগ করেই নিজেদের উপস্থিতির মধ্যে দিয়েই ভূমিকা টুকুই রাখতে পেরেছেন।

সারণি ৪.৭: ১৯৯৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। অসীম বালা	নবদ্বীপ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। সনৎ কুমার মণ্ডল	জয়নগর (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections. 1996 to the Eleventh Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1996, পৃঃ ৪৭৫-৭৬। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), W.B. Government Printing Press, Alipur, 1999, NLC. থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৯৬ সালে এখানে যে, লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে কংগ্রেস মাত্র ১৪০ টি আসন পায়, আর অন্যদিকে ভারতীয় জনতা দল পায় ১৬১ টি আসন, যা কিনা ১৯৯১ সালে ছিল ১২০ টি। এই সময় লোকসভায় কোন রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি। কাজেই প্রথমে বি.জে.পিকে সরকার গড়ার সুযোগ দেওয়া হয় কিন্তু বি.জে.পি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পাড়ায় অটল বিহারীর নেতৃত্বাধীন সরকার ভেঙ্গে যায়। ফলে সরকারের দায়িত্ব নেন এইচ. ডি. দেবগৌড়া তাঁর সমর্থিত সরকারের নাম হয় যুক্তফ্রন্ট

সরকার। দেবগৌড়া কে প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও সি.পি.আই.এম সমর্থন করেন, কিছু দিন পরে অবশ্য সি.পি.আইও সরকারে যোগ দিলে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে যুক্তফ্রন্ট সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ দেয়। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত হলেন ভারতের প্রথম বামপন্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আবার দেখা যায় ১৯৯৭ সালের ৩০ শে মার্চ কংগ্রেস দল যুক্তফ্রন্ট সরকারের থেকে সমর্থন তুলে নিলে দেবগৌড়া লোকসভায় আস্থাভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পাড়ায়, আবার একটা যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় যে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন ইন্দ্র কুমার গুজরাল। আই. কে. গুজরালের সরকারের থেকে কিছু দিনের মধ্যে সমর্থন তুলে নেওয়া হলে সরকার আবার পরে যায়।[২০] কাজেই আমরা দেখতে পেলাম দুই বছরে মধ্যে তিনবার সরকার ভাঙ্গাগড়ার কাজেই লোকসভার রাজনৈতিক দলগুলো ও তাঁদের সাংসদগণ মত্তছিলেন। ফলে কোন রাজনৈতিক দলই লোকসভায় গঠনমূলক কাজে সময় দিতে পারেননি। তারা কেবলমাত্র লোকসভায় আস্থাভোট নিয়েই নিজেদের ভূমিকা পলন করেছিলেন। উক্ত দুই বছরের তিনজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে লোকসভায় যতগুলো বিতর্কসভার বসেছিল, তা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির সাংসদগণ নিজের দলের পক্ষনিয়ে শুধুমাত্র আস্থাভোট দিয়েই লোকসভায় নিজেদের ভূমিকাটাই রাখতে পেয়েছিল।[২১] তবে এই সময় কোনই যে গঠনমূলক কাজ সরকারগুলো রাখতে পারেনি, সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারব না। কারণ হল অটল বিহারীর সময় অর্থনৈতিক উদারীকরণ নরসিংহ রাও আমলের থেকে অধিক পরিমানে বিদেশি পুঁজিকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। আবার ইন্দ্র কুমার গুজরালের সময় ভারতের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে যে নীতি নেওয়া হয়েছিল, তা গুজরাল ডোক্ট্রিন নামে পরিচিতি পায়। কাজেই বলা যেতে পারে লোকসভায় ভূমিকা রাখতে হলে স্বাধীনমন্ত্রী বা বিরোধী দলনেতা না হলে রাখা বেশ কঠিন হয়ে যায়। আমাদের আলোচনার সময়সীমার মধ্যে নমঃশূদ্র বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কোন সাংসদই লোকসভার স্বাধীনমন্ত্রী বা বিরোধী দলনেতা হতে পারেন নি, কাজেই তারা এমন কোন ভূমিকাও রাখতে পারেন নি।

সারণি ৪.৮: ১৯৯৮ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। অসীম বালা	নবদ্বীপ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। সনৎ কুমার মণ্ডল	জয়নগর (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections. 1998 to the 12th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1998, পৃঃ ২৬০। Jawhar Sirser, (ed) Parliamentary Elections in West Bengal (1952-1999), W.B. Government Printing Press, Alipur, 1999, NLC. থেকে প্রার্থীদের জাতিভিত্তিক পরিচয় নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

আবার দেখা যায় ১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনের অটল বিহারী বাজপেয়ীকে প্রধানমন্ত্রী করে বি.জে.পি আবার ক্ষমতায় আসে। এই নির্বাচনে বি.জে.পি ১৮২ টি পেয়ে টি. ডি. পি, এ. আই. এ. ডি. এম. কে এবং নবগঠিত তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্যান্য সেকিউলার দলের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয় অল্প কিছু দিনের জন্য। এই সরকারের জোট সঙ্গীর সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে লোকসভার স্থিতিশীলতার বেশ অভাব দেখা দেয়। কাজেই বি.জে.পির জোট নিজনিজ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং নিজ দলের সাংসদদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদের লোভ থাকার কারণে জোট সঙ্গীদের মধ্যে মতপার্থক্য ব্যাপক আকারে প্রকাশ্যে চলে আসে। ফলে ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে জোট সরকার আস্থাভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হয়, কাজেই সরকারের পতন হয়। আবার অন্যদিকে কংগ্রেস ১৪৭ টি আসন নিয়ে সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়।[২২] উক্ত সরকারের আস্থাভোটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল জয়ললিতার এ. আই. এ. ডি. এম. কে তার সমর্থন তুলে নেওয়ার জন্য। কাজেই কংগ্রেস ও বি.জে.পি কোন রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ না থাকার কারণে বি. জে.পিকে ১৯৯৯ সালের সেপ্টম্বর – অক্টোবর মাস পর্যন্ত নির্বাচন শেষ না হওয়ার সময় টুকু তদারকি সরকার হিসাবে সাংবিধানিক আইনানুসারে কাজ চালিয়েছিল।[২৩] ক্ষণিকের সরকারের আমলে লোকসভার অধিবেশনের বেশিরভাগ সময় মুলতুবী হয়ে যেতে সাংসদের মধ্যে মতানৈক্যের অভাবে।

বামপন্থী যেহেতু সরকারের সঙ্গে জোট সঙ্গী হিবাসে ছিল না, তাই তারা সরকারের বিরোধিতায় থেকে নিজ দলের রাজনৈতিক এজেন্ডার মধ্যে থেকেই লোকসভায় বিরোধিতার ভূমিকা পালন করে। ঠিক এই ভাবেই বামপন্থীদলের সাংসদ নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এই লোকসভায় উক্ত ভূমিকা পালন করেন।

সারণি ৪.৯: ১৯৯৯ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। আনন্দ মোহন বিশ্বাস	নবদ্বীপ (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
২। সনৎ কুমার মণ্ডল	জয়নগর (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections. 1999 to the Thirteenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1999, পৃঃ ২৫৫-৫৬। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বি.জে.পি ও জোট সঙ্গীরা মোট **২৯৬** টি আসন পায়, যদিও বি.জে.পির নিজের আসন সংখ্যা বাড়ল না। সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস জোট তেমন ভালো রেজাল্ট করতে পারল না, তাদের জোট সঙ্গীর মোট আসন হয় **১৩৪** টি। ফলে আবার অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে সরকার তৈরি হয়, যার স্থায়ীত্ব হয়েছিল পাঁচ বছর। এই স্থায়ী হওয়ার পিছনে বি.জে.পির একটা কৌশল ছিল, যেটা **১৯৯৮** সালের মে মাসে পোখরানে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। **১৯৯৯** সালে ভারত – পাকিস্তানের মধ্যে ঘটে যাওয়া কারগিল যুদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটের দিকে লক্ষ্য দিয়েই অটল বিহারী বাজপেয়ীর শাসন কাল থেকেই ভারতের একটা পারমানবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বি.জে.পি সাংসদের লোকসভা

অধিবেশনে ও বিতর্কে সরকারকে পরমানু পরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন।[২৪] উপরি উক্ত বাজপেয়ীর সময়কালের মধ্যে লোকসভায় সব থেকে বিতর্কিত বিষয় হল পরমানু পরীক্ষা কে কেন্দ্র করে নানান সময় আয়োজিত অধিবেশন উত্তাল হয়ে ওঠে এবং অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। তবে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, তৃণমূল কংগ্রেস যেহেতু বাজপেয়ী সরকারের জোট সঙ্গী ছিল, কাজেই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ আনন্দ মোহন বিশ্বাস নিজের মতো করে লোকসভার বিতর্কে মতামত জ্ঞাপন করে ভূমিকা রাখতে পেড়েছিলেন। **১৯৯১** সালের পরে কোন নমঃশূদ্র সাংসদ প্রথম বার লোকসভার অধিবেশনে নিজ জাতির হয়ে সওয়াল করতে পেরেছিল। অন্যদিকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির দুই জন বামপন্থী সাংসদ লোকসভা বিতর্কে পার্টি লাইনের বাইরে বেড়িয়ে গিয়ে নিজ জাতির অভাব – অভিযোগের কথা বলতে পারেননি।[২৫] কাজেই আমরা দেখতে পেলাম যে, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ আনন্দ মোহন বিশ্বাস যে ভাবে নিজের জাতির হয়ে সওয়াল করতে পেরেছিল লোকসভায় সে ভাবে কিন্তু বামপন্থী সাংসদ দ্বয় সনৎ কুমার নস্কর ও রাধিকারঞ্জন প্রামানিকদের পক্ষে নিজের জাতির উন্নয়ন কল্পে সওয়াল হতে পারেননি। এর কারণ হল বামপন্থী পার্টি লাইনের বাইরে বেড়িয়ে গিয়ে তাদের পার্টির মেম্বর কেউ যদি প্রকাশ্যে কোন মতামত ব্যক্ত করেন, তাহলে পার্টির গাইড লাইনানুসারে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়। ফলে তাদের পক্ষে লোকসভায় নিজস্ব মতামত দিয়ে ভূমিকা রাখা বেশ কঠিন।

সারণি ৪.১০: ২০০৪ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। অলোকেশ দাস	নবদ্বীপ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। সনৎ কুমার মণ্ডল	জয়নগর (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। বাসুদেব বর্মন	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections. 2004 to the 14th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2004, পৃঃ ৩৩৬-৩৮। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি

বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জোট সরকারকে হারিয়ে দিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করে কংগ্রেস ও তার জোট সঙ্গীরা, বামপন্থী দলগুলো বাইরে থেকে কংগ্রেসকে সমর্থন করে সরকার গঠন করার জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদগণ যাতে করে কংগ্রেসের পক্ষে থাকে। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে মনমোহন সিংহ কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করা হয় এবং কংগ্রেস লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখার জন্যে বামপন্থী সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লোকসভার অধ্যক্ষ করেন।[২৬] এটা ছিল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কৌশল, আবার বামেদের রাজনৈতিক কৌশল ছিল সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করে, সরকারের ভুল নীতির সমালোচনা করে জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের প্রচারে রাখা। কাজেই কংগ্রেসকে দৃঢ়ভাবে বামপন্থীরা কিন্তু সমর্থন দিতে প্রস্তুত ছিল না। এর প্রমাণ আমরা পাই যখন পারমাণবিক শক্তির বিষয় নিয়ে মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করার আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন বামপন্থী দলগুলো সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। মজার বিষয় হল, লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় কিন্তু তার পদ থেকে ইস্তফা দিলেন না, যা কিনা বামপন্থী পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে নীতি গ্রহণ করা বলে। ফলে সি.পি.আই.(এম) সোমনাথ বাবুকে দল থেকে বহিস্কার করেন। এই সময় বামপন্থী সানহসদ হয়েও সোমনাথ বাবু সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শের কথা বলে তিনি অধ্যক্ষ পদের পুরো পাঁচ বছরের সময় দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। সোমনাথ বাবুর যুক্তি ছিল আমার পদতা যেহেতু লোকসভার অধ্যক্ষ কাজেই আমি কোন রাজনৈতিক দলের একক সিদ্ধান্তের জন্য পদত্যাগ করতে রাজী নয়। বামেরা কংগ্রেস সরকারের থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ায় পরে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক কৌশল হয়ে দাঁড়ায় বামপন্থী ঘাটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামপন্থীদের উচ্ছেদ করা। কাজেই কংগ্রেস এই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করতে থেকে। ২০০৮ সালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বেশ ভালো ফল করে। অন্যদিকে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম নিয়ে বামপন্থী সরকার বেশ চাপের মধ্যে ছিল, তার পরে আবার কংগ্রেস তৃণমূল দলকে যে ভাবে সমর্থন করছে এতে করে বামেরা বেশ চাপে পরে যায়। আবার ২০০৯ সালের প্রথমদিকেই নমঃশূদ্র

জাতির মানুষ ও নবদ্বীপ কেন্দ্রের বামপন্থী সাংসদের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও তাকে শুধুমাত্র সি.পি.আই. এমের রাজ্য কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, দল থেকে বহিস্কার করার সাহস কিন্তু সি.পি.আই.এম দেখাতে পারেননি।[২৭] এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দল থেকে বহিস্কার করে সি.পি.আই.এম যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তা পুনরায় লোকসভা ভোটের আগে নবদ্বীপের সাংসদকে বহিস্কার করে নতুন করে আর কোন বিপদে পড়তে চায় না। এই সময় রাজ্যে সি.পি.আই.এম নেতা সুভাষ চক্রবর্তী মতুয়াদের প্রধান বীণাপাণি দেবীর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং রাজ্য সরকার মতুয়াদের জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর পুরস্কার ঘোষণা করে মতুয়াদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বীণাপাণি দেবীর বড় ছেলে কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরকে গুরুচাঁদ পুরস্কার দিয়ে ঠাকুর বাড়ীর সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হন। আর যেহেতু নবদ্বীপের সাংসদ নমঃশূদ্র তথা মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ, কাজেই সি.পি.আই.এম এই সাংসদের বিরুদ্ধে বড় কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি, তাঁদের জাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক সমর্থন হারানোর ভয়ে।

চতুর্দশ লোকসভায় নমঃশূদ্র জাতির অলকেশ দাস ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সনৎ কুমার নস্কর ও বাসুদেব বর্মন মহাশয় দ্বয়রা নিজ নিজ জাতির বা দলিত জাতির হয়ে লোকসভায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতেই পারেননি।[২৮] এই সকল বামপন্থী সাংসদের কাছে দলের নীতি রীতিই অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই ছিল প্রধান কাজ। উক্ত সাংসদগণ যখন তাঁদের দল সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করে তখন তারা নিজ নিজ দলের আদর্শ রক্ষা করে, লোকসভা অধিবেশনে ভাষণ ও বিতর্কে লিপ্ত হয়েই নিজের ভূমিকা লোকসভায় রেখেছেন।

সারণি ৪.১১: ২০০৯ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। সুচারু রঞ্জন হালদার	রাণাঘাট (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
২। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	বনগাঁ (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। ড. তরুণ মণ্ডল	জয়নগর (সংরক্ষিত)	নির্দল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। চৌধুরী মোহন জাটুয়া	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections. 2009 to the 15th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2009,

Constituency Wise Detailed Results। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

২০০৯ সালের লোকসভা ভোট পাঁচ দফায় অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা কেন্দ্রগুলোতে তৃণমূল কংগ্রেস, এস.উই.সি. আই ও কংগ্রেস জোট করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস আসন পায় ১৯ টি আর নির্দল প্রার্থী পায় ১ টি আসন। কংগ্রেস সরকার গঠন করেন, প্রধানমন্ত্রী হন মনমোহন সিংহ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী হন রেলমন্ত্রী।[২৯] মমতা ব্যানার্জী পূর্ণ্য রেলমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে তিনি মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ককে পাখির চোখ করে মতুয়া অধ্যুষিত লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রগুলোতে কেন্দ্র সরকারে রেলমন্ত্রকের সহায়তা নানা ধরণের উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনার শিলারন্যাস করেন। কাজেই মতুয়াদের ভোটের বেশির ভাগ অংশ তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেন।

রাণাঘাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে সুচারু রঞ্জন হালদার জয়ী হয়েছিলেন, তিনি জাতিতে ছিলেন নমঃশূদ্র। আর বনগাঁ কেন্দ্র থেকে জয়ী প্রার্থী গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর জাতিতে ছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময় মমতা ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয় যে, বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বেশির ভাগ ভোটার মতুয়া হওয়া সত্ত্বেও কেন তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্রদের মধ্য থেকে প্রার্থী না করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষকে প্রার্থী করলেন। উত্তরে মমতা ঠাকুর বলেন, যে, তাঁর স্বামী অর্থাৎ কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী রাজী হননি। এই রাজী না হওয়ার কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করে ঠাকুর বাড়িকে রাজনৈতিক মুক্ত রাখার জন্যে কপিল বাবু বদ্ধপরিকর ছিলেন। এছাড়াও কপিল বাবু মতুয়াদের ধর্মের আদর্শের প্রতি ভক্তদের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করে বেড়াতেন, যা কিনা তাঁর শ্বশুর প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরও করার সময় পেতেন না। শ্বশুর মশায় উদ্বাস্তুদের পুনরবাসন ও রাজনীতিতে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, কাজেই তার পক্ষে মতুয়া আদর্শ প্রচার করা সম্ভব হয়নি।[৩০] এই প্রসঙ্গে গাইঘাটার

প্রাক্তন বামপন্থী ও চাঁদপাড়ার প্রবীণ মতুয়া গবেষকের কথায় কপিল বাবু যেহেতু বুদ্ধদেব বাবুর কাছ থেকে গুরুচাঁদ পুরুস্কার নিয়েছিলেন, তাই তিনি এই সময় তৃণমূলের হয়ে ভোটে দাঁড়াতে রাজী হননি।[৩১]

জয়নগর ও মথুরাপুর থেকে যথাক্রমে ড. তরুণ মণ্ডল, চৌধুরী মোহন জাটুয়া জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দুই ২৪ পরগনা ও নদীয়া থেকে ৩ জন পৌণ্ড্র ও ১ জন নমঃশূদ্র সাংসদ লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছিল। মমতা ব্যানার্জী যেহেতু মতুয়া ও পৌণ্ড্রদের প্রতি সহৃদয় থাকার কারণে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সাংসদগণ লোকসভার বিতর্কে স্বাধীন ভাবে অংশগ্রহণ করে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন।[৩২] বামপন্থীদের সাংসদের থেকে তৃণমূলের ও নির্দলের সাংসদগণ বেশ স্বাধীন ভাবে নিজের জাতের ও লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন কল্পে লোকসভায় ভূমিকা রাখতে পেরেছেন।

সারণি ৪.১২: ২০১৪ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থী	নির্বাচনীক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। তাপস মণ্ডল	রাণাঘাট (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
২। কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর	বনগাঁ (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
২। প্রতিমা মণ্ডল	জয়নগর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। চৌধুরী মোহন জাটুয়া	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections. 2014 to the 16th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2014, Detalls for Assemby Segments of Pariamentary Constituencies। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কচ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার কাছে কংগ্রেস জোট পর্যদস্ত হয়ে পরে। বি.জে.পি একাই ২৮২ টি আসন পেয়ে ও নিজেদের জোট সঙ্গী নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। এবারের মন্ত্রীসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী থাকলেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা নমঃশূদ্র সাংসদের মধ্যে থেকে কেউই কেন্দ্রীয়মন্ত্রী হতে পারেন নি। এই হতে না পাড়ার কারণ হল, উক্ত জাতি দুটির সাংসদগণ সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৩৩] কাজেই বি.জে.পি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে এই নির্বাচনে জোট না হওয়ার কারণেই হয়তো এদের মধ্যে থেকে কেউই কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পায়নি। ২০০৯ সালের নির্বাচনে বীণাপাণি দেবীর বড় ছেলে কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে চাইলেও কিন্তু ২০১৪ সালের নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিপুল ভোটে জয়ী হন। তিনি লোকসভার শপথগ্রহনের সময় জয় হরিচাঁদ জয় গুরুচাঁদ ধ্বনি দিয়ে শপথ নিয়েছিলেন। যা কিনা ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে কোন নমঃশূদ্র সাংসদই উচ্চারণ করতে পারেন নি। কলিপ কৃষ্ণ ঠাকুর লোকসভায় উক্ত ধ্বনি দিয়েই তার ভূমিকা টুকু রাখতে পেড়েছিলেন।[৩৪] অন্যদিকে রাণাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তাপস মণ্ডল জাতিতে নমঃশূদ্র হলেও তিনি কিন্তু কপিল বাবুর ভূমিকার মতন তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি। তিনি সাংসদের অন্যান্য সাংসদগণের ন্যায় নিজের সাংসদ এলাকার উন্নতি সম্পর্কে লোকসভায় ভূমিকা রাখতে পেরেছেন । যদিও তাপস মণ্ডলের সাংসদ এলাকার অধিকাংশ ভোটার নমঃশূদ্র জাতির মানুষ, কাজেই তাপস বাবু যে সকল উন্নয়ন মূলক কাজের প্রস্তাব লোকসভা অধিবেশনে রাখতেন তা নমঃশূদ্রদের উন্নয়নের দিকেই যেত। কাজেই আমরা উল্লেখ করতে পারব না যে, তাপস মণ্ডল বিশেষ করে যে শুধুমাত্র তাঁর জাতির জন্যেই সচেষ্টা করেছিলেন তা কিন্তু নয়। তিনি একজন সাধারণ সাংসদ হয়েই কাজ করেছিলেন।[৩৫] আর সাংসদের এই কাজ করাটাই তো সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শ দায়িত্ব থাকাটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংসদের মূল ভূমিকা রাখাই উচিত। কিন্তু প্রাকৃতিক অর্থে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সকল সাংসদ যে জাতি বা যে গায়ের রং ও যে অর্থনৈতিক শ্রেণী থেকে উঠে এসে সাংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব করেন, তারা যদি আলাদা আলাদা ভাবে নিজের জাতির বা গায়ের রং এর ও শ্রেণীর হয়ে বিশেষ কোন ভূমিকা সংসদে না রাখতে পারেন, তাহলেই যে তারা ব্যার্থ হবে এমন কোন মন্তব্যটাও কিন্তু আমরা করতে পারি না। আবার আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির দুই জন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার সাংসদের ক্ষেত্রেও দেখতে পেলাম যে, তারাও কিন্তু শুধুমাত্র নিজের জাতির

জন্যেই কাজ না করতে পাড়ার জন্যে যে লোকসভায় ভূমিকা রাখতে ব্যার্থ হয়েছেন, সেটাও কিন্তু আমাদের বলা ঠিক হবে না। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দুই ২৪ পরগনা ও নদীয়া থেকে যে চারজন দলিত জাতির সাংসদ জয়ী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে দুই জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও দুইজন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ছিলেন।[৩৬] ১৯৭১ সালের পর থেকে ২০১৪ সালে এসে পশ্চিমবঙ্গের উক্ত তিন জেলা থেকে কেবলমাত্র সমকক্ষ জাতিগত সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিল। ১৩ অক্টোবর ২০১৪ সালে কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের মৃত্যু হওয়ায় বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৫ সালে উপনির্বাচনে ঠাকুর বাড়ি থেকে মমতা ঠাকুর তৃণমূলের টিকিটে আর সুব্রত ঠাকুর বি.জে.পির টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উক্ত উপনির্বাচনে কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের স্ত্রী মমতা ঠাকুর জয় পায়, সুব্রত ঠাকুর পরাজিত হয়। উক্ত নির্বাচনের টিকিট পাওয়াকে কেন্দ্র করে মতুয়া মহাসংঘ আড়াআড়ি ভাবে ভাগ হয়ে, দুটি রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করতে থাকে। মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া মহাসংঘ তৃণমূল কংগ্রেস ও মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া মহাসংঘ বি.জে.পি পন্থী হয়ে পড়ে। মমতা ঠাকুরের কথায় এই ভাগ হওয়ার কারণটা বেশ ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়েই হতে হয়েছিল। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বীণাপাণি দেবীর ছোট ছেলে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে মমতা ব্যনার্জীর সরকারের পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রীসভায় কাজ করার সুযোগ পান। স্বাধীনতার পরে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের পরে তাঁর ছোট ছেলে মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় ঠাকুর বাড়ি থেকে স্থান পায়। ঠাকুর বাড়ীর প্রতি মাননীয়া মমতা ব্যনার্জী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে মতুয়াদের বিষয়ে আগের থেকে আরও অধিক যত্নশীল হয়ে পড়েন। যা কিনা আগের ১৯৭১ সারের পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত যেসকল ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁদের থেকে অধিক ভাবে মমতা ব্যনার্জী মতুয়াদের প্রাধান্য দেয়। কাজেই মতুয়াদের থেকে ২০১৪ সালে যখন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া হবে বলে তৃণমূল কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নেয় তখন মতুয়াদের একাংশ কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রার্থী করার জন্য প্রস্তাব দেয়। অন্যদিকে মঞ্জুল বাবুর বড় ছেলে সুব্রত ঠাকুরকে প্রার্থী করার জন্য মঞ্জুল বাবু নিজেই দলের কাছে প্রস্তাব দেন, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রার্থী করেন।[৩৭] ফলে মঞ্জুল বাবু অল্পকিছু দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন ও পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। কাজেই মমতা ঠাকুর বনগাঁর সাংসদ থাকাকালীন নিজের মতো করে নিজের পক্ষের মতুয়া মহাসংঘকে সাজিয়ে তোলেন। মতুয়া মহাসংঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কাজে অখুশি হয়ে মমতা ঠাকুর তাঁকে সরিয়ে দিয়ে খগেন্দ্রনাথ বাড়ুই

কে সাধারণ সম্পাদক করেন। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য ছিল এইরকম - মমতা ঠাকুর একজন অক্ষর জ্ঞানে অশিক্ষিত মানুষকে আমার সঙ্গে যৌথ সাধারণ সম্পাদক করায় ও মতুয়া মহাসংঘকে তৃণমূলের দলদাসে পরিণত করার কারণেই তিনি সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করেন।[৩৮] আবার উক্ত প্রসঙ্গে ঠাকুরনগর নিবাসী বর্ষিয়ান মতুয়া ভক্ত বলেন "আমরা তো মা মমতা ঠাকুরকে দেবী জ্ঞানে মানি ফলে প্রাক্তন সম্পাদকের কিছু কাজে মমতা ঠাকুরকে বিপদে পড়তে হয়েছিল, কাজেই আমাদের মতামতের উপর নির্ভর করেই মমতা ঠাকুর সিদ্ধান্ত নেন সম্পাদকে সরানোর"।[৩৯] ফলে একদিকে ঠাকুর বাড়ীর পারিবারিক মতপার্থক্য অন্যদিকে মতুয়াদের মধ্যে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া ও নিজের স্বামী হারানোর যন্ত্রনা নিয়ে লোকসভায় যে ভূমিকা নমঃশূদ্র জাতির জন্য রেখেছেন, তা কিন্তু ১৯৭১ সালের পর থেকে কোন নমঃশূদ্র জাতির সাংসদগণ রাখতে পারেননি।[৪০] লোকসভার সাংসদ হিসাবে মমতা ঠাকুর নিজের কেন্দ্রের উন্নতি কল্পে যে সকল প্রস্তাব লোকসভার অধিবেশনে রাখেন, সেগুলো মোটামুটি তিনি সাংসদ তহবিলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে পেড়েছিলেন। আমরা যখন তার সাংসদ এলাকাতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম তখন দেখতে পেয়েছি, এই রাস্তা তৈরির ব্যয়িত অর্থ সাংসদ মমতা ঠাকুর অর্থানুকুলে হয়েছে, এই বিশ্রমাগার মমতা ঠাকুরের সাংসদ অর্থানুকুলে হয়েছে। সর্বপরি ঠাকুরনগরের বিশাল ফুল বাজারটাও তৈরি হচ্ছে মমতা ঠাকুরের অর্থানুকুলে। মমতা ঠাকুর সাংসদ হিসাবে ভারতের লোকসভায় বেশ ভালো ভূমিকা রাখতে পেরেছেন। আবার যখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা র বারুইপুরে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, তখন কোলকাতার চিত্তরঞ্জন কলেজের অধ্যাপক ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তাঁদের বক্তব্য উল্লেখ করেন "নমঃশূদ্রদের মমতা ঠাকুরের কথায় তৃণমূল সরকার তাদের ধর্মগুরুর নামে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় করে দিলেন, আমাদের ধর্মগুরুর নামে বা জাতির নেতার নামে কেন হবে না বিশ্ববিদ্যালয়"।[৪১] উনারা আরও উল্লেখ করেন, নমঃশূদ্রদের মতন আমরা ঐক্যবদ্ধ না হতে পারলে আমরা কিন্তু রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকারের নিকট কোন মূল্য পাবোনা। ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত দুই ২৪ পরগনা ও নদীয়া থেকে যেকল সংরক্ষিত লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন, সংখ্যাগত দিক থেকে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা ছিল দ্বিগুন। কিন্তু জাতিগত দাবিদাবা আদায়ের দিকে থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্র জাতির সাংসদগণ লোকসভায় অধিক ভূমিকা রেখেছেন বলে ওনারা উল্লেখ করেন।[৪২] নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির লোকসভার সাংসদগণের মধ্যে

জাতিগত সুযোগ সুবিধা আধায়ের ক্ষেত্রে লোকসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্র জাতির সাংসদগণ অধিক ভূমিকা রাখেছেন। এটা আমরা সরকারি দলিল দস্তাবেজ ও ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের তথ্য থেকে জানতে পেরেছি।

যাই হোক এবারে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়কদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৪.১৩: ১৯৭১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল	নাকাশিপাড়া (সংরক্ষিত)	নির্দল	নমঃশূদ্র
২। আনন্দ মোহন বিশ্বাস	হাসখালি (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	নমঃশূদ্র
৩। নরেশচন্দ্র বিশ্বাস	রাণাঘাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৪। অপূর্ব লাল মজুমদার	বাগদা (সংরক্ষিত)	ফরওয়ার্ড ব্লক	নমঃশূদ্র
৫। জগদীশ চন্দ্র দাস	বিজপুর	আই.এন.সি	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1971 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1973, পৃঃ **৩০৪-১৫**। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1971, Government Printing Press. Alipure,1972, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেছে, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর,।

১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল সরকার গঠন করলেও রাষ্ট্রপতি শাসনের কারণে **১৯৭১** সালের জুন মাস থেকে **১৯৭২** সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় নমঃশূদ্র বিধায়কদের তেমন কোন ভূমিকার নিদর্শন পাওয়া যায় না।[৪২] দেখতে

না পাওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাঁচ জন বিধায়কের মধ্যে ৩ জন বিধায়কই অকংগ্রেসী রাজনৈতিক টিকিটে নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় গিয়েছিলেন। কাজেই তাদের পক্ষে সরকারের বিরোধিতা করা ছাড়া অন্য কোন গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন নি। উক্ত না পাড়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, নমঃশূদ্র জাতির কোন বিধায়কের মন্ত্রীসভায় কোন প্রতিনিধি না থাকার কারণেও।

সারণি ৪.১৪: ১৯৭১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র’র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। খগেন্দ্র নাথ মণ্ডল	রাজারহাট (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। গোপাল চন্দ্র গায়েন	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। গণেশ চন্দ্র মণ্ডল	গোসাবা (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। গঙ্গাধর প্রমানিক	হাড়োয়া (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	ক্যানিং (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। প্রবোধ পুরকাইত	কুলতলি (সংরক্ষিত)	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। বিমল মিস্ত্রি	বারুইপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। গঙ্গাধর নস্কর	সোনারপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৯। রামকৃষ্ণ বর	বিষ্ণুপুর পূর্ব (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	মগরাহাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। মুকুন্দ রাম মণ্ডল	কুলপি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। রেনুপদ হালদার	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩।প্রভরঞ্জন কুমার মণ্ডল	সাগর	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৪। রবীন মণ্ডল	পাথরপ্রতিমা	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৫। জ্যোতিষ রায়	ফলতা	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৬। সুবেন্দু মণ্ডল	মগরাহাট পশ্চিম	বাংলা কংগ্রেস	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৭। ক্ষিতিভূষন রায় বর্মন	বজবজ	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৮। অর্দ্ধেন্দু শেখর নস্কর	বেলেঘাটা (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1971 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1973, পৃঃ ৩০২-১৫। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who’s who : 1971, Government Printing Press. Alipure,1972, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল

বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেছে, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৭১ সালের জুন থেকে **১৯৭২** সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের উপর রাষ্ট্রপতি শাসন জারী থাকার দরুন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির **১৮** জন বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও বিধানসভায় তেমন কোন ভূমিকার নিদর্শন পাওয়া যায় না বললেই চলে। উক্ত নির্বাচিত বিধায়কদের মধ্যে সংখ্যায় মাত্র ৪ জন বিধায়ক ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন, আর বাকি **১৩** জন বিধায়ক বামপন্থী ও **১** বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হওয়ার কারণেও নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়কগণও তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি।[৪৪] না পাড়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তখন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা বেশ টালমাটাল অবস্থায় ছিল। একদিকে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী ও অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের নিকটে অবস্থিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য মুক্তিযুদ্ধাদের ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গেই প্রধান আশ্রয় স্থল হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ায় মুক্তিযুদ্ধাদের সঙ্গে হাজার হাজার উদ্বাস্তু আগমনের কারণেও বিধানসভা সচল রাখা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়কদের পক্ষেও জাতির বা নিজ এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিধানসভায় ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়নি।

সারণি ৪.১৫: ১৯৭২ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। নীলকমল সরকার	নাকাশিপাড়া (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	নমঃশূদ্র
২। আনন্দ মোহন বিশ্বাস	হাসখালি (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	নমঃশূদ্র
৩। নিতাইপদ সরকার	রাণাঘাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই	নমঃশূদ্র
৪। অপূর্ব লাল মজুমদার	বাগদা (সংরক্ষিত)	নির্দল	নমঃশূদ্র
৫। জগদীশ চন্দ্র দাস	বিজপুর	আই.এন.সি	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1972 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of

India, New Delhi, 1973, পৃঃ ৩০১-১০। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1973, Government Printing Press. Alipure,1973, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর,

সারণি ৪.১৬: ১৯৭২ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। খগেন্দ্র নাথ মণ্ডল	রাজারহাট (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। অনিল কৃষ্ণ মণ্ডল	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। পরেশ বৈদ্য	গোসাবা (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। গঙ্গাধর প্রমানিক	হাড়োয়া (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	ক্যানিং (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। অরবিন্দ নস্কর	কুলতলি (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। ললিতা গায়েন	বারুইপুর (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। কংসারি হালদার	সোনারপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৯। রামকৃষ্ণ বর	বিষ্ণুপুর পূর্ব (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। মনোরঞ্জন হালদার	মগরাহাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। সন্তোষ কুমার মণ্ডল	কুলপি (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। বিরেন্দ্রনাথ হালদার	মথুরাপুর (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩।প্রভরঞ্জন কুমার মণ্ডল	সাগর	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৪। ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মন	বজবজ	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৫। প্রভাশ চন্দ্র রায়	বিষ্ণুপুর পশ্চিম	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৬। সুবেন্দু মণ্ডল	মগরাহাট পশ্চিম	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৭। অর্ধেন্দু শেখর নস্কর	বেলেঘাটা (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1972 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of

India, New Delhi, 1973, পৃঃ ৩০১-১০। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who: 1972, Government Printing Press. Alipure,1973, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৭২ সালের কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ শংকর রায় কে মুখ্যমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। রায়ের মন্ত্রিসভায় নমঃশূদ্র জাতির থেকে আনন্দ মোহন বিশ্বাস ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি থেকে গোবিন্দ নস্কর পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন।[৪৫] এর আগেই আমরা দেখেছি যে স্বাধীনতার পর, অর্থাৎ ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের তপসিলিরা কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসকে রাজনৈতিক ভাবে সমর্থন করলেও, তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে তো পারেন নি। এবং নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মন্ত্রী ও বিধায়করা মন্ত্রিসভায় তথা বিধানসভায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি বলে আমরা ধরে নিতে পারি। আবার নমঃশূদ্র জাতির অধিকাংশ মানুষ উদ্বাস্তু থাকার দরুন তাদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান, ভূমি সংস্কার ও জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ করে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র মন্ত্রী ও বিধায়করা তাদের জাতিগত দাবিদাবা আদায়ের ক্ষেত্রে বিধানসভায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেও মনে করা যেতে পারে। এই মনে করা যেতে পারে কেন তার সদোত্তরে উল্লেখ করা যায় যে, পৌণ্ড্রজাতির থেকে উক্ত তিনটি জেলা থেকে ১৭ জন বিধায়ক নির্বাচিত হন, আর নমঃশূদ্র জাতি থেকে ৫ জন বিধায়ক নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের দাবিদাওয়া মন্ত্রীসভা তথা বিধানসভায় রাখার ক্ষেত্রে তেমন ভাবে জোরালো বক্তব্য রাখায় ব্যর্থ হয়েছে।

তবে রায়ের শাসন কালে নমঃশূদ্র জাতির থেকে অপূর্বলাল মজুমদারকে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মন্ত্রীসভায় অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কাজেই তার নেতৃত্বেই পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায় তপসিলি জাতি ও উপজাতির ২২.৫ শতাংশ

আসন সংরক্ষিত রাখাটা কার্যকর হয়েছিল। যা আগে শুধুমাত্র সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল।[৪৬] কাজেই আমরা বলতে পারি শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে তো আর সরকারি চাকরি পাওয়া যায় না। তাইতো আমরা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উচ্চ পদে ৮০ দশকের আগে অতিনগ্ন সংখ্যায় দলিত জাতির কর্তাব্যক্তিদের নামের উল্লেখ পায়। ৭০এর দশকের গোঁড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসন কার্যকর হওয়ায়, ৮০ এর দশকের শুরুতেই দলিত জাতির বেশ সংখ্যক মানুষ ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, প্রশাসনিক আধিকারিক নাম পেয়েছি। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময় নমঃশূদ্র জাতির বিধায়কগন তথা মন্ত্রী বেশ স্বাধীন ভাবে বিধানসভায় জাতিগত সমস্যা ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে ভূমিকা রাখতে পেরেছিল।

সারণি ৪.১৭: ১৯৭৭ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	কৃষ্ণগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। সুকুমার মণ্ডল	হাসখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৩। সতিশ চন্দ্র বিশ্বাস	রাণাঘাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৪। কমলাক্ষী বিশ্বাস	বাগদা (সংরক্ষিত)	এফ.বি.এল	নমঃশূদ্র
৫। কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস	সন্দেশখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৬। জগদীশ চন্দ্র দাস	বিজপুর	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৭। ননীগোপাল মালাকার	হরিঘাটা	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৮। কান্তি চন্দ্র বিশ্বাস	গাইঘাটা	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1977, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1977, Government Printing Press. Alipure,1977, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর,

সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

সারণি ৪.১৮: ১৯৭৭ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	রাজারহাট (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। সুধাংশু মণ্ডল	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। গণেশ মণ্ডল	গোসাবা (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল	হাড়োয়া (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। সুভাষ নস্কর	বাসন্তী (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। প্রবোধ পুরকাইত	কুলতলি (সংরক্ষিত)	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। চিত্তরঞ্জন মৃধা	ক্যানিং পশ্চিম (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। গঙ্গাধর নস্কর	সোনারপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৯। সুন্দর নস্কর	বিষ্ণুপুর পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	মগরাহাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। সুভাষ রায়	মন্দিরবাজার (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। কৃষ্ণসাধন হালদার	কুলপি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩।প্রভরঞ্জন কুমার মণ্ডল	সাগর	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৪। ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মন	বজবজ	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৫। প্রভাশ চন্দ্র রায়	বিষ্ণুপুর পশ্চিম	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৬। দেবপ্রসাদ সরকার	জয়নগর	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৭। নিমাই চন্দ্র দাস	ফলতা	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1977, পৃঃ ৩২৬-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1977, Government Printing Press. Alipure,1977, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর,

সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া ও চব্বিশ ২৪ পরগনা থেকে সংরক্ষিত ও সাধারণ আসন থেকে মোট ২৫ জন বিধায়কের মধ্যে ১৭ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং ৮ জন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ছিলেন। উক্ত নির্বাচনে ২৫ টি আসনই বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো পায়।[৪৭] কাজেই সি.পি.আই (এম) নেতা জ্যোতি বসুকে মুখ্যমন্ত্রী করেন বামপন্থী দলগুলো। তবে উল্লেখ করার বিষয় হল যে, বামপন্থী দলগুলো সংরক্ষিত কেন্দ্রগুলো থেকে ৮১ শতাংশ সমর্থন পেলেও শুধুমাত্র নমঃশূদ্র জাতির মানুষ কান্তি বিশ্বাসকে যুব এবং পাসপোর্ট বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে জ্যোতি বসু মন্ত্রীসভায় স্থান পায়। কাজেই শুরুতেই বামেরা নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং পশ্চিমবঙ্গের দলিতদের জাতিগত সমস্যা ও তাদের দাবিদাওয়া দিকে কোন নজর না দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার দিকে নজর দিয়েই তারা দলিত জাতির উন্নতি করবে বলে নিজেদের পার্টির প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে তুলে ধরে দলিতদের ভোট বা সমর্থন পায়। কিন্তু বাস্তবে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জাতি সচেতনা ও শ্রেণী সচেতনা মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে এবং ছিল। ফলে কান্তি বাবু সি.পি.আই. (এম) বিধায়ক ও বামপন্থীদের মন্ত্রী হওয়ার কারণে তার পক্ষে নমঃশূদ্র জাতির বা দলিত জাতির পক্ষে কোন গঠন মূলক কাজের ভূমিকা বিধানসভায় বা মন্ত্রীসভায় রাখতে পারেননি।[৪৮] ১৯৭৭ সালে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটল। উত্থান হল বামফ্রন্ট সরকারের। 'সর্বভারতীয় উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'র নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও ত্রাণমন্ত্রী রাধিকারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়ে যান, তাঁরা এখন সুন্দরবনে আসবার জন্য প্রস্তুত।[৪৯] কাজেই উদ্বাস্তু মানুষের আন্দোলনের ফলেই যে, তারা পশ্চিমবঙ্গে বসতি স্থাপন করতে চায়। এক্ষেত্রে কিন্তু নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রজাতির বিধায়কদের তেমন কোন ভূমিকা আমরা দেখতে পেলাম না।

১৯৭৮ সালের ১৬ জানুয়ারী মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জ্জী, বামফ্রন্টের নেতা অশোক ঘোষ মহাশয়কে নিয়ে পুনরায় দণ্ডকারণ্য পরিদর্শনে যান। উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশার অবস্থা দেখে-শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে অশোক ঘোষ তাঁদের উদ্দেশে বললেন- 'আপনারা বাংলায় ফিরে গেলে, বাংলার পাঁচ কোটি মানুষ দশ কোটি হাতে স্বাগত জানাবে।' রামবাবু বলেন- 'হতাশার কোনও কারণ নেই, দিন আপনাদের আসবেই। আমি অতীতেও আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, এখনও আছি আর ভবিষ্যতেও থাকব।'

এপ্রিল মাসে ৩০ হাজারের মতো নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ হাসনাবাদ হয়ে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে প্রবেশ করে। কয়েরকদিন বাদে ১৮ এপ্রিল আরও ১০ হাজার উদ্বাস্তু কুমিরমারি পার হয়ে মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁরা জঙ্গল থেকে সংগৃহীত কাঠ বিক্রি করে, ছোটখাটো হাতের কাজ করে বেঁচে থাকার সংগ্রামে ব্যাপৃত হয়। তারা জলাশয় বাঁধ দিয়ে, ভেড়ি করে মাছের চাষ শুরু করে।[৫০] ফলে বামফ্রন্ট সরকার মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের জীবনযাত্রা ও কার্যাবলী জেনেশুনে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ, ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পরে। পুলিশের সাহায্যে তাঁদের বসতি স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করল। অসহায় উদ্বাস্তুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নানাবিধ বিঘ্ন সৃষ্টি করে পুলিশ তাঁদের উৎখাত করার অভিসন্ধি গ্রহণ করল। উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মন্ডল প্রশাসনের প্রতিনিধিদের জানালেন-'আমরা সরকারের কোনও সাহায্য চাই না, শুধু এখানে আমাদের একটু মাথা গুঁজে থাকতে দেন।[৫১] উদ্বাস্তু নেতাগণ আরও উল্লেখ করেন যে, আমাদের দ্বারা দেশের ক্ষতিকর কিছু ঘটবে না, বরং মাছের চাষের দ্বারা ব্যবসার মাধ্যমে অনেক বিদেশি মুদ্রা এনে সরকারকে বলিষ্ঠ করব। বামফ্রন্ট সরকারে প্রশাসনের পুলিশ তবু নিত্যদিনের দুষ্কর্ম থেকে বিরত হল না। এই মর্মেও পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র জাতির বিধায়কগণ বিধানসভায় সরকারের পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন নিন্দা প্রস্তাব আনলেন না, এবং কোন বিধায়কই পদত্যাগ করেও প্রতিবাদ জানালেন না। ফলে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নিয়ে যা প্রতিবাদ হয় তা হলে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সরকারের উপর রাজনৈতিক বিরোধী দলের সহযোগিতায় চাপ সৃষ্টি করা ছাড়া তারাও বাম সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর কোন প্রতিরোধ তখনও গড়ে তুলতে পারে নি।

রাজনৈতিক ক্ষমতার কী নির্মম পরিহাস! ক্ষমতাসীন হবার পর বামফ্রন্ট সরকার অতীতের প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গেল। শুধু ভুলে গেল তা-ই নয়, মাত্র বৎসরকাল সময়ের ব্যবধানে তাদের ভিতর কী ভাবে একটা ধ্বংসাত্মক জিঘাংসু প্রবৃত্তি জাগ্রত হল, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ১৯৭৮ সালের ১৯ আগস্ট বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যাধিক পুলিশ ও কুড়িটি লঞ্চের সাহায্যে সামরিক কায়দায় নদীপথ অবরোধ করে। খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে, অনাহারে, তৃষ্ণায় উদ্বাস্তু বসতির অসংখ্য শিশু বৃদ্ধ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময় এই মন্তব্য পাই উত্তর ২৪ পরগনা র চাঁদপাড়ার বাসিন্দা ও মতুয়া গবেষক নন্দদুলাল মোহন্ত কাছ থেকে। তিনি আরও বলেন বামপন্থী বিধায়ক তথা আমার জাতির ৮ জনের কেউই উক্ত উদ্বাস্তুদের উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ তখন করেন নি। কাজেই নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির

বিধায়ক গণের পক্ষে বিধানসভায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।[৫২] আবার ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ এবং ১৪৪ ধারা জারি করে বাইরের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ঘরে ঘরে কান্নার রোল ওঠে। পুলিশের লঞ্চ দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা চারদিক টহল দিতে থাকে। খাদ্যের অভাবে মানুষ যদুপালং ও অন্যান্য গাছের পাতা খেতে শুরু করে তাতেও জীবন রক্ষা হল না। অনাহারে ২৭ জনের মৃত্যু হল। ৩১ জানুয়ারী লঞ্চের ধাক্কায় পুলিশ উদ্বাস্তুদের খাদ্য ও পানীয় জলের নৌকা মাঝনদীতে ডুবিয়ে দেয়। তারা সাঁতার কেটে কুমিরমারির পাড়ে গিয়ে ওঠে। সেখানেও পুলিশ টিয়ার গ্যাস প্রয়োগ করে। উদ্বাস্তুরা তবু অগ্রসর হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করলে, তাতে ৩০ জনের মৃত্যু ঘটে এবং ৭০ জন আহত হয়, অন্যান্যদের পুলিশ- ক্যাম্পে আটক রাখা হয়।[৫৩]

১৩ মে মরিচঝাঁপির ঘাটে লঞ্চে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত পুলিশ মাইক্রোফোনে ঘোষণা করল- চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি ছাড়তে হবে, অন্যথায় পরিণতি হবে ভয়াবহ। সর্বহারা, বাস্তুহারা, সম্ভ্রমহারা মৃতপ্রায় মানুষের সেই একই প্রতিজ্ঞা-মরিচঝাঁপি ছাড়ছি না ছাড়ব না।[৫৪] আবার অন্যদিকে ১৪ মে এক অসতর্ক মুহূর্তে ২৫টি লঞ্চভর্তি পুলিশ, অসংখ্য বেসরকারি যুব কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মরিচঝাঁপিতে প্রথমে তারা স্কুল ঘরে আগুন লাগায়। পুলিশের তাঁবেদার যুব বাহিনী একের পর এক ঝুপড়িতে আগুন ধরাতে লাগলো, পুলিশ সমানে লাঠিচার্জ ও গুলি চালাতে চালাতে সেনাবাহিনীর মতো এগিয়ে চলল। সমগ্র বনভূমি জুড়ে শিশু, বৃদ্ধ, নারীর 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার শুরু হয়। যুব কর্মীরা এক- একজন যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। খড়কুটো পাতায় ছাওয়া ঘরপোড়া আগুনের লেলিহান শিখা গগনচুম্বী হয়ে উঠল। বন্দুকের গুলিতে অসংখ্য, অগণিত আহত মানুষ নিমেষের মধ্যে জল-কাদায় ঢলে পড়তে লাগল। যারা দৌড়ে পালাতে পারল না- শিশু, বৃদ্ধ, নারী- পুলিশ তাদের ঠ্যাং ধরে লঞ্চের মাঝে ছুড়তে লাগল। কারও দেহ ভিতরে গেল, কারও দেহ নদীতে পড়ল। চারদিকে মৃত্যুর হাহাকার। রাশি-রাশি মৃতদেহ, ঘরপোড়া ছাইয়ের মাঝে পড়ে রইল। তার পরেও যাদের জীবন্মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল, পরদিন তাদের জোর করে লঞ্চে তুলে নিয়ে বিদায় হল পুলিশ ও সঙ্গী যুব বাহিনী।[৫৫]

১৯৭৯ সালের ১৫ মে মরিচঝাঁপি সভ্যতার মর্মান্তিক অবলুপ্তি ঘটল। ১৯৭৯ সালের মে মাসের পরে মরিচঝাঁপির উৎখাত হওয়া উদ্বাস্তুদের একটা বিরাট অংশের মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তুদের একটা বিরাট অংশের মানুষ,

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মগোপন করে রইল। কিছু অংশের মানুষ তাদের ছেড়ে আসা দন্ডকারণ্যে ফিরে গিয়ে পুনর্বসতি নির্মাণ করে দুঃসহ শারীরিক পরিশ্রমে নতুন করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু করে। একাধিক সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন থাকলেও কোন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দর্শন তারা প্রচার করতে পারেনি। যে প্রদেশে যে রাজনীতির প্রভাব আছে, সেই নেতৃত্বের অধীনস্থ হয়ে বিবাদ- বিসংবাদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে উদ্বাস্তুরা একপ্রকার নির্বিবাদী জীবনসংগ্রামে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সরকারি উদ্যোগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে ক্রমশ কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। সেচ ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় কাঁকরমিশ্রিত রুক্ষ অনুর্বর জমি চাষযোগ্য হয়ে পড়ে। পূর্বের থেকে অধিকতর ফসল উৎপন্ন হওয়ায় কৃষিজীবীদের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পায়।[৫৬] কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুরা খেয়েপরে বেঁচে থাকার একটা পরিস্থিতি তৈরি হলেও বাস্তুহারা পরিবারের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা তখনও নাগালের বাইরে। বাসস্থান থেকে বিদ্যালয় অনেক দূরে। জঙ্গলাকীর্ন পথে বালকেরা যাতায়াত করতে সাহস পেলেও, বালিকারা লেখাপড়ায় বিরত থাকত নিরাপত্তার অভাবে।

পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথ সুগম হলেও শিক্ষার মাধ্যম, ভাষা-সমস্যা থেকেই গেল। উদ্বাস্তু বাঙালি শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার কোন সুযোগ সৃষ্টি হল না। প্রাদেশিক ভাষায় লেখা পাঠ্য পুস্তকের বিষয় অধিগত করতে তাদের সময় লেগে গেল। ওড়িয়া, হিন্দি, কানাড়া বিভিন্ন ভাষায় তাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হল। বাংলা ভাষায় লেখাপড়া তারা ভুলেই গেল। বাড়িতে নিজ পরিবারের সঙ্গে কথা বলার সময় ছাড়া অন্য সময় তাদের প্রাদেশিক ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেই সমস্যা আজও প্রকট। বাঙালির সন্তান সন্ততিগণ বাংলা বই পড়তে পারে না, কোনও চিঠিপত্র মাতৃভাষায় লিখতে পারে না। শ্রম, বুদ্ধি, নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায় উদ্বাস্তু বালক-বালিকারা জীবন প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে অগ্রসর হচ্ছে বটে, তবে স্বকীয়তা হারাতে হচ্ছে তাদের।[৫৭] তবে নিখিল ভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতি'র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দু'-একটি প্রদেশে বাংলা ভাষা শিক্ষার সামান্য সুযোগ প্রাপ্তি ঘটেছে। উক্ত সময়ে মুহূর্তে বাংলার বাইরে নমঃশূদ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা আগের থেকে অনেকটা সচ্ছল জীবন যাপন করছে, কিন্তু কোনও রাজনৈতিক শক্তি বা প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন পদ তারা অধিগ্রহণ করতে পারে নি।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মরিচঝাঁপি থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তুসমাজ বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে। এক শ্রেণীর মানুষ রেললাইনের ধারে ঝুপড়ি বেঁধে আজও বসবাস করছে। রুটি-রুজির তাগিদে তারা ভোর না হতে

শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জনমজুরির সন্ধানে ছোটে। এক চিলতে জায়গা কিনে বসতি গড়ার সামর্থ্য তাদের আজও হয়নি। সামান্য লেখাপড়া শিখে তরুণ বয়সে তারা কাঠের মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী বা রঙের মিস্ত্রী হয়ে কায়ক্লেশে জীবন যাপন করছে ভাঙা কুঁড়েঘরের ভিতর। তাদের সন্তানসন্ততি যে কী ভাবে মানুষ হবে, তা আজও ভাবনার বাইরে। এই সব তথ্য আমরা পেয়েছি নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা র উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে সকল ক্ষেত্রসমীক্ষার বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে। তাইতো বলা যায় এখানকার উদ্বাস্তুদের একটা অংশের মানুষ শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে সাধ্যমত মাথা গোঁজার নিজস্ব একটু ঠাঁই করতে পেরেছে বিভিন্ন প্রান্তে শহর থেকে অনেক দূরে। কম দামের জমি কিনে এরা একত্রিত হয়ে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তুলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে।[৫৮]

শিয়ালদহ- ক্যানিং লাইনের ঘুটিয়ারি শরিফ স্টেশন থেকে হাঁটাপথে পনেরো মিনিট দূরত্বে। পথের শেষ’ নামে একটা গ্রাম তৈরি হয়েছে মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত মানুষদের উদ্যোগে। মরিচঝাঁপি আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আহত প্রতিবন্ধী যুবক সন্তোষ সরকারের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজসেবামূলক সংগঠন ‘পথের শেষ সবুজ পৃথিবী উন্নয়ন সমিতি’।[৫৯] এই সংগঠনের বহুমুখী প্রকল্পে চতুর্পার্শ্বের গ্রামের সাধারণ মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়েছে।

মরিচঝাঁপি প্রত্যাগত অধিক সংখ্যক বাস্তুহারা মানুষের সংঘবদ্ধ বসবাস ঘটেছে, শিয়ালদহ- হাসনাবাদ লাইনে কড়েয়া কদম্বগাছি স্টেশনের সন্নিকট হেমন্ত বসু নগরে। নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল ও রাধিকারঞ্জন বিশ্বাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরিচালিত হচ্ছে ‘সর্বভারতীয় উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (মরিচঝাঁপি)’। এই সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিবৎসর ৩১ জানুয়ারি ‘মরিচঝাঁপি দিবস’ উদযাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু মানুষের সমাবেশ ঘটে ঐ সম্মেলনে।[৬০]

কুমিরমারি, সাতজেলিয়া, গোসাবা, বসিরহাট, হাসনাবাদ, আলবেরিয়া, মালতীপুর, বনগাঁ, মছলন্দপুর, সংহতি, মধ্যমগ্রাম, নিউ ব্যারাকপুর, মেটিয়া, বাদু, সাজিরহাট, কামারগাতি, দক্ষিণ কলকাতায় পঞ্চান্ন গ্রাম ও কালিকাপুরের মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা দীর্ঘদিন বসবাস করছে। এই উদ্বাস্তু মানুষেরা কঠোর জীবনসংগ্রামে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত ও স্বাবলম্বী হয়েছে। এই সব পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়নি; সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চশিক্ষার দ্বারপ্রান্তে অনেকেই পৌঁছে গেছে। সংরক্ষণের

সুযোগপ্রাপ্তিতে এদের তেমন বাধা হয়নি, প্রশাসনিক স্তরে উচ্চ পদাধিকারীও কেউ কেউ হতে পেরেছে।[৬১] তাইতো বলা যেতে পারে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা অন্যান্য সাধারণ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। একটা সময়ে এরা প্রায় সবাই সর্বভারতীয় মতুয়া আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি। এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ২০১০ সাল পর্যন্ত ঠাকুর পরিবার ছিল রাজনীতির উর্ধ্বে, কিন্তু তারপর থেকে এই পরিবার প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সাধু, ভক্ত, গোঁসাইদের ভিতর ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই প্রেক্ষিতে সারা ভারতের মতুয়া ভক্তদের পরস্পরের ভিতর একটা বিচ্ছিন্নতার মনোভাব দানা বাঁধে। দিন যত এগিয়ে যায়, এই ক্ষোভ ক্রমশ প্রকট হয়। বর্তমানে ঠাকুর পরিবার বিধিসম্মত দুইভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মতুয়া ভক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে ধর্মচর্চা করেন।

মতুয়া আন্দোলনের বিভিন্ন ধারায় প্রভাবিত হওয়ায় উদ্বাস্তুরাও আজ এক প্রকার দিকভ্রান্ত। অথচ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক-চতুর্থাংশ আসনের জয়-পরাজয় নির্ভর করে মতুয়াদের সমর্থনের ওপর। রাজনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুরা সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। ১৯৭৯ সালে বামপন্থী রাজনৈতিক প্রশাসনের নৃশংস নির্যাতনে এরা উচ্ছিন্ন হলেও বামপন্থীদের বিরোধিতা করার শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করতে পারে নি ২০০৯ সাল পর্যন্ত, তা হলে এরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারত না।

আমরা আমাদের গবেষণায় বারংবার সংখ্যাগরিষ্ঠ নমঃশূদ্র ও কিছু সংখ্যক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য থেকে মরিচঝাঁপির ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করেছি। এর কারণ হল উক্ত নির্বাচনে জেলা তিনটি থেকে পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র জাতি থেকে ২৫ টি আসন বামফ্রন্ট পেয়েছিল। কাজেই সংখ্যার দিক থেকে পৌণ্ড্ররা নমঃশূদ্রদের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বিধায়ক বামেরা পেয়েছিল। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংরক্ষিত পৌণ্ড্র জাতির আসন পাওয়ার লক্ষ্যে বামেরা অধিকাংশ নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে যাতে না বসতি গড়ে তুলতে পারে সেই জন্য পৌণ্ড্রদের দিয়েও উদ্বাস্তুদের উপর অত্যাচার চালায়। তাইতো বলা যেতে পারে বামেরা রাজনৈতিক ভাবে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রদের মধ্যে একটা বিভেদ তৈরি করার পরিকল্পনা তখন হয়তো করেছিল। উদ্বাস্তুরা থাকলে স্থানীয় পৌণ্ড্রদের কাজের সুযোগ ও চাষের জমির পাট্টা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। উক্ত সকল যুক্তি দেখিয়ে বামেরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়কদের নিজেদের পার্টি লাইনের বাইরে যেতে দেয়নি। ঠিক নমঃশূদ্র বিধায়কদের ক্ষেত্রে বামেরা নাগরিকত্বের ও

ভোটাধিকার পাওয়ার ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে এবং চাষের জমির পাট্টা যাতে করে সাধারণ নমঃশূদ্ররা পাওয়া ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে বিধানসভায় উদ্বাস্তুদের হয়ে মুখ খুলতে দেয় নি। **১৯৭৭ – ১৯৮২** সালের মধ্যে একমাত্র কান্তি বিশ্বাসকে মন্ত্রী করেই বামেরা নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রদের উপর দায়িত্ব পালন টুকুই করেছেন। তবে বাম সরকারের ভূমি সংস্কারের ফলে দরিদ্র নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র জাতির মানুষও বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়কেরা তেমন কোন জাতিগত উন্নয়নের বা উদ্বাস্তুদের নিয়ে ভূমিকা পালন করতে পারেনি।[৬২] জাতিগত কোন ভূমিকা বা উদ্বাস্তুদের হয়ে ভূমিকা না দেখানোর কারণ হল, বামপন্থী দলের বা সরকারের রাজনৈতিক আদর্শ হল শ্রেণী সংগ্রামের কাজেই তারা জাতিভিত্তিক সুবিধা ভোগের পক্ষে দলের বিধায়কদের কখনেও কাজ করার অনুমতি দিতেন না। বাম সরকারের মন্ত্রী বা বিধায়কদের এককভাবে কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়া হয় না, যা হবে দলগত ভাবে হবে।

সারণি ৪.১৯: ১৯৮২ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	কৃষ্ণগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। সুকুমার মণ্ডল	হাসখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৩। সতিশ চন্দ্র বিশ্বাস	রাণাঘাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৪। কমলাক্ষী বিশ্বাস	বাগদা (সংরক্ষিত)	এফ.বি.এল	নমঃশূদ্র
৫। কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস	সন্দেশখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৫। জগদীশ চন্দ্র দাস	বিজপুর	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৭। কান্তি চন্দ্র বিশ্বাস	গাইঘাটা	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৮। ননীগোপাল মালাকার	হরিঘাটা	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1982 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1982, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1982, Government Printing Press. Alipure,1982, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর,

খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

সারণি ৪.২০: ১৯৮২ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	রাজারহাট (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। সুধাংশু মণ্ডল	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। গণেশ মণ্ডল	গোসাবা (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল	হাড়োয়া (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। সুভাষ নস্কর	বাসন্তী (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। প্রবোধ পুরকাইত	কুলতলি (সংরক্ষিত)	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। চিত্তরঞ্জন মৃধা	ক্যানিং পশ্চিম (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। গঙ্গাধর নস্কর	সোনারপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৯। সুন্দর নস্কর	বিষ্ণুপুর পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	মগরাহাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। সুভাষ চন্দ্র রায়	মন্দিরবাজার (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। কৃষ্ণসাধন হালদার	কুলপি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩।প্রভরঞ্জন কুমার মণ্ডল	সাগর	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৪। ক্ষিতিভূষন রায় বর্মন	বজবজ	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৫। প্রভাশ চন্দ্র রায়	বিষ্ণুপুর পশ্চিম	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৬। দেবপ্রসাদ সরকার	জয়নগর	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৭। নিমাই চন্দ্র দাস	ফলতা	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1982 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1982, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1982, Government Printing Press. Alipure,1982, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর,

খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৮২ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। দ্বিতীয় বারের জন্যে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। এই নির্বাচনে ৯২.৫২ শতাংশ সংরক্ষিত আসনের সমর্থন পায় বামপন্থী দলগুলো, আর নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত সংরক্ষিত আসনে ১০০ শতাংশ সমর্থন পায় বামেরা। তা সত্ত্বেও দলিতদের থেকে মাত্র ২ জনকে মন্ত্রিত্ব দান করে, নমঃশূদ্র নেতা কান্তি বিশ্বাস এবং রাজবংশী নেতা বনমালী রায়কে নতুন ভাবে তপসিলি ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী করা হয়। কাজেই তপসিলিদের মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তি ছিল মাত্র ৪.৪৪ শতাংশ।[৬৩] বামফ্রন্টের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির কোন মন্ত্রী ছিল না। তাইতো মন্ত্রীসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির কোন বিধায়কই ভূমিকা রাখতে পারেননি। নমঃশূদ্র বিধায়ক কান্তি বিশ্বাস মন্ত্রী হওয়ার সুবাধে মন্ত্রীসভায় খানিকটা ভূমিকা রাখতে পেড়েছিলেন।

নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র জাতির সকল বিধায়কগণ বামপন্থী দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানভার অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে নানাবিধ বিতর্কে নিজেদের মতামত দিলে পরে নিজের জাতির জন্যে আলাদা কোন সুযোগ সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। না পারার কারণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কারের নীতির কার্যকরের ফলে দরিদ্র দলিত জাতির একচেটিয়া সমর্থন পেয়ে দ্বিতীয় বার সরকার গঠন করলে কোন নমঃশূদ্র বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়কের পক্ষে সম্ভব হয়নি, বাম পার্টিলাইনের বাইরে বেড়িয়ে গিয়ে কোন জাতিগত উন্নয়নের আলাদা করে ভূমিকা পালন করা। যদিও এস.ইউ.সি.আইয়ের বিধায়কেরা বিধানসভার অধিবেশনের বিতর্কে সরকারের নীতির সমালোচনা করলেও পৌণ্ড্রজাতির বা দলিত জাতির হয়েও আলাদা ভাবে কোন ভূমিকার ছাপ রাখতেও পারেনি।

সারণি ৪.২১: ১৯৮৭ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। নয়ন চন্দ্র সরকার	কৃষ্ণগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। সুকুমার মণ্ডল	হাসখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৩। বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস	রাণাঘাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৪। অপূর্ব লাল মজুমদার	বাগদা (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	নমঃশূদ্র
৫। কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস	সন্দেশখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৬। জগদীশ চন্দ্র দাস	বিজপুর	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৭। কান্তি চন্দ্র বিশ্বাস	গাইঘাটা	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৮। ননীগোপাল মালাকার	হরিঘাটা	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1987 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1987, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who: 1987, Government Printing Press. Alipure,1987, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

সারণি ৪.২২: ১৯৮৭ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	রাজারহাট (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। সুধাংশু মণ্ডল	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। গণেশ চন্দ্র মণ্ডল	গোসাবা (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল	হাড়োয়া (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। সুভাষ নস্কর	বাসন্তী (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। প্রবোধ পুরকাইত	কুলতলি (সংরক্ষিত)	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	ক্যানিং পশ্চিম (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। ভদ্রেশ্বর মণ্ডল	সোনারপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

৯। সুন্দর নস্কর	বিষ্ণুপুর পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। রাধিকারঞ্জন প্রমানিক	মগরাহাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। সুভাষ চন্দ্র রায়	মন্দিরবাজার (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। কৃষ্ণসাধন হালদার	কুলপি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩।প্রভরঞ্জন কুমার মণ্ডল	সাগর	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৪। ক্ষিতিভূষন রায় বর্মন	বজবজ	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৫। দেবপ্রসাদ সরকার	জয়নগর	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1987 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1987, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1987, Government Printing Press. Alipure,1987, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

পশ্চিমবঙ্গের ১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মোট ২৫ জন বিধায়ক নির্বাচিত হন নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনা থেকে, তাঁদের মধ্যে অপূর্ব লাল মজুমদার ও গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হয়েছিলে এবং ২৩ জন বিধায়ক বামপন্থী দল থেকে নির্বাচিত হয়েছিলে।[৬৪] বাম সরকার গঠন হওয়ার পরে অর্থাৎ ১৯৭৭ ও ১৯৮২ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র জাতির কোন বিধায়কই উক্ত তিনটি জেলা থেকে বাম বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত হতে পারেন নি। কিন্তু ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে দুই জন বিধায়ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হয়ে বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধীদের ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালন করেন। কিন্ত কোন জাতিগত উন্নতির জন্যে আলাদা কোন ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বামপন্থী দলের টিকিটে নির্বাচিত কোন নমঃশূদ্র বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়কই শ্রেণী

সংগ্রামের বাইরে বেড়িয়ে জাতিগত চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিধানসভায় নতুন কোন বিল উথাপন করে আলাদা কোন ভূমিকা পালন করতে পারেননি।[৬৫] তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় ৩ জন দলিত জাতির মানুষকে মন্ত্রী করা হয়। নমঃশূদ্র নেতা কান্তি বিশ্বাস এবং রাজবংশী নেতা বনমালী রায়কে মন্ত্রী রেখে নতুন ভাবে রাজবংশীর নেতা দীনেশচন্দ্র ডাকুয়াকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু পৌণ্ড্রজাতির কোন বিধায়কে জ্যোতি বাবুর তৃতীয় মন্ত্রীসভায় কোন স্থান দেওয়া হয়নি।[৬৬] কাজেই বলা যেতে পারে পর পর দুটো মন্ত্রীসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির কোন মন্ত্রী না রাখার কারণে বাম সরকারের বিধানসভায় মন্ত্রী হিসাবে কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ পায়নি। নমঃশূদ্র নেতা ও মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস আগের দুটো মন্ত্রীসভায় যেটুকু ভূমিকা রাখতে পেড়েছিলেন, এই মন্ত্রীসভায় সেটুকুও ভূমিকা রাখতে পারেননি।

সারণি ৪.২৩: ১৯৯১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। সুশীল বিশ্বাস	কৃষ্ণগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। নয়ন সরকার	হাসখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৩। বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস	রাণাঘাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৪। কমলাক্ষ্মী বিশ্বাস	বাগদা (সংরক্ষিত)	এফ.বি.এল	নমঃশূদ্র
৫। ননীগোপাল মালাকার	হরিঘাটা	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৬। জগদীশ চন্দ্র দাস	বিজপুর	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1991 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1991, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1991, Government Printing Press. Alipure,1991, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর,

সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

সারণি ৪.২৪: ১৯৯১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	রাজারহাট (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। নৃপেন গায়েন	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। ধীরেন মণ্ডল	সন্দেশখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। গণেশ চন্দ্র মণ্ডল	গোসাবা (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল	হাড়োয়া (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। সুভাষ নস্কর	বাসন্তী (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। প্রবোধ পুরকাইত	কুলতলি (সংরক্ষিত)	নির্দল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। বিমল মিস্ত্রি	ক্যানিং পশ্চিম (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৯। ভদ্রেশ্বর মণ্ডল	সোনারপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। সুন্দর নস্কর	বিষ্ণুপুর পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। নির্মল সিনহা	মগরাহাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। সুভাষ চন্দ্র রায়	মন্দিরবাজার (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩। কৃষ্ণসাধন হালদার	কুলপি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৪।প্রভরঞ্জন কুমার মণ্ডল	সাগর	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৫। দেবপ্রসাদ সরকার	জয়নগর	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1991 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1991, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who: 1991, Government Printing Press. Alipure,1991, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর,

সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৯১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া, দুই ২৪ পরগনা থেকে সংরক্ষিত ও সাধারণ আসন থেকে মোট ২১ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। উক্ত ২১ জন বিধায়কের মধ্যে প্রবোধ পুরকাইত নির্দল ও বিমল মিস্ত্রী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের টিকিট নির্বাচিত হয়েছিলেন, আর ১৯ জন বিধায়ক বামপন্থী দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৬৭] নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ১৯ জন বামপন্থী দলের বিধায়কের মধ্যে থেকে জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভায় কোন বিধায়কেই মন্ত্রী করা হয়নি। এই মন্ত্রীসভায় বামপন্থী সরকার ২ জন রাজবংশী জাতির বাম বিধায়কে মন্ত্রী, ১ জন বাগদি এবং বাউরি জাতির জাতির বিধায়কে মন্ত্রী করেন।[৬৮] কাজেই বাম সরকারের উক্ত মন্ত্রীসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির কোন বিধায়কই মন্ত্রী হিসাবে কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি। এবং তাদের জাতির নির্বাচিত বামপন্থী দলের বিধায়কগন বিধানসভায় নিজ নিজ জাতির জন্যে আলাদা কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি।[৬৯] ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে বিধানসভায় যেসকল অধিবেশন ও বিতর্কের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলিতে বামপন্থী পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র জাতির বিধায়কগণ পার্টি লাইনের বাইরে বেড়িয়ে গিয়ে আলাদা কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। শুধুমাত্র নির্দল বিধায়ক প্রবোদ পুরকাইত ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিধায়ক বিমল মিস্ত্রী দুজন পৌণ্ড্র জাতির বিধায়ক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন, কিন্তু কোনরূপ জাতিগত সমস্যার সমদানের ভূমিকা ও নতুন কোন বিল বিধানসভার বিতর্কসভায় উত্থান করে পাশ করাতে পারেননি।

সারণি ৪.২৫: ১৯৯৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। সুশীল বিশ্বাস	কৃষ্ণগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। শশাঙ্ক শেখর বিশ্বাস	হাসখালি (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	নমঃশূদ্র
৩। বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস	রাণাঘাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৪। কমলাক্ষী বিশ্বাস	বাগদা (সংরক্ষিত)	এফ.বি.এল	নমঃশূদ্র
৫। কান্তি চন্দ্র বিশ্বাস	সন্দেশখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৬। আনন্দ মোহন বিশ্বাস	বিষ্ণুপুর পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৭। মন্মথ রায়	গাইঘাটা	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৮। মিলি হিরা	হরিণঘাটা	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1996 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1996, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1996, Government Printing Press. Alipure, 1996, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

সারণি ৪.২৬: ১৯৯৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	রাজারহাট (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। নৃপেন গায়েন	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। দেবপ্রসাদ সরকার	জয়নগর	নির্দল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। গণেশ চন্দ্র মণ্ডল	গোসাবা (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল	হাড়োয়া (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। সুভাষ নস্কর	বাসন্তী (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। প্রবোধ পুরকাইত	কুলতলি (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। বিমল মিস্ত্রি	ক্যানিং পশ্চিম (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৯। ভদ্রেশ্বর মণ্ডল	সোনারপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। শঙ্কর শরণ নস্কর	বিষ্ণুপুর পশ্চিম	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। নির্মল সিনহা	মগরাহাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। নিকুঞ্জ পাইক	মন্দিরবাজার (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩। শকুন্তলা পাইক	কুলপি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৪।প্রভরঞ্জন কুমার মণ্ডল	সাগর	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 1996 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of

India, New Delhi, 1996, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1996, Government Printing Press. Alipure,1996, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

১৯৯৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে উপরি উক্ত তিনটি জেলা থেকে মোট ২২ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। উক্ত ২২ জন বিধায়কের মধ্যে ২০ জন বিধায়ক বামপন্থী দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং দেবপ্রসাদ সরকার নির্দল ও প্রবোদ পুরকাইত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৭০] তবে জ্যোতি বসুর এই মন্ত্রীসভায় নমঃশূদ্র জাতির থেকে কান্তি বিশ্বাস, রাজবংশী জাতির থেকে দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া এবং যোগেশচন্দ্র বর্মন, মাল জাতি থেকে নিমাইচন্দ্র মাল'কে এবং বাগদি জাতি থেকে বিলাসীবালাকে মন্ত্রী হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় ১০ শতাংশ মন্ত্রী ছিল দলিত জাতির।[৭১] তবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ১২ জন বাম বিধায়কের মধ্যে থেকে কোন বিধায়ক মন্ত্রী করা হয়নি। কিন্তু নমঃশূদ্র জাতির ৮ জন বাম বিধায়কের মধ্যে থেকে ১ জনকে মন্ত্রী করা হয়েছিল। ফলে নমঃশূদ্র জাতির বাম বিধায়ক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়কগনের থেকে মন্ত্রিত্বের দিকে এগিয়ে ছিলে, এই মন্ত্রীসভা পর্যন্ত। এবং বিধানসভায় অধিবেশনে ও বিতর্কের অনুষ্ঠানে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বামপন্থী বিধায়কগণ ও মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেন। এর প্রমাণ আমরা পাই বিধানসভা অধিবেশনে দলিল ও দস্তাবেজ থেকে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্দল বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইত সরকারে বিরোধিতা করে নিজেদের ভূমিকাটা পালন করেছিলেন। কিন্তু কোন জাতিগত সমস্যার সমাধান বা নিজের জাতির উন্নতির ও দলিত জাতির উন্নতির

জন্যে কোন ভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় রাখতে পারেন নি। আবার সরকার পক্ষের পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র জাতির বাম বিধায়কগণ তো নিজ নিজ জাতির জন্যে বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধার লক্ষ্যে কোন নতুন বিলের উত্থান করতেই পারেনি।[৭২]

সারণি ৪.২৭: ২০০১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। সুশীল বিশ্বাস	কৃষ্ণগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। নয়ন সরকার	হাসখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৩। অসীম বালা	রাণাঘাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৪। কমলাক্ষ্মী বিশ্বাস	বাগদা (সংরক্ষিত)	এফ.বি.এল	নমঃশূদ্র
৫। কান্তি চন্দ্র বিশ্বাস	সন্দেশখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৬। হরিপদ বিশ্বাস	জগদ্দল	এফ.বি.এল	নমঃশূদ্র
৭। জগদীশ চন্দ্র দাস	বিজপুর	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ West Bengal Assembly Election Result, 2001, Election Commission of India, 2001. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who: 2001, Govt. Printing Press, Alipur, 2001, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এবং Statistical Report on General Elections, 2001 to the Legislative Assembly of West Bengal থেকে তথ্য নির্বাচনী কেন্দ্রের সংখ্যাগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

সারণি ৪.২৮: ২০০১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	রাজারহাট (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। নৃপেন গায়েন	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। সুজিত প্রমানিক	গোসাবা (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল	হাড়োয়া (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। সুভাষ নস্কর	বাসন্তী (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। প্রবোধ পুরকাইত	কুলতলি (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	ক্যানিং পশ্চিম (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। নির্মল চন্দ্র মণ্ডল	সোনারপুর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৯। দিলীপ মণ্ডল	বীষ্ণুপুর পূর্ব (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। বাঁশরি মোহন কাঞ্জি	মগরাহাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। চৌধুরী মোহন জাটুয়া	মন্দিরবাজার (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। যোগরঞ্জন হালদার	কুলপি (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩। দেবপ্রসাদ সরকার	জয়নগর	নির্দল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৪। বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা	সাগর	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৫। ঋষি হালদার	ডায়মন্ড হারবার	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ West Bengal Assembly Election Result, 2001, Election Commission of India, 2001. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who: 2001, Govt. Printing Press, Alipur, 2001, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এবং Statistical Report on General Elections, 2001 to the Legislative Assembly ,of West Bengal থেকে তথ্য নির্বাচনী কেন্দ্রের সংখ্যাগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

২০০১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া, দুই ২৪ পরগনা থেকে মোট ২২ জন বিধায়ক নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি থেকে নির্বাচিত

হয়েছিলেন। উক্ত ২২ জন বিধায়কের মধ্যে ১২ জন বিধায়ক বামপন্থী রাজনৈতিক দলের টিকিটে, ৬ জন বিধায়ক সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং ৩ জন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ১ জন বিধায়ক নির্দলের হয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৭৩] এই নির্বাচনে ৭ জন নমঃশূদ্র জাতির বিধায়ক বামপন্থী দলের টিকিটেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে ১৫ জন পৌণ্ড্র জাতির বিধায়কের মধ্যে ১০ জন বিধায়ক অবামপন্থী দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাজেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের মন্ত্রীসভায় ৫ জন দলিত জাতির মন্ত্রীদের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতির কান্তি বিশ্বাস মন্ত্রিত্বের স্থান পেলে কোন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়ক মন্ত্রীসভায় স্থান পান নি। বুদ্ধদেব বাবুর মন্ত্রীসভায় ৬.৬৬ শতাংশ দলিত জাতির মন্ত্রিছিলেন।[৭৪] মন্ত্রিত্বের দিক থেকে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্র জাতির থেকে এগিয়ে থাকলেও মন্ত্রী হিসাবে কান্তি বিশ্বাস তেমন কোন ভূমিকা বিধানসভায় রাখতে পারেন নি। এবং নমঃশূদ্র বিধায়কগন বিধানভার অধিবেশনে ও বিতর্কে জাতিগত দিক থেকে কোন ভূমিকা ও ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব অধিকার অর্জনের পক্ষ নিয়ে নমঃশূদ্র জাতির উদ্বাস্তুদের সুহারার কোন আলাপ আলোচনা করতে পারেন নি। কিন্তু পৌণ্ড্র জাতির ৬ জন সর্ভাভারতীয় তৃনমুল কংগ্রেসের বিধায়ক বিরোধী দল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন পরে বিধানসভায় সরকার বিরোধী ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।[৭৫]

সারণি ৪.২৯: ২০০৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস	কৃষ্ণগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
২। নয়ন সরকার	হাসখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৩। দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	রাণাঘাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৪। দুলাল বর	বাগদা (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	নমঃশূদ্র
৫। অবনী রায়	সন্দেশখালি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৬। অলোকেশ দাস	রাণাঘাট পশ্চিম	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৭। আনন্দ মোহন বিশ্বাস	বিষ্ণুপুর পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৮। ড. বীথিকা মণ্ডল	বারাসাত	এ.আই.এফ.বি	
৯। হরিপদ বিশ্বাস	জগদ্দল	এ. আই.এফ.বি.	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 2006 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2006, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly,

who’s who : 2006, Government Printing Press. Alipure,2006, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

সারণি ৪.৩০: ২০০৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র’র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	রাজারহাট (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। গোপাল গায়েন	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। চিত্তরঞ্জন মণ্ডল	গোসাবা (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। অসীম কুমার দাস	হাড়োয়া (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। সুভাষ নস্কর	বাসন্তী (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। জয়কৃষ্ণ হালদার	কুলতলি (সংরক্ষিত)	নির্দল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। দ্বিজপদ মণ্ডল	ক্যানিং পশ্চিম (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। শ্যামল নস্কর	সোনারপুর (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৯। যজ্ঞেশ্বর দাস	পাথরপ্রতিমা	সি.পি.আই.এ	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। বাঁশরি মোহন কাঞ্জি	মগরাহাট পূর্ব (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। ড. তপতি সাহা	মন্দিরবাজার (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। শকুন্তলা পাইক	কুলপি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩। দেবপ্রসাদ সরকার	জয়নগর	নির্দল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৪। ঋষি হালদার	ডায়মন্ড হারবার	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Electon, 2006 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2006, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who’s who : 2006, Government Printing Press. Alipure,2006, NLC. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত

প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

পশ্চিমবঙ্গের ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উক্ত তিনটি জেলা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মোট ২৩ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। উক্ত ২৩ জন বিধায়কের মধ্যে থেকে ২০ জন বিধায়ক বামপন্থী দলের টিকিটে নির্বাচিত আর ১ জন বিধায়ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ২ জন নির্দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ২৩৫ টি আসন পেয়েছিল। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র জাতির অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কোন আসনই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস পায়নি।[৭৬] ২০০১ সালের নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৬ টি আসন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস পেলেও এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কোন আসনই পায়নি। ২০০৬ সালের নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য মন্তব্য করেন ওরা ৩৯ আমরা ২৩৫। কাজেই বামফ্রন্টের মুখ্যমুন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবু বিরোধী রাজনৈতিক দলের শক্তির অস্থিত পশ্চিমবঙ্গে বেশ দুর্বল বলে তিনি মেনে নিয়ে বিরোধী দলের সঙ্গে কোনরূপ আলাপ আলোচনা না করেই সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ভারী শিল্প করার লক্ষ্যে অনিচ্ছুক চাষীদের থেকে সরকারি ভাবে জমি অধিগ্রহণ করার দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক ভাবে ভোটে পরাজিত মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে অনিচ্ছুক কৃষকদের নিয়ে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে বেশ বড় জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে ২০০৮ সালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের আলোচ্য তিনটি জেলার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পগনার জেলাপরিষদ তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেস দখল করে এবং নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা পঞ্চায়েত স্তরে বেশ ভালো ফল করে তৃণমূল কংগ্রেস। আবার ২০০৯ সালের ভারতের লোকসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এবং এস.ইউ.সি.আইয়েয় জোটবদ্ধ হয়ে তৃণমূল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে সর্বকালের সেরা ১৯ টি লোকসভার আসন পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পথে দ্রুতগতিতে

এগিয়ে চলে। এই চলার ক্ষেত্রে দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীর উৎসাহকে প্রেরণা হিসাবে তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মী ও বিধয়াকদের অদ্যম পরিশ্রমের ফলে ধীরে ধীরে গোটা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েই চলে। কাজেই দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জী সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সাথে সাথে তিন দশকের বামপন্থীদের ভোট ব্যাঙ্ক দলিত ও সাংখ্যালঘু ভোট নিজের দলের প্রতি আনার লক্ষ্যে নমঃশূদ্রদের মতুয়া ঠাকুর ও সাংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্থানে গিয়ে প্রচার ও তাদের ধর্মের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ও মতুয়াদের ধর্মীয় সদস্য হয়ে তাদের আস্থাভাজন হয়ে পড়েন। উক্ত সকল রাজনৈতিক কৌশলগুলো মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক কেরিয়ার বেশ মসৃণ করে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় নমঃশূদ্র নেতা কান্তি বিশ্বাস ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সুভাষ নস্কর 'সেচ ও জলসম্পদ বিভাগের' দায়িত্ব পায়। কান্তি বিশ্বাস স্কুল শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীনও নিজদলের অনুশাসনের বাইরে বেড়িয়ে এসে কোনরূপ জাতিগত পিছিয়ে পড়া জাতির জন্যে নতুন কোন শিক্ষার বিল এসে নিজ জাতি তথা দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা লাভের জন্যে আলদা করে বিধানসভায় তথা মন্ত্রীসভায় ভূমিকা রাখতে পারেন নি। অন্যদিকে পৌণ্ড্র জাতির সুভাষ নস্কর সুন্দরবনে অধ্যুষিত পৌণ্ড্রজাতির জন্যে চাষের জলের এবং শক্তপোক্ত নদী বাদ দেওয়া ক্ষেত্রেও তেমন কোন ভূমিকা বিধানসভায় রাখতে পারেন নি।[৭৭] উপরি উক্ত নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মন্ত্রীরা যে বিধানসভা তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেন না, সে দুটি জাতির বিধায়কেরা কী বিধানসভায় কোন ভূমিকা রাখতে পারেন। ফলে বলা যেতে পারে বামফ্রন্টের বিধায়কেরা ও মন্ত্রীরা জাতিগত সমস্যা থেকে শ্রেণীগত সমস্যার দিকে অধিক নজর দেওয়াটাই তাদের পার্টি লাইনের নির্দেশ মেনে চলতেন। তাইতো কোন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বামপন্থী বিধায়কেরা নিজ নিজ জাতির হয়ে কোন ভূমিকা বিধানসভায় রাখতে পারেননি।

সারণি ৪.৩১: ২০১১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। সুশীল বিশ্বাস	কৃষ্ণগঞ্জ (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
২। সমীর কুমার পোদ্দার	রাণাঘাট উত্তর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
৩। আবীর রঞ্জন বিশ্বাস	রাণাঘাট দক্ষিণ (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
৪। ড. রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	কল্যাণী (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
৫। নীলিমা নাগ মল্লিক	হরিণঘাটা (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র

৬। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	বাগদা (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
৭। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	বনগাঁ উত্তর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
৮। সুরজিত কুমার বিশ্বাস	বনগাঁ দক্ষিণ (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
৯। মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর	গাইঘাটা (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections, 2011to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2011 ,পৃঃ ৩৪০-৫৯। West Bengal Assembly Election Result, 2011, Election Commission of India, 2006. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 2011, Govt. Printing Press, Alipur, 2011, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

সারণি ৪.৩২: ২০১১ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। বীণা মণ্ডল	স্বরূপনগর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। উষা রানী মণ্ডল	মিনাখাঁ (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। আনন্দময় মণ্ডল	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পিয়াই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। জয়ন্ত নস্কর	গোসাবা (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। সুভাষ নস্কর	বাসন্তী (সংরক্ষিত)	আর.এস.পি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। রামশঙ্কর হালদার	কুলতলি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। জয়দেব হালদার	মন্দিরবাজার (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। তরুণ কান্তি বিশ্বাস	জয়নগর (সংরক্ষিত)	এস.ইউ.সি.আই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৯। নির্মলচন্দ্র মণ্ডল	বারুইপুর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। শ্যামল মণ্ডল	ক্যানিং পশ্চিম (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। দিলীপ মণ্ডল	বিষ্ণুপুর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। দীপক কুমার হালদার	ডায়মন্ড হারবার	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩। যগরঞ্জন হালদার	কুলপি	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections, 2011to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2011 ,পৃঃ ৩৪০-৫৯। West Bengal Assembly Election Result, 2011, Election Commission of India, 2006. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 2011, Govt. Printing Press, Alipur, 2011, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনা থেকে ২৩ জন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত বিধায়কের মধ্যে ১৮ জন বিধায়ক সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে এবং ১ জন এস.ইউ.সি.আই এবং ৩ জন বামপন্থী দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৩ জন নির্বাচিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির বিধায়কের মধ্যে মাত্র ৬ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিল সর্বাভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে আর ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৯ জন নমঃশূদ্র ও ৯ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়।[৭৮] সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ২০০৬ সালের নির্বাচনে ৯ জন নির্বাচিত নমঃশূদ্র বিধায়কই বামপন্থী দলের টিকিটে নির্বাচিত হন, সেখানে ২০১১ সালের নির্বাচনে ৯ জন বিধায়কই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হন। নমঃশূদ্র অধ্যুষিত ৯ টি বিধানসভায় তৃনমুল কংগ্রেসের জয়ের পিছনে মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ীর বড়মা বীণাপাণি দেবী ঠাকুর ভূমিকা স্ববিশেষ, এছাড়াও ১৯৭৮-৭৯ সালের মরিচঝাঁপিতে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের উপর বামপ্রশাসনের ভূমিকা ও তখনকার শাসকদলের ভূমিকা এবং সর্বপরি সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলন তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও এস.ইউ.সি.আই জোট বদ্ধ হয়ে ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের

উচ্ছেদ ঘটানোর পক্ষে উপরি উক্ত ভূমিকা ও রাজনৈতিক কৌশল বিশেষ ভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। অন্যদিকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলি থেকে ২০০৬ সালে ১৪ টি আসনের মধ্যে ৬ টি আসন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল, আর ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৩ টি আসনের মধ্যে ৯ টি আসন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস পায়। কাজেই ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সমর্থন পায় মমতা ব্যানার্জী। যেমন ১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সমর্থন বামপন্থীরা একচেটিয়া পেয়েছিল, ঠিক ২০১১ সালের নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সমর্থনও একচেটিয়া পায়। ফলে ২০১১ সালের মমতা ব্যানার্জীর মন্ত্রীসভায় নমঃশূদ্র জাতির ড. উপেন বিশ্বাস, মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর, রাজবংশী জাতির বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, হিতেন বর্মন, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির শ্যামল মণ্ডল এবং বাগদি জাতি থেকে সুনীলচন্দ্র তিরকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়।[৭৯] মমতা ব্যানার্জীর মন্ত্রীসভায় ২ জন নমঃশূদ্র জাতির বিধায়ক হলেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি থেকে কেমবল মাত্র ১ মন্ত্রীসভায় স্থান পায়। কাজেই মন্ত্রীসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্র জাতির মন্ত্রীরা সংখ্যাগত দিক থেকে অধিকা ভূমিকা রেখেছেন।

লোকসভায় নমঃশূদ্র জাতির সাংসদের ভূমিকার রাখা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, আরেকবার নিবিঢ় গবেষণার প্রয়োজনে উল্লেখ করলাম। ২০১৫ সালের উপনির্বাচনের সময় বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রতে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের বড় ছেলে সুব্রত ঠাকুরকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস টিকিট না দেওয়ায় সুব্রত ঠাকুর ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে জেঠিমা মমতা ঠাকুরের কাছে পরাজিত হয়। সুব্রত ঠাকুরের পরাজয়ের পরে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর দলনেত্রী মমতার ব্যানার্জীর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। আমরা যখন বনগাঁ লোকসভার পরাজিত বি.জে.পি প্রার্থীর বাবার কাছে ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্ন করে যে, কি কারণে আপনি মন্ত্রিত্বের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। তখন তিনি বলেন, “মমতা ব্যানার্জী যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ভাবে সমর্থন আদায় করেছিলেন, সরকারে এসে তার কোন প্রতিশ্রুতি পালন করতে আগ্রহী ছিলেন না। মমতা ব্যানার্জী তো আমার কোন কথাই শোনেন না। কাজেই ঐ দলের মন্ত্রী হিসাবে আমি কোন কাজ করতে পারব না । তাই ২০১৫ সালে আমি মমতা ব্যানার্জীর মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করি”।[৮০] আমরা তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রীকে প্রশ্ন করি যে, মমতা ব্যনার্জী আপনার বাবার নামে সরকারি কলেজ স্থাপন করা সত্ত্বেও

কেন আপনি মন্ত্রী থেকে ও পরে দল থেকে পদত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে গেলেন। তখন তিনি বলেন, “ভারতীয় জনতা দল আমার মতুয়াদের যথেষ্ট সম্মান করে তাই গিয়েছিলাম”।[৮১] আরও তিনি বলেন, “আমার দলত্যাগের ফলেই তো মমতা ব্যনার্জী ভয় পেয়ে মতুয়া ভোটের আশায় হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদের নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। যদিও এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নির্দিষ্ট ক্যাম্পাস ও শিক্ষক নিয়োগের কাজই শুরু করতে পারেন নি। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঘোষণা করলেই তো হয় না। তার উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি না করলে ছাত্র-ছাত্রিরা পঠন – পাঠন শুরু করবে কি করেন”।[৮২] তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রীকে আমরা আরও একটা প্রশ্ন করি যে, প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক, প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের গাইঘাটার বিধায়ক, এবং ঠাকুরনগরের তৃণমূলের দলের রাজনৈতিক নেতারা বলেন যে, প্রাক্তন মন্ত্রীর বড় ছেলে তৃণমূলের টিকিট না পাওয়ার জন্যেই ওনি ভারতীয় জনতা দলের যোগদিয়েছেন। উত্তরে তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, “ওনারে মতুয়াদের অভাব অভিযোগ নিয়ে কোন দিন কি দলনেত্রীর কাছে আবেদন করেছেন। যদি আবেদন করতেন তাহলে দলনেত্রীর মনোভাব বুঝতে পারতেন মতুয়াদের বা নমঃশূদ্রদের নিয়ে তাঁর কী ধারণা। তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক তো নমঃশূদ্রদের নিয়ে কোনো দিন বিধানসভায় কোনো দাবিদাওয়া উত্থাপন করতে পারেন নি। আমি তো ওনাদের মতো তৃণমূলের দলদাস হয়ে থাকতে পারিনি তাই দল আমাকে ঠিক ঠাক ভাবে গুরুত্ব দিতেন না। আমি স্বাধীন ভাবে মন্ত্রীসভায় কাজ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি, তাই তো তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করি”।[৮৩] এই প্রসঙ্গে বনগাঁর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ এবং ঠাকুর বাড়ীর সংঘজননী বলেন, “প্রাক্তন তৃণমূলের মন্ত্রী চেয়েছিলেন আমার স্বামী মারা যাওয়ায় ওঁর বড় ছেলেকে তৃণমূলের টিকিটে উপনির্বাচনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্যে কিন্তু দল ওদের টিকিট না দিয়ে আমাকে টিকিট দেয়। এর ফলে ওঁ আর ওঁর বড় ছেলে ভারতীয় জনতা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে বি.জে.পির প্রার্থী হন, আর আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ নমঃশূদ্র ও মতুয়া ভক্তদের স্বার্থের কথা ভেবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে রাজী হয়েছিলাম এবং নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমি বৃহত্তর নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের অভাব অভিযোগ নিয়ে লোকসভায় নানা সময় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া রাখতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আমিও স্বীকার করব যে, আমি তৃণমূলের সাংসদ ছিলাম নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের সাংসদ ছিলাম না, দলের অনুশাসনের বাইরে বেড়িয়ে স্বাধীন ভাবে নমঃশূদ্র ও মতুয়াদের উন্নয়ন নিয়ে

তেমন কোন কাজ করতে পারিনি, তবে হ্যাঁ তৃণমূল কংগ্রেস মতুয়াদের যে সকল উন্নয়ন মূলক কাজ ও স্বীকৃতি দিয়েছে, তা স্বাধীন ভারতের কোন রাজনৈতিক দল আমাদের দেয়নি। তবে আমাদের মতুয়াদের নীতি আদর্শ ঠিক না, কারণ হল এঁরা নিজের ব্যাক্তিগত স্বার্থের জন্যে নিজের দল ত্যাগ করতে কোন দ্বিধাবোধ করে না। কাজেই আমার জাতির মানুষকে কোন রাজনৈতিক দলই বিশ্বাস করে না। এই না করার কারণ হল মমতা ব্যানার্জী তার লোকসভার সাংসদ তহবিল থেকে ঠাকুর বাড়ীর মন্দির ও কামনা সাগরকে যে ভাবে নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছে এবং আমার শ্বশুর মহাশয়ের নামে সরকারি কলেজ এবং হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে বিশ্ববিদ্যালয়য় করে দিয়েছেন এর পরেও যদি নমঃশূদ্র ও মতুয়ারা তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন না করে বি.জে.পিকে সমর্থন করে তা হলে বলতে হয় একদিন নমঃশূদ্র বা মতুয়ারাও বি.জে.পির থেকে সরে যাবে নিজেদের স্বার্থের জন্যে। কাজেই আমি বিশ্বাস করি আমার দল তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে আমার জাতির উন্নতির জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন ভারতের আর কোন রাজনৈতিক দল নিতে পারবে না”।[৮৪] আবার এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রীর বড় ছেলে বলেন যে, প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের বনগাঁর সাংসদ ওঁ তো, “মমতা ব্যানার্জীর অন্ধ সমর্থক উনিতো নমঃশূদ্র বা মতুয়াদের জন্যে কোন উন্নয়নমূলক কাজই করেননি”।[৮৫] তবে দেখা গেছে নমঃশূদ্রদের জন্যে তৃণমূল এখনও পর্যন্ত যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন ভারতের আর কোন রাজনৈতিক তা করতে পারেন নি, ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মন্ত্রী তথা বিধায়কগণ বামপন্থী সরকারে আমলের বিধানসভা অধিবেশনের চেয়ে অধিক পরিমানে নিজ নিজ এলাকা ও জাতির উন্নয়নের জন্যে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। কাজেই দীর্ঘদিনের বামপন্থী দলের অনুশাসন থেকে বেড়িয়ে এসে উক্ত জাতির বিধায়ক ও মন্ত্রীরা বেশ স্বাধীন ভাবেই বিধানসভায় নিজেদের মতামত দিতে পেরেছেন।[৮৬] কাজেই নিজ নিজ জাতির নিকট বিধায়কগণ ও মন্ত্রীরা বেশ গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মন্ত্রী শ্যামল মণ্ডল দলের স্বার্থে ২০১৫ সালে মন্ত্রীত্ব থেকে সরে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তি বিস্তারের কাজে নিয়োজিত হন।

সারণি ৪.৩৩: ২০১৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র’র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। সত্যজিৎ বিশ্বাস	কৃষ্ণগঞ্জ (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
২। সমীর কুমার পোদ্দার	রাণাঘাট উত্তর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র

৩। রমা বিশ্বাস	রাণাঘাট দক্ষিণ (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	নমঃশূদ্র
৪। ড. রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	কল্যাণী (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
৫। নীলিমা নাগ মল্লিক	হরিণঘাটা (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
৬। দুলাল চন্দ্র বর	বাগদা (সংরক্ষিত)	আই.এন.সি	নমঃশূদ্র
৭। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	বনগাঁ উত্তর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
৮। সুরজিত কুমার বিশ্বাস	বনগাঁ দক্ষিণ (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র
৯। পুলিন বিহারী রায়	গাইঘাটা (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections, 2016 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2016, the Legislative Assembly of West Bengal Detailed Results, থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। West Bengal Assembly Election Result, 2016, Election Commission of India, 2006. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 2016, Govt. Printing Press, Alipur, 2016, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

সারণি ৪.৩৪: ২০১৬ সালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম

জয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনীক্ষেত্র'র নাম	রাজনৈতিক দল	জাতির নাম
১। বীণা মণ্ডল	স্বরূপনগর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
২। উষা রানী মণ্ডল	মিনাখাঁ (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৩। দেবেশ মণ্ডল	হিঙ্গলগঞ্জ (সংরক্ষিত)	সি.পিয়াই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৪। জয়ন্ত নস্কর	গোসাবা (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৫। গোবন্দ চন্দ্র নস্কর	বাসন্তী (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৬। রামশঙ্কর হালদার	কুলতলি (সংরক্ষিত)	সি.পি.আই.এম	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৭। জয়দেব হালদার	মন্দিরবাজার (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
৮। বিশ্বনাথ দাস	জয়নগর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

৯। নির্মলচন্দ্র মণ্ডল	বারুইপুর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১০। শ্যামল মণ্ডল	ক্যানিং পশ্চিম (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১১। দিলিপ মণ্ডল	বিষ্ণুপুর (সংরক্ষিত)	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১২। দীপক কুমার হালদার	ডায়মন্ড হারবার	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
১৩। জগরঞ্জন হালদার	কুলপি	এ.আই.টি.সি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ Statistical Report on General Elections, 2016 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2016, the Legislative Assembly of West Bengal Detailed Results, থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। West Bengal Assembly Election Result, 2016, Election Commission of India, 2006. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 2016, Govt. Printing Press, Alipur, 2016, NLF. থেকে জাতিগত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, মমতা ঠাকুর, খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, তন্ময় পোদ্দার, ডাঃ সুকুমার হালদার, ভবানী শঙ্কর রায়, বিনোদ বৈরাগী, তুষার কান্তি বিশ্বাস, রক্তিম দাস,। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তারা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, সুধাকর সরদার, তারকনাথ জাটুয়া, মেঘনাথ হালদার, বিনোদ সরদার, পঙ্কজ কুমার তাঁতী, শান্তনু নস্কর।

২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া এবং দুই ২৪ পরগনা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মোট ২২ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়। উক্ত ২২ জন বিধায়কের মধ্যে ১৮ জন বিধায়ক সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে, ৩ জন বিধায়ক সি.পি.আই (এম) এবং ১ জন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়।[৮৭] উক্ত নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির প্রায় ৮০ শতাংশ বিধায়কই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হলেও দ্বিতীয় মমতা সরকারের মন্ত্রীসভায় দু'টি জাতির কোন বিয়ায়কই স্থান পাননি। উক্ত মন্ত্রীসভায় দলিত জাতির ৬ শতাংশ অংশীদারি হয়।[৮৮] কাজেই উক্ত মন্ত্রীসভায় পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র জাতির বিধায়কগণ কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি। তবে বিধানসভার অধিবেশনে উক্ত দুই জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কগণ সরকারে সঙ্গে থেকে নিজ নিজ এলাকায় উন্নতির জন্যে বিশেষ কিছু ভূমিকা পালন করেন। যেমন প্রাক্তন

তৃণমূল কংগ্রেসের বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক তাঁর বিধানসভার এলাকাই হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে বিধানসভায় আলোচিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিলের স্বপক্ষে মতামত দিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৮৯] তাইতো বলা যায় আমাদের গবেষণায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির বিধানসভায় ভূমিকা হিসাবে সময় ধরেছি ১৯৭১-২০১৬ সাল পর্যন্ত কাজেই দ্বিতীয় মমতা ব্যানার্জীর শাসনের মাত্র ৮ মাস সময় নিয়ে দুটি জাতির বিধানসভায় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। ফলে অল্পসময়ের মধ্যে পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র জাতির তৃণমূল বিধায়কেরা সরকারের পক্ষে থেকে নিজ নিজ এলাকায় বিধায়কের তহবিল থেকে ভালোই কাজ করেছেন। এবং বিধানসভার অধিবেশনে উপস্থিত থেকে নিজের জাতির ও এলাকার অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরতেও পেরেছেন। দুই জাতির তিনজন বিধায়ক বিরোধী দলের হয়ে বিধানসভায় সরকারের বিরোধিতা করে ভূমিকা পালন করেন। কংগ্রেস বিধায়কও নিজের এলাকার উন্নতির জন্যে বিধানসভায় সওয়াল হয়েছেন। কিন্তু তিনি বিধানসভায় তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন নি।

মুল্যায়নঃ

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, লোকসভায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার সময় সীমা ধরেছি ১৯৭১-২০১৬ সাল পর্যন্ত। নমঃশূদ্র জাতি অধ্যুষিত নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রে ১৯৭১-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বামপন্থী দলের সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার কারণে ওঁদের জাতির থেকে মন্ত্রী হওয়ার কোন সুযোগ পায় নি। কারণ হল লোকসভায় কোন দিনই বামপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। তাইতো তাঁরা কেউই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন নি বা অন্যকোনো মন্ত্রীও হতে পারেন নি। বামপন্থী নমঃশূদ্র সাংসদের পক্ষে তাঁদের নিজের জাতির ও উদ্বাস্তুদের নিয়ে লোকসভায় নিজের কোন মতামত দিতে পারেন। কারণ হল, বামপন্থীদের রাজনৈতিক কিছু অনুশাসন থাকে তার বাইরে বেড়িয়ে কোন কাজ সাংসদরা করতে পারে না। তবে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভা ঘোষ গোস্বামী ভারতের লোকসভায় যে ভূমিকা দেখতে পেয়েছি, তা হল শ্রেণী সংগ্রাম নিয়ে তর্কবিতর্কে বেশির ভাগ সময় মতামত দিয়েছেন। বিভা দেবী নিজেও বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেত্রীত্ব স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেও পরে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে কোনরূপ গঠনমূলক কাজের নিদর্শন আমরা পাই নি। বিভা ঘোষ গোস্বামীর বাবা ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী কাজেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক

ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ফলে শৈশব কাল থেকেই বিভা দেবী জাতি-ভিত্তিক আন্দোলন থেকে শ্রেণীগত সচেতনার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। সাংসদ বিভা দেবী হয়তো তাঁর জাতির সমস্যা নিয়ে লোকসভা কোনরূপ ভূমিকা পালন না করলেও দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার নিয়ে লোকসভায় বহুবিতর্কে অংশগ্রহণ করে নিজের তেজস্বী বক্তব্য রাখতে কোন জড়তা বোধ করতেন না। বিভা ঘোষ গোস্বামী যেহেতু নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে থেকে ওঠে আসা রাজনৈতিক নেত্রী ছিলেন না, সেহেতু তিনি নমঃশূদ্র জাতির অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত তেমন কোন ধারণাও ছিল না। তাইতো তিনি লোকসভায় সবসময় জাতিগত রাজনৈতিক চেতনা থেকে শ্রেণীগত রাজনৈতিক চেতনার প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পেরেছেন। মথুরাপুর কেন্দ্রের সাংসদ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ মধুরজ্যা হালদার (১৯৭১-১৯৭৭) ও মুকুন্দ কুমার মণ্ডল (১৯৭৭- ১৯৮৪) বামপন্থী সাংসদ হওয়ার কারণে বিভা ঘোষ গোস্বামীর মত লোকসভায় কোনরূপ জাতিগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন নি। ওঁনারা যা ভূমিকা লোকসভা রেখেছেন তা হল দরিদ্র শ্রেণীর জন্যে ও শ্রেণী চেতনা রাজনীতিতে। জয়নগর কেন্দ্রেও পৌণ্ড্রজাতির মানুষ শক্তি কুমার সরকার (১৯৭১-১৯৭৭ এর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে) ও (১৯৭৭-১৯৮০ পর্যন্ত ভারতীয় লোকদলের টিকিটে) নির্বাচিত হয়ে তাঁর নিজের জাতিগত উন্নয়ন ও এলাকার উন্নতি জন্যে লোকসভার অধিবেশনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বামপন্থী সাংসদ সনৎ কুমার মণ্ডল জয়নগর কেন্দ্র থেকে টানা ১৯৮০- ২০০৯ সাল পর্যন্ত সাংসদ ছিলেন। সনৎ কুমার মণ্ডলও বিভা ঘোষ গোস্বামীর ন্যায় শ্রেণী চেতনার ক্ষেত্রে লোকসভায় ভূমিকা রেখেছেন, জাতিগত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি। আবার মথুরাপুর কেন্দ্রের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাংসদ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ মনোরঞ্জন হালদার ১৯৮৪-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সরকারের পক্ষের সাংসদ হওয়ার দরুন লোকসভায় জাতিগত ও নিজের সাংসদ এলাকার উন্নয়নের জন্যে দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে বাম সাংসদদের থেকে বেশ ভালো ভূমিকা পালন করেছেন। বিভা ঘোষ গোস্বামীর রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরে নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই. (এম)র টিকিটে অসীম বালা ১৯৮৯-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সাংসদ হয়েছিলেন। নমঃশূদ্র জাতির মানুষ অসীম বালার বাড়ি ঠাকুরনগরে তিনি নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলন ও প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের উদ্বাস্তু ও মতুয়া আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু বালা বাবু লোকসভায় কখনও নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের জন্যে কোন পদক্ষেপ করেন নি।

এক্ষেত্রে আমরা ১৯৮৯-১৯৯৯ সালের মধ্যে কতগুলো লোকসভার অধিবেশনে এবং বিতর্ক সভার সরকারি তথ্য থেকে জানতে পারি। এই সময়ের মধ্যে নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদ নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সঙ্গে যখন আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্ন করি যে, আপনি কি স্বাধীনভাবে লোকসভায় আপনার জাতির হয়ে কোন বিল উথ্থাপন করতে পেরেছেন? উত্তরে প্রাক্তন সি.পি.আই.এমের সাংসদ বলেন, "আমি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারতাম কিন্তু দলের নীতির বাইরে বেরিয়ে কোন কাজ বা মতামত ও বিল উথ্থাপন করতাম না"।[৯০] কাজেই সি.পি.আই.এমের সাংসদের কথাই বামপন্থী রাজনৈতিক দলের রীতি নীতি নমঃশূদ্র ও মতুয়াদের জন্য কি ছিল তা তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ব্যাখ্যার উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, "আমার দল দরিদ্র মানুষের স্বার্থের জন্যে কাজ করেন, কাজেই আমার জাতির অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র, ফল, আমার দলের দ্বারা নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ব্যাপক ভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবে উন্নতি ঘটেছে বলে মনে করি।[৯১] শুধু মনে করি বললে হয় না তথ্য প্রমাণ দিতে হয়, উত্তরে তিনি বলেন, "বিভিন্ন সালের পঞ্চবার্ষিকীর রিপোর্ট ও সরকারি দলিল-দস্তাবেজ দেখলেই তার প্রমাণ পাবেন"।[৯২] আমরা প্রশ্ন করি, "ওগুলো তো কেন্দ্র সরকারের পরিকল্পনার রিপোর্ট আপনারা রাজনৈতিক দল কেন্দ্র সরকারে মূল ক্ষমতায় কোন থাকেন নি, তাহলে কেন দাবি করছেন যে, নমঃশূদ্র ও মতুয়াদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনি সাংসদ থাকালীন তাঁদের সামাজিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ব্যাপক ঘটেছে"।[৯৩] কিন্তু আমরা বিভিন্ন সরকারি তথ্য প্রমাণ থেকে জানতে পেরেছি যে, বামপন্থী নমঃশূদ্র সাংসদগণ লোকসভায় সামাজিক ভেদাভেদ নিয়ে তেমন কোন বিতর্কে অংশগ্রহণ বা ভূমিকাও রাখতে পারেন নি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে থেকে পৌণ্ড্র জাতির মানুষ রাধিকা রঞ্জন প্রামানিক (১৯৮৯- ২০০৪ সাল পর্যন্ত সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত হন) ও বাসুদেব বর্মন (২০০৪-২০০৯ সাল পর্যন্ত সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত) কাজেই উক্ত দুজন বামপন্থী সাংসদ লোকসভায় জাতিগত উন্নয়নের চেয়ে শ্রেণীগত উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে বি.জে.পি ও তৃণমূলের জোট প্রার্থী আনন্দ মোহন বিশ্বাস নির্বাচিত হন। কাজেই কেন্দ্রে সরকারের অল্পকিছু দিনের জন্য সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, বি.জে.পি জোট সরকার সঙ্গে ছিলেন, মমতা ব্যানার্জী রেলমন্ত্রী হন। ফলে সাংসদ আনন্দ মোহন বিশ্বাস লোকসভায় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া রাখতেন এবং নিজের কিছু মতামতা স্বাধীনভাবে দিতে পারতেন, যা কিনা বামপন্থী সাংসদ নমঃশূদ্ররা দিতে

পারেনি।[৯৪] ২০০৩ সালে নতুন নাগরিকত্ব আইন আসার ফলে নমঃশূদ্রদের বিরাট অংশের মানুষ নাগরিকত্ব না থাকায় নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েন। এই সময় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ আনন্দ মোহন বিশ্বাস নমঃশূদ্রদের হয়ে লোকসভায় কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি এবং সাধারণত নমঃশূদ্র সমস্যার কোন সুহারা দিতেও পারেন নি। এর কারণ হল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস বি.জে.পির জোট সরকারে ছিলেন না। সাংসদ আনন্দ মোহন বিশ্বাস নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলনের কথা মাথায় রেখেই জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক কাঠামোর শক্তভূমি রচনা করার ক্ষেত্রে তাঁর সাংসদ এলাকার নমঃশূদ্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁদের মতামত শুনে লোকসভায় নিজের জাতির হয়ে সওয়াল হয়েছেন।[৯৫] এর প্রমাণ আমরা পাই ১৯৯৯-২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি যে সকল বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করেছেলেন সেই সরকারি দলিল দস্তাবেজ ও সরকারী রিপোর্ট থেকে। ২০০৩ সালের এন.ডি.এ সরকারের নতুন নাগরিকত্ব আইনের ফলে ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আবার নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই.এম প্রার্থী নমঃশূদ্র জাতির মানুষ নির্বাচিত হন। সি.পি.আই.এম সাংসদ তাঁর নির্বাচনের প্রচারে সময় বলেছিলেন, "আমরা বামপন্থীরা যদি কেন্দ্রে সরকার গড়ি, তাহলে নাগরিকত্বের ২০০৩ সালের আইনের সংশোধন করে নমঃশূদ্রদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে"।[৯৬] কিন্তু নির্বাচনের পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সরকার গঠন করার জন্যে প্রয়োজনীয় লোকসভার সাংসদ না থাকার কারণে সরকার গড়তে সমস্যা দেখা দিলে বামপন্থী দলগুলো বাইরে থেকে সমর্থন করে কংগ্রেস দলকে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। ২০০৪-২০০৯ সালের মধ্যে লোকসভার অধিবেশনে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদ যতবার বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন, কোন বারই তিনি নমঃশূদ্রদের নাগরিকত্ব নিয়ে কথা বলেন নি। নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদ কথায়, "আমরা তো বামপন্থী দলের সাংসদ আমরা তো নমঃশূদ্রদের সাংসদ হতে পারি নি। কাজেই দলীয় অনুশাসনের বাইরে বেড়িয়ে নিজের জাতির সমস্যা নিয়ে কথা বলা যায় না। তাইতো লোকসভায় জাতিগত দাবি-দাওয়া নিয়ে সওয়াল না হতে পারলেও দরিদ্র শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি করার লক্ষ্যে সওয়াল হতে পেরেছেন"।[৯৭]

আবার সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের গ্রামের আন্দোলনের মাধ্যমে এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষের অধ্যুষিত লোকসভা আসনের ১০০ শতাংশ লোকসভা আসন পায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। কাজেই দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জী

নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির লোকসভার সাংসদদের বিশেষ স্বাধীনতা দিয়ে লোকসভার বিতর্কে সভায় অংশগ্রহণের অধিকার দেয়। ফলে রাণাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের নমঃশূদ্র জাতির মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ এবং বনগাঁ কেন্দ্রের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও জয়নগর কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী সাংসদ এবং মথুরাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ লোকসভা কেন্দ্রের উন্নতি ঘটানোর জন্যে লোকসভার অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে পেরেছেন বলে তাঁরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন।[৯৮] তবে মথুরাপুর লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ বলেন, "আমি তো সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কোন নির্দিষ্ট দলিত জাতির সাংসদ নোই, আমি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ হতে পারি, তার মানে এই নয় যে, শুধুমাত্র লোকসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের উন্নয়নের কথা বলবো। আমি আমার সাংসদ এলাকার সকল মানুষের জন্যেই কাজ করি।[৯৯] কিন্তু বিরোধী প্রার্থীর আমাদের বলেন, "মথুরাপুর লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ভোটের আগে প্রচারে বলেছিলেন, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির জন্যে বিশেষ বিশেষ উন্নয়ন মূলক কাজ করবো। কাজেই উনি নির্বাচিত হওয়ার পরে এখন বলছেন সব জাতির মানুষের জন্যেই কাজ করেছি। আমার যতদূর জানা আছে ওঁনি লোকসভায় ওঁনার এলাকার জন্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রস্তাব রাখতে পারেন নি"।[১০০] তবে বলা যেতে পারে চৌধুরী মোহন জাঁতুয়া একজন নিষ্ঠাবান তৃণমূল সাংসদ হিসাবে তাঁর ভূমিকা লোকসভায় রেখেছেন। ২০১৪ সালে নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনা র ৪ টি সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে নমঃশূদ্র জাতির তাপস মণ্ডল রাণাঘাট ও কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর বনগাঁ এবং জয়নগর ও মথুরাপুর কেন্দ্র থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রতিমা মণ্ডল ও চৌধুরী মোহন জাটুয়া, ৪ জন সাংসদই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হন। এই ৪ জন সাংসদ লোকসভায় বামপন্থী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র সাংসদের থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের উক্ত জাতি দুটির সাংসদগণ নিজ নিজ জাতির ও এলাকার উন্নতির জন্যে লোকসভায় স্বাধীনভাবে অধিক ভূমিকা রেখেছেন। বনগাঁ কেন্দ্রের মতুয়া তথা নমঃশূদ্র জাতির মানুষ মমতা ঠাকুর সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ নিজের এলাকার উন্নতির জন্যে সাংসদ তহবিল ব্যয়ে লোকসভার অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে দলিত সাংসদ জাতির সাংসদ নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় গিয়েছিলেন তাঁদের সবার থেকে অধিক ভূমিকা রেখেছেন।[১০১]

পরিশেষে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে যে, সকল ভূমিকা রেখেছেন তার মূল্যায়ন করব।

১৯৭১-১৯৭৭ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দুটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসন জারী থাকার দরুন কোন বিধায়ক বা মন্ত্রী বিধানসভায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতার আমূল পালাবদল ঘটে। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। বামফ্রন্ট সরকার জমিদারী প্রথা ও ভূমিসংস্কার করে দরিদ্র জনগণের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। উক্ত সংস্কারের ফলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় তথা নমঃশূদ্র জাতির দরিদ্র ও ভূমিহীন মানুষেরা ব্যাপক লাভবান হন। তাইতো ১৯৭৮-১৯৮৯ সালের মরিচঝাঁপিতে বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপক অত্যাচারের শিক্ষার হওয়া সত্ত্বেও নমঃশূদ্ররা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তেমন জোড়তোর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। কারণ হল বেশির নমঃশূদ্র বিধায়ক বামপন্থী দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বেশির ভাগ নমঃশূদ্র রাজনৈতিক ব্যক্তিগন বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে থাকার দরুন কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু দরদী বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীর আহ্বানে বামফ্রন্ট সরকারের বিরদ্ধে যেতে চাননি। ১৯৭৭-২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সরকারে একটানা ৩৪ বছর থাকার কারণে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিধায়কগণ জাতিগত তথা নিজের এলাকার উন্নতির জন্যে তেমন কোন ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। আর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষ বামফ্রন্টের বিধায়ক ও মন্ত্রীগণ তারা তো নিজ নিজ জাতির উন্নতি এবং আলাদা ভাবে জাতিগত সমস্যা সমাধানের জন্যে বিধানসভায় কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি। উক্ত দুটি দলিত জাতির বিধায়কগণ ও মন্ত্রীগণ যা ভূমিকা বিধানসভায় রেখেছেন, তা বামপন্থী দলের রীতি নীতি মেনেই রেখেছেন। এর আগেও আমরা বার বার উল্লেখ করেছি যে, বামপন্থী দলের মূল আদর্শ হল, শ্রেণী সংগ্রাম করা জাতিগত সমস্যা নিয়ে আলাদা কোন ভূমিকা পালন করা হবে না। বামেদের বিশ্বাস ছিল শ্রেণী সংগ্রাম কার্যকর হলে জাতিগত সমস্যা আর পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখাগেছে উপরে উপরে যদিও জাতিগত ভেদাভেদ না মানলেও বামেদের মন্ত্রীসভায় নামের তালিকার পদবী লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, তাঁরা জাতিগত উচ্চু-নিচু ভেদাভেদ প্রাধান্য দেয়েছিল কি না? উত্তরে বলা যায় হ্যাঁ দিয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় উল্লেখ করেছেন, এই ভাবে “ কান্তি

বিশ্বাস স্কুল শিক্ষামন্ত্রী হলে, কান্তি গাঙ্গুলী বলেছিলেন এই রে এবার চণ্ডালের শিক্ষা নীতি আমাদের মেনে চলতে হবে”।[১০২] এই যদি একজন বামপন্থী উচ্চবর্ণের মন্ত্রীর মনোভাব হয়। তাহলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র জাতির বাম বিধায়কগণ বিধানসভায় কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন কী? তবে বলা যেতে পারে বামফ্রন্টের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক মানুষের রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি পায় কিন্তু নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র জাতি থেকে রাজ্যস্তরের গুরুত্বপূর্ণ কোনো নেতা-নেত্রী উঠতে পারেননি। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের অবসান ঘটিয়ে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়। মমতা সরকারের রীতি নীতি হয়ে দাঁড়ায় দলিত জাতির ও সংখ্যালঘু জাতির সার্বিক উন্নয়নের এবং আদিবাসীদের ধারাবাহিক উন্নতি করা। তবে ২০১১ সালের পরে যে সকল নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়কেরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জাতির জন্য বিধানসভা বক্তব্য রাখতে পেরেছেন। আমাদের সমীক্ষিত ৩টি জেলার নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়কদের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার থেকে ওঠে আসা একমাত্র তৃণমূলের কংগ্রেসের মন্ত্রী ও ঠাকুর বাড়ীর সদস্য দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীর জন্যে স্বাধীনভাবে বিধানসভায় ভূমিকা রাখতে পারেননি বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মন্ত্রী বা বিধায়কগণ এমন কোন কথা বলেন নি, তাঁরা বলেছেন তৃণমূল দলের বিধায়ক হওয়ার জন্যে আমরা স্বাধীনভাবে বিধানসভায় নিজ নিজ জাতির এবং এলাকার উন্নতির জন্যে বিধানসভায় ভূমিকা রাখতে পেরেছি।[১০৩] কাজেই বলা যেতে পারে ৫ বছরের তৃণমূল সরকারের আমলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়ক ও মন্ত্রীরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জাতির এবং এলাকার জন্যে বিধানসভায় যে ভূমিকা রাখেন তা আগামী দিনের কী ভূমিকা রাখবেন সেটাই আমাদের দেখবার বিষয় হয়ে থাকবে। তবেই আমরা ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে ৫ বছরের তৃণমূল সরকারের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়কগণের বিধানসভায় ভূমিকা নিয়ে পুংখানুপুঙ্ক ভাবে তুলনা করতে পারি না। ১৯৭১-২০১৬ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্র মন্ত্রিত্বের সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে থাকলে বিধায়কের সংখ্যার দিক থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে পিছিয়ে, কাজেই বলা যেতে পারে পৌণ্ড্রদের থেকে নমঃশূদ্র বিধানভায় খানিকটা অধিক ভূমিকা রাখতে পেরেছেন।

নির্দেশিকা

১) নমঃশূদ্র জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ব্যক্তিদের নিকট থেকে তাঁরা হলেন, মমতা ঠাকুর, মতুয়া উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি, ঠাকুর নগর,উত্তর ২৪ পরগনা , ফোন নং ৮৩৪৮৩১৭০০২। খগেন্দ্র নাথ বাড়ুই, মতুয়া উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, রাণাঘাট, নদীয়া, ফোন নং ৯০৬৪৮৮৮৮৯০। তন্ময় পোদ্দার, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের যুব পর্যবেক্ষক, ঠাকুর নগর,উত্তর ২৪ পরগনা , ফোন নং ৮৬৩৭৫৪১৯৮৩। ডাঃ সুকুমার হালদার, মতুয়া সাহিত্য সম্মেলন ঠাকুর নগরের সভাপতি,উত্তর ২৪ পরগনা , ফোন নং ৯৮৩২৭০১৭৪৯। ভবানী শঙ্কর রায়, মতুয়া সাহিত্য সম্মেলন ঠাকুর নগরের কোষাধ্যক্ষ,উত্তর ২৪ পরগনা , ফোন নং ৮১১৬১৭৭৪০৪। পরিতোষ দাস গোঁসাই, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা , ফোন নং ৭৬৮৫৮১৪৯২৪। বিনোদ বৈরাগী,(কবি) খরের মাঠ, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা , ফোন নং ৭৩৬৩৯৮৭৩৯৯। তুষার কান্তি বিশ্বাস, (কবি), হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা , ফোন নং ৮৬৩৮১৭৪৪৭৮। রক্তিম দাস, মুখ্য সাংবাদিক, যুগশঙখ, ফোন নং ৯৮৩০০০৬০৯১।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত প্রার্থীদের জাতিগত পরিচয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে যে সকল বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে তাঁরা হলেন, সনৎকুমার নস্কর, অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ফোন নং ৯০৮৮২১৫৬৯১। সুধাকর সরদার, অধ্যাপক, ইংরাজি সাহিত্য, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস কলেজ, কলকাতা, ফোন নং ৯৮৩০৯২৯৬৭১। তারকনাথ জাটুয়া, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, টাকী সরকারি মহাবিদ্যালয়, ফোন নং ৯৮৮৩৫৬৮৩১৫। মেঘনাথ হালদার, পৌণ্ড্র মহাসংঘ, সভাপতি, ফোন নং ৯২৩৯৩১৪৮৮৮। সুব্রত সরদার, পৌণ্ড্র মহাসংঘ সহ সম্পাদক এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের আমন্ত্রিত সদস্য, বাড়ুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা , ফোন নং ৯৮৭৫৫২০৭৬৪। বিনোদ সরদার, আম্বেদকর জনজাগরনী সমিতি (সম্পাদক) মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা , ফোন নং ৮৭৫৯৪২৬৩৭১। পঙ্কজ কুমার তাঁতী, সুপারইন্ডেন্ট ইন লাইব্রী সার্ভিস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবিডেন্ট অফ আম্বেদকর জনজাগরিনি

সমিতি, ফোন নং ৮৭৭৭৮৬৫৭০২। শান্তনু নস্কর, শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়, গড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা , ফোন নং ৯৩৩২২৫৫৩৩১।

২) Lok Sabha Debates, 1971 to 1977, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1971 to 1977.

৩) ভারতীয় সংবিধান ৩৪০ ও ৩৩৮বি ধারা দ্রষ্টব্য।

৪) Amit Bhattacharya, "Who are the OBCs?" Archived from the Original on 27 June 2006, Retrieved 19 April 2006, Times of India, 8 April 2006.

৫) Lok Sabha Debates, 1977 to 1979, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1977 to 1979.

৬) Lok Sabha Debates, 1980 to 1984, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1980 to 1984.

৭) বিপন চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি (সম্পাদিত), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০, আনন্দ, কোলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ১৪৬।

৮) Lok Sabha Debates, 1980 to 1984, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1980 to 1984.

৯) বিপন চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি (সম্পাদিত), ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০, আনন্দ, কোলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ১৪৬।

১০) বিপন চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি (সম্পাদিত), প্রাগক্ত, পৃঃ ৩৩০-৩১।

১১) Lok Sabha Debates, 1985 to 1989, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1985 to 1989.

১২) Lok Sabha Debates, 1985 to 1989, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1985 to 1989.

১৩) বিপন চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি (সম্পাদিত), প্রাগক্ত, পৃঃ ৩৩৮।

১৪) বিপন চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি (সম্পাদিত), প্রাগক্ত, পৃঃ ৩৪৩।

১৫) ভারতীয় সংবিধান ৩৪০ ও ৩৩৮ ধারা দ্রষ্টব্য।

১৬) বিপন চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি (সম্পাদিত), প্রাগক্ত, পৃঃ ৩৪৭-৪৮।

১৭) Lok Sabha Debates, 1991 to 1996, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1991 to 1996.

১৮) জয়ন্তনুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকল্প বিশ্বায়ন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রা.লি. কোলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ৭১।
১৯) V.P. Dutta, India's Foreign policy in a Changing World, Paperback, New Delhi, 1999, Page, 15.
২০) Lok Sabha Debates, 1996 to 1997 Dicemder, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1996 to 1997 December.
২১) Lok Sabha Debates, 1996 to 1997 December, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1996 to 1997 December.
২২) Lok Sabha Debates, 1998, to 1999 April, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1996 to 1997 April.
২৩) Statistical Report on General Elections. 1998 to the 12th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 1998, পৃঃ ২-২৫।
২৪) Lok Sabha Debates, 1998 to 1999 April, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1998 to 1999 April.
২৫) Lok Sabha Debates, 1999 to 2004, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 1999 to 2004 April
২৬) Ratul Datta, (Compiled & Edited), Bengal Vote in Loksabha (Since Independence), Deys Publishing, Kolkata, 2016, Page 40.
২৭) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৮।১।২০০৯
২৮) Lok Sabha Debates, 2004 to 2009, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 2004 to 2009.
২৯) Lok Sabha Debates, 2009 to 2014, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 2009 to 2014.
৩০) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বর্তমানের মতুয়াদের সংঘজননীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩১) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গাইঘাটার প্রাক্তন বাম বিধায়ক ও চাঁদপাড়ার বাসিন্দা প্রবীণ মতুয়া গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩২) Lok Sabha Debates, 2009 to 2014, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 2009 to 2014.

৩৩) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, লোকসভা নির্বাচন ২০১৪ বাংলার জনাদেশ, প্রগতিশীল প্রকাশক, কোলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৩৫।

৩৪) ২০১৪ লোকসভা টিভি সপোত বাক্য পাঠ অনুষ্ঠান,

৩৫) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে রানাঘাট লোকসভার প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩৬) Statistical Report on General Elections. 2014 to the 16th Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Election Commission of India, New Delhi, 2014, Detalls for Assemby Segments of Pariamentary Constituencies।

৩৭) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বর্তমানের মতুয়াদের সংঘজননীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩৮) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়াদের মহাসংঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঠাকুরনগর নিবাসী মতুয়া ভক্তের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪০) Lok Sabha Debates, 2015 to 2019, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Verious, 2015 to 2019.

৪১) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কোলকাতার চিত্তরঞ্জন কলেজের অধ্যাপক দ্বয়ের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪২) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কোলকাতার চিত্তরঞ্জন কলেজের অধ্যাপক দ্বয়ের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৩) Abhijit Dasgupta,(2000): In the Citadel of Bhadralok Politicians: The Scheduled Caste in West Bengal in Journal of Indian School of Political Economy, Vol.12, No.3 and 4.

৪৪) Abhijit Dasgupta: (2000) প্রাগক্ত।

৪৫) Abhijit Dasgupta: (2000) প্রাগক্ত।

৪৬) Abhijit Dasgupta: (2000) প্রাগোক্ত।

৪৭) Statistical Report on General Electon, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1977, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1977, Government Printing Press. Alipure,1977, NLC.

৪৮) Abhijit Dasgupta: (2000) প্রাগোক্ত।

৪৯) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭৮।

৫০) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ' মরিচঝাঁপি বুলেটিং ২৯ শে মে ১৯৭৯, এছাড়াও তাঁর লেখা ১১ ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে আনন্দ বাজার পত্রিকা 'মরিচঝাঁপি সম্পর্কে জরুরী কথা' শিরোনামে প্রকাশিত অনুচ্ছেদ।

৫১) শৈবাল কুমার গুপ্ত, 'মরিচঝাঁপির মরীচিকা' ১৯ শে মে ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপি বুলেটিং এ প্রকাশিত। বাবুল কুমার পাল, 'বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্যঃ পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস', গ্রন্থমিত্র, কোলকাতা, ২০১০, পৃঃ ১০৫।

৫২) West Bengal Assembly Proceedinds, West Bengal Legislative Assembly 22nd Session, July August 1979, Vol-22, No-I Page-419-420, NLC.

৫৩) যুগান্তর পত্রিকা, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭৯।

৫৪) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৪ মে, ১৯৭৯।

৫৫) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ছেলে জগদীশ চন্দ্র মণ্ডলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা র গড়িয়ার নিবাসীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫৬) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ছেলে জগদীশ চন্দ্র মণ্ডলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা র গড়িয়ার নিবাসীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫৭) নকুল মল্লিক, 'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি' নিখিল ভারত 'উদ্বাস্তু আন্দোলনের আলোচিত কয়েকটি অধ্যায়, বিশেষ সংখ্যা জানুয়ারী, ২০১০, পৃঃ ৩৫।

৫৮) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা র জেলার ৫০ জন নমঃশূদ্র ও ১০ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫৯) নকুল মল্লিক, প্রাগোক্ত, পৃঃ ৩৬।

৬০) নকুল মল্লিক, প্রাগোক্ত, পৃঃ ৩৭।

৬১) নকুল মল্লিক, প্রাগোক্ত, পৃঃ ৩৮।

৬২) West Bengal Assembly Proceedinds, West Bengal Legislative Assembly verious Session, 1977-1982, various Vol, NLC.

৬৩) Rupkumar Barman, (2018): 'Right-Left-Right' and caste politics: The Schedules Castes in West Bengal Assembly Election, from 1920 to 2016, Contemporary Voice of Dalit, Vol.10, issue.2.

৬৪) Statistical Report on General Electon, 1987 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1987, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1987, Government Printing Press. Alipure,1987, NLC

৬৫) West Bengal Assembly Proceedinds, West Bengal Legislative Assembly verious Session, 1987-1991, various Vol, NLC.

৬৬) Rupkumar Barman, (2018): প্রাগোক্ত।

৬৭) Statistical Report on General Electon, 1991 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1991, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1991, Government Printing Press. Alipure,1991, NLC

৬৮) Rupkumar Barman, (2018): প্রাগোক্ত।

৬৯) West Bengal Assembly Proceedinds, West Bengal Legislative Assembly verious Session, 1991-1996, various Vol, NLC.

৭০) Statistical Report on General Electon, 1996 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 1996, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 1996, Government Printing Press. Alipure,1996, NLC.

৭১) Rupkumar Barman, (2018): প্রাগোক্ত।

৭২) West Bengal Assembly Proceedinds, West Bengal Legislative Assembly verious Session, 1996-2001, various Vol, NLC.

৭৩) Statistical Report on General Electon, 2001 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2001, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 2001, Government Printing Press. Alipure,2001, NLC.

৭৪) Rupkumar Barman, (2018): প্রাগোক্ত।

৭৫) West Bengal Assembly Proceedinds, West Bengal Legislative Assembly verious Session, 2001- 2006, various Vol, NLC.

৭৬) Statistical Report on General Electon, 2006 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2006, পৃঃ ৩২২-৩১। List of the Member of the West Bengal Legislatures, West Bengal Legislative Assembly, who's who : 2006, Government Printing Press. Alipure,2006, NLC.

৭৭) West Bengal Assembly Proceedinds, West Bengal Legislative Assembly verious Session, 2006-2011, various Vol, NLC.

৭৮) Statistical Report on General Elections, 2011to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2011 ,পৃঃ ৩৪০-৫৯। West Bengal Assembly Election Result, 2011, Election Commission of

India, 2006. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 2011, Govt. Printing Press, Alipur, 2011, NLF.

৭৯) Rupkumar Barman, (2018): প্রাগোক্ত।

৮০) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ীর প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৮১) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ীর প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৮২) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ীর প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৮৩) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ীর প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৮৪) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ীর প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার সাংসদ-র থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৮৫) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ীর প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীর বড় ছেলের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৮৬) West Bengal Assembly Proceedinds, West Bengal Legislative Assembly verious Session, 2011-2016, various Vol, NLC.

৮৭) Statistical Report on General Elections, 2016 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi, 2016, the Legislative Assembly of West Bengal Detailed Results, থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। West Bengal Assembly Election Result, 2016, Election Commission of India, 2006. List of Member's of the West Bengal Legistature, Who's Who : 2016, Govt. Printing Press, Alipur, 2016, NLF.

৮৮) Rupkumar Barman, (2018): প্রাগোক্ত।

৮৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়কের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯০) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদের (১৯৮৯-১৯৯৯) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯১) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদের (১৯৮৯-১৯৯৯) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯২) ৯২ । গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদের (১৯৮৯-১৯৯৯) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯৩) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদের (১৯৮৯-১৯৯৯) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯৪) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাঁদপাড়ার প্রবীণ মতুয়া গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯৫) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাঁদপাড়ার প্রবীণ মতুয়া গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯৬) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে রাণাঘাট লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের (২০০৯-২০১৪) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯৭) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদের (২০০৪-২০০৯) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯৮) ৯৮ । গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমীক্ষিত ৩ টি জেলার সংরক্ষিত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের (২০০৯-২০১৪) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মথুরাপুর লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের (২০০৯-২০১৪) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১০০) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মথুরাপুর লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের (২০০৯-২০১৪) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১০১) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বর্তমানের মতুয়াদের সংঘজননীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১০২) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়া গবেষক ও নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যলয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১০৩)গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমীক্ষিত ৩ টি জেলার সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ও মন্ত্রীদের (২০১১-২০১৬), কেবলমাত্র ঠাকুর বাড়ীর প্রাক্তন মন্ত্রী বাদে, পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণ

এই গবেষণা প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সময় সীমা ধরা হয়েছে ১৯৭৮-২০১৩ সাল পর্যন্ত। নদীয়া ও দুই চব্বিশ পরগনার উক্ত জাতিদুটির সংখ্যাধিক্য গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হবে এখানে। পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালে ও ১৯৯৩ ও ২০১৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ধরে আমরা একটা তুলনামূলক আলোচনা করব। উক্ত ৩টি সাল ধরার মূল কারণ হল, ১৯৭৮ সালেই প্রথম ত্রি-স্তর গ্রাম পঞ্চায়েত এই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনের দ্বারা প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। এবং ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন ধরার মূল কারণ হল, ১৯৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর ফলে পঞ্চায়েতস্তরে নারী ও দলিত নারী পুরুষের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি দুটিই দলিত জাতির অন্তর্ভুক্ত। আর ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন ধরার মূল কারণ হল, দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামশাসনের অবসান ঘটিয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে ২০১৩ সালে প্রথম তৃণমূল প্রশাসনের আমলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ কত পরিমানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেই চিত্র তুলে ধরব। তবে আলোচনা করার আগে সংক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে নেব।

আজকের দিনের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নতুন নয়। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্ব-শাসন আইনের মাধ্যমে প্রথম ত্রি-স্তরীয় জনপ্রতিনিধিমূলক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। আর ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্ত্বশাসন আইনের দ্বারা ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানীয় ব্যাপারে জনসাধারণের উদ্যোগ বা অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল সামান্যই।[১] আর সেই সময়ে স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণের কোনো প্রশ্নই ছিল না।

স্বাধীনতার পরে ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ও ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইনের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে চারস্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কিন্তু কার্যত সত্তরের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে

স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।[২] ১৯৭৩ সালে উপরোক্ত দুটি আইনকে একত্রিত করে, আর সেই সঙ্গে নতুন কিছু বিধান সংযোজিত করে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (West Bengal Panchayet Act, 1973) প্রণীত হয়। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হয়নি। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার অশোক মেহটা কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৩ সালের আইনে কয়েকটি সংশোধনী গ্রহণ করেন, এবং তখনই এ রাজ্যে ত্রি-স্তর ও রাজনৈতিক দলভিত্তিক স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।[৩] অন্য অনেক রাজ্যে যেসব কারণের জন্য নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি, তার মধ্যে অন্যতম হল সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নিচুতলায় ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিচ্ছা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই জেলা থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্থানীয় স্ব-শাসনের মাধ্যমে জনগণের উন্নয়নে বিশ্বাসী ছিল। আর তাই ১৯৭৮ সাল থেকেই এ রাজ্যে প্রতি ৫ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে, যা সারাভারতে প্রায় ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে। আর মেহটা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এ রাজ্যে নির্বাচন সম্পূর্ণই রাজনৈতিক দলভিত্তিক হওয়ায় এখানে পঞ্চায়েত একাধারে একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে উঠেছে।[৪] সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিই হল দলীয় রাজনীতি এবং দলভিত্তিক নির্বাচন। বিধানসভা ও পার্লামেন্টেও তো দলভিত্তিক নির্বাচনই হয় । সুতরাং তৃণমূল স্তরেও দলভিত্তিক নির্বাচন হওয়াই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে ভূমিসংস্কারকে পঞ্চায়েতি রাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি মালিকের জন্য জমির নির্ধারিত উর্ধ্বসীমার উপরে উদ্‌বৃত্ত জমি পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্টন করে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুরানো কাঠামো চূর্ণ করে গণতান্ত্রিক কাঠামো গঠন করার পথ দেখানো হয়েছে। এখনও কোনো কোনো জেলায় অনেক খাস জমি পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই উদ্ধার করা হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে নানাবিধ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলিকেও পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই রূপায়িত করার ফলে জনসাধারণের সাথে পঞ্চায়েতের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই প্রক্রিয়ায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির স্থান কোথায় এবং কতটুকু?

পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের প্রাথমিক পর্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার আদর্শগতভাবেই সামাজিক ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রথমদিকে রাজ্য সরকার সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব উচ্ছেদে যতখানি উৎসাহী ছিলেন, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে এবং দলিত জাতির আর্থসামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ততখানি উদ্যোগী ছিলেন না। ১৯৯২ সালের সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সব রাজ্যে পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক সংরক্ষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রগতিশীল রাজ্যে পঞ্চায়েতে নারীর উপস্থিতি ছিল যৎসামান্য। কাজেই অনেক দলিত নারীও উক্ত সংরক্ষণ পেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তুলে আনেন। যদিও মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রথম থেকেই ছিল। আবার কোনো কোনো রাজ্যে সংরক্ষিত আসনের কিছু অংশ নির্দিষ্ট থাকত তপশিলী জাতি/উপজাতি নারী পুরুষের জন্যে। কিন্তু এ রাজ্যে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর পূর্বে কোনো সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না।[৫] তবে সত্তর ও আশির দশকেও এ রাজ্যে কোথাও কোথাও দলিত মহিলা ও পুরুষেরা সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে তাঁদের সংখ্যা ছিল নগন্য, তা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক দলিতজাতির ভালোসংখ্যক প্রতিনিধি ছিল। যেমন ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় আমরা - দেখেছি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পুরুষের সংখ্যা বেশ ছিল, কিন্তু তাদের জাতির নারীদের সংখ্যা ছিল না তেমন। উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলায় নমঃশূদ্র জাতির কিছু সংখ্যক পুরুষ প্রতিনিধি পাওয়া গেলেও নারীদের তেমন কোন সংখ্যা আমরা পাইনি। তাইতো পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে, এই সময় নমঃশূদ্র জাতির নারী পুরুষ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী পুরুষের সংখ্যা ছিল অনেকটা বেশি।

অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েতে দলিতদের ক্ষমতায়ন এবং বিশেষত দলিত নারীর পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার প্রধান অসুবিধা হল এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের অভাব। ১৯৯৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি পুস্তকের মধ্যে শুধু নেইল ওয়েবস্টার- এর পুস্তকে তার সমীক্ষিত পঞ্চায়েত দুটিতে নারী ও অন্যান্য পিছিয়েপড়া জাতির অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[৬] ওয়েবস্টার কর্তৃক সমীক্ষিত পঞ্চায়েত দুটি হল বর্ধমান জেলার কানপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সালদিয়া গ্রাম

পঞ্চায়েত (সমীক্ষক পঞ্চায়েত দুটির আসল নাম প্রকাশ করেননি)। এই সমীক্ষা অনুসারে ১৯৭৮ সালে কানপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন মহিলা। ইনি সাধারণ বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত নির্বাচিত সদস্যা ছিলেন। আর ১৪ জন পুরুষের মধ্যে ৫ জন ছিলেন তপশিলি জাতিভুক্ত (২ জন কো-অপ্ট করা এবং বাকি ৩ জন নির্বাচিত)। ১৯৮৩ সালে কোনো মহিলা সদস্যা ছিলেন না। মোট ১১ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৩ জন ছিলেন তপশিলি জাতির নির্বাচিত সদস্য। আর ১৯৮৮ সালের নির্বাচিত মোট ১৪ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা সদস্যা ছিলেন। বাকি ১৩ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৪ জন ছিলেন তপশিলি জাতি, এবং এঁদের মধ্যে ১ জন ব্যতীত বাকি সবাই ছিলেন নির্বাচিত সদস্য।[৭] কিন্তু আমাদের আলোচ্য নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনা র কোন গ্রামপঞ্চায়েতের উপরে নেইল ওয়েবস্টারের সমীক্ষিত পঞ্চায়েত নেই। কাজেই ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী পুরুষের পঞ্চায়েত স্তরে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের নমুনা হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ধরেছি, সেগুলো হল, নদীয়া থেকে হরিণঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি এবং উক্ত সমিতির অধীনে ফতেপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, কাষ্ঠভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত, বিরহী ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, নগরউখড়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত ধরেছি। তেহট্ট ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এবং সমিতির অধীনে নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েত, তেহট্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, বেতাই ১ ও ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত ধরেছি। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত ধরেছি, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি এবং উক্ত সমিতির অধীনে ইছাপুর ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত। স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতি এবং উক্ত সমিতির অধীনে গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতি এবং উক্ত সমিতির অধীনে বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত। রাজার হাট পঞ্চায়েত সমিতি এবং উক্ত সমিতির অধীনে রাজার হাট বিষ্ণুপুর ১ ও ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত, চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ধরেছি। আর দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি এবং উক্ত সমিতির অধীনে খেয়াদহ গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রতাপ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত, সোনারপুর ২নং, কালিকাপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত। ক্যানিং ২নং পঞ্চায়েত সমিতি এবং সমিতির অধীনে বাঁশড়া , দীঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত ধরেছি। মগরাহাট ২নং পঞ্চায়েত সমিতি এবং সমিতির অধীনে বাঁশড়া, মাতলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত, ধনপোতা, উড়েলাচাঁদপুর, মগরাহাট পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে আমরা আমাদের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি, এই গবেষণার নমুনা হিসাবে। এই ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের সহযোগিতায় নমঃশূদ্র ও

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী পুরুষের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে এই পরিচ্ছেদে তুলে ধরবো।

আমরা আমাদের আলোচনায় **১৯৭৮** সাল এবং বিশেষ করে **১৯৯৩** সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজনীতিতে দলিত নারী-পুরুষের ক্ষমতায়নের বিষয়টি কতটা হয়েছিল, সেই তথ্য তুলে ধরে নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনা র আমাদের সমীক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী-পুরুষের ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণের তথ্যও তুলে ধরব। প্রথমে আমরা আলোচনা করব **১৯৭৮** সালের এবং **১৯৯৩** সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে উক্ত তিনটি জেলার সমীক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে অন্যান্য সাধারণ জাতির অংশগ্রহণের বিষয়টিও এসে যাবে। আর আলোচনা করা হবে **২০১৩** সালের তৃণমূল সরকারের আমলের প্রথম নির্বাচনের পর পঞ্চায়েত রাজনীতিতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের বিষয়।

সাধারণ নারী ও পুরুষ এবং দলিত নারী পুরুষ, আদিবাসী নারী পুরুষ এবং ও.বি.সি নারী পুরুষের ১৯৯২ সালের ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনীর পর **১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতে আসন বণ্টন এর পর। এই গবেষণায় আমরা লোকসভা ও বিধানসভায় আলাদা ভাবে সাধারণ নারী ও দলিত নারী ও আদিবাসী নারী এবং নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরেনি। কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের তথ্য আলাদা ভাবে তুলে ধরেছি। এর কারণ হল, ১৯৯২** সালের ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনীর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার **১৯৭৩** সালের পঞ্চায়েতি আইনে কিছু সংশোধনীর মাধ্যমে এই রাজ্যেও পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে নারীর জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন (তপশিলি জাতি/উপজাতি নারীসহ) সংরক্ষিত রাখার নীতি গ্রহণ করেন। আর সেই সঙ্গে গৃহীত হয় তপশিলি জাতি/উপজাতি মানুষের জন্য নিজ নিজ গোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের নীতি। তপশিলি জাতি/উপজাতি সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত থাকে এই গোষ্ঠীর নারীদের জন্য। আর সংরক্ষিত সব আসনই আবর্তিত হওয়ার নিয়মও গৃহীত হয়।[৮] **১৯৯৩** সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েতের নির্বাচনে এই নতুন নীতিই অনুসৃত হয়। আরও উল্লেখ্য যে প্রায় সব রাজ্যেই মন্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) জন্য একটি আলাদা বিভাজন করে আলাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওবিসি

নারী-পুরুষের জন্য কোনো সংরক্ষণ নেই। নির্বাচনে ওবিসিরাও সাধারণ বিভাজনের মধ্যেই পড়েন।

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ৩২২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩২৮টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১৭টি জেলা পরিষদে নতুন আইনি অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সারণি ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৩টি স্তরে মোট ৭১,১২০টি আসনের মধ্যে ৪১,০৫১টি আসনকে (৫৯ শতাংশ) সংরক্ষিত রাখা হয়। এর মধ্যে ২৪,৮৯৫টি আসন (৩৫ শতাংশ) সংরক্ষিত ছিল নারীদের (তপশিলি জাতি/উপজাতি নারীসমেত) জন্য। এই ৩৫ শতাংশ আসনকে ঘোষিত সরকারি নীতির (৩৩.৩ শতাংশ) থেকে বেশি বলা যায় না। মোট আসনের ভগ্নাংশজনিত কারণেই এটি হয়েছে। আরও প্রতিফলিত হচ্ছে যে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে তপশিলি জাতি/উপজাতি নারী-পুরুষের জন্য সংরক্ষিত ছিল যথাক্রমে ৩৭.২৮ শতাংশ, ৩৫.৮২ শতাংশ এবং ৩৪.৬০ শতাংশ আসন।[৯] সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনীর পর পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় নারী এবং দলিত অন্যান্য দুর্বল শ্রেণী্র আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের প্রতি সামাজিক সুবিচারের পথটি কিছুটা উন্মুক্ত হয়েছে, আর সেই সাথে বিকেন্দ্রিকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও হয়েছে পূর্বাপেক্ষা বেশি অর্থবহ। প্রসঙ্গত এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে কয়েকটি রাজ্যে ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনীর সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষণের নীতি কার্যকর হয়নি। তবে রাজ্যে তা বিস্তারিত ভাবে কার্যকর হয়েছে। এর প্রমাণ আমরা পাই আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষা করার লক্ষ্যে যে সকল গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে গিয়েছিলাম সেগুলিতে সাংবিধানিক আইনানুসারে দলিত জাতির প্রতিনিধিদের পেয়েছি। তবে উল্লেখ করতে হয় রাজনৈতিক কৌশলের জন্যে তাঁদের দলের নেতারা যে অঞ্চলে নমঃশূদ্র বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ অধিক থাকা সত্ত্বেও অন্যকোনো দলিত জাতির মানুষকে প্রধান বা উপপ্রধান করেছেন। এর উদাহরন হল, নদীয়ার তেহট্ট ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে বেতাই ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম নমঃশূদ্র অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রধান করা হয়েছিল বাগদি জাতির মানুষকে। এই তথ্য আমাদের দিয়েছেন, বেতাই ড. বি. আর আম্বেদকর কলেজে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাশয়। আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য বলেন, আমাদের পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যদিও আমি নমঃশূদ্র জাতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও,

এই পঞ্চায়েতের অধীনে সংখ্যাগরিষ্ঠ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষকেই প্রধান করা হয়ে থাকে। তবে, আমাদের পাশের গ্রাম পঞ্চায়েত সোনারপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে সি.পি.আই.এম সদস্য (জাতিতে শুঁড়ি) ও তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যদের (জাতিতে নমঃশূদ্র) প্রধান করা হয়েছিল, ঐ পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সদস্য জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।[১০] তবে, আমি মনে করি এটা সব রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কৌশল।

১৯৭৮ সালের ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের আলোচ্য তিনটি জেলায় বসবাসরত নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ তেমন একটা ছিল না। এবং 'Panchayet Raj, Government of West Bengal' থেকে আমরা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিনিধিত্বের জাতিগত নারী-পুরুষের তথ্য আমরা যথাপোযুক্ত না পাওয়ার কারণেই, ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের তথ্য তুলে ধরতে পারলাম না। তবে ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে উপরিউক্ত ৩ টি জেলা থেকে নমুনা হিসাবে যেসকল গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোর উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি, তার মধ্যে থেকে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানদের জাতির তালিকা নিম্নে তুলে ধরলাম।

নদীয়া জেলার তেহট্ট ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নাটনা, বেতাই ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের জাতির তালিকা তুলে ধরলাম ১৯৭৮, ১৯৯৩, ২০১৩ সালের।

সারণি ৫.১: নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের নাম ও জাতি

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	শচীন ঘোষ	ও.বি.সি, বর্তমানের সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে	রণজিৎ কুমার বিশ্বাস	ও.বি.সি, বর্তমানের সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে
১৯৯৩	নিরঞ্জন কুমার পাল	ঐ	ব্রজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি
২০১৩	শঙ্কর তেওয়ারী	ব্রাহ্মণ	দিলীপ বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৯৭৮ সালের পর থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতে ২ জন মহিলা প্রধানের নাম পেয়েছি, তাঁরা হলেন রেণুকা বিশ্বাস (২০০৩-২০০৮) ও

দ্রৌপদী বিশ্বাস (২০০৮-২০১৩) জাতিতে নমঃশূদ্র। তবে নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বসবাসরত মানুষের মধ্যে দলিত জাতির সংখ্যা অধিক এবং দলিত জাতির সিংহভাগ আবার নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। সংরক্ষণের আইনানুসারে প্রধান ও উপপ্রধানের ১৯৯৩ সালের পর থেকে পরিবর্তন হতে থাকে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের বক্তব্য “আমি তো তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলাম, কাজেই দল আমাকে আমার জাতি তথা অন্যান্য দলিত জাতির উন্নয়নে সাংবিধানিক আইনানুসারে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়েছেন। বরং সি.পি.আই.এম আমাকে ঠিক ভাবে কাজ করতে দেয়নি। যারা সব সময় প্রচার করেন যে, দরিদ্র মানুষের হয়ে তাঁরা নাকি কাজ করেন। কিন্তু বাস্তবে দায়িত্ব পাওয়ার পর দেখলাম নমঃশূদ্র তথা অন্যান্য দলিত জাতি যে বেশ দরিদ্র মানুষ, তা সত্ত্বেও তাঁদের উন্নয়নে বাম সদস্যরা বাধা দিয়েছেন”।[১১] আবার সি.পি.আই.এমের টিকিটে জয়ী মহিলা প্রধান বলেন, “তৃণমূলের মহিলা প্রধান হয়তো জানেন না, প্রান্তিক মানুষের রাজনৈতিক অধিকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছেন। কাজেই নমঃশূদ্র সহ দলিত জাতির মানুষ ও প্রান্তিক মানুষের পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ সহজ হয়েছে। আমরা যখন ওঁনাকে প্রশ্ন করি যে, আপনি নমঃশূদ্র জাতির জন্য আলাদা কোন সুযোগের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন? উত্তরে তিনি বলেন সকল প্রান্তিকমানুষের জন্যেই কাজ করেছি । আমাদের পার্টি লাইনের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কোনো কাজ আমরা করি না।[১২] এই পঞ্চায়েতের নবীন সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের এবং সি.পি.আই.এমের দুজনেই বলেন সকল প্রান্তিকমানুষের জন্যেই আমরা কাজ করি।[১৩] এই গ্রাম পঞ্চায়েতের সি.পি.আই.এমের উপপ্রধান (১৯৯৩-১৯৯৮) সদস্য বর্তমানে বি.জে.পির গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং সি.পি.আই.এম সদস্য ও কৃষক নেতা (১৯৯৩-১৯৯৮) বর্তমানে তৃণমূল দলের সমর্থক এবং সি.পি.আই.এমের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য (২০০৩-২০০৮) বর্তমানে তৃণমূল সমর্থক ও বি.জে.পির গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য (২০০৮-২০১৩) বর্তমানেও বি.জে.পির সদস্য এদের সকলকেই আমরা প্রশ্ন করি যে, নমঃশূদ্র জাতি হওয়ার দরুন কি আপনারা স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন? উত্তরে ওনারা আমাদের জানিয়েছেন দলের নীতি মেনেই কাজ করতে হয়েছে। তবে দলিত হওয়ার দরুণ উচ্চবর্ণের নিজ দলের আধিকারিকদের নিকট থেকে কু-কথা ও না কাজ করার কথা অধিক শুনতে হয়েছে।[১৪]

সারণি ৫.২: বেতাই ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	বৈদ্যনাথ কর	নমঃশূদ্র জাতি	হরিবর সরকার	নমঃশূদ্র জাতি
১৯৯৩	নিতাই চন্দ্র বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি
২০১৩	দেবী রানী সেন পোদ্দার	নমঃশূদ্র জাতি	নারায়ণ সরকার	নমঃশূদ্র জাতি

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

বেতাই ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সি.পি.আই.এমের প্রধান, সি.পি.আই.এমের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য বিশ্বজিৎ কংগ্রেসের প্রধান এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানকে নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো করা হলে, এনারাও একই উত্তর দিয়েছেন।[১৫] এই গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল পদাধিকারীগণ নমঃশূদ্র জাতির মানুষ হওয়ার ফলে এদের মধ্যে জাতিগত উচু-নীচু ভেদাভেদ থাকলেও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্যে প্রধান ও উপপ্রধানের নিজের জাতের বিরোধী দলের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের বিরোধিতার জন্য অনেক সময় উন্নয়নের কাজে বাধা পেতে হয়েছে বলে নির্বাচিত সাক্ষাৎকার ব্যক্তিগন আমাদের জানান।[১৬] উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানদের বক্তব্য থেকে বোঝা গেলে যে, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে জাতিগত ভেদাভেদ উন্নয়নের কাজে বড় বাধা নয়, বড় বাধা হল রাজনৈতিক দলের পক্ষের ও বিপক্ষের সদস্য থাকার কারণে।

সারণি ৫.৩: বেতাই ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানের নামের তালিকা ও জাতি

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	পরেশ বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	বৃন্দাবন ঘোষ	ও.বি.সি, বর্তমানের সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে
১৯৯৩	নগেন ভদ্র	নমঃশূদ্র জাতি	অমৃত বাওয়ালী	নমঃশূদ্র জাতি
২০১৩	মঞ্জুরাণী বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	উৎপল বিশ্বাস	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত তিনটি গ্রাম পঞ্চায়ের মধ্যে বেতাই ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৯৩ সালের সংরক্ষণের ফলেও কিন্তু নমঃশূদ্র জাতির প্রধানের নাম পেলাম না। ২০১৩ সালে এসে নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতে নমঃশূদ্র জাতির প্রধানের নাম পেলাম। আর বেতাই ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০১৩

সালে এসে সংরক্ষণের আইনানুসারে নমঃশূদ্র মহিলা প্রধানের নাম পেলাম। উক্ত ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ মানুষ নমঃশূদ্র জাতির। এই তথ্যটা আমরা পেয়েছি, তেহট্ট ১ নং সমষ্টি উন্নয়নের আধিকারিকের নিকট থেকে ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিকট থেকে। তিনি আরও বলেন, তেহট্ট গ্রামপঞ্চায়েতে কোনো নমঃশূদ্র প্রধান হতে পারেননি, কিন্তু মালো জাতির প্রধান হয়েছেন। আবার কানাইনগর গ্রামপঞ্চায়েতের ১৯৭৮, ১৯৯৩ ও ২০১৩ সালের প্রধানেরা ছিলেন নমঃশূদ্র জাতির।[১৭] কাজেই বোঝা গেলো যে, উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের জাতি-ভিত্তিক সমীকরণ সবক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি।

উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে বাগদা গ্রামপঞ্চায়েতে প্রধান ও উপপ্রধানের নামের ও জাতির তালিকা নিম্নে তুলে ধরলাম।

সারণি ৫.৪: বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৯৭৮, ১৯৯২ ও ২০১৩ সাল

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	নারায়ণ চন্দ্র দত্ত	নমঃশূদ্র	অজিত মল্লিক	নমঃশূদ্র
১৯৯৩	দুলাল চন্দ্র বর	নমঃশূদ্র	মদন উকিল	নমঃশূদ্র
২০১৩	পুষ্প সরদার	নমঃশূদ্র	অমূল্য হালদার	নমঃশূদ্র

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বাগদা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানেরা ১৯৭৮, ১৯৯৩, ২০১৩ সালের সকলেই জাতিতে ছিলেন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। উপরের সারণিতে যেমনটি দেখলাম ঠিক তেমনটি বাগনা গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও নমঃশূদ্র জাতির অংশগ্রহণ বেশ ভালো আছে। বাগদা গ্রামপঞ্চায়েতের সারণি আকারে আমরা আর তুলে ধরলাম, কারণ নতুন কোন তথ্য এখানে নেই, সেই একই নমঃশূদ্র সর্বাধিক অংশগ্রহণ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপরিউক্ত একই বক্তব্য।[১৮] তবে উল্লেখ করতে হয় যে, আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯৯৩ সালের প্রধানকে প্রশ্ন করি বিধানসভায় নাকি গ্রামপঞ্চায়েতে আপনি অধিক ভূমিকা রাখতে পেরেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, গ্রামপঞ্চায়েতে।[১৯] তিনি ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাগদার বিধায়ক ছিলেন , এই কারণেই আমরা তাঁকে উপরিউক্ত প্রশ্নটা করি। তাঁর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে উল্লেখ্য যে, তিনি কখনও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ও নানা ধরনের নির্দলের পক্ষ নিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।[২০] এর ফলে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট যেমন

বিশ্বাসী হতে পারেননি, আবার নিজের জাতির কাছেও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বিশ্বাসী হতে পারেননি। এই তথ্য আমরা বাগদায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে পেয়েছি।

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ইছাপুর ১ ও ২ নং এবং শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নামের জাতির তালিকা ১৯৭৮, ১৯৯৩, ও ২০১৩ সালের নিম্নে তুলে ধরলাম।

সারণি ৫.৫: ইছাপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের নাম ও জাতি

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	নিতাই চন্দ্র ঘোষ	ও.বি.সি, বর্তমানের সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে	বিশ্বনাথ ঘোষ	ও.বি.সি বর্তমানের সংরক্ষণের আইনানুসারে
১৯৯৩	নির্মল দে	ও.বি.সি বর্তমানের সংরক্ষণের আইনানুসারে	পূর্ণিমা দালাল	নমঃশূদ্র জাতি
২০১৩	তরুণ বৈরাগী	নমঃশূদ্র জাতি	শঙ্করী পাল	নমঃশূদ্র জাতি

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত গ্রামপঞ্চায়েতে নমঃশূদ্র মানুষের বসবাস অধিক হলেও সংরক্ষণের আইনানুসারে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত কোনো নমঃশূদ্র জাতির প্রধান আমরা পাইনি। ২০১৩ সালে এসে আমরা নমঃশূদ্র জাতির প্রধানের নাম পেলাম। প্রধানের কথানুসারে আমার জাতির জনসংখ্যা, আমার গ্রাম পঞ্চায়েতে অধিক থাকলেও পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য পিছিয়েপড়া জাতির মানুষ রাজনৈতিক দলের হয়েও নেতৃত্বে এগিয়ে আছেন, আমার জাতির থেকে।[21] এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন বামপন্থী প্রধানের কথা আমাদের দল থেকে সংরক্ষণের আইন মেনেও সাধারণ জাতির প্রধানের নির্বাচনে আমরা যোগ্য নমঃশূদ্র জাতির মানুষকেও করেছি। তাঁর কথাই গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ আসন থেকেও আমরা জানতে পারি যে, প্রথম নমঃশূদ্র জাতির মানুষকে দল টিকিট দিয়ে নির্বাচনে জয়ী করেছিলেন। তিনি আমাদের আরও জানান বর্তমানের সরকারের রাজনৈতিক দল গ্রামপঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা ও লোকসভার নমঃশূদ্র জাতির সদস্য, বিধায়ক ও সাংসদদের রাজনৈতিক ফাইদা ওঠানোর জন্য ব্যবহার করছেন। নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের নিমিত্তে ঐ দলের কোন ভূমিকা নেই।[22] আবার এই গ্রামপঞ্চায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নমঃশূদ্র জাতিকে

অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন আমার দল। দল আমার জাতির গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য থেকে শুরু করে বিধায়ক তথা সাংসদদের উপযুক্ত প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।[২৩] উক্ত গ্রামপঞ্চায়েতের যে কয়েকজন সদস্যকে আমরা সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাঁদের ৯০ শতাংশ বলেছেন, বামআমল থেকে বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতে নমঃশূদ্র জাতির অংশগ্রহণ অধিক হয়েছে ।

সারণি ৫.৬: ইছাপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের নাম ও জাতি, এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি ১৯৯৩ সালের ৫ই জানুয়ারী উদ্বোধন হয়। কাজেই ১৯৭৮ সালের প্রধানের নাম ও জাতি উল্লেখ নেই।

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৯৩	সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	মাখন লাল গাইন	নমঃশূদ্র
২০১৩	রীতা মণ্ডল হালদার	নমঃশূদ্র জাতি	আনারুল মণ্ডল	ও.বি.সি

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইছাপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত মূলত ঠাকুর নগরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ার কারণে ৯৫ শতাংশ নির্বাচিত সদস্য হলেন নমঃশূদ্র জাতির । বাম আমল থেকে তৃণমূল আমল পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে। ১৯৯৩ ও ২০১৩ সালের ২ জন প্রধান ও ২ জন উপপ্রধানের মধ্যে মাত্র ১ জন উপপ্রধান জাতিতে সংখ্যালঘু বা ও. বি. সি। আমরা যখন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে প্রশ্ন করি যে, ৯৫ শতাংশ নমঃশূদ্র সদস্য থাকা সত্ত্বেও কেন ১ জন সংখ্যালঘু মানুষকে উপপ্রধান সিহাবে আপনারা বেছে নিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন একচেটিয়া নমঃশূদ্র থাকার কারণে, নিজের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন নিয়ে সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া জন্যে আমরা উক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ওনাকে উপপ্রধান করেছি।[২৪] এই রূপ ক্ষেত্রসমীক্ষার থেকে উঠে এলে যে, সব সময় একই জাতির মানুষ একটা গ্রামপঞ্চায়েতে সর্বাধিক বসবাস করলেই যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিক প্রয়োগ করা যাবে তেমনটা কিন্তু উক্ত গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারলাম। আবার বরং আমরা দেখতে পেলাম ঠাকুরনগরের প্রাণ কেন্দ্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ অন্যান্য গ্রামপঞ্চায়েত থেকে কম।

সারণি ৫.৭: শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	দ্বিজেন্দ্র লাল জয়	কায়েস্ত জাতি	নীলাময় বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি
১৯৯৩	মহাদেব বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	কমলা বাগচী	নমঃশূদ্র জাতি
২০১৩	সন্তোষ কুমার বৈদ্য	নমঃশূদ্র জাতি	সীমা দাস	নমঃশূদ্র জাতি

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শুধুমাত্র **১৯৭৮** সালের প্রধান ছিলেন জাতিতে কায়েস্ত আর ২ জন প্রধান ও ৩ জন উপপ্রধান জাতিতে নমঃশূদ্র। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে অধিকাংশ মানুষ নমঃশূদ্র জাতি হওয়া সত্ত্বেও ইছাপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ন্যায় ক্ষমতা বন্টনের পথে হাঁটেননি। উক্ত গ্রামপঞ্চায়েতে নমঃশূদ্র জাতির অংশগ্রহণ বেশ ভালো। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন ও বর্তমান দুজন তৃণমূল বিরোধী নির্বাচিত সদস্য বলেন, আমরা জাতিতে নমঃশূদ্র হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের উন্নয়নের কাজে আমাদের যুক্ত করেন না। কিন্তু আমাদের সময় আমরা সকল নির্বাচিত বিরোধী সদস্যদেরও গ্রামের উন্নয়নের কাজে যুক্ত করতাম।[২৫] আবার তৃণমূলের প্রধান আমাদের বলেন, সি. পি. আই. এমের অধীনে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত থাকার সময় আমরা কোন উন্নয়ন মূলক কাজের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতাম না। ওদের সময় যা কিছু হতো দলের উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে, আর ওনাদের দলের উচ্চ নেতৃত্বের সকল ব্যক্তিই ছিলেন সামাজিক দিক থেকে উচু জাতির। ফলে ওনাদের সময় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ছিল বেশ।[২৬] তৃণমূল প্রধানের কথার যুক্তির পক্ষে উল্লেখ করা যায় নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সি. পি. আই. এমের উপপ্রধানের যুক্তির কথা।

সারণি ৫.৮: চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	নারায়ণ চন্দ্র সাহা	নমঃশূদ্র জাতি	রবীন্দ্রনাথ দে	ও.বি.সি বর্তমানের সংরক্ষণের আইনানুসারে
১৯৯৩	নারায়ণ চন্দ্র সাহা	নমঃশূদ্র জাতি	সুবোধ সরকার	নমঃশূদ্র জাত
২০১৩	হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (২০১৩-২০১৪) মনিমালা বিশ্বাস (২০১৪-২০১৮)	দুজনেই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ	নিমাই বিশ্বাস (২০১৩-২০১৪) চন্দন সরকার (২০১৪-২০১৮)	দুজনেই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ জন প্রধানই নমঃশূদ্র জাতির এবং ৪ উপপ্রধানের মধ্যে ৩ জনই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় আমরা জানতে পারি যে, ২০১৪ সালে সি.পি.আই.এমের কাছ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস আস্থা ভোটের মাধ্যমে গ্রামপঞ্চায়েত দখলে নিয়ে নেয়। উক্ত গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন সি.পি.আই. এমের প্রধান বলেন, আমি রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করে ২০১৩

সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হয়ে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসাবে দলের দ্বারা মনোনীত হই, যা আমার প্রাক্তন দল কখনোই এই সম্মান বা প্রাধান্য দিতেন না। তিনি আরও বলেন, তৃণমূল দলে থাকার কারণে আমার রাজনৈতিক সম্মান আগের থেকে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৭] উক্ত গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচিত বি.জে.পির সদস্য বলেন, উনি তো ক্ষমতার লোভে রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেছেন। নমঃশূদ্র জাতির পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্যে নয়। প্রাক্তন সি.পি.আই.এমের উপপ্রধান বলেন, বি.জে.পির সদস্যের কথার সঙ্গে আমিও একমত। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করাটা তেমন কোন গুরুত্ব দিতে চাইলেন না তৃণমূলের প্রধান।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সোনারপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯৭৮, ১৯৯৩, ২০১৩ সালের প্রধানদের নাম ও জাতি সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করলাম।

সারণি ৫.৯: সোনারপুর - ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	ভূষণ বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	নীলমণি মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি
১৯৯৩	অরুন মণ্ডল (৩ বছর ৬ মাস) শিবানী মণ্ডল (১ বছর ৬ মাস)	দুজনেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ	মানস মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি
২০১৩	দীপা সাঁফুই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	সীমালতা মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

সোনারপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে বসবাসরত অধিকাংশ মানুষ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৮ সালে প্রধান হিসাবে আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানতে পারলাম তিনি জাতিতে নমঃশূদ্র। আবার ১৯৯৩ সালে প্রধান এবং ২০১৩ সালের প্রধান এনারা সকলেই জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। উক্ত দু'জন মহিলা প্রধানের বক্তব্য "আমরা আমাদের দায়িত্বে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারলেও আমাদের সমাজে তো নারীর প্রতি পুরুষের একটা নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা রাখেন। ফলে কাজ করতে গিয়ে কিছুটা তো অসুবিধার মধ্যে পরতেই হয়েছে"।[২৮]

সারণি ৫.১০: কালিকাপুর - ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	বিভূতি নস্কর	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	ডা. কমলা কান্ত মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি
১৯৯৩	অমল কৃষ্ণ মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	অজিত নস্কর	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি
২০১৩	বন্দনা মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	প্রভা মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

কালিকাপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে উক্ত ৩ টি সালের প্রধানেরা জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হওয়ার দরুন তাদের অঞ্চলের মানুষের কাছে জাতিগত অপমানের স্বীকার হতে হয়নি বলে বর্তমানের প্রধান আমাদেরকে জানিয়েছেন। তবে তিনি আমাদের একথাও বলেন যে, জাতিগত অপমানের স্বীকার না হলেও স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি নানা সময়ে। তিনি আরও বলেন, "দলিত হওয়ার জন্যেই যে কাজে বাধা পেতে হয়, তাই নয়, নারী হওয়ার জন্যেও আমার কাজের সময় ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হওয়ার কারণে বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারীরা আগের থেকে অধিক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন"।[২৯]

ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯৭৮, ১৯৯৩, ২০১৩ সালের প্রধানের নাম ও জাতি।

সারণি ৫.১১: মাতলা - ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	বঙ্কিম মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	শিশির রায়	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি
১৯৯৩	প্রফুল্ল মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	ধনুরাম সরদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি
২০১৩	তপন সাহা	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	হরেন ঘোড়ই	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাত

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

মাতলা ১ নং গ্রামপঞ্চায়েতে ১৯৭৮, ১৯৯৩, ২০১৩ সালের প্রধানেরা জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। এই গ্রামপঞ্চায়েতে কোনো নারী প্রধানের নাম আমরা উক্ত ৩ টি সালে পেলাম না। তবে ২০০৮ সালে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী প্রধানের নাম আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময় পেয়েছি। ওনাকে আমরা যখন প্রশ্ন করি যে, বর্তমানে কি গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী ও দলিত জাতির নারীদের অংশগ্রহণ আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে? তিনি আমাদের জানিয়েছেন, আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩০] মাতলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে অধিকাংশ মানুষ জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হওয়ার দরুন এই অঞ্চলের প্রধান ও উপপ্রধান সকলেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। কাজেই এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের আলাদা

করে জাতিগত উন্নয়নের জন্যে কাজ করতে হয়নি। আবার অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতে যেমন জাতিগত উচু-নীচু প্রধান ও উপপ্রধান থাকার ফলে মাঝে মাঝে জাতিগত অপমানের স্বীকার হতে হয়, উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে তেমনটা ঘটেনি। তবে ইছাপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে যেমন নমঃশূদ্র জাতির মানুষের মধ্যে পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণে অণীহা দেখা গেছে মাতলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতেও একই রকম অণীহা দেখা গেছে। এর কারণ হল, আমরা গ্রামপঞ্চায়েত গুলোর উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি, তখন আমরা দেখতে পেলাম পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরিকির অধীনে যত সংখ্যক ভোটার থাকবে, তাঁদের প্রাধান্য তত বেশি থাকে নির্বাচনে। কাজেই উক্ত দুটি গ্রামপঞ্চায়েতে নমঃশূদ্রদের মধ্যে বৃহত্তর শরিকি বসবাস, আবার মাতলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে বৃহত্তর শরিকি বসবাস করার, কারণে ছোটো ছোটো শরিকিগুলো ভয়ে গ্রামপঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ করতে অণীহা দেখায়। আবার যেসকল গ্রামপঞ্চায়েতে মিশ্রজাতির বসবাস সেইসকল গ্রামপঞ্চায়েত গুলোতে জাতিগত সংখ্যাগত ভোটার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত জাতি দুটির অংশগ্রহণ অধিক হয়ে থাকে। এই অধিক হওয়ার মূল কারণ হল কোনো জাতি থেকে প্রধান বা উপপ্রধান হবেন সেই লক্ষ্যেও।

সারণি ৫.১২: ধণপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	ভবেন্দ্র নাথ হালদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	বাঁশরী কাঁজী	ও.বি.সি. বর্তমানের সংরক্ষণের আইনানুসারে
১৯৯৩	প্রভাস চন্দ্র আড়ং	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	সুশান্ত প্রামাণিক	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি
২০১৩	রশিদ মল্লিক	ও. বি. সি	মুরারী মোহন মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

ধনপোতা গ্রামপঞ্চায়েতে আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানতে পেরেছি যে, ১৯৭৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৫ জন প্রধানের নাম পেয়েছি, তাঁরা সকলেই জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং সংরক্ষণের আইনানুসারে কোনো মহিলা প্রধানের সংরক্ষণ ছিল না। তাইতো লক্ষ করা গেল যে, পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের জন্য সংরক্ষণ নাথাকলে তাঁদের সচরাচর প্রধান করা হয় না। যেমনটি আমরা লক্ষ করতে পারি লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ নাথাকার কারণে, এক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদ ও বিধায়কদের থেকে নারী

সাংসদ ও বিধায়কদের সংখ্যা অতি নগণ্য। কাজেই ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর ফলেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েতে দলিত নারী পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য থেকে জানতে পারি যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী পুরুষের গ্রাম পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ বর্তমানে অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩১]

সারণি ৫.১৩: বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

সাল	প্রধানের নাম	প্রধানের জাতি	উপপ্রধানের নাম	উপপ্রধানের জাতি
১৯৭৮	আফছার সরদার	ও. বি. সি বর্তমানের সংরক্ষণের আইনানুসারে	ফকির মহম্মদ সরদার	ও. বি. সি. বর্তমানের সংরক্ষণের আইনানুসারে
১৯৯৩	ফকির মহম্মদ সরদার	ও. বি. সি বর্তমানের সংরক্ষণের আইনানুসারে	শিবশংকর ভট্টাচার্য্য	ব্রাহ্মণ
২০১৩	দিপালী মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	সিরাজ উদ্দিন দেওয়ান আবুল কাশেম সরদার	ও. বি. সি. বর্তমানের সংরক্ষণের আইনানুসারে

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছে ।

বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৩ এবং ২০০৮ সালের সকল প্রধানের জাতি পরিচয় হল সংখ্যালঘু এবং ১৯৯৮, ২০০৩ ও ২০১৩ সালের প্রধানেরা জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, এঁনাদের মধ্যে ১৯৯৮ সালে রীণা রক্ষিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী প্রধান হয়েছিলেন। উপপ্রধানের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সালে ও. বি. সি বর্তমানের সংরক্ষণের আইনানুসারে এবং ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ জাতি ও ১৯৯৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির, ২০১৩ সালের পরে আবার ও. বি. সি. জাতির মানুষ হয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ ও সংখ্যালঘু জাতির মানুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান।[৩২]

অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে 'বামফ্রন্টের শাসনকালের শুরুর দিকে পঞ্চায়েতের আসন সংরক্ষণের আগে অর্থাৎ ১৯৭৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েতের নেতৃত্বের আর্থিক প্রেক্ষিত বিতর্ক থাকলেও প্রায় সমস্ত গবেষণাতে নেতৃত্বের সামাজিক প্রকৃতি বিষয়ে একই ধরনের ফলাফল লক্ষ করা গেছে। প্রায় প্রত্যেক গবেষকই তাঁদের গবেষণা থেকে দেখিয়েছেন যে, বামশাসনকালে অপেক্ষাকৃত কমবয়সের মানুষ থেকে পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব উঠে এসেছে। শিক্ষাগত, পেশাগত, জাতিগত দিক থেকেও সমস্ত স্তরের নাগরিকদের

পঞ্চায়েতের কাজকর্মে প্রতিনিধিত্ব ঘটেছিল। তবে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েতের কাজে মাত্র ২ শতাংশ মহিলার অংশগ্রহণ ঘটেছিল। তপশিলি জাতি-উপজাতি এবং মহিলারা পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের এই সময় তেমন সুযোগ পাননি'।[৩৩] উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, নমঃশূদ্র জাতির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ না থাকলেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ ছিল। এর কারণ হল আমাদের আলোচ্য তিনটি জেলায় নমঃশূদ্রদের বসবাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে পঞ্চায়েতে সংরক্ষণের আগে পর্যন্ত এদের অংশগ্রহণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের থেকে অনেক কম ছিল। আর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে এককভাবে বসবাস করার কারণে পঞ্চায়েতে সংরক্ষণের আগে থেকেই সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণে নমঃশূদ্র তথা অন্যান্য দলিত জাতির থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে।

এবারে আমরা নিম্নে ১৯৯৩ পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতে নারীদের সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা করব।

সারণি ৫.১৪: ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে সাধারণ নারী-পুরুষ ও তপশিলি জাতি/উপজাতি নারী-পুরুষ সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত আসন বন্টনের অবস্থান

স্তর	সাধারণ	সাধারণ	তপশিলি জাতি/ উপজাতি	তপশিলি জাতি/ উপজাতি	তপশিলি জাতি/ উপজাতি	মোট আসন	নারীর জন্য সংরক্ষিত
	পুরুষ	নারী সংরক্ষিত	পুরুষ সং	নারী সংরক্ষিত	মোট	মোট	
গ্রাম পঞ্চায়েত	২৪৭১১	১৩৫৫৩	১৪৮১১	৭৯৩৬	২২৭৪৭	৬১০১১	২১৪৮৯
শতাংশ	৪০.৫০	২২.২২			৩৭.২৮	১০০.০০	৩৫.২২
পঞ্চায়েত সমিতি	৪০৭১	১৯৯৬	২২০০	১১৮৬	৩৩৮৬	৯৪৫৩	৩১৮২
শতাংশ	৪৩.০৭	২১.১১			৩৫.৮২	১০০.০০	৩৩.৬৬
জেলা পরিষদ	২৮৭	১৪২	১৪৫	৮২	২২৭	৬৫৬	২২৪
শতাংশ	৪৩.৭৫	২১.৬৫			৩৪.৬০	১০০.০০	৩৪.১৪
মোট	২৯০৬৯	১৫৬৯১	১৭১৫৬	৯২২০	২৬৩৬০	৭১১২০	২৪৮৯৫

সূত্রঃ Panchayet Raj, Government of West Bengal, March-April and May-June, 1993

সারা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নারী-পুরুষ তপশিলি জাতি/উপজাতির জন্য উপরের চিত্র থেকে আমরা অবশ্যই বিভিন্ন জেলার স্থানীয় চিত্র পাই না। স্থানীয় অর্থনীতি, জনসংখ্যা এবং মানুষের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির বিভিন্নতা নির্বিশেষে সব জেলার প্রতিটি স্তরেই নারীর অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করা কাম্য। কিন্তু গিরিশ কুমার ও বুদ্ধদেব ঘোষ তাঁদের সমীক্ষিত ৪টি গ্রীলপঞ্চায়েতে (বর্ধমান জেলার মেমারি ব্লক-এর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, মালদহের সাহপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ব্লকের ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ব্লক-এর কাষ্ঠডাঙ্গা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত) দেখেছেন যে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা গড়ে ছিলেন মাত্র ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের কম । তবে এই ৪টে গ্রাম পঞ্চায়েতের সমীক্ষা অনুসারে সাধারণ প্রতিনিধিদের মধ্যে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ৭.৭৩ শতাংশ। মধ্যবর্ণের মানুষেরই ছিল প্রাধান্য (৪১.৫১ শতাংশ)। তার পরের স্থানটি ছিল তপশিলি জাতি/উপজাতি জনগোষ্ঠীর (২৯.৩০ শতাংশ)। সমীক্ষকদ্বয় আরও লিখেছেন যে, “Caste status generally, thogh necessarily reflects class position also. The incidence of poverty is more acute among the lower castes.”[৩৪] পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৯টি জেলার **১৯৯৩** সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়া, এই তিনটি জেলার পঞ্চায়েতকে এখানে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হল। যদিও ত্রি-স্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েতের গ্রামস্তরটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে শুধু নমুনা হিসাবে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে উপরে আলোচনা করেছি। এবারে নিম্নে আমরা **৩টি জেলার (উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়া) গ্রাম পঞ্চায়েতে নারী-পুরুষ সদস্য, ১৯৯৩** আসন সংখ্যার বিভাজনকে সারণি মাধ্যমে তুলে ধরব।

কাজেই আমরা পঞ্চায়েতসমিতি ও জেলাপরিষদ নিয়েও নমুনা হিসাবে আলোচনায় তুলে ধরব।

সারণি ৫.১৫: ৩টি জেলার (উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়া) গ্রাম পঞ্চায়েতে নারী-পুরুষ সদস্য, ১৯৯৩*

	উত্তর ২৪ পরগনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা 200			দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রাম পঞ্চায়েত সংখ্যা ৩১২			নদীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৮৭		
বিভাজন	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ
সাধারণ	২১৫২	৭১৬	১৪৩৬	৩১০৩	১০২৫	২০৭৮	২২৬৫	৭৬৩	১৫০২
শতাংশ	৫৫.৯৮	১৮.৬৩	৩৭.৩৫	৫২.৫৮	১৭.৩৭	৩৫.২১	৬১.৩৮	২০.৬০	৪০.৭০

তপশিলি জাত	১৫৮৩	৬০১	৯৮২	২৬৫৫	১০০০	১৬৫৫	১২৯৫	৪৯৯	৭৯৬
শতাংশ	৪১.১৮	১৫.৬৩	২৫.৫৫	৪৫.০০	১৬.৯৫	২৮.০৫	৩৫.১০	১৩.৫২	২১.৫৮
তপশিলি উপজাতি	১০৯	৪৪	৬৫	১৪৩	৫৪	৮৯	১৩০	৫৫	৭৫
শতাংশ	২.৮৪	১.১৪	১.৭০	২.৪২	০.৯১	১.৫১	৩.৫২	১.৮৯	২.০৩
মোট	৩৮৪৪	১৩৬১	২৪৮৩	৫৯০১	২০৭৯	৩৮২২	৩৬৯০	১৩১৭	২৩৭৩
শতাংশ	১০০.০০	৩৫.৪১	৬৪.৫৯	১০০.০০	৩৫.২৩	৬৮.৭৭	১০০.০০	৩৫.৬১	৬৪.৩১

সূত্রঃ 1. Socio-Economic Profile of Panchayat Members, Government of West Bengal, State Institute of Panchayats and Rural Development, North & South 24 Parganas, Nadia, Page- 3 – 15.

সারণি ৫.১৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৩টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে গড়ে ন্যনতম ৩৩.৩ শতাংশ নারী নির্বাচিত হয়েছেন। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়ায় তপশিলি জাতির সংখ্যাধিক্য পঞ্চায়েতেও প্রতিফলিত হয়েছে। আর নদীয়া থেকে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে তপসিলি জাতির জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ার ফলে নদীয়া জেলা অপেক্ষা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দলিত জাতির নারী-পুরুষের প্রতিনিধিত্ব কিছুটা বেশি। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, নমঃশূদ্রদের থেকে উক্ত তিনটি জেলায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী-পুরুষের প্রতিনিধিত্ব অনেক বেশিই হবে, তথ্য প্রমাণে তাই দেখা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল, এই জনপ্রতিনিধিরা, বিশেষত দলিত মহিলা ও পুরুষ সদস্যারা, শিক্ষা এবং আর্থিক কাঠামোর কোনো স্তরে অবস্থান করতেন? আর পঞ্চায়েতে কোন জাতিবর্ণ ও শ্রেণীর মানুষরাই বা আধিপত্য করেছেন?

উপরিউক্ত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত গুলোর আলোচনা থেকে পঞ্চায়েত সদস্যদের শ্রেণী ও শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে সাধারণত আয় এবং সম্পত্তির মালিকানা দিয়েই শ্রেণী নির্ণয় করা হয়। বাস্তবে কিন্তু অধিকাংশ দলিত নারী- পুরুষের নিজস্ব কোনো অর্থকরী পেশা কিংবা উল্লেখযোগ্য উপার্জন নাথাকলেও তাঁদের পারিবারিক আয়, অর্থাৎ স্বামী অথবা স্ত্রীর বা অন্য কোনো পুরুষ বা নারীদের অভিভাবকের আয় এবং জমির মালিকানা দিয়ে মহিলা ও পুরুষ সদস্যাদের শ্রেণীগত চিত্র পাওয়া যায়।

উক্ত বিষয়ে প্রথমেই আমরা উল্লেখ করব যে, কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সদস্যদের আয়ের উৎসই হল কৃষি বা ইমারত গড়ার কাজের শ্রমিক। আমাদের রাজ্যে ভূমিসংস্কারের সফল রূপায়নের মাধ্যমে জমির উচ্চ মালিকানার উচ্ছেদ ঘটার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা (পঞ্চায়েত সদস্যাসহ) কৃষিতে নিযুক্ত থাকেন চাষি, ভাগ চাষি এবং শ্রমিক রূপে। এঁদের মধ্যে দলিত জাতির মানুষের সংখ্যা অধিক, আর নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনার মধ্যে দলিতদের মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা উক্ত তিনটি জেলার মোট দলিত জাতির মধ্যে সর্বাধিক। তবে ভূমি হীনতা সবসময় দারিদ্রের সূচক হয়না। অনেক সময় দেখা যায়, ভূমিহীন মানুষও চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষকতা প্রভৃতির মাধ্যমে ভালো উপার্জন করেন। এই ৩টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা কৃষি ছাড়াও কারিগর, ইমারত গড়ার শ্রমিক ও মিস্ত্রী, কামার, কুমোর, ছুতোর ইত্যাদি, এছাড়া পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের বড় একটা অংশের মানুষ, জেলে, পশুপালক, নানা ধরনের ছোটো ও মাঝারি এবং মাছের ব্যবসায়ী, শিক্ষক এবং চাকুরীজীবী রূপেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। তবে এই একই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও আবার আয়ের প্রধান উৎসের পার্থক্য তো থাকেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত) ও উত্তর ২৪ পরগনায় (২০০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত) এবং নদীয়া (১৮৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত), এই ৩ টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের যথাক্রমে ৪৪ শতাংশ ৩৯ শতাংশ এবং ৩৬ শতাংশ সদস্যের বাৎসরিক আয়ের উর্ধ্বসীমা ছিল ৪ হাজার টাকা। অর্থাৎ এই সদস্যরা সকলেই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করতেন। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়ায় ৪ হাজার- ১১ হাজার টাকার বাৎসরিক আয় ছিল যথাক্রমে ৩৯ শতাংশ, ৩৬ শতাংশ ও ৪৪ শতাংশ সদস্যের। অনুরূপে যথাক্রমে ১২ শতাংশ, ৭ শতাংশ এবং ১২ শতাংশের আয় ১১০১ হাজার-২৫ হাজারের মধ্যে ছিল। ২৫ হাজার ও তার উর্ধ্ব আয়ের সদস্য ছিলেন খুবই কম শতাংশ। এঁদের মধ্যে আবার তপশিলী জাতি/উপজাতি সদস্য ছিলেন খুবই নগণ্য।[৩৫] উল্লেখ্য যে দারিদ্র পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সদস্যের সংখ্যা অধিক, তবে তপশিলি উপজাতির সদস্যদের ব্যতিরেখে নির্নয় করা হয়েছে।

জমির মালিকানার যে চিত্র সরকারী রিপোর্টে ফুটে উঠেছে, তাতে দেখা যায় যে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদীয়া জেলার উপরোক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির যথাক্রমে ৪৮ শতাংশ, ৫২ শতাংশ এবং ৪৬ শতাংশ সদস্যের জমির পরিমাণ ২.৫০ একরের নীচে, আর যথাক্রমে ৮.৫২ শতাংশ, ১৫ শতাংশ

এবং ১২.৫ শতাংশ সদস্যের জমির পরিমাণ ২.৫০ একর-৫ একরের মধ্যে ছিল। মাত্র ৩-৫ শতাংশ সদস্যের জমির মালিকানা ছিল ৫-১০ একরের মধ্যে। তার উর্ধ্বে জমি ছিল খুব নগন্য সংখ্যক সদস্যের। সুতরাং বলা যায় যে, জমির মালিকানা যাদের আছে (পাট্টাদারদের বাদ দিয়ে), তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি জমির মালিক, আর জমির মালিকানা দিক দিয়েও সাধারণভাবে নিম্নতর এবং নিম্নতম স্থানে অবস্থান ছিল যথাক্রমে তপশিলি জাতির মধ্যে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সদস্যদের।[৩৬] এক্ষেত্রেও আমরা তপসিলি উপজাতির সদস্যদের ব্যতিরেকে সমীক্ষা করেছি।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের আয় এবং জমির মালিকানার চিত্র থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাই স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থার দায়িত্বে এসেছিলেন। আর এই তথ্যের ভিত্তিতেই বলা যায় যে, দলিত নারী-পুরুষ সদস্যদের ব্যক্তিগত আয় এবং জমির মালিকানা না থাকলেও (ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া) এঁরাও সাধারণভাবে গ্রামের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারভুক্তই ছিলেন এবং এঁদের মধ্যে আবার নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সদস্যদের সংখ্যা বেশি। উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাদের পঞ্চায়েতে বিশেষ স্থান ছিল না, তবে পুরুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্টে উপরোক্ত ৩টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার হার কম এবং নারীদের মধ্যেও আবার তপশিলি জাতি ও উপজাতি নারী শিক্ষার নিম্নতর ও নিম্নতম হারই প্রতিফলিত হয়েছে, তবে এঁদের মধ্যে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী সদস্যদের শিক্ষার হার অধিক। সদস্যরা প্রায় সকলেই বিবাহিত এবং ২০-৭০ বছর বয়সী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এরা শিক্ষার সুযোগ এবং সময় পেয়েছেন কম, কাজেই নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের ক্ষেত্রে এমনটা ছিল না। অধিকাংশ সদস্যের শিক্ষাবিদ্যালয় অতিক্রম করতে পারেননি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়ায় মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যরা গড়ে ৩৪.৮ শতাংশ ৪০.০০ শতাংশ এবং ৪০.২২ শতাংশ যথাক্রমে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত ছিলেন। তবে এখানেও তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সদস্যরা ছিলেন নিম্নতর এবং নিম্নতম স্থানে কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির নারীদের শিক্ষার হার ছিল যথেষ্ট ভালো। প্রাথমিক স্তরে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সদস্যাদের শিক্ষার হার ছিল যথাক্রমে ৩৭.৬২ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ। আর মাধ্যমিক স্তরে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি নারীদের শতাংশ ছিল যথাক্রমে ২৫ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ। সাধারণ নারীদের মধ্যে স্নাতক স্তরে শিক্ষার

শতকরা হার ছিল ৭.৩২, আর তপশিলি জাতি নারীরক্ষেত্রে এই স্তরের শিক্ষার শতকরা হার ছিল ৩.৬০ শতাংশ। তপশিলি উপজাতির মধ্যে স্নাতকোত্তর কেউ ছিলেন না। সাধারণ সদস্যাদের মধ্যে নিরক্ষর ছিলেন ০.৭৮ শতাংশ, কিন্তু তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সদস্যাদের নিরক্ষরতার হার ছিল যথাক্রমে ১.৯০ শতাংশ এবং ৫.৫৫ শতাংশ। সাধারণভাবে নারীদের তুলনায় পুরুষদের শিক্ষা ছিল উচ্চমানের। পুরুষ সদস্যদের মধ্যে প্রায় কেউই নিরক্ষর ছিলেন না।[৩৭] দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদীয়া জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতেও কমবেশি অনুরূপ চিত্রই পাওয়া গেলেও, নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী –পুরুষের শিক্ষার হার ছিল বেশ ভালো।[৩৮]

কাজেই উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে যে দলিত পুরুষ ও নারীরা তৃণমূল স্তরে রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন, তাঁরা স্বামী কিংবা অন্য কোনো পুরুষ অভিভাবক সূত্রে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত স্তরভুক্ত এবং শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ অসুবিধাভোগী। কিন্তু ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় দলিত প্রার্থীদের শিক্ষার ও আয়ের অবস্থান অনেকটা পাল্টে যায়। বিশেষ করে উক্ত ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্কুল সার্ভিস চালু হওয়ার ফলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী – পুরুষের শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পতি যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে পেরেছে।

এবারে আমরা কাজের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র দলিত জাতি সহ নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী পুরুষের ক্ষমতায়ন, ১৯৯৮

প্রথমেই উল্লেখ্য যে, এই পরিচ্ছেদ মূলত গবেষকের ব্যক্তিগত সমীক্ষার উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ভূমিকায় বলা হয়েছে। আমরা উদাহরণ হিসাবে নিম্নে ১৯৯৮ সালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ৩টি স্তরের নারী-পুরুষ প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব, এর কারণ হল নিবিড়ভাবে গবেষণা করার জন্যে।

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে দলিত পুরুষ ও নারীসহ নিম্নজাতির মানুষের স্থানীয় স্ব-শাসনে যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়, ৫ বছর পরে ১৯৯৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তা আরও সম্প্রসারিত হয়।

সারণি ৫.১৬: ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে পঞ্চায়েতের ৩টি স্তরে সাধারণ জাতি সহ দলিত নারী-পুরুষ প্রতিনিধিত্ব

গ্রাম পঞ্চায়েতে জাতি ও বর্ণ				পঞ্চায়েত সমিতি			জেলা পরিষদ		
	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ
সাধারণ	৩২৬৬৫	১০৯৯০	২১৬৭৫	৫৬৭২	১৮৪১	৩৮৩১	৪৬৭	১৫৪	৩১৩
	৬৬.৩৫	২২.৩২	৪৪.০৩	৬৬.২৪	২১.৫০	৪৪.৭৪	৬৫.২২	২১.৫১	৪৩.৭১
তপশিলি জাতি	১৩৩৮০	৫১৫৬	৮২২৪	২৩১৬	৮৬০	১৪৫৬	১৯৯	৭৪	১২৫
	২৭.১৮	১০.৪৭	১৬.৭১	২৭.০৪	১০.০৪	১৭.০০	২৭.৭৯	১০.৩৩	১৭.৪৫
তপশিলি উপজাতি	৩১৮০	১৩৯১	১৭৮৯	৫৭৪	২১২	৩৬২	৫০	১৫	৩৫
	৬.৪৭	২.৮২	৩.৬৫	৬.৭০	২.৪৭	৪.২৩	৬.৮৯	২.০৯	৪.৮৯
মোট	৪৭৪৩৪	১৭৫৩৭	৩১৬৮৮	৮৫৬২	২৯১৩	৫৬৪৯	৭১৬	২৪৩	৪৭৩
	১০০.০০	৩৫.৬১	৬৪.৩৯	৯৯.৭৪	৩৫.০২	৬৫.৯৮	১০০.০০	৩৩.৯৪	৬৬.০৭

সূত্রঃ Information on West Bengal Panchayats, Government of West Bengal, State Institute of Panchayats and Rural Development, West Bengal, Kalyani, Nadia, 1999, pp. 162-182 and 183.

সারণি ৫.১৬ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে ১৬টি জেলার (দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য এলাকা বাদ দিয়ে) মোট ৪৯,২৩৪ জন গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য এবং ৮,৫৬২ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের মধ্যে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে ৩৫.৬২ শতাংশ এবং ৩৫.০২ শতাংশ। আর জেলা পরিষদ স্তরে মোট ৭১৬ জন সদস্যদের মধ্যে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল ৩৩.৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতিটি স্তরেই মোট আসনের অন্যুন এক-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভগ্নাংশজনিত সুবিধাটি নারীরাই পেয়েছেন। লক্ষণীয় যে, সাধারণ নারীরা ৩টি স্তরেই মোটামুটি ২২ শতাংশ আসন লাভ করেছেন। আর তপশিলি জাতি ও উপজাতি নারীরা আছেন নিম্নতর এবং নিম্নতম স্থানে (যথাক্রমে ১০ এবং ৩ শতাংশ)। সুতরাং বলা যায় যে, পঞ্চায়েতে সাধারণ এবং তপশিলি জাতি/উপজাতি নারীর এই অবস্থান তাঁদের নিজ নিজ আর্থসামাজিক অবস্থানেরই অনুরূপ। আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য থেকে জানতে পেরেছি নদীয়া এবং দুই ২৪ পরগনায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির নারী পুরুষের পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ সাংবিধানিক সংরক্ষণ অনুসারে যথাযথ কার্যকর হয়েছে। যা কিনা এই ৩টি জেলার অন্যান্য দলিত জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির সদস্য/সদস্যাদের শ্রেণী ও শিক্ষা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির উপর ব্যক্তিগত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আলোচিত ৩টি জেলার ১০টি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের নারী সদস্যাদের অধিকাংশই ছিলেন গৃহবধূ ও যাঁদের নিজস্ব কোনো অর্থকরী পেশা ছিলনা এবং অল্পসংখ্যক স্কুল শিক্ষিকা, আর পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন কৃষক, ছোটো ব্যবসায়ী এবং বেশ কয়েকজন স্কুল শিক্ষক। কিন্তু তাঁরা গড়ে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারভুক্তই ছিলেন। অনেক পরিবার চাষের সাথে যুক্ত। অধিকাংশ চাষি পরিবারে মহিলারাও চাষ ও ফসল তোলার কাজে যুক্ত থাকেন। যাঁদের নিজেদের চাষের জমি নেই, তাঁরাও অনেক সময় ভাগ চাষ করেন। এছাড়া আছে পাট্টা চাষ ও অগ্রিম চাষ। অগ্রিম চাষের ক্ষেত্রে ভূমিহীন মানুষ চাষের মরশুমে কিছু টাকার বিনিময়ে অন্যের জমি কিনে নেন চাষের জন্য। সার, বীজ ইত্যাদি ধার নিয়ে পরিবারের মহিলারা সহ সবাই মিলে চাষ করে ফসল ঘরে তোলেন। আর তখনই পরিশোধ করেন জমির মালিকের ঋণ। অগ্রিম চাষের ক্ষেত্রে চাষ করা যায় অনেকটা নিজের জমির মতো, অন্যের জমিতে শ্রমিকের মতো নয়। তবে এমনও কিছু পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন, পেশায় যারা কৃষি শ্রমিক এবং রিক্সা ভ্যান চালক। উদাহরণস্বরূপ, নদীয়ার তেহট্ট ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সি.পি.আই.এমের সদস্য একজন ছিলেন কৃষি শ্রমিক আর একজন ছিলেন রিক্সা ভ্যান চালক এবং চাকদহ ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত তাতলা ২ নং গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য পল্ট্রি মুরগির ফার্মের শ্রমিক ছিলেন এবং সি.পি.আই.এমের সদস্য ছিলেন বাঁধাকপি খুচরো বিক্রেতা ও হরিণঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বিরহী ২ নং গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য একজন বাজারে খুচরো সবজি বিক্রেতা এবং নগর উখড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য পেশায় রাজমিস্ত্রী। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত শিমূলপুর গ্রামপঞ্চায়েতের সি.পি.আই.এমের সদস্য পেশায় ফুল বিক্রেতা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যও পেশায় ফুল বিক্রেতা, এবং বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বাগদা গ্রামপঞ্চায়েতের কংগ্রেসের সদস্য পেশায় কৃষি শ্রমিক, স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ জন সি.পি.আই.এম এবং ১ জন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য পেশায় অন্যান্য বড় ভেড়ির মালিকের বেড়িতে মাছ ধরার শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, ও রাজার হাট পঞ্চায়েতসমিতির অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামপঞ্চায়েতের

সি.পি.আই.এমের সদস্য পেশায় বেড়ির পাহারাদার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, রাজার হাট বিষ্ণুপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য পেশায় ভ্যানে করে ইট, বালি টানার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর পঞ্চায়েতির অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্য পেশায় ছিলেন বাজারে খুচরো মাছের বিক্রেতা, ক্যানিং ২ নং পঞ্চায়েতসমিতির অন্তর্গত মাতলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সি.পি.আই.এমের সদস্য কাঁকড়া ধরার পেশায় নিযুক্ত ছিলেন এবং এই গ্রামপঞ্চায়েতের ১ জন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য মিনি বাগদা ধরার পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। মগরাহাট ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ধনপোতা গ্রামপঞ্চায়েতের ১ জন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য পেয়ারা খুচরো বিক্রেতা ছিলেন এবং সি.পি.আই.এমের ১ জন সদস্য ট্রেনে হকারি করতেন। কৃষিনির্ভর জীবিকা ছাড়াও পঞ্চায়েত সদস্যাদের অন্যান্য পারিবারিক জীবিকা হল পশুপালন, নানাবিধ কুটির শিল্প, ছোটো ব্যবসা, ফুল চাষি, কলা বাগান, পেয়ারা বাগান, নানা ধরণের সব্জির বাগান, ছোটো ও মাঝারি মুদির দোকান, হাতুড়ে ডাক্তারি ও হোমিওপ্যাথি, অফিসের করণিক এবং শিক্ষকতা প্রভৃতি। প্রতিটি পঞ্চায়েতে ৮ থেকে ১৫ জন প্রাইমারি ও হাই স্কুলের শিক্ষিক ও শিক্ষিকা গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যা হিসাবে পাওয়া গেছে।[৩৯]

উপরি উক্ত পঞ্চায়েত সমিতি গুলোর অধীনে বেশ কয়েকটি গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রশ্ন মালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নিয়ে এবং পঞ্চায়েতসমিতির ও গ্রামপঞ্চায়েতগুলোর আধিকারিকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে সাধারণভাবে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পঞ্চায়েত সদস্যাদের গড় শিক্ষার মান ছিল স্কুলের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে এরই মধ্যে ৫ থেকে ৬ জন স্নাতকোত্তর সদস্যা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ২ থেকে ৩ জন নব স্বাক্ষর, যাঁরা শুধু নিজের নামটুকুই সই করতে পারতেন। শিক্ষা ও আয়ের দিক থেকে তপশিলি জাতির সদস্যরা ছিলেন সাধারণ জাতির সদস্যদের অনেকটাই নিচে আর তপশিলি উপজাতির নারী পুরুষ সদস্যরা আছেন সব থেকে নীচে। তবে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী পুরুষ পঞ্চায়েত সদস্যদের শিক্ষা ও আয় ছিল অন্যান্য তপশিলিদের থেকে অনেকটা উপরে। উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ পঞ্চায়েত সদস্যা পাওয়া যায় কদাচিৎ। এর কারণ হল, সমীক্ষিত পঞ্চায়েত গুলোর জনবিন্যাসের দিক থেকে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ ছিল অধিক। এই গবেষণায় পঞ্চায়েতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ যে সকল অঞ্চলে অধিক বসবাস করেন, সেই সকল অঞ্চলগুলোকেই আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে ধরেছি, যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সংক্ষেপে

বলা যায়, সমীক্ষিত গ্রামপঞ্চায়েতগুলির সদস্যারা ছিলেন সাধারণভাবে অল্প শিক্ষিত, এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা বেশ চোখে পড়ার মত। তবে এ হল গ্রামপঞ্চায়েতের চিত্র। পঞ্চায়েত সমিতির চিত্র একটু আলাদা। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যাদের গড় শিক্ষার স্তর এবং পারিবারিক আয় গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যাদের থেকে অনেকটা ভালো। আর পঞ্চায়েতের উচ্চতম স্তরে অর্থাৎ জেলাপরিষদে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষিত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত সদস্যা আছেন বেশ কিছু। উচ্চস্তরের নির্বাচনে প্রার্থী দেবার সময় স্বাভাবিক কারণেই প্রার্থীর শিক্ষার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়। তবে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী একই জেলার বিভিন্ন ব্লকে এবং একই ব্লকের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতেও কিছুটা আলাদা আলাদা চিত্রও আমরা পেয়েছি।

একথা অনস্বীকার্য যে, সংরক্ষণের ফলেই অল্প শিক্ষিত এবং মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ এবং তপশিলি জাতি/উপজাতি নারী পুরুষেরা এখন তাঁদের নিজ নিজ আর্থসামাজিক অবস্থান অনুযায়ী স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় স্থান করে নিতে পেরেছেন। অন্যথায় সামাজিক কাঠামোর বিচারে সমাজে এতগুলি আসনে দলিত নারী পুরুষের পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই সম্ভব হতনা। তবে দলিত নারীর প্রতিটি পদক্ষেপই আজও ছড়ানো আছে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জাল। যাই হোক, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী - পুরুষ সদস্যদের থেকে নমঃশূদ্র নারী পুরুষের গ্রাম পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণটা একটু কম। এর কারণ হল, নমঃশূদ্ররা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করার ফলে।

নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ত্রি-পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যাদের যোগ্যতার প্রশ্ন

এখন প্রশ্ন হল, নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী পুরুষ ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের এই সদস্যারা কি তৃণমূল স্তরের রাজনীতির যোগ্য, আর কীভাবেই বা তাঁরা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করছেন? তাঁরা কি শুধুই তাঁদের রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীর 'প্রক্সি' রূপে কাজ করছেন?

এখানে প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দল ভিত্তিক। দলীয় ভিত্তিতেই প্রার্থী ঠিক করা হয়। ফলে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত সদস্যরা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। উক্ত জাতি দুটির সামাজিক আন্দোলনের মধ্য

দিয়েও গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে ও পঞ্চায়েতসমিতি স্তরে এবং কিছু কিছু জেলা পরিষদ স্তরেও রাজনৈতিক দলের টিকিটে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তম দল সিপিআই (এম)-এর মহিলা শাখা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বহু বছর ধরে এ রাজ্যে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মহিলাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার কাজে ব্রতী আছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে উক্ত ৩টি জেলার গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যাদের মধ্যে ২০১৩ সালের আগে অনেকেই গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যা ছিল। সুতরাং এই দলের মহিলা প্রতিনিধিদের অনেকেরই রাজনৈতিক সচেতনতা আগেই থেকে ছিল। কিছু নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সদস্যা আছেন যারা সারাক্ষণের কর্মী। আর কোনো দলের মহিলা শাখা না থাকলেও পরিবারের দলীয় পুরুষ সদস্যদের মাধ্যমে নারীরা কিছুটা রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকেন। একথা সত্য যে, অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও পঞ্চায়েতের মহিলা প্রতিনিধিদের অধিকাংশ এমন কোনো ব্যক্তির স্ত্রী অথবা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট আত্মীয়া যিনি বা যাঁরা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য, সক্রিয় কর্মী অথবা দ্বিধাহীন সমর্থক। আর এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসন ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলে অন্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও পুরুষেরাই নিকট আত্মীয়াকে সেই আসনে পাঠাবার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এতে আসনটি পরিবারের মধ্যেই থাকে। আর সঙ্গে কিছু প্রচ্ছন্ন আর্থিক কিংবা অন্য সুবিধাও হয়তো থাকে। সমীক্ষিত গ্রামপঞ্চায়েতে সদস্যাদের অধিকাংশেরই পিতৃকুল অথবা শ্বশুরকুলের একাধিক ব্যক্তি এমনকী অনেক সময় শাশুড়ি, ননদও বিভিন্ন দলের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। কয়েকজন সদস্যা আবার ইতিমধ্যে দল পরিবর্তনও করেছেন। সুতরাং পারিবারিক সূত্রে অন্তত কিছুটা রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং মানসিকতা বেশ কিছু সদস্যারই আছে। নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী দেবার সময়ও প্রার্থীর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ যথাসম্ভব দেখে নেওয়া হয়। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের অবিভাবক তাঁদের জাতির পুরুষেরা হয়ে থাকেন, তাহলে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের রাজনৈতিক দলগুলো। লোকসভা এবং বিধানসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের যে চিত্র অংশগ্রহণ ও ভূমিকাতে দেখতে পেয়েছি ঠিক পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতেও আমরা কমবেশি একই চিত্র দেখতে পেলাম।

সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত সর্বভারতীয় তৃণমূল, সি.পি.আই. (এম), সি.পি.আই, কংগ্রেস, বিজেপি এবং অল্প কিছু জায়গায় আর.এস.পি এবং

এস.ইউ.সি.আই, ও বি.এস.পি পঞ্চায়েত নির্বাচনের অংশীদার। ফলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রত্যেকটি আসনের জন্য ৩/৪ জন করে বিভিন্ন দলীয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কোনো কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে আবার নির্দল প্রার্থীর অংশগ্রহণও দেখাগেছে।[৪০] আমাদের সমীক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্য কেবলমাত্র বহু জনসমাজ পার্টির টিকিটে নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। আমাদের সমীক্ষিত ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের সংরক্ষণের বাইরেও সাধারণ আসনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পুরুষ ও মহিলারা নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচনে জয়লাভ করার পরে প্রায় প্রত্যেকটি সদস্যাই নিজ নিজ দলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং নিজ নিজ দলের নীতিই হয় সদস্যাদের নীতি। অধিকাংশ সময়ে দলীয় নির্দেশেই তাঁরা পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনা করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মহিলা সদস্যারা দলীয় (গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, মহিলা মোরচা, মহিলা সমিতি) কাজ এবং পঞ্চায়েতের কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। আর নারী - পুরুষ সকলের জন্যই একথা সত্য।[৪১] পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও দলভিত্তিক হওয়ার ফলে অন্য অনেক রাজ্যের অপেক্ষা এ রাজ্যে পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের দলের প্রতি আনুগত্য বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

পঞ্চায়েতে দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র পুরুষ ও মহিলাদের অবশ্যই কিছুটা সাহায্যের প্রয়োজন হয়। স্বল্পশিক্ষিত অথবা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে একেবারেই নতুন আসা পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এ ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করেন দলীয় পুরুষ এবং মহিলা সদস্যারা, অথবা দলের সাথে যুক্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা। অধিকাংশ উক্ত জাতি দুটির পুরুষ ও মহিলা সদস্যা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে, প্রথম প্রথম তাঁদের পুকুরের মাছ সমুদ্রে পড়ার মত অসহায় মনে হয়েছে। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে সে জড়তা কেটে গেছে। প্রশ্নের উত্তরে সমীক্ষিত সব সদস্যারাই জানিয়েছেন যে, পঞ্চায়েতে তাঁদের কোনো সমস্যা হয় না। উচ্চজাতির, নারী - পুরুষ সদস্যরা সবসময়ই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কোনো কোনো সদস্যা বলেছেন, ওরাই তো আমাদের পঞ্চায়েতে পাঠিয়েছে, তা এখন সাহায্য তো করতেই হবে।'' আবার কেউ কেউ অকপটে বলেছেন, "উচ্চজাতির নারী পুরুষ সদস্যরা আমাদের সাহায্য করে, তবে তার মধ্যেও মনে মনে একটু অসন্তোষ আছে।"[৪২] অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র পুরুষ ও মহিলা সদস্যাদের বিরুদ্ধে উচ্চজাতির নারী

পুরুষদের মনে একটু চাপা অসন্তোষ কাজ করলেও দলীয় স্বার্থে সহযোগিতার হাত বাড়াতেই হয়। ক্ষমতার লোভ এবং সামাজিক কাঠামোতে সমাজে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পুরুষ - নারী বিরোধী মনোভাব কি হঠাৎ ত্যাগ করা সম্ভব? তবে যেব্যবস্থা আইনি - বিধানের ফলে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তার সাথে সহযোগিতা করাই তো বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক।

এখন প্রশ্ন হল, নিজ দলের নেতা – নেত্রীর সহযোগিতা করেন বলেই কি নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পুরুষ ও মহিলা সদস্যাদের "রাজনৈতিক দলের নেতা - নেত্রীর প্রক্সি" বলা যায়? মনে রাখা প্রয়োজন যে, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং বিভিন্ন গণআন্দোলনে যোগদানকারী উক্ত দু'টি দলিত জাতির পুরুষ ও মহিলারাও সামাজিক এবং পারিবারিক সূত্রেই রাজনীতিতে এসেছিলেন। তাঁরা উচ্চ জাতির সংগ্রামীদের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন বলেই কি তাঁরা সংগ্রামীরা জাতির 'প্রক্সি' ছিলেন? আর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম থেকে এখনও পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র পুরুষ ও মহিলারা সাংসদদের অধিকাংশই তাঁদের পিতা/ভ্রাতা/স্বামী, এমনকী মৃত স্বামীর সূত্র ধরেই লোকসভার সংসদে এসেছেন, আর এঁদের মধ্যে অনেকেই দক্ষতার পরিচয়ও দিচ্ছেন। এঁরাও কি সবাই 'প্রক্সি' সদস্যা? মনে হয় উচ্চ জাতির নেতা নেত্রী নারী পুরুষ যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র নারী পুরুষ পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, পরিপূরক, একথাটি মনে রাখলেই অনেক সমস্যা এড়ানো সম্ভব।৪৩ কিছুটা নিজ দলের উচ্চ জাতির নারী - পুরুষের সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়েও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী পুরুষ সদস্যারা যদি অল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় রাজনীতিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন তবে ক্ষতি কি? সুতরাং যুগ - যুগান্তর ধরে পিছিয়ে থাকা উক্ত দলিত জাতি দু'টির নারী পুরুষদের জন্য, একটু সহনশীলতা থাকা উচিত নয় কি? নৈতিক দিক দিয়েও কি যুক্তিসঙ্গত নয়? তাছাড়া অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য তো একসময় সকলকেই শুরু করতে হয়। উচ্চ জাতির নেতা নেত্রী সদস্যদের জন্যও একথা সত্য। আরও বড় কথা হল এই যে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র সদস্যারা উচ্চ জাতির নেতা নেত্রীর কথা শুনে কাজ করেন এবং সেটা সম্পূর্ণ দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী। সেক্ষেত্রে তারাও কি শুধু দলের 'প্রক্সি' রূপে কাজ করেন?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রামপঞ্চায়েতে মহিলাদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ সালে বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতে এমন বেশ কিছু নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সদস্যরা ছিলেন, যাঁরা কূট রাজনীতির খেলায় উচ্চ জাতির সদস্যদের হারিয়ে দিতে পারতেন। অনেকে আবার সুবক্তাও আমরা পেয়েছি। যারা তৃণমূল স্তরের

অভিজ্ঞতা নিয়ে অনায়াসে এখন রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক ও বিধায়িকা রূপে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তৃণমূল স্তরের কঠিন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিত্বে যে পূর্ণতা আনে, তা কখনোই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নেতৃত্বের মধ্যে পাওয়া যায় না।[৪৪] মনে রাখা প্রয়োজন যে, বুদ্ধি বিবেচনা না মস্তিষ্ক উচ্চজাতির সদস্যদের অপেক্ষা নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সদস্যরা যেকোনো অংশে কম নয়, তা - প্রমাণিত সত্য। আর উক্ত দুটি দলিতজাতির কাছে একটি অতিরিক্ত গুণ আছে, তা হল এরা কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন। প্রয়োজন শুধু কিছুটা সুযোগ সুবিধা এবং পরিবেশ। সেই পরিবেশ এখন তৈরি হচ্ছে পঞ্চায়েত রাজনীতিতে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির নারী - পুরুষ প্রধান এবং উপপ্রধানদের দক্ষতার প্রশ্ন

ক্ষেত্রসমীক্ষা করে আমরা উক্ত ৩টি জেলার সমীক্ষিত ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানদের কাজের দক্ষতার উপর প্রশ্ন করে যা জানতে পেরেছি, তা - বেশ গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তবে গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে প্রধান ও উপপ্রধানদের আসনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিরপেক্ষ এবং দক্ষব্যক্তি প্রধান ও উপপ্রধানের পদে আসীন থাকলে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারেন। কিন্তু কার্যত, প্রত্যেক প্রধানকেই তার দলীয় নীতির সাথে সঙ্গতি রেখেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। সংবিধান সংশোধনী আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানদের আসনগুলির এক-তৃতীয়াংশের মহিলাদের জন্য (তপশিলি জাতি/উপজাতিসহ) সংরক্ষিত আছে। আর প্রধান ও উপপ্রধানদের পদে নির্বাচনের সময় স্বাভাবিক কারণেই মহিলাদের ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং রাজনৈতিক (দলীয়) অভিজ্ঞতার উপর কিছুটা বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী পুরুষ প্রধান ও উপপ্রধানদের নির্বাচনের সময় বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। উপরিউক্ত ১৩টি গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে ১৯৭৮, ১৯৯৩, ২০১৩ সালের এছাড়াও বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেসকল নারী - পুরুষ প্রধান ও উপপ্রধানদের জাতিবর্ণ, শিক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, ৫ জন মহিলা প্রধান উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা আছে এবং ৩ জন মহিলা উপপ্রধান বি.এ পাস এবং ৮ জন পুরুষ এম.এ পাশ ও ৩ জন বি.এ পাশ এবং ৫ জন উপপ্রধান বি.এ পাস ও ২ উপপ্রধান এম.এ পাশ আবার কয়েকজনের প্রধান ও

উপপ্রধান মাধ্যমিক পাশ করতে পারেন নি।[৪৫] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তপশিলি সদস্যাদের মধ্যে এই স্তরের শিক্ষার হার অনেক কম। তবে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে অন্যান্য তপসিলিদের থেকে উচ্চ শিক্ষার হার অনেক বেশি, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

আইনানুসারে গ্রামপঞ্চায়েতে মহিলা প্রধানদের এক-তৃতীয়াংশ আসন তপশিলি জাতি/ উপজাতি মহিলার জন্য নির্দিষ্ট রাখার নিয়ম। তপশিলি মহিলা প্রধানরা এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশি আসন লাভ করেছেন। একটি ক্ষেত্রে তো বাগদা পঞ্চায়েতসমিতির অধীনে সংরক্ষিত প্রধান ও উপপ্রদানের এবং ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েতসমিতির অধীনে গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের আসন থেকে অনেক বেশি পদে নির্বাচিত হয়েছিল নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী - পুরুষেরা। এটা সম্ভব হয়েছে এই নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি অধ্যুষিত এলাকায় সংরক্ষিত আসনের বাইরেও এই জনগোষ্ঠীর নারী পুরুষেরা সাধারণ আসনে বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হওয়ার ফলে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, প্রধান ও উপপ্রধানদের গবেষক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, অন্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গে কোনো তপশিলি জাতি/উপজাতি পুরুষ ও মহিলা প্রধান ও উপপ্রধানদের অযথা অপমান কিংবা শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়নি।[৪৬] জনগণনা থেকে জানা যায়, নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির জনগোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্য ও জাতিদ্বন্দ্বের শিথিলতা ও নিজস্ব সংস্কৃতি এর কারণ।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির পুরুষ ও মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানদের রাজনৈতিক দক্ষতা সম্পর্কে বলা যায় যে, ১৯৯৩ সালের নির্বাচিত পুরুষ ও মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানদের মধ্যে সকলেই ১৯৯৩ সাল থেকে উপপ্রধান অথবা সাধারণ সদস্যা রূপে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। কেউ কেউ আবার ১৯৮৮ কিংবা তারও আগে থেকে পঞ্চায়েতে মনোনীত সদস্যা রূপে কাজ করেছেন। সুতরাং পুরুষ ও মহিলা প্রধান ও উপপ্রধানদের অনেকেরই কিছুটা প্রত্যক্ষ পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাও ছিল। তবু অনেক প্রধান ও উপপ্রধানই অকপটে বলেছেন যে, প্রথম দিকে কীভাবে মিটিং পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে কী বলতে হয়, তা বাড়ি থেকে মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামী কিংবা অন্য কেউ শিখিয়ে দিয়েছেন এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে দলের নেতা নেত্রী শিখিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে নদীয়ার নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধান জাতিতে নমঃশূদ্র বলেছেন, “যখন নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হলাম, সংসারী মানুষ, মিটিং করতে ভয় পেতাম। স্বামী বুদ্ধি পরামর্শ

দিয়েছেন, তিনি সিপিআই (এম) করেন। স্বামী এবং অন্যরাও শিখিয়ে দিতেন কীভাবে কী বলতে হবে। পরে তো নিজেই সব শিখে নিয়েছি।” এই বক্তব্যকে সমর্থন করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সোনারপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আরেকজন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা প্রধান জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আমাদের জানিয়েছেন, “অন্যরা শিখিয়ে দিত, কিন্তু তার মধ্যেও আবার অনেক সময় হঠাৎই আমাদের বলতে হত। ভয়ে ভয়ে বলতাম। এভাবেই ঠিক হয়ে গেছে।” আবার উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের প্রধান জাতিতে নমঃশূদ্র, তিনি পরে রাজ্যের বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি আমাদের জানিয়েছেন, “ দলিত জাতির মানুষ হওয়ার ফলে গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলাম, কিন্তু নিজের তেমন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার তেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না । কাজেই নিজের দলের উচ্চ জাতির নেতা নেত্রীর সহযোগিতায় শুরু করেছিলাম পরে নিজেই নেতৃত্ব ও বক্তব্য দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে রাজ্যের বিধানসভায়ও বক্তব্য রেখেছি দৃঢ়তার সঙ্গে”।[৪৭] অভিজ্ঞতা, বাস্তববুদ্ধি, একাগ্রতাই দক্ষতা তৈরি করে। গ্রাম পঞ্চায়েতে যেহেতু, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সহযোগিতাও প্রধান ও উপপ্রধান পেয়ে থাকেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে পুরুষ প্রধানরাও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সহযোগিতা নিয়েই দলীয় নীতি অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। আর ২০০৮ সালের নির্বাচনে সাধারণভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যারাই প্রধানের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতরাং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির নারী - পুরুষ প্রধান ও উপপ্রধানদের শুধু দলিত জাতির অন্তর্গত বলেই পঞ্চায়েত পরিচালনার দক্ষতার অভাবের প্রশ্নই অবান্তর।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, অসুবিধা হয় কিছু স্বল্প শিক্ষিত নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী পুরুষ প্রধান ও উপপ্রধানদের জন্যে। উদাহরণরূপে ২০০৮ সালের সোনারপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং চাকদহ ব্লকের তাতলা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের কথা উল্লেখ করা যায়। তবে এরা সংখ্যায় কম, এবং আশা করা যায় এদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের কাজ চালানোর জন্য নিযুক্ত থাকেন পঞ্চায়েত সচিব, করণিক, সাহায্যকারী ইত্যাদি। আর স্বল্প শিক্ষিত প্রধানরাও বাংলায় চিঠি লিখতে বা পড়তে পারেন। আর গ্রামপঞ্চায়েতের অফিসের কাজকর্ম বাংলাতেই হয়। অসুবিধা দেখা দেয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে আসা ইংরেজিতে

লেখা চিঠি, ইস্তাহার অথবা নথিপত্র নিয়ে। তখনই প্রধান বা উপপ্রধানকে শরণাপন্ন হতে হয় কোনো বিশ্বাসভাজন দলীয় সদস্যের নিকট। আর এইসব ক্ষেত্রেই ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার প্রধান বা উপপ্রধানকে উপযুক্ত সম্মান দেন না। আরও একটি সমস্যা উদ্ভব হয় প্রধান এবং উপপ্রধান, এই দুজন ভিন্ন দলভুক্ত হলে। এ রকম ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সম্ভবত এই কারণেই উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা পঞ্চায়েতসমিতির অন্তর্গত টেংরা গ্রামপঞ্চায়েতের মহিলা উপপ্রধানের আসনটি খালি রেখে দেওয়া হয়েছিল। এই আসনে কাউকে নির্বাচিত করা হয়নি। উক্ত গ্রামপঞ্চায়েতে ২২ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জনই মহিলা সিপিআই (এম) দলভুক্ত। বাকি ১ জন মহিলা তৃণমূল সদস্যা প্রায় কখনোই পঞ্চায়েতের অফিসে আসতেন না। তবে এ ধরনের সমস্যা তো পুরুষ প্রধানদের ক্ষেত্রেও আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ব্লক-১-এর অন্তর্গত ধোসা-চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান (পুরুষ) এসইউসিআই দলভুক্ত। আর উপপ্রধান (পুরুষ) ছিলেন তৃণমূল দলভুক্ত।[৪৮] ফলে এই পঞ্চায়েত চলছিল দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি। সেই সঙ্গে উন্নয়নও ব্যহত হচ্ছিল। একথা জানিয়েছেন সদস্যারাই।

নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী পুরুষ পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের উচ্চস্তরে অংশগ্রহণ

ত্রি-স্তর ভিত্তিক স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় সাধারণত গ্রামপঞ্চায়েত স্তরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যারাই উচ্চতর পঞ্চায়েত সমিতি এবং সর্বোচ্চ জেলাপরিষদ স্তরে নির্বাচিত হন। আর এই দুটি স্তরেই স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষার বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন সকল রাজনৈতিক দল। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি ছাড়াও এ দুটি স্তরের প্রত্যেকটিতে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য ১০টি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের আসন গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের উক্ত ৩টি জেলার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র নারী - পুরুষ এসব গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং এঁরা সকলেই পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। উদাহরণরূপে বলা যায় যে, সমীক্ষিত জেলাগুলির মধ্যে নদীয়ার তেহট্ট ১ নং পঞ্চায়েতসমিতিতে ১৯৯৮ – ২০০৩ সালে নিতাই চন্দ্র বিশ্বাস এবং ২০০৮ – ২০১৩ সালে দিলীপ পোদ্দার নমঃশূদ্র জাতির মানুষ সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। নিতাই চন্দ্র বিশ্বাস ১৯৯৩ – ১৯৯৮ সালে বেতাই ১ নং গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান এবং তিনি সুবক্তা পরে

তিনি তো সভাপতি হয়েছিলেন। দিলীপ পোদ্দার সি.পি.আই.এম দল ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ২০০৩ – ২০০৮ সালে বেতাই ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন এবং তিনি তো পরে সভাপতি হয়েছিলেন। এবং উত্তর ২৪ পরগনা বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ১৯৭৮ – ১৯৮৩ সালে প্রবোধ দত্ত চৌধুরী, ১৯৮৩ – ১৯৮৮ সালে অর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস, ১৯৮৮ – ১৯৯৩ সালে সন্তোষ কুমার বিশ্বাস, ১৯৯৩ – ১৯৯৮ সালে অশোক সরকার, ১৯৯৮ – ২০০৩ সালে পূর্ণিমা বিশ্বাস, ২০০৮ – ২০১৩ দীনবন্ধু মণ্ডল, ২০১৩-২০১৬ শম্পা অধিকারী, এই সাত জন সভাপতিই নমঃশূদ্র জাতির মানুষ, আবার সাত জন সভাপতির মধ্যে দুজন মহিলা সভাপতির নামও আমরা পেলাম, একটি রাজনৈতিক দল ও তাঁর মহিলা শাখার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন, এবং ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হয়ে পঞ্চায়েত সমিতির নারী কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ২০১৩ সালে সমিতির সভানেত্রী পদে নির্বাচিত হয়ে সাফল্যের সাথে কাজ করছেন। এবং ৬ জন সভাপতি কেউ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান আবার কেউ উপপ্রধানের পদে ছিলেন। অনুরূপে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৯৭৮ – ১৯৮৩ সালে নিশিকান্ত বিশ্বাস, ১৯৮৩ – ১৯৯৩ সালে পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস, ১৯৯৮ – ২০০৩ সালে চন্দ্রেশ্বর নস্কর, ২০০৩ – ২০০৮ সালে শুভেন্দু কুমার নস্কর সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। উক্ত চার জন সভাপতি জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। এনারা সকলেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিনের সক্রিয় কর্মী এবং গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েতসমিতির নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। শুভেন্দু কুমার নস্কর ১৯৯৮ সালে গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যা ছিলেন। আরও উল্লেখ্য সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৯৯৫ – ১৯৯৮ সালে প্রভাস মণ্ডল, ১৯৯৮ – ২০০৩ সালে পঞ্চানন খাঁ, ২০০৮ – ২০১১ সালে নির্মল চন্দ্র মণ্ডল ও ২০১৩ – ২০১৮ সালে তরুণ মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৪৯] উক্ত চার জন সভাপতিই জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। চার জনের মধ্যে তিন জন সভাপতি ৫ বছরের জন্যে নির্বাচিত না হওয়ার কারণ হল, ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, ঐ তিন জনের বাকী সময়ের দায়িত্বে ছিলেন ১ জন ব্রাহ্মণ ও ২ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, এটা উক্ত পঞ্চায়েত সমিতির রাজনৈতিক সমীকরণ। তরুণ মণ্ডল ২০০৮ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। আমাদের আলোচ্য ৪টি পঞ্চায়েত সমিতির সি.পি.আই.এমের সভাপতিদের প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনার জাতির জন্য দলের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা করে উন্নয়ন মূলক কাজ করতে পেরেছেন? উত্তরে তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন একদমই না। ঐ একই প্রশ্ন তৃণমূলের সভাপতিদের করলে তাঁরা জানান আংশিক পেরেছি।[৫০] আবার যখন

সি.পি.আই.এমের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সভাপতিদের প্রশ্ন করি যে, আপনাদের নিজ নিজ জাতির উন্নতির জন্যে বিরোধী নির্বাচিত সদস্যগণ পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রস্তাব দিলে, তাদের সমর্থন করতেন? উত্তরে জানান - না। তৃণমূলের সভাপতিরাও একই উত্তর দিয়েছেন।[৫১] দুটি রাজনৈতিক দলের উক্ত জাতিদুটির সভাপতিগণ আমাদের জানায় যে, ওটা তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিরোধী সদস্যরা দিয়ে থাকেন, কিন্তু ক্ষমতায় থাকাকালীন কেউই নিজ জাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করেন না। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে নির্বাচিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির সদস্যরা যে যে রাজনৈতিক দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাঁরা নিজ নিজ জাতির বিরোধী নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে জাতিগত ঐক্য স্থাপন করে কাজ করেন না, কাজ করেন নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের ঐক্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে। তবে উক্ত জাতিদুটির মধ্যে রাজনৈতিক দল পরিবর্তনের সংখ্যা অন্যান্য জাতির থেকে অধিক।

আমাদের সমীক্ষিত জেলা ৩টির জেলা পরিষদের ১৯৭৮ – ২০১৩ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির জেলাপর্ষদের সভাধিপতি ও সহসভাধিপতিগণও পঞ্চায়েত স্তরের গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েতসমিতির নির্বাচিত সদস্য থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেই উঠে এসেছেন। উদাহরণ স্বরূপ নদীয়া জেলার সভাধিপতি হরিপ্রসাদ তালুকদার (১৯৯২-১৯৯৮) জাতিতে নমঃশূদ্র। হরিপ্রসাদ বাবু প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে প্রধানের ভূমিকা পালন করেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করে, পরে জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৫২] সি.পি.আই.এমের রাজনৈতিক শিক্ষায় তিনি সারা জীবন রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্মে লিপ্ত ছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে জাতিগত রাজনৈতিক চেতনা থেকে দলের রাজনৈতিক চেতনায় অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। রমা বিশ্বাস (২০০৩ – ২০০৮) মহিলা এবং জাতিতে নমঃশূদ্র সি.পি.আই.এমের নদীয়া জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রমা বিশ্বাস মাস্টার ডিগ্রী পাশ। তিনিও হরিপ্রসাদ বাবুর ন্যায় সি.পি.আই.এমের রাজনৈতিক আদর্শেই রাজনীতি করছেন। ২০১৬ সালে তিনি রাণাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রমা বিশ্বাস পঞ্চায়েত স্তরের রাজনৈতিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমঙ্গের বিধানসভার অধিবেশনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ২০১৯ সালে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৫৩] আমরা নদীয়ার জেলাপরিষদে কোনো নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির

সহসভাধিপতির নাম পেলাম না। তাই তাঁদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হল না। তবে, ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা দেখতে পেলাম - তৃণমূল স্তরের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচনে রমা বিশ্বাস অংশগ্রহণ করেছেন।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলা পরিষদের ১৯৮৬ – ২০১৩ (এই জেলা পরিষদের সময় ধরা হল, ১৯৮৬ সালে কেন, এর কারণ হল, ২৪ পরগনা ভেঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১৯৮৩ সালে ড. অশোক মিত্র মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে, এই কারণেই ধরা হয়েছে) সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সভাধিপতি ও সহসভাধিপতিদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হবে। ভরত দাস (২০০৮ – ২০১৩) সি.পি.আই.এমের টিকিটে এই জেলাপরিষদের সভাধিপতি হয়েছিলেন। ভরত দাস জাতিতে নমঃশূদ্র। ১৯৭৮ -২০১৩ সালের মধ্যে মোট ৭ জন সভাধিপতির মধ্যে একমাত্র ভরত দাসই দলিত তথা নমঃশূদ্র জাতির সভাধিপতির পদে আসীন হতে পেরেছিলেন। তবে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ভরত বাবু নমঃশূদ্র জাতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু জাতি বিচার করে কাজ করতেন না। দলের সিদ্ধান্তকেই তিনি অগ্রগণ্য দিতেন।[৫৪] উক্ত জেলাপরিষদের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সহসভাধিপতিগণের নাম হল, ভ্রান্তি অধিকারী (১৯৯৮ – ২০০৩), ডলি দাস (২০০৩ – ২০০৮), বিনতা হালদার (২০০৮ – ২০১৩), উক্ত ৩ জন সহসভাধিপতি মহিলা ও নমঃশূদ্র জাতির এবং এনারা সকলেই সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এনারা জাতিগত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বাইরে বেরিয়েই নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের নীতি অনুসারেই কাজ করেছেন। এই জেলা পরিষদের (১৯৮৬ – ২০১৩) ৭ জন সহসভাপতির মধ্যে ৩ জন মহিলা সদস্য তাঁরা আবার দলিত জাতির।[৫৫] কাজেই নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ক্ষেত্রে সহসভাপতির পদে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন ও নমঃশূদ্র জাতির জেলা পরিষদে অংশগ্রহণটাও অন্যান্য দলিত জাতি থেকে সংখ্যায় অনেক এগিয়ে।

উত্তর ২৪ পরগনার ন্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সভাধিপতি ও সহসভাধিপতিদের অংশগ্রহণের সময় ধরা হয়েছে, ১৯৮৬ – ২০১৩ সাল পর্যন্ত। ক্ষেত্রসমীক্ষা করে আমরা জানতে পেরেছি, ১৯৯৩ – ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ঋষি হালদার এই জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছিলেন। ঋষি বাবু জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং তিনি সি. পি. আই. এমের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জেলা ভাগ হওয়ার পরে ঋষি বাবুই

প্রথম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সভাধিপতি হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে প্রধান হয়েছিলেন। প্রধান থাকার সময়, যে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সভাধিপতির কাজ তিনি নিখুঁতভাবে পরিচালনা করতেন বলে এক জন সি.পি.আই. এম পার্টির সাধারণ সদস্য আমাদের জানিয়েছেন। তিনি আমাদের আরও জানান যে, ঋষি বাবু জাতি ভিত্তিক রাজনীতির ঊর্দ্ধে ছিলেন। এবং তিনি দলের নীতির উপরে ভিত্তি করে কাজ করতেন।[৫৬] এবং আরেকজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ ২০০৩ – ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিমল মিস্ত্রী উক্ত জেলা পরিষদের সভাধিপতি সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত হন। বিমল মিস্ত্রীর রাজনৈতিক নির্বাচনের অংশগ্রহণ শুরু হয়েছিল, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে। কাজেই তাঁর জেলা পরিষদের রাজনৈতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাপরিষদের সভাধিপতি পদে বেশ ভালো ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর সহকর্মীদের কথানুসারে বিমল বাবু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু জাতিগত রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন নি। তিনি একজন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই সারাজীবন কাজ করেছেন। তাঁরা আরও জানান যে, বিমল বাবু দলিত ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ হয়েও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, এবং মার্জিত, ভদ্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে দেওয়ার ব্যাপক ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিলন।[৫৭] আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, নমঃশূদ্র বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ সভাধিপতি হলেও জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের রীতি – নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে হয়েছে। অবশ্য ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রাজনৈতিক কাঠামোতে জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি না করায় রাজনৈতিক পদাধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষে গণতান্ত্রিক আর্দশ মেনে চলাটা সুবিধাজনক হয়।

এবারে, আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাপরিষদের সহসভাধিপতিদের ১৯৮৮ – ২০১৩ সাল পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করব। ১৯৯৮ – ২০০৩ সাল পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধুভূষণ মণ্ডল আর.এস.পি দলের (Revolutionary Socialist Party) টিকিটে নির্বাচিত হয়ে, উক্ত জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। বিধুভূষণ মণ্ডল প্রথমে পঞ্চায়েত সমিতি স্তরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, এবং পরে জেলা পরিষদ স্তরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ক্ষেত্রসমীক্ষার

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, বিধুভূষণ বাবু আর.এস.পি দলের সারাক্ষণের রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। ওনার সম্পর্কে আরও জানা যে, বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৫৮] নিমাই বর্মন ২০০৩ – ২০০৮ সাল পর্যন্ত আর.এস.পির টিকিটে সহসভাধিপতি হিসাবে নির্বাচিত হন, এবং জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। নিমাই বাবুর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত স্তরের অংশগ্রহণ হল, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে। ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে পারি যে, আর.এস.পি রাজনৈতিক দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কার্যকারী সদস্য হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা সম্পর্কে আমরা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যা জানতে পেরেছি তা হল, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নিজের জাতির তথা সমগ্র জাতির মানুষকেই তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপন করে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করেন।[৫৯] উপরিউক্ত দুইজন সহসভাধিপতিই আর.এস.পি রাজনৈতিক দলের টিকিটে নির্বাচিত হন এবং বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে।

২০০৮-২০০৯ সাল পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ চৌধুরী মোহন জাটুয়া তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে উক্ত জেলাপরিষদের সহসভাধিপতি নির্বাচিত হন। চৌধুরী মোহন জাটুয়া উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দীর্ঘদিন ধরে আই.এ.এস থাকার কারণেই তিনি প্রশাসনিক কাজে যথেষ্ট পারদর্শি হয়ে ওঠেন। কাজেই ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাপরিষদের ক্ষমতার পালাবদল ঘটিয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে সামিমা সেখকে সভাধিপতি করে, এবং সহসভাধিপতি করেন, চৌধুরী মোহন জাটুয়াকে। চৌধুরী বাবু উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার কারণে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মথুরাপুর সংরক্ষিত কেন্দ্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য টিকিট দেয়। এবং তিনি নির্বাচনে জয় পান। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, তিনি ১ বছরের জন্য সহসভাধিপতি থাকার সময়, যে ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন, তা থেকেই তিনি পরবর্তী সময়ে লোকসভার অধিবেশনে বিশেষ বক্তব্য রাখতে পারতেন।[৬০] কাজেই দেখা গেলে যে, চৌধুরী মোহন জাটুয়া রাজনৈতিক নির্বাচনের প্রথম অংশগ্রহণ হল, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ। ২০০৯ সালের পর থেকে বর্তমানেও তিনি লোকসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আছেন। চৌধুরী জাটুয়ার ছেড়ে যাওয়া পদে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ মানবেন্দ্র মণ্ডল সর্বভারতীয় তৃণমূল

কংগ্রেসের জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যকে সহসভাধিপতি করেন। মানবেন্দ্র মণ্ডলের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরে তিনি জেলাপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ২০০৯-২০১৩ সাল পর্যন্ত সহসভাধিপতি নির্বাচিত হন। আমরা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে পারি যে, তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আগে থেকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব দেওয়া যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আরও জানা যায়, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ও সুবক্তা, বাম বিরোধী বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপন করে নিজ জাতির তথা তাঁর অঞ্চলের ভোটার ও নাগরিকদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।[৬১] জানা গেছে যে, মানবেন্দ্র বাবু যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সহসভাধিপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনিও জাতিভিত্তিক রাজনীতির ঊর্দ্ধে উঠে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ করে তৃণমূল কংগ্রেসের রীতি - নীতি অনুসারে কাজ করেন।

আমাদের সমীক্ষিত জেলা ৩টি থেকে জেলাপরিষদের সভাধিপতির পদে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির থেকে ২ জন করে পেয়েছি। আর সহসভাধিপতির পদে পেয়েছি সম্পূর্ণ সময়ের জন্য ৪ জন নমঃশূদ্র ও ৩ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষকে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে সহসভাধিপতির অংশগ্রহণে নমঃশূদ্ররা এগিয়ে আছেন।

যাইহোক এবারে ২০১৩ সালের জেলাপরিষদের নির্বাচনে উক্ত ৩টি জেলা থেকে নমঃশূদ্র এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নির্বাচিত সদস্যদের নাম নিম্নে সারণি আকারে তুলে ধরা হল।

সারণি ৫.১৭: নদীয়া জেলাপরিষদে ২০১৩ সালের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত সদস্যদের নাম

পঞ্চায়েত সমিতির নাম ও নির্বাচিত জেলা পরিষদের আসন নম্বর	রাজনৈতিক দলের নাম	সদস্যদের নাম	জাতির নাম	নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা
তেহট্ট-১, আসন নং-৭	সি.পি.আই.এম	সুবোধ বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	১
তেহট্ট-১, আসন নং-৮	সি.অই.আই.এম	তপতী মণ্ডল	নমঃশূদ্র জাতি	২
নাকাশিপাড়া, আসন নং-১২	সি.পি.আই.এম	সুপ্রভা সরকার	নমঃশূদ্র জাতি	৩
নাকাশিপাড়া, আসন নং- ১৩	তৃণমূল কংগ্রেস	কমলেশ বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	৪
কালীগঞ্জ, আসন নং- ১৭	তৃণমূল কংগ্রেস	কার্তিক চন্দ্র বর্মন	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৫
কৃষ্ণনগর-১, আসন নং-২২	তৃণমূল কংগ্রেস	সারথী বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	৬
শান্তিপুর, আসন নং-২৮	জাতীয় কংগ্রেস	নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	৭
শান্তিপুর, আসন নং-২৯	সি.পি.আই.এম	লক্ষ্মী রায়	নমঃশূদ্র জাতি	৮
রাণাঘাট-১, আসন নং-৩২	তৃণমূল কংগ্রেস	সঞ্চিতা বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	৯

রাণাঘাট-১, আসন নং-৩৩	তৃণমূল কংগ্রেস	রীনা সমাদ্দার	নমঃশূদ্র জাতি	১০
কৃষ্ণগঞ্জ, আসন নং-৩৪	তৃণমূল কংগ্রেস	সবিতা চৌধুরী	নমঃশূদ্র জাতি	১১
কৃষ্ণগঞ্জ, আসন নং-৩৫	তৃণমূল কংগ্রেস	অশোক হালদার	নমঃশূদ্র জাতি	১২
হাঁসখালি, আসন নং-৩৬	তৃণমূল কংগ্রেস	শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	১৩
হাঁসখালি, আসন নং-৩৭	তৃণমূল কংগ্রেস	শিপ্রা দাস	নমঃশূদ্র জাতি	১৪
হাঁসখালি, আসন নং-৩৮	তৃণমূল কংগ্রেস	কল্যাণ কুমার ঢালি	নমঃশূদ্র জাতি	১৫
রাণাঘাট-২, আসন নং-৩৯	তৃণমূল কংগ্রেস	বিজলী বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	১৬
রাণাঘাট-২, আসন নং-৪০	তৃণমূল কংগ্রেস	বাণী কুমার রায়	নমঃশূদ্র জাতি	১৭
রাণাঘাট-২, আসন নং-৪১	তৃণমূল কংগ্রেস	সন্তোষী সরদার	নমঃশূদ্র জাতি	১৮
চাকদহ, আসন নং-৪২	তৃণমূল কংগ্রেস	শেফালী দাস (হালদার)	নমঃশূদ্র জাতি	১৯
চাকদহ, আসন নং-৪৩	তৃণমূল কংগ্রেস	শকুন্তলা সরকার	নমঃশূদ্র জাতি	২০
হরিণঘাটা, আসন নং-৪৫	সি.পি.আই.এম	নারায়ণ দাস	নমঃশূদ্র জাতি	২১
হরিণঘাটা, আসন নং-৪৬	তৃণমূল কংগ্রেস	জয়ন্ত বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	২২

সূত্রঃ নদীয়া জেলাপরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও জেলা পরিষদের কার্যকর্তাদের থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে ।

২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নদীয়া জেলা পরিষদের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সদস্যরা সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিল মোট ২২ জন সদস্য। তাদের মধ্যে ২১ জন নমঃশূদ্র জাতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, আর ১ জন মাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। ২২ জন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৬ জন সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন ও ১ জন জাতীয় কংগ্রেসেরে টিকিটে এবং ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে।৬২ কাজেই তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে এই নির্বাচনে অধিকাংশ নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ওতপ্রোত ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিল।

সারণি ৫.১৮: উত্তর ২৪ পরগনা জেলাপরিষদে ২০১৩ সালের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত সদস্যদের নাম

পঞ্চায়েত সমিতির নাম ও নির্বাচিত জেলা পরিষদের আসন নম্বর	রাজনৈতিক দলের নাম	সদস্যদের নাম	জাতির নাম	নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা
বাগদা, আসন নং-১	তৃণমূল কংগ্রেস	নীতু মণ্ডল	নমঃশূদ্র জাতি	১
বাগদা, আসন নং-৩	সি.পি.আই.এম	সুশান্ত চৌধুরি	নমঃশূদ্র জাতি	২
বনগাঁ, আসন নং-৪	তৃণমূল কংগ্রেস	শ্যামল রায়	নমঃশূদ্র জাতি	৩
বনগাঁ, আসন নং-৬	তৃণমূল কংগেস	গৌরাঙ্গ দাস	নমঃশূদ্র জাতি	৪
গাইঘাটা, আসন নং-৭	তৃণমূল কংগ্রেস	সুষমা সরদার	নমঃশূদ্র জাতি	৫
গাইঘাটা, আসন নং-৮	তৃণমূল কংগ্রেস	পম্পা বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	৬
গাইঘাটা, আসন নং-৯	তৃণমূল কংগ্রেস	নিত্যানন্দ রায়	নমঃশূদ্র জাতি	৭
হাবরা-১, আসন নং-১০	তৃণমূল কংগ্রেস	অনিতা রায়	নমঃশূদ্র জাতি	৮
হাবরা-১, আসন নং-১২	তৃণমূল কংগ্রেস	শিবানী বিশ্বাস	নমঃশূদ্র জাতি	৯

স্বরূপনগর, আসন নং-১৩	সি.পি.আই.এম	সজল কান্তি রায়	নমঃশূদ্র জাতি	১০
স্বরূপনগর, আসন নং-১৪	সি.পি.আই.এম	সত্যব্রত হালদার	নমঃশূদ্র জাতি	১১
হাবরা-২, আসন নং-১৯	তৃণমূল কংগ্রেস	পুষ্পা রানি বৈদ্য	নমঃশূদ্র জাতি	১২
বারাসাত-১, আসন নং-২৪	তৃণমূল কংগ্রেস	সবিতা নস্কর (মণ্ডল)	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৩
ব্যারাকপুর-১, আসন নং-২৬	তৃণমূল কংগ্রেস	দেবাশিস অধিকা	নমঃশূদ্র জাতি	১৪
রাজারহাট, আসন নং-৩২	তৃণমূল কংগ্রেস	গৌর নস্কর	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৫
হাড়োয়া, আসন নং-৩৯	তৃণমূল কংগ্রেস	অঞ্জনা সরকার	নমঃশূদ্র জাতি	১৬
মিনাখাঁ, আসন নং-৪৩	সি.পি.আই.এম	কুসুমবালা দাস	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৭
সন্দেশখালি, আসন নং-৪৪	তৃণমূল কংগ্রেস	রঞ্জিত কুমার দাস	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৮
সন্দেশখালি-২, আসন নং-৪৬	তৃণমূল কংগ্রেস	শিবপ্রসাদ হাজরা	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৯
সন্দেশখালি-২, আসন নং-৪৭	সি.পি.আই.এম	রেণুকা সরদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২০
বসিরহাট-১, আসন নং-৪৯	সি.পি.আই	ভারতী অধিকারী	নমঃশূদ্র জাতি	২১
হাসনাবাদ, আসন নং-৫৪	সি.পি.আই	শশাঙ্ক শেখর হাওলী	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২২
হিঙ্গলগঞ্জ, আসন নং-৫৬	তৃণমূল কংগ্রেস	অর্চনা মিদ্দা	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২৩
হিঙ্গলগঞ্জ, আসন নং-৫৭	সি.পি.আই.এম	অনন্ত কুমার মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২৪

সূত্রঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলাপরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও জেলা পরিষদের কার্য্যকর্তাদের থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে ।

উত্তর ২৪ পরগনা থেকে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ২৪ জন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে ২৪ জন জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৯ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং ১৫ জন নমশূদ্র জাতির মানুষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২৪ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৮ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বামপন্থী দলের টিকিটে আর ১৬ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে।[৬৩] কাজেই নদীয়ার মতো উত্তর ২৪ পরগনা থেকে অধিকাংশ নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তৃনমূল কংগ্রেসের হয়েই পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সারণি ৫.১৯: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাপরিষদে ২০১৩ সালের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত সদস্যদের নাম

পঞ্চায়েত সমিতির নাম ও নির্বাচিত জেলা পরিষদের আসন নম্বর	রাজনৈতিক দলের নাম	সদস্যদের নাম	জাতির নাম	নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা
বাসন্তী, আসন নং-১	তৃণমূল কংগ্রেস	নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১
বাসন্তী, আসন নং-২	সি.পি.আই.এম	নির্মলচন্দ্র বর্মন	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২
গোসাবা, আসন নং-৪	সি.পি.আই.এম	উত্তম কুমার সাহা	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৩
গোসাবা, আসন নং-৫	তৃণমূল কংগ্রেস	নির্মল মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৪
কুলতলি, আসন নং-১১	সি.পি.আই.এম	রমণী রঞ্জন দাস	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৫
কুলতলি, আসন নং-১২	সি.পি.আই.এম	সুকুমার সরদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৬
জয়নগর-২, আসন নং-১৪	সি.পি.আই.এম.	সুব্রত নস্কর	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৭
জয়নগর-২, আসন নং-১৫	তৃণমূল কংগ্রেস	মহামায়া নস্কর	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৮
পাথরপ্রতিমা, আসন নং-১৬	তৃণমূল কংগ্রেস	তনুশ্রী দাস	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৯

পাথরপ্রতিমা, আসন নং-১৭	সি.পি.আই.এম	জে. দাস	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১০
পাথরপ্রতিমা, আসন নং-১৮	তৃণমূল কংগ্রেস	অরবিন্দু প্রামাণিক	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১১
কাকদ্বীপ, আসন নং-১৯	তৃণমূল কংগ্রেস	রীনা দাস	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১২
কাকদ্বীপ, আসন নং-২০	তৃণমূল কংগ্রেস	দেবাশিস মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৩
নামখানা, আসন নং-২২	সি.পি.আই.এম	বিনীতা জানা	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৪
নামখানা, আসন নং-২৩	তৃণমূল কংগ্রেস	অখিলেশ বারুই	নমঃশূদ্র জাতি	১৫
সাগর, আসন নং-২৫	সি.পি.আই.এম	কবিতা বাগ	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৬
কুলপী, আসন নং-২৮	তৃণমূল কংগ্রেস	নিরঞ্জন মাঝি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৭
মথুরাপুর-১, আসন নং-৩০	তৃণমূল কংগ্রেস	পূর্ণিমা সরদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৭
মথুরাপুর-১, আসন নং-৩১	তৃণমূল কংগ্রেস	মানবেন্দ্র হালদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৮
মথুরাপুর-২, আসন নং-৩২	সি.পি.আই.এম	অর্ধেন্দু সরদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	১৯
মথুরাপুর-২, আসন নং-৩৩	সি.পি.আই.এম	বীণা হালদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২০
মথুরাপুর-২, আসন নং-৩৪	সি.পি.আই.এম	সুকুমার মালি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২১
মন্দিরবাজার, আসন নং-৩৭	তৃণমূল কংগ্রেস	গৌতম গায়েন	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২২
জয়নগর-১, আসন নং-৩৯	তৃণমূল কংগ্রেস	শিখা মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২৩
জয়নগর-১, আসন নং-৪০	সি.পি.আই.এম	শ্যামলী হালদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২৪
ক্যানিং-১, আসন নং-৪৪	তৃণমূল কংগ্রেস	শান্তি মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২৫
মগরাহাট-২, আসন নং-৫০	তৃণমূল কংগ্রেস	পলাশ চন্দ্র সরদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২৬
মগরাহাট-১, আসন নং-৫৫	তৃণমূল কংগ্রেস	তন্দ্রা পুরাকাইত	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২৭
ডায়মন্ডহারবার-১, আসন নং-৫৭	সি.পি.আই.এম	প্রদীপ মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২৮
ফলতা, আসন নং-৬১	তৃণমূল কংগ্রেস	ভক্তরাম মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	২৯
ফলতা, আসন নং-৬২	তৃণমূল কংগ্রেস	মীনাক্ষী মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৩০
বিষ্ণুপুর-২, আসন নং-৬৩	তৃণমূল কংগ্রেস	নকুল চন্দ্র মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৩১
বজবজ-২, আসন নং-৬৭	তৃণমূল কংগ্রেস	রীতা মিত্র	নমঃশূদ্র জাতি	৩২
বজবজ-২, আসন নং-৬৮	সি.পি.আই.এম	প্রবীর দাস	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৩৩
ঠাকুরপুকুর-মহেশতলা, আসন নং- ৭০	সি.পি.আই.এম	সুপ্রিয়া মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৩৪
বিষ্ণুপুর-১, আসন নং-৭১	তৃণমূল কংগ্রেস	সুফল কুমার সরদার	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৩৫
বিষ্ণুপুর-১, আসন নং-৭২	তৃণমূল কংগ্রেস	জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৩৬
বিষ্ণুপুর-১, আসন নং-৭৩	তৃণমূল কংগ্রেস	শচী নস্কর	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৩৭
সোনারপুর, আসন নং-৭৪	তৃণমূল কংগ্রেস	দিলীপ কুমার ঢালি	নমঃশূদ্র জাতি	৩৮
সোনারপুর, আসন নং-৭৫	তৃণমূল কংগ্রেস	অঞ্জন মাঝি	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৩৯
সোনারপুর, আসন নং-৭৬	তৃণমূল কংগ্রেস	রঞ্জন বৈদ্য	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৪০
ভাঙ্গড়-২, আসন নং-৭৭	তৃণমূল কংগ্রেস	উর্মিলা মণ্ডল	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৪১
বজবজ-১, আসন নং-৮১	তৃণমূল কংগ্রেস	বিকাশ চন্দ্র বাগ	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি	৪২

সূত্রঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও জেলাপরিষদের কার্যকর্তাদের থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য হিসাবে মোট ৪২ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৪২ জনের মধ্যে ৩৯ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ এবং ৩ জন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। ৪২ জন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন সি.প.আই.এমের টিকিটে এবং ২৭ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে। উপরিউক্ত দু'টি জেলার ন্যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির অধিকাংশ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের হয়েই পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ করেছেন।[৬৪]

আমাদের সমীক্ষিত ৩টি জেলা থেকে মোট ৮৮ জন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৩৯ জন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ এবং ৪৯ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। উক্ত ৩টি জেলা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র বেশ কয়েকটি সাধারণ আসন থেকেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। জেলাপরিষদের স্তরে নমঃশূদ্র থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ১০ জন নির্বাচিত সদস্যদের দিক থেকে এগিয়ে ছিলেন।[৬৫] এর আগেই আমরা বারংবার উল্লেখ করেছি যে, নমঃশূদ্ররা বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বসতি স্থাপন করার কারণেই, সংখ্যাগত দিক থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে অধিক থাকলেও উক্ত ৩টি জেলায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সংখ্যাগত থেকে বেশি। এই বেশি হওয়ার কারণ হল, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের আদিবাসস্থান হল, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।

এবারে আমরা সমীক্ষিত ৩টি জেলার অন্তর্গত মোট ৬৮ পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতিকে নমুনা হিসাবে বেছে নিয়ে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত হওয়ার কারণে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থীদের নাকি তৃণমূল কংগ্রেসকে হয়ে অধিক অংশগ্রহণ করেছিলেন সেটাই আমরা নিম্নে তুলে ধরব ।

যেমন নদীয়া জেলা অন্তর্গত মোট ১৭টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত ৩টি পঞ্চায়েত সমিতি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মোট ২২টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ অধ্যুষিত ৩টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মোট ২৯ পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি অধ্যুষিত ৫টি পঞ্চায়েত সমিতি নমুনা ধরা হয়েছে।

সারণি ৫.২০: জয়ী রাজনৈতিক দলের আসন সংখ্যা ২০১৩

জেলা	পঞ্চায়েত সমিতির নাম	মোট আসন	সি. পি. আই. এম	সি. পি. আই	ফরওয়ার্ড ব্লক	আর. এস. পি	টি. এম. সি.	বি. জে. পি	আই. এন. সি	নির্দল ও অন্যান্য	যে দলের পঞ্চায়েত সমিতি
নদীয়া	তেহট্ট-১	৩৩	১৬	০	০	০	১৫	০	২	০	টি.এম.সি
	চাকদা	৪৭	১০	০	০	০	৩২	০	৪	১	টি.এম.সি
	হরিণঘাটা	৩০	১৫	০	১	০	১৩	০	১	০	সিপিআইএম
উত্তর ২৪ পরগনা	বাগদা	২৭	৮	০	২	০	১৫	০	১	১	টি.এম.সি.
	গাইঘাটা	৩৯	৮	০	০	০	৩১	০	০	০	টি.এম.সি
	রাজারহাট	১৭	১	০	০	০	১৬	০	০	০	টি.এম.সি
দক্ষিণ ২৪	ক্যানিং-১	২৯	২	০	০	১	২২	০	৩	১	টি.এম.সি
	জয়নগর-১	৩৬	১	০	০	৯	২৮	০	০	০	সিপিআইএম

পরগনা	জয়নগর-২	৩০	১৩	০	০	০	৫	১	০	০	এসইউসিআই
	সোনারপুর-	৩৩	৯	০	০	০	২৪	০	০	০	টি.এম.সি
	মথুরাপুর-২	৩২	২১	০	০	০	১০	০	০	১	সিপিআইএম

সূত্রঃ নদীয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সমীক্ষিত পঞ্চায়েত সমিতি গুলোর নির্বাচিত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতি গুলোর কার্যকর্তাদের থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

সমীক্ষিত **১১**টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ৩টি পঞ্চায়েত সমিতিতে জয় পায় সি.পি.আই.এম ও **১**টি জয় পায় এস.ইউ.সি.আই এবং ৭টি জয় পায় তৃণমূল কংগ্রেস। কাজেই পঞ্চায়েত সমিতির অধিকাংশ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতি নির্বাচিত সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেসের হয়েই পঞ্চায়েত সমিতিতে রাজনৈতিক ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, **১১**টি পঞ্চায়েত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৩৫৩ জন। ৩৫৩ জন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ২০৮ জন সদস্য হলেন, নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ। আবার ২০৮ জন সদস্যের মধ্যে ৯৮ জন হলেন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ আর **১১০** জন হলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ।[৬৬] কাজেই পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা **১২** জন সদস্যেই এগিয়ে ছিলেন।

আমরা ৫টি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক সদস্যের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তাদের জাতিগত অংশগ্রহণের সংখ্যা তুলে ধরব। এবং নিম্নে সারণি আকারে সমীক্ষিত ৫টি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৬৪টি গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচিত মোট সদস্যের সংখ্যা তুলে ধরব।

সারণি ৫.২১: ৫ টি পঞ্চায়েত সমিতির গ্রাম পঞ্চায়েতের নারী – পুরুষ সদস্য এবং দলিত ও আদিবাসী নারীর সংখ্যা ২০১৩

জেলা, পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	পুরুষ	নারী	দলিত জাতির নারী	আদিবাসী জাতির নারী	সাধারণ ও সংরক্ষিত মোট নারী	মোট সদস্য সংখ্যা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি, ১১	৯২	৩০	২৬	৮	৬৯	১৫৬
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মগরাহাট-২ পঞ্চায়েত সমিতি, ১৪	১১৩	৫১	৩৮	১২	১০১	২১৪
উত্তর ২৪ পরগনা, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি, ১৩	১২০	৫৮	৪৭	১৭	১২২	২৪২
নদীয়া, চাকদহ পঞ্চায়েত সমিতি, ১৭	২০৫	৭০	৩৭	৭	১১৬	৩২১
নদীয়া, তেহট্ট-১ পঞ্চায়েত সমিতি, ৯	১০৪	৪৩	৩৬	৮	৮৭	১৯১

সূত্রঃ সমীক্ষিত পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিকগণের ও নির্বাচিত সদস্যদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সারণি আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

৬৪ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ১১২৪ জন। ১১২৪ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৩৪০ জন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ এবং ২১৪ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ।[৬৭] গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নমঃশূদ্রদের নির্বাচিত সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ হল, সমীক্ষিত ৩টি জেলা থেকে আমরা নমঃশূদ্র অধ্যুষিত ৩টি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৩৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ধরেছি। আর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত ২টি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ধরার জন্যেই নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সংখ্যাগত দিক থেকে অংশগ্রহণে পিছিয়ে গিয়েছে।

২২: ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নারী ও পুরুষের ত্রিস্তরে সংরক্ষণ চিত্র

স্তর	মোট আসন	মহিলা বাদে জাতিগত সংরক্ষণ		মহিলা সংরক্ষণ					মোট মহিলা সংরক্ষণ	অসংরক্ষিত
		তপঃ জাতি	তপঃ উপজাতি	মোট	তপঃ জাতি	তপঃ উপজাতি	তপঃ জাতি/ উপজাতি মোট	সাধারণ		
গ্রাম পঞ্চায়েত	৪৮,৮০০	৮,৪০৫	১৯৯৯	১০,৪০৪	৫৩৭৬	১২৯৬	৬৬৭২ (১৩.৭)	১০,৮২২ (২২.২)	(৩৫.৮)	২১,০২৯
পঞ্চায়েত সমিতি	৯,২৪০	১,৫৭৮	৪০৮	১৯৮৬	৫৫২	২৩৩	১১৮৫ (১২.৮)	২০১৫ (২১.৮)	(৩৪.৬)	৩,৭২৯
জেলা পরিষদ	৮২৫	১৫১	৩৫	১৮৬	৮২	১১	৯৩ (১১.২)	১৭৭ (২১.৫)	(৩২.৭)	৩৬৯

সূত্রঃ Information on West Bengal Panchayats, Government of West Bengal, State Institute of Panchayats and Rural Development, West Bengal, Kalyani, Nadia, 2014, pp. 80-120, 162-182 and 183-195. *বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা শতাংশ নির্ণয় করছে।

৩২১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন সংখ্যা ৪৮৮০০ এবং ৩২৯টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ৯২৪০। সর্বোচ্চ জেলা পরিষদ স্তরে ১৭টি জেলায় (দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদ বাদ দিয়ে) আসন সংখ্যা ছিল ৮২৫টি।[৬৮] পঞ্চায়েতের এই ৩টি স্তরেই মহিলারা (তপশিলি জাতি-উপজাতির মহিলা সহ) সংরক্ষিত আসনে কতটা অংশগ্রহণ করেছেন, তা সারণি ৫.২২ দেখানো হয়েছ।

সারণি ৫.২২ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৩ সালে মহিলারা পঞ্চায়েতে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ আসনে সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার পাওয়ার প্রায় ২০ বৎসর পরে তাঁদের অধিকৃত আসন সংখ্যার সামান্যই তারতম্য হয়েছে।

গ্রামপঞ্চায়েতে মহিলারা অধিকার করেছেন প্রায় ৩৫.৪ শতাংশ। এর মধ্যে তপশিলি জাতি-উপজাতির মহিলারা লাভ করেছেন ১৩.৭ শতাংশের কাছাকাছি, ২২.২ শতাংশের বেশি লাভ করেছেন সাধারণ মহিলারা। পঞ্চায়েত সমিতিতে মহিলাদের দ্বারা অধিকৃত ৩৪.৬ শতাংশ আসনের মধ্যে তপশিলি জাতি-উপজাতির মহিলারা লাভ করেছেন প্রায় ১২.৮ শতাংশ এবং সাধারণ মহিলারা প্রায় ২১.৮ শতাংশ। আর সর্বোচ্চ জেলাপরিষদ স্তরের মহিলারা ন্যূনতম সংরক্ষিত ৩২.৭ শতাংশই লাভ করেছেন। এখানে তাঁদের অধিকৃত ৩২.৭ শতাংশের মধ্যে তপশিলি জাতি-উপজাতির মহিলাদের দ্বারা অধিকৃত আসনের শতাংশ হল ১১.২। আর সাধারণ মহিলারা লাভ করেছেন ২১.৫ শতাংশ।

লক্ষণীয় যে, সারণি ৫.২২ অনুযায়ী সর্বোচ্চ জেলাপরিষদে মহিলারা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসনই শুধু লাভ করলেও পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তাঁরা এক-তৃতীয়াংশের সামান্য কিছু বেশি আসন লাভ করেছেন। এর কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। জেলা স্তরেই শিক্ষা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় বেশি। যে সব সদস্যারা তুলনাক্রমে বেশি শিক্ষিত এবং পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে বিভিন্ন পদে আসীন থেকে কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাঁরাই প্রধানত জেলা স্তরের নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন আর গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মহিলারা সাধারণত আসেন অল্প শিক্ষা এবং কিছুটা পারিবারিক রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে, অর্থাৎ পিতা, স্বামী, ভ্রাতা ইত্যাদির হাত ধরে। রাজনৈতিক সচেতনতা এবং বিশেষত শিক্ষা যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা আরও প্রমাণিত হয় তিনটি স্তরেই তপশিলি জাতি/উপজাতি মহিলাদের অধিকৃত আসনের শতাংশ থেকে। সারণি ৫.২২ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি স্তরেই তপশিলি জাতি/উপজাতি মহিলাদের মোট অধিকৃত আসনের শতাংশ সাধারণ মহিলাদের অধিকৃত আসনের কম/বেশি অর্ধেক মাত্র। এর মধ্যে তপশিলি উপজাতি মহিলাদের শতাংশ তপশিলি জাতি মহিলাদের প্রাপ্ত শতাংশের কাছাকাছি নয়, অনেক কম। কোনো পরিসংখ্যানের দিকে না তাকিয়েও বলা যায়, বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণে সাধারণ নারীদের থেকে তপশিলি জাতি নারীদের শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং অভিজ্ঞতা থাকে অনেক কম। আবার তপশিলি উপজাতি নারীদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে তপশিলি জাতি নারীদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক জ্ঞান কিছুটা বেশি থাকে। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই সাধারণ তপশিলী জাতি ও উপজাতি মহিলাদের শতাংশ তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সর্বোপরি আর্থসামাজিক অবস্থানকেই প্রতিফলিত

করেছে। স্বাভাবিক কারণেই এদের মধ্যে অল্প শিক্ষিত এবং অল্প বয়সী মহিলাদের অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নমঃশূদ্র জাতির মহিলাদের শিক্ষাগত অবস্থানে অন্যান্য দলিত জাতি তথা পৌণ্ড্রজাতির জাতির মহিলাদের অনেকটা ভালো ।

এখানে উল্লেখ্য যে, সারণি ৫.২২-এ দেওয়া ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিসংখ্যানের সাথে ২০১৪-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সমীক্ষা তথ্যের কিছু অমিল আছে।[৬৯] মনে হয় কোনো কোনো স্থানে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদকে ধরে গণনা করা অন্যস্থানে এই পার্বত্য পরিষদকে বাদ দেওয়ার ফলেই এরকম ঘটে থাকতে পারে। অন্য কারণকেও বাদ দেওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে যে, বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমীক্ষার পরিসংখ্যান এক হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত তথ্যের সাথে বাস্তবের মিল হয় না।

মূল্যায়ন

পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নদীয়া ও উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নমঃশূদ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণের নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যে সকল তথ্য পেয়েছি, তা তুলে ধরেছি। তাইতো মূল্যায়নে এসে একথা উল্লেখ করতে হয় যে, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নমঃশূদ্র জাতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী – পুরুষের থেকে রাজনৈতিক দল পরিবর্তনের সংখ্যা অনেক বেশি আমরা পেয়েছি। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রাজনৈতিক দল পরিবর্তন নমঃশূদ্র জাতির ক্ষেত্রে অধিক হওয়ার কারণ হল, বাংলাদেশ থেকে এসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মতন গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে একই গ্রামে বসবাস না করতে পারার জন্যে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতে হলে রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক দলের সমর্থক না হলে ক্ষমতা ভোগ করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন নির্ভর করে অনেকটা গ্রামের বৃহত্তর শরিকির ও পরিবারের উপরে। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় আমরা জানতে পেরেছি, নির্বাচনের সময় বৃহত্তর পরিবারের চাপ পড়ে ছোট পরিবারের সদস্যদের নিজের রাজনৈতিক দলের ভোট নিতে পারেন না, তাঁরা বৃহত্তর পরিবারের রাজনৈতিক দলকে ভোট দিতে বাধ্য থাকেন। এই বাধ্য থাকার আরেকটি কারণ হল, পাশাপাশি বসবাস ও চাষের জমি থাকার জন্য বৃহত্তর পরিবারের কথা যদি ছোট পরিবার না শোনেন তা হলে তাদের চাষের ও বসবাস করার ক্ষেত্রে হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই ছোট পরিবার গুলো বৃহত্তর সদস্য ভুক্ত পরিবারগুলোর সঙ্গেই গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনীতিতে

অংশগ্রহণ করে থাকেন। আর পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষেত্রেও সাধারণ জাতি থেকে বেশিই পাওয়া গিয়েছে। তবে নমঃশূদ্র জাতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির থেকে অধিক বার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেছেন, সে তথ্যও আমরা পেয়েছি। উল্লেখ্য যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সমিতির ও জেলা পরিষদের সদস্যদের রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করাটা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগের জন্যেই করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় নমঃশূদ্র জাতির একজন নির্বাচিত সদস্যের কথা তিনি নদীয়ার তেহট্ট-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত জেলাপরিষদের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যের কথা, তিনি সি.পি.আই.এমে থাকার সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের উপর রাজনৈতিকভাবে অত্যাচার করতেন, আবার তৃণমুলে কংগ্রেসে এসেও সেই একই রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেই চলেছেন।[৭০] এই সমিতির অন্তর্গত আরেক জন সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত সদস্যের কথায়, আমি তো দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু কখনও রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করিনি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এস.সি.পি.আই করতাম তখন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ হওয়ার জন্যে উচ্চ জাতির নেতৃত্বের কাছ থেকে জাতিগত কারণে অনেক অপমানিত হয়েছি, তবু রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করিনি।[৭১] ওনার প্রসঙ্গে আরেক জন সি.পি.আই.এমের নেতা বলেন, উনি তো পাট্টায় অনেক জমি পেয়েছিলেন, কাজেই ওনার পক্ষে রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।[৭২] আবার দেখা গেছে, উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সি.পি.আই.এমের নির্বাচিত সদস্য রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করে তৃণমূল কংগ্রেসে চলে আসেন, এবং তিনি পরে ঐ সমিতির সভাপতি পদে বসেন। ওনার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন সম্পর্কে তৃণমূলের একজন নির্বাচিত সদস্য বলেন, উনি তো আমাদের দলকে ভালো বেসে আসেননি, ক্ষমতা ভোগ করার জন্যে এসেছেন। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় দেখতে পেয়েছি, পরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃনমূল কংগ্রেসে অন্যান্য সদস্যরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করে ওনাকে পরাজিত করেন। এই সমিতির অন্তর্গত তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত জেলাপরিষদের সদস্য ক্ষমতার লোভে বি.জে.পিতে গিয়েও আবার তৃণমূল কংগ্রেসে ফেরৎ আসেন।[৭৩] দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত ক্যানিং-১ পঞ্চায়েত সমিতির সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ ২০১১ সালের রাজ্য রাজনীতির পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এবং পরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসেরে টিকিটে জেলা পরিষদে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার দেখা গেছে মগরাহাট-২ পঞ্চায়েত সমিতির পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সি.পি.আই.এমের নির্বাচিত সদস্য, পরে,

তিনি ক্ষমতার লোভে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৭৪] কাজেই ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত স্তরে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে যা আমরা জানতে পেরেছি, তা হল উক্ত জাতি দুটির নিকট রাজনৈতিক আদর্শ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করাটাই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। তাই উল্লেখ করা যায়, ২০১২ সালের পঞ্চায়েত সংশোধিত নির্বাচনী আইনে পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে ৫০ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি তপশিলি জাতি – উপজাতিদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন বরাদ্দ রাখা হয়। এছাড়াও ওবিসিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নেতৃত্বের কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন এসেছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল বাধ্য হয়েছিল তপশিলি জাতি – উপজাতি, ওবিসি ও মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত আসনগুলোতে সেই সেই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দিতে । ১৯৯৩ –র নির্বাচনের পর লক্ষ করা যায় যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উঁচু-জাত, এবং নিচু জাত, মহিলা এবং পুরুষ, তপশিলি জাতি – উপজাতিভুক্ত মানুষ অপেক্ষাকৃত যুবক এবং বৃদ্ধ, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং পুরোপুরি অনভিজ্ঞ দরিদ্র এবং ধনী সকল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের প্রতিনিধিত্ব ঘটেছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থায়। ১৯৯৩ সালের পর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এলিট চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তপশিলি জাতি – উপজাতি ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল যথেষ্টই কম। এক্ষেত্রে সংরক্ষণের আগে নমঃশূদ্র জাতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সদস্যদের থেকে বেশ পিছিয়ে ছিল। সংরক্ষণের ফলে নমঃশূদ্রদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সংরক্ষণের আগে থেকেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নমঃশূদ্র জাতির থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। পঞ্চায়েত স্তরে দলিতদের জন্য সংরক্ষণ করার ফলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অন্যান্য দলিত জাতির থেকে অনেকটা এগিয়ে যায়। কিন্তু ১৯৯৩ সালের নির্বাচনের পর থেকে সাবেকি নেতৃত্বের কাঠামোর পরিবর্তে নতুন নেতৃত্বের কাঠামোর উদ্ভব ঘটে, সংরক্ষণের পূর্বে তপশিলি জাতি – উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পঞ্চায়েতের কাজে প্রতিনিধিত্ব তাদের জনসংখ্যা অনুপাত অনুসারে ছিল না। কিন্তু পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে তপশিলি জাতি – উপজাতি এবং মহিলাদের আসন সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে এই জাতি সমূহের যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব ঘটেছে। সংবিধান সংশোধনের পর পঞ্চায়েতের কাজে মহিলা, তপশিলি জাতি – উপজাতিভুক্ত মানুষের অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য এসেছে।[৭৫] ফলে উক্ত ৩টি জেলায় অন্যান্য

দলিত জাতির থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির সদস্যরা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত স্তরে ব্যাপক এগিয়ে যায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সদস্যরা বেশ এগিয়ে আছেন। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সদস্যরা প্রায় সমসংখ্যক পেয়েছি।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী-পুরুষদের রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো সমস্যা যদি থাকে, তবে তা আছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নতুন আসা সদস্যাদের নিয়ে, এবং তা হল প্রধানত অশিক্ষা এবং অনভিজ্ঞতাপ্রসূত সমস্যা, কিন্তু অন্যান্য দলিত জাতি অপেক্ষা অনেকটা এগিয়ে আছেন উক্ত দুটি দলিত জাতি। তবে প্রথাগত স্কুল কলেজের শিক্ষা অপেক্ষা মনে হয় রাজনীতিতে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বেশি, যা অর্জন করতে হয় কঠিন বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে। গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে এরকম অনেক সদস্যা আছেন যাঁদের প্রথাগত শিক্ষা স্কুলের নীচু শ্রেণীর মধ্যে সীমিত হলেও পরবর্তীকালে অনেকখানি শিক্ষা তাঁরা নিজগুণে ও চেষ্টায় অর্জন করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ব্লক-১-এর অন্তর্গত সি.পি.আই.এমের গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রবীণ সদস্য নিজেই জানিয়েছেন যে, তিনি কোনোদিন স্কুলের দরজার ভিতরে পা রাখেননি, কিন্তু পরবর্তী জীবনে বাড়িতে বসে তিনি অনেকখানি পড়াশুনা শিখেছেন। ইনিও খুব সপ্রতিভ এবং স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেক খবরই রাখতেন। ইচ্ছা এবং উদ্যোগের সমন্বয়ে অশিক্ষা ও অনভিজ্ঞতার সমস্যাকে অচিরেই অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। বড়ো কথা হল এই যে, পঞ্চায়েতের সদস্যারা তাঁদের এই সমস্যা সম্পর্কে খুবই সচেতন। আর এঁদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনারও কোনো অভাব নেই। উক্ত জাতি দুটির অনেক নারী-পুরুষ নানাভাবে বলেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন নদীয়া জেলার নাটনা গ্রামপঞ্চায়েতের সি.পি.আই.এমের মহিলা সদস্যা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "সংসারের কাজের বাইরে এসে একবার যখন পঞ্চায়েতে এসেছি, আর ফিরে যাব না। লক্ষ্য এখন সামনের দিকে।"[৭৬] এ বিষয়ে তাঁরা দৃঢ়মনস্ক। মনে হয় বাড়ির আবদ্ধ পরিবেশের বাইরে এসে এক ধরনের মুক্তির স্বাদ তাঁরা অনুভব করছেন। এই অনুভব ও দৃঢ় মানসিকতা মহিলা সদস্যাদের চলার পথে বড়ো পাথেয়। আবার নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বেশিরভাগ নারী-পুরুষ পঞ্চায়েতের সদস্যা ও সদস্যদের কথায় 'পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক ভাবে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা বিধানসভা ও লোকসভার রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছি'।৭৭ এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পেলাম যে, ১৯৯৩ সালের আগে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নমঃশূদ্র জাতির অংশগ্রহণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অনেক কম সংখ্যাগত দিক থেকে, আবার নেতৃত্বের দিক থেকেও কম। পঞ্চায়েতসমিতি ও জেলাপরিষদ স্তরে ১৯৯৩ সালের আগে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অনেকটা সংখ্যাগত দিক থেকে এগিয়ে ছিলেন। ১৯৯৩ সালের পরে নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রায় সমানুপাতিক হয়ে যায়। এর পরের অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব 'পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ভূমিকা' নিয়ে।

নির্দেশিকা

১) অসিত কুমার বসু, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃঃ ১৯-২০।

২) West Bengal Panchayet Act. 1957. Sec. 7.

৩) West Bengal Panchayet Act, 1957. Sec. 17. & West Bengal Zela Parishads Act, 1963, Sec. 52.

৪) অসিত কুমার বসু, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃঃ ৭১ ।

৫) The Constitution of India, Part IX, - The Pachayats, - Arts. 243C-243D ।

৬) Neil Webster, Panchayati Raj and Decentralisation of Development Planning in West Bengal (A case study), K.P. Bagchi & Company, Calcutta, 1992 ; Kristeen Westergaard, People's Participation. Local Government and Rural Development Research, Copenhagen, 1986 ; Krishna Chakravarty, Leadership; Faction, and Panchayati Raj : A Case Study of West Bengal, Rawat Publications, Jaipur, 1993, Nirmal Mukherjee and Debabrata Bandopadhyay, New Horizon for West Bengal's Panchayats. Government of West Bengal, 1993.

৭) Ibid., 24 Parganas, p. 26 ; Birbhum, p. 26 ; and Nadia, p. 26.

৮) G. K. Lienten, "Caste, Gender and class in panchayat: case of Bardhaman, West Bengal", EPW, 18 July, 1992, pp. 1567-1574.

৯) Information on West Bengal Panchayats, Government of West Bengal, State Institute of Panchayats and Rural Development, West Bengal, Kalyani, Nadia, 1998.

১০) গবেষক তেহট্ট-১ ও সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত এবং সাধারণ ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১১) গবেষক নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১২) গবেষক নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৩) গবেষক নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৪) গবেষক নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৫) গবেষক বেতাই-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তির প্রাপ্ত সাক্ষাৎকারের তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৬) গবেষক বেতাই-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তির প্রাপ্ত সাক্ষাৎকারের তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৭) গবেষক বেতাই-নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তির সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৮) গবেষক বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তির সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৯) গবেষক বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তির সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২০) গবেষক বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তির সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২১) গবেষক ইছাপুর – ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২২) গবেষক ইছাপুর – ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৩) গবেষক ইছাপুর – ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৪) গবেষক ইছাপুর – ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৫) গবেষক শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৬) গবেষক শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিরদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৭) গবেষক চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৮) গবেষক সোনারপুর-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তির সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৯) গবেষক কালিকাপুর -২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩০) গবেষক মাতলা – ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩১) গবেষক ধনপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩২) গবেষক বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩৩) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রূপরেখা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৮, পৃঃ ১৬৪।

৩৪) Girish Kumar and Buddhadeb Ghosh, West Bengal Panchayat Elections, 1993, A Study of Participation, Institutions of Social Sciences and Concept Publishing Company, 1996, p. 15.

৩৫) Socio-Economic Profile of Panchayat Members : Nadia, North 24 Parganas & South 24 Parganas, State Institute of Panchayats and Rural Development, West Bengal, Nadia, 1997, pp. 25,26,27.

৩৬) Ibid, Nadia, North 24 Parganas & South 24 Parganas, pp. 25,26,27.

৩৭) Ibid, Nadia, North 24 Parganas & South 24 Parganas, pp. 25,26,27.

৩৮) Ibid, Nadia, North 24 Parganas & South 24 Parganas, pp. 25,26,27.

৩৯) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪০) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪১) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪২) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৩) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৪) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৫) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৬) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৭) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৮) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৯) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫০) গবেষক সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫১) গবেষক সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫২) গবেষক নদীয়া জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫৩) গবেষক নদীয়া জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫৪) গবেষক উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫৫) গবেষক উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫৬) গবেষক দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫৭) গবেষক দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫৮) গবেষক দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫৯) গবেষক দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬০) গবেষক দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬১) গবেষক দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬২) গবেষক নদীয়া জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬৩) গবেষক উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬৪) গবেষক দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬৫) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬৬) গবেষক সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬৭) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬৮) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০১৩, তথ্য ও সমীক্ষা, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, মে, ২০১৪, পৃ. ২০-৩০।

৬৯) Information on West Bengal Panchayats, Government of West Bengal, State Institute of Panchayats and Rural Development, West Bengal, Kalyani, Nadia, 2014.

৭০) গবেষক নদীয়া জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৭১) গবেষক নদীয়া জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৭২) গবেষক নদীয়া জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৭৩) গবেষক উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৭৪) গবেষক দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৭৫) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৩, গ্রাম বাংলার রায়, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৪৪২।

৭৬) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৭৭) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের স্বাধীনতার আগে দলিত রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়ার প্রয়োজন। এর কারণ হল, নমঃশূদ্রদের অধিকাংশ মানুষের বসবাস ছিল বর্তমানের বাংলাদেশে। আর অল্প কিছু সংখ্যক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বাংলাদেশের খুলনা জেলা থেকে এসে অবিভক্ত ২৪ পরগনা ও নদীয়াতে বসতি স্থাপন করেন। এছাড়াও ভারতের বেশ কিছু অঙ্গরাজ্যেও উক্ত জাতি দুটির মধ্যে নমঃশূদ্ররা অধিক সংখ্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন। স্বাধীনতার আগে নমঃশূদ্ররা বাংলাদেশের যশোহর, খুলনা, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশালে সংখ্যাগত দিক থেকে হিন্দুদের মধ্যে সর্বাধিক বসবাস করার জন্য এদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি। ভৌগোলিকগত দিক থেকে কলকাতার একান্ত নিকটেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বসবাস করার জন্যেও পৌণ্ড্রদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে নমঃশূদ্রদের সঙ্গে যৌথভাবে। এর উদাহরণ আমরা পাই ১৯৩৮ সালে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও হেমচন্দ্র নস্করের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ড. বাবা সাহেব আম্বেদকরের ‘All India Backward Classes Association’ অনুকরণে বাংলার ‘Independence Scheduled Caste Party’।[১] এটির অস্তিত্ব দেশভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিলীন হয়ে যায়। যদিও বাংলাদেশে এই জাতিগত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে বিরাজিত ছিল।

দেশভাগের আগে পৌণ্ড্রদের থেকে নমঃশূদ্ররা জাতিগত রাজনৈতিক দলের হয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে অধিক ভূমিকা রেখেছিল। এ সম্পর্কে আমরা এর আগেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। পশিমবঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর লেখা বইপত্র নেই বললেই চলে। অপরদিকে নমঃশূদ্রদের নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর নির্মোহ ভাবে লেখা বইপত্র খুবই কম। নমঃশূদ্রদের নিয়ে যা লেখা হয়েছে, তার অধিকাংশই বঞ্চনাবোধ থেকেই লেখা বলে দেখা গেছে। আবার কিছু বই লেখা হয়েছে জাতিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আর কিছু লেখা হয়েছে দলিত আন্দোলনের প্রয়োজনে। এর ফলে লেখক বা

গবেষকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা তৃপ্ত হলেও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের তেমন কোনও সুফল আসেনি বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপট হল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দলিতদের আরও ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করা। সেটা করতে গেলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিজেদের মধ্যে থাকা সামাজিক ভাবে উচু-নিচু ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দলিত রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলোকে মোকাবিলা করে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত দলিতদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বলয় তৈরি করার মধ্যে দিয়ে দলিতদের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখাকেই আমরা এখানে বৃহত্তর প্রেক্ষাপট বলতে চেয়েছি। কিছু জাতি সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্ষমতাসীন দলের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে দলিত সমাজের যে বিচ্ছিন্নতাবোধ বাড়িয়ে দিচ্ছে, কাজেই দলিত সমাজ নিপীড়নের ছোবল থেকে কোনোদিন রক্ষা পাবে না বলে মনে করা যেতে পারে। বিশেষত ক্ষমতাসীনদের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য দলিত জাতিগুলোর দুর্দশা আরও বাড়তে থাকবে। দলিতদের এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, সমস্ত দলিত জাতিগুলোকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষা দেওয়ার শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন বলেও মনে যেতে পারে। আর এই শক্তির উৎসগুলি কী এবং সেগুলি কী ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে কার্যকর করা যায়, তার কৌশল নির্ধারণ ও লক্ষ্য স্থির করার উপায় উদ্ভাবন করাটাও জরুরি। তবে দলিতদের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের মনে রাখা প্রয়োজন যে, দলিত আন্দোলনের নামে যেন দেশের জাতীয় ও সাংবিধানিক প্রেক্ষাপটকে অটুট রেখেই আন্দোলন করাটাই গণতান্ত্রিক পরিবেশে কাম্য বলে আজকের দিনে আশা করা যেতেই পারে।[২]

১৯৪০ দশকের সময় পর্যন্ত বর্তমানের বাংলাদেশের কিছু জেলা হিন্দু প্রভাবিত জেলা ছিল। কাজেই আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, দেশভাগ সমকালে অথবা তার অব্যবহিত পরেই পূর্বপাকিস্থান থেকে অধিকাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ভারতে চলে আসেন। উচ্চবর্ণের মানুষ স্থাবর সম্পত্তি ফেলে আসেন কিন্তু ভারতে এসে যে তাদের অনেক অনেক বড় সমস্যায় পড়তে হয়েছিল, তা কিন্তু একেবারে না। এর কারণ হল স্বাধীনতার আগে থেকেই ব্যবসা, চাকরি ও লেখাপড়ার সুবাদে কলকাতার সঙ্গে তাদের একটা যোগসূত্র ছিলই।[৩] ফলে দেশভাগের পরে পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে কলকাতা ও তার পার্শ্ববতী জেলাতে স্থায়ীভাবে বাসতি গড়ে তুলল। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ বেশ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়লেও তা কাটিয়ে উঠতে বেশিদিন সময় লাগেনি বলে বিভিন্ন উদ্বাস্তু আন্দোলনের দলিল ও দস্তাবেজ থেকে আমরা জানতে পারি।

পক্ষান্তরে আমাদের উল্লেখ করতে হবে যে, পূর্বপাকিস্তানের নিম্নবর্ণের মানুষেরা ছিলেন একান্ত ভাবেই কৃষিনির্ভর ও মৎস্যজীবী। এদের উচ্চবৃত্তির পেশার উপর দক্ষতা ছিলনা বললেই চলে, তেমনি আবার অর্থনৈতিক সঞ্চিত পুঁজি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন ছিল না। প্রসঙ্গত কারণেই আমরা বলতে পারি যে, দেশত্যাগ করে অনিশ্চিত জীবন যাপনের সাহসিকতা তখন তারা দেখাতে পারেনি, বলে মনে করা যেতে পারে। এছাড়াও পূর্বপাকিস্তানে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের তখনকার সময়ে সম্পর্ক ছিল বেশ ভালো, এর প্রমাণ স্বরূপ আগেই আমরা উল্লেখ করেছি ১৯৩৭ ও ১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালের বাংলার সরকার গঠনের সময় কি ভাবে দলিতরা মুসলিমদের সমর্থন করেছিল। আবার দলিত ও মুসলমানরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চোখে ছিল সমান ঘৃণিত। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এই সময় ভেবেছিল দেশের পরিস্থিতি এমনটা থাকবে না, একদিন তো ভালো হবেই। তাই তারা মনে করেছিলে যে মুসলিমদের সঙ্গে সম্প্রীতির বাতাবরন গড়ে উঠবেই। কিন্তু পরবর্তী কালে পূর্বপাকিস্তানের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় যে দলিতদের সে আশা কেবল আশাতেই থেকে গিয়েছিল।[৪] যখন দলিত নেতা যগেন্দ্রনাথ মণ্ডল চিকিৎসার জন্য কলকাতায় চলে আসেন, সেই সময় হিন্দুদের ওপর চরম আক্রমণের প্রতিবাদে ৮ অক্টোবর ১৯৫০ সালে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করে ভারতে চলে আসায় নিম্নবর্ণের মানুষদের পূর্বপাকিস্তানে থাকার বিশ্বাসের ভিতটা টলমল হয়ে যায়।[৫] এর ফলেই নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে দেশত্যাগের সংখ্যাটা তখন থেকেই বাড়তে থাকে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে এক একটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে এক একটি অঞ্চলে হিন্দুরা পূর্বপাকিস্থান তথা বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন ১৯৫০ সালের ঢাকার জাতিদাঙ্গা, ১৯৬৪ সালের পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু নিধন দাঙ্গা এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা ভারতে চলে আসেন। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করার ফলেও বহুসংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে যে সকল হিন্দুরা বাংলাদেশ ত্যাগ করেন করেন তাদের অধিকাংশই ছিল নমঃশূদ্র জাতির মানুষ।[৬] এবারে আমরা আগে নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করব। পরের অংশে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পূর্বপাকিস্তান থেকে নমঃশূদ্র নেতারা পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হওয়ার দরুন অধিকাংশ নেতাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হয়েই রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ

করেন। অল্পকিছু সংখ্যক নেতা যেমন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও রসিকলাল বিশ্বাস আর. পি. আই ও অরাজনৈতিক সংগঠন হয়ে নমঃশূদ্রদের পক্ষে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫২ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ নিয়ে (১৯৫২ – ১৯৬৪) এবং বাংলা কংগ্রেসের হয়ে (১৯৬৪ – ১৯৭১) আবার জাতীয় কংগ্রেস হয়ে (১৯৭১-১৯৭৭) এবং ১৯৭৭ সালের পর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিয়ে মতুয়া মহাসংঘ মাধ্যমে উদ্বাস্তুর উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেছেন। “১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ইউনিভারসিটির ইনিস্টিটিউট হলে নমঃশূদ্র সমাজ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহাপ্রয়াণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গবাসী নমঃশূদ্রগণের সামাজিক চেতনাবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়”।[৭] একথা বলা যেতেই পারে যে উক্ত সামাজিক চেতনার মধ্যে দিয়েও যোগেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কিছু নেতা জাতীয় কংগ্রেস ব্যতিত রেখেই রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দেশভাগের পর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আর.পি.আই. ও নির্দল প্রার্থী হিসেবেই রাজনৈতিক আন্দোলন করেগিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত কারণেই আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগীর পদত্যাগের ফলেও নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের মনে রাজনৈতিক আন্দোলনের জাগরণ ঘটে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আবার লোকসভার সাংসদ বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহার কঠোর ভাষার প্রতিবাদও নমঃশূদ্রদের সাহস যোগায়।[৮] বিধান চন্দ্র রায় চেয়েছিলেন পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত বরাবর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিয়ে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরাপত্তা বলয় গঠন করতে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতামূলক হস্তক্ষেপের অভাবে এবং সমসাময়িক বিরোধী মতাদর্শের কারণে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। কাজেই ষাটের দশকে পশিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা, খাদ্য সংকট, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নানাবিধ কারণে পশ্চিমবঙ্গ একটি সমস্যা সঙ্কুল রাজ্যে পরিণত হয়।[৯] আবার অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে, ভারত সরকার ‘ভিন্ন পন্থা’ অর্থাৎ ভারত – পাক যুদ্ধের মাধ্যমে যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীকে ভারতভুক্ত করার চিন্তা করেছিলেন। ডাঃ

বিধান চন্দ্র রায় উক্ত পরিকল্পনার সঙ্গে বল্লবভাই প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সহমত ছিলেন বলে উল্লেখিত আছে।[১০] কাজেই আমরা বলতে পারি যে উদ্বাস্তু সমস্যাকে সামনে রেখেই নমঃশূদ্র নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের মূল রাজনৈতিক কংগ্রেস ও বামপন্থীদের হয়েই রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমেছিল।[১১] ১৯৫১ সালে যখন প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর রাজ্যপালকে প্রস্তাব দেন সীমান্ত জেলাগুলিতে নমঃশূদ্রদের পুনর্বাসন ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে তাদের নিয়োগের জন্য যা ডাঃ রায়ের সঙ্গে একই মত দেখা যায়।[১২] কার্যত দেখা যায় যে, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের উপরিউক্ত পরিকল্পনার প্রতি প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে জোটনিরপেক্ষ নীতি নিয়েছিলেন, তাতে ভারতের সম্মান ও মর্যাদা হানির ঘটার সম্ভাবনা থাকার দরুণ তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেননি এবং তিনি ১৯৫০ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যালঘু সমস্যার ক্ষেত্রে দুই দেশের লোক বিনিময় ও যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিলেন।[১৩] যাইহোক যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় তখন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বাঙালি উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পুনর্বাসনের প্রস্তাব দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবে রাজি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পাঠাতে উদ্যোগী হন। সেই অনুসারে ১৯৫২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ৩৯২ টি পরিবারের ১৫৮৩ জন উদ্বাস্তুকে আন্দামানে পাঠিয়েছিল।[১৪] এই সময় বামপন্থী দলের নেতারা উদ্বাস্তুদের আন্দামানের শ্বাপদ সংকুল অঞ্চলে, হিংস্র জন্তু – জানোয়ারের ভয়, বসবাসের অনুপযোগী বলে অভিযোগ করে এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন।[১৫] কাজেই আমরা বলতে পারি যে, নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক দল না থাকার কারণে এই সময় থেকেই বেশ কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু নেতা-নেত্রী ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

নমঃশূদ্র তথা মতুয়া নেতা প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পুনর্বাসন সরকারি পরিকল্পনাকে অগ্রগতি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ঘুরে উদ্বাস্তু জনগণকে আন্দামানে যাওয়ার নিমিত্তে উৎসাহিত করেন। বিশেষ করে তিনি ক্যাম্পবাসী নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে সংগ্রামী মানসিকতা জাগরণ বা আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে আন্দামানে যেতেও উৎসাহিত করতেন। এই মর্মে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৫৮ সালে নদীয়ার ধুবুলিয়া ক্যাম্পের প্রায় ৫৭ টি পরিবারের লোক এসে পি.আর. ঠাকুরের পরামর্শ চান, ঠাকুর তখন তাঁদের বলেন, আমরা শক্তিশালী কৃষিজীবী আমাদের পূর্ব পুরুষগণ সুন্দরবনের জঙ্গল ও জলাভূমি পরিস্কার করে চাষযোগ্য আবাদ ক্ষেত তৈরি করে এবং

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পি. আর. ঠাকুর আরও বলেন "তোমাদের হারাবার কি আছে, পূর্ববাংলায় অভাবে দিন কাটাতে হত, কোনমতে খেয়ে পরে অভাবে দিন কাটত। তিনি উল্লেখ করেন আমাদের বসবাসের স্থানে না ছিল নাগরিক পরিষেবা, না ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। আন্দামানে কেন্দ্রীয় সরকার বসবাস ও চাষের জমি দেবে, চাষের জন্য লাঙ্গল, গরু দেবে তোমরা আন্দামানে যাও, গিয়ে একটা নতুন বাংলা তৈরি কর"।[১৬] প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পাঠানোর উদ্যোগ থেকে বলা যেতেই পারে যে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ নিয়েই রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রসর হয়েছিলেন। আবার মমতা ঠাকুরের থেকে আমরা জানতে পারি যে, পি. আর. ঠাকুর কংগ্রেসের সহযোগিতায় বাস্তুহারা পূর্ব পাকিস্তানের থেকে এসে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি জমি না পাওয়ার কারণে নমঃশূদ্রদের সাবলম্বী করার লক্ষ্যে তিনি উক্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।[১৭]

১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রায় ৮০ হাজার বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে 'দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা' গ্রহণ করেন ও পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করতে দণ্ডকারণ্য ডেভলপমেন্ট অথরিটি গঠন করেন।[১৮] পরবর্তীকালে দীর্ঘ আলোচনা ও সমালোচনার মধ্যে দিয়ে দণ্ডকারণ্যে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, পি. আর. ঠাকুরের বড় ছেলে কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর দণ্ডকারণ্যের মহারাষ্ট্রের অংশে পুনর্বাসন নিয়ে বসবাস করেন।[১৯] পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু সভাগুলিতে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বক্তব্য, উদ্বাস্তুদের স্বার্থে তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকার উদ্বাস্তুদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এই সময় পি.আর. ঠাকুর ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মধ্যে ঠাকুরনগর উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা শেষে পি.আর. ঠাকুর যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে বলেন তাঁর সাংগঠনিক শক্তিকে সমর্থন জানিয়ে মণ্ডলকে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের বাসস্থান, বেঁচে থাকার জন্য চাষের জমি পেতে কংগ্রেসের সাথে যোগ দান করতে ও উদ্বাস্তুদের অন্য রাজ্যে পুনর্বাসনের প্রস্তাবকে সমর্থন করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পি.আর. ঠাকুরের অনুরোধকে উপেক্ষা করে ১৯৫৭ সাল থেকে 'দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা' ও পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবীকে সমর্থন করে সি.পি.আই সমর্থিত সংযুক্ত কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পরিষদ (UCRC) সংগঠনের সঙ্গে একত্রে উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত করতে থাকেন।[২০] সুতারং আমরা বলতেই পারি যে

এই সময় থেকেই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সমর্থকেরা বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি সরাসরি বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত না হলেও জোটবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আবার পি. আর. ঠাকুরের সমর্থকেরা আগে থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন।

১৯৫৮-৫৯ সালে UCRC নেতৃত্ব দণ্ডকারণ্যের ক্যাম্পবাসী নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য জবরদখল কলোনী তৈরির পরিকল্পনা ও সত্যগ্রহ আন্দোলন করতে অস্বীকার করে। দলিত নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের সমর্থন থাকলেও UCRC পরবর্তী সময়ে দণ্ডকারণ্য প্রস্তাব ও উস্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে সি.পি.আই পার্টির নেতৃত্ব উগ্র – আন্দোলনের পরিবর্তে ‘নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন’ ও ‘সাংবিধানিক পরিমণ্ডল’ অতিক্রম না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২১] UCRC এর আন্দোলন মূলত শহরকেন্দ্রিক ও প্রতিষ্ঠিত উচ্চবর্ণের উদ্বাস্তুদের জবরদখল কলোনী উচ্ছেদ বিরোধিতা, চাকুরির দাবীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং জেলাগুলির নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ হল এই সময় বামপন্থীদের ও UCRC কর্মীদের গ্রাম বাংলায় কংগ্রেস নেতা নেত্রী দ্বারা অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই হয়তো তারা শহর কেন্দ্রীক হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুরা নিজেদের বাঁচাবেন না কি UCRC ও বামপন্থীদের আন্দোলনে যাবেন - এই রূপ একটা প্রশ্নও থেকেই যায়।

১৯৫৮ সালের প্রথম থেকেই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হাওড়া, বীরভূম জেলার কলোনীতে নিয়মিত নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের সাথে আন্দোলন গড়ে তোলেন ও দণ্ডকারণ্যে সরকারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রচার করেন। আগে থেকেই নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুগণ বাংলা ভাগ ও মুসলিম লীগের সমর্থন জনিত কারণে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে দায়ী করতেন। মণ্ডলের সঙ্গে এই সময় নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে সমর্থন হন যে, নমঃশূদ্র ও পূর্বপাকিস্তানের মানুষের স্বার্থে তিনি ‘সার্বভৌম যুক্ত বঙ্গদেশ’ গঠনে মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছিলেন। বাংলা বিভাগ এবং তাদের দুরবস্থার জন্য কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বরাই মূলত দায়ী বলে মণ্ডল প্রচার করেন।[২২] প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতেই পারে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল আবার নমঃশূদ্রদের সামনে নিজের ভুল স্বীকার না করে তিনি দেশভাগের প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বদের শুধু দায়ী করলেন।

কাজেই মুসলিম লীগ সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করার জন্য তাঁর ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তার অভাব ছিল বলেই মনে করা যেতে পারে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নিজেই তো মুসলিম শাসকদের উপর বিশ্বাস না রাখতে পেরে ভারতে চলে আসেন। শ্রী মণ্ডল আবেগ না দেখিয়ে এই সময় নমঃশূদ্রদের সামনে সঠিক কারণটা উল্লেখ করলেই হয়তো তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ তুলে ধরতে পারতেন।

যাইহোক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে UCRC এর নীতির পরিবর্তন ঘটলে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পগুলোতে তাদের প্রভাব হ্রাস পায় এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় কুর্পাস ক্যাম্প, বাগজোলা ক্যাম্পের নেতা ও উদ্বাস্তুরা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে ছাড়া কোন প্রকার সংগঠনকে সভা করতে বাধা দিতেন। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে UCRC এর সঙ্গে যৌথ ভাবে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করায় তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ৩৫ দিন প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। জেলে থাকাকালে বামপন্থী উদ্বাস্তু নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যোগেন্দ্রনাথা মণ্ডল বুঝতে পারেন যে উদ্বাস্তু সমস্যার চেয়ে রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করায় তাদের মূল উদ্দেশ্য।[২৩] এই সময় উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের আশার কথা বলে, তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনই CPI ও UCRC নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল। অবশেষে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে কলকাতার মহাবোধী সোসাইটি হলে ‘পূর্ব ভারত বাস্তুহারা সংসদ’ (PBBS) নামে স্বতন্ত্র উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে তোলেন।[২৪] এই সংগঠনের প্রাণ পুরুষ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল PBBS কে অবাম ও অকংগ্রেস মুক্ত স্বতন্ত্র আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলেন। ‘সারা বঙ্গ বাস্তুহারা সমতি’ (SBBC) সঙ্গে PBBS যৌথ ভাবে নিজস্বতার মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তু আন্দোলন গড়ে তুলে একত্রে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় UCRC এর সঙ্গে মণ্ডল একত্রে আন্দোলন করতে রাজী হয়নি। আবার PBBS ও SBBC যৌথ উদ্বাস্তু আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পুনরায় UCRC এর সঙ্গে একত্রে ১৯৫৯ সালের ৭ জানুয়ারী থেকে ১৮ জানুয়ারী পর্যন্ত ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যৌথ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ‘মৃত ব্যাক্তিদের আত্মার প্রতি স্তবগান’ করার মত UCRC এর উদ্বাস্তুদের সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়ে অন্যদিকে ভবিষ্যতে UCRC ও PBBS এর যৌথ আন্দোলনের পরিসমাপ্ত ঘটে যায়।[২৫] উক্ত আলোচনা থেকে

আমরা দেখতে পারলাম যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল উদ্বাস্তু আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি সময়ের নিরিখে নানাবিধ মতাদর্শের সঙ্গে মিলেমিশে একত্রিত হয়েছেন, আবার তাদের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে দূরে সরে এসে নিজের মনোমত উদ্বাস্তুদের নিয়ে আলাদা সংগঠন গড়ে তোলেন। যা মণ্ডলের নিকট বৃহত্তর আন্দোলন মনে হলেও বাস্তবে দেখা যায় সীমিত পরিসরের মধ্যেই থাকে। এই সমস্ত কারণেই তাঁর মতের অস্থিরতার কারণেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কোনভাবেই নির্বাচিত হতে পারেননি। তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ গুণ থাকলেও নির্বাচনে জয়ী হওয়া সম্ভব হয়নি বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এই সময় নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের আরেকজন প্রাণপুরুষ নেতা প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অর্থাৎ কংগ্রেসের উদ্বাস্তু নীতির সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যের প্রেরণের পক্ষে সোয়াল করে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেই চলেন। এই মর্মে বামপন্থী নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের দণ্ডকারণ্য প্রস্তাব এবং নিজের উদ্যোগে উদ্বাস্তু কলোনী স্থাপন করার চেষ্টাকে কটাক্ষ করে বিধানসভায় বলেছিলেন- "আমি ঠাকুর মশাইকে বলছি যে, তাঁর আর ঠাকুরগিরি বেশী দিন চলবে না, আমরা জানি যে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। তাদেরকে ঠকিয়ে অনেকে দালালী করে চলেছেন"।[২৬] বামপন্থী নেতা কোঙারের কটাক্ষকে পাত্তা না দিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতির সঙ্গে চলেই তাঁর জাতির উদ্বাস্তুদের পরিত্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যদিও এই সময় পি.আর. ঠাকুরের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মত বামদের সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে সরকারের বিরুদ্ধে কোনরূপ রাজনৈতিক তথা উদ্বাস্তু আন্দোলন করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাইতো তিনি ১৯৬২ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জয়ী হয়ে মন্ত্রীও হন।

১৯৬২ সালের চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্তগত কারণে দুই দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কাজেই এই যুদ্ধে ভারতের পরাজয় হয় এবং দেশে বামপন্থীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ বেশ অগ্রসর হয়। এই সময় বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর বিপ্লবী অংশকে সোভিয়েত 'সংশোধনবাদী' লাইনের সমর্থকদের থেকে আলাদা হয়ে যাবার আহ্বান জানিয়ে চীন সি.পি.আইয়ের মধ্যেকার বিরোধকে খুঁচিয়ে তোলে। কাজেই ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর সি.পি.আই

দু'টুকরো হল। আগের 'দক্ষিণ' ও 'মধ্যপন্থী' প্রবনতা-যুক্ত অংশটি সি.পি.আই নামেই পরিচিতি হল, আর আগেকার 'বামপন্থী' প্রবণতা-যুক্ত অংশটি অল্পকাল পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সি.পি.আই.এম নামে পরিচিত হল। যদিও কিছু কিছু ব্যক্তিগত ও উপদলীয় বিরোধ থাকলেও এ বিচ্ছেদ মূলত তাত্ত্বিক কারণেই ঘটে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।[২৭] আবার ১৯৬৪ সালে পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আসায় তাদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন নতুন মোড় নেয়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হয়। আমরা দেখেছি যে, ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে বহু সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক পার্টির অস্তিত্ব ছিল। সাম্প্রদায়িক দলগুলোর মধ্যে হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ ১৯৫২ সালের পরে মুছে গেলেও কেরালাতে ও তামিলনাড়ুর কোথাও কোথাও তা আবার মাথা চাড়া দিল। প্রথমে কংগ্রেস, তারপরে সি.পি.আই এবং সি.পি.আই.এম সেখানে তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে তাদের মর্যাদা দিল।[২৮] এই সময় থেকে বামপন্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে নমঃশূদ্রদের একটা অংশ যুক্ত হয়ে পড়েন। এর কারণ হল পূর্বপাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও পরে বিশেষ করে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের উপর কংগ্রেস সরকারের পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের প্রতিবাদী অংশগ্রহণের দরুণ নমঃশূদ্রদের মধ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের চেতনাবোধ কাজ করে বলে মনে করা যেতে পারে। অনেকেই জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে এসে শ্রেণীগত রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। "ভারতীয় রিপাবলিকান পার্টিও তখন একটি জাতীয় দল। যোগেন্দ্রনাথ উক্ত দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সভাপতি। পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যোগেন্দ্রনাথকে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য প্রস্তুতি চালায়। নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে অকংগ্রেসী বামপন্থী যুক্ত ফ্রন্ট গঠনে যোগেন্দ্রনাথ উভয় শিবিরের সঙ্গে আলোচনা চালায়। যোগেন্দ্রনাথ বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কেন্দ্রটির ৭ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দেগঙ্গা কেন্দ্রটি মূলত মুসলিম অধ্যুষিত। বাকী ৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটদাতাগণের অধিকাংশ পূর্ববঙ্গাগত তপসিলি নমঃশূদ্র জাতি"।[২৯] যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল জোটবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে নামলেও সফলতা পান নি। এর দুটি কারণ ছিল সব বামপন্থী দল তাঁকে সমর্থন করে নি। অন্য কারণটি হল ১৯৬৬ সালে অজয় মুখার্জি বাংলা কংগ্রেস গঠন করলে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর দলের সহসভাপতি হওয়ার ফলেও যে নমঃশূদ্র বড় একটা অংশ বাংলা কংগ্রেসকেই রাজনৈতিক আন্দোলন তথা

নির্বাচনে সমর্থন করে বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। ৬৭ নির্বাচনে পি. আর. ঠাকুর বাংলা কংগ্রেসের হয়ে নবদ্বীপ সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হওয়ার কারণ হল নমঃশূদ্র উদ্বাস্তরা এই সময় কংগ্রেসের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো তেমন কোন সরকারি সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের থেকে সরে এসে বাংলা কংগ্রেসকে ভোট দেয়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পি.আর. ঠাকুর বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ নিয়েই রাজনৈতিক আন্দোলন করেন।

এই সময় পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্রদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট না থাকার কারণে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত নেতা তাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১৯৬৭ সালে ডাঃ সুধীর কুমার বাগচীর উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার যোগেন্দ্র নগরে উত্তরবঙ্গ নমঃশূদ্র সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন রসিকলাল বিশ্বাস।[৩০] দক্ষিণবঙ্গে যে সময় নমঃশূদ্র নেতারা অন্যান্য দলিত জাতির সঙ্গে জোট করে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে, আর সেই সময় উত্তরবঙ্গের নমঃশূদ্ররা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার নমঃশূদ্ররা একত্রে এই সময় রাজনৈতিক আন্দোলন করে নি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এবারে আমরা উল্লেখ করব ১৯৬৮ সালে সারা আসাম নমঃশূদ্র সম্মেলনের কথা। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ সুধীর কুমার বাগচী, উদ্বোধক আসামের নমঃশূদ্র নেতা খগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, সভাপতি ছিলেন অসমের বর্ষীয়ান নমঃশূদ্র নেতা মহাদেব দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রধান বক্তা অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস।[৩১] বক্তা এবং প্রধান অতিথি দুজনই পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়ে আসামের নমঃশূদ্রদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু নিজেদের রাজ্যে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজনের সমস্যার সমাধান না করেই মণ্ডল বাবু রাজনৈতিক আন্দোলন করেন। যা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। যাইহোক এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের দেশভাগের ফলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার কারণে তাদের পূর্বেকার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা ব্যাহত হওয়ার কারণ নিয়ে আলোচিত হয়। যেমন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, দণ্ডকারণ্য, আন্দামান, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নমঃশূদ্র তথা অনুন্নত সমাজ নিয়ে বহু সম্মেলন কথা ঘোষণা করা হয়। সেই মতাবেগ যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, ডাঃ সুধীর কুমার বাগচী, সন্তোষ কুমার মল্লিক, ভবানী মজুমদার, মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস অগ্নি কুমার মিস্ত্রী, অপূর্বলাল

মজুমদার, অল ইন্ডিয়া সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রাক্তণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিয় কুমার কিস্কু, রাজ্য শাখার সভাপতি নন্দদুলাল মোহান্ত ও সাধারণ সম্পাদক কে.সি. রায়, মহেন্দ্রনাথ তালুকদারের উদ্যোগে নানাবিধ নমঃশূদ্র জাতির অধিকার নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৩২] শাখা সম্মেলনের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র শিক্ষিত মানুষ নিজ জাতি তথা অন্যান্য কিছু নিম্নজাতির মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রয়াস চালালেও কিন্তু তা কখনোই স্বাধীনতার আগের নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ন্যায় হয়ে ওঠেনি। আবার একটা ভাববার বিষয় উত্তরবঙ্গে ও আসামে রাজবংশী নমঃশূদ্রদের থেকে অধিক থাকলেও এই সময়কার নমঃশূদ্রদের আন্দোলনের সঙ্গে রাজবংশীদের কোন যৌথ রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা যায় না। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের মধ্যেও রাজনৈতিক ভাবে যৌথ আন্দোলনও দেখা যায় না। এখন আমাদের মনে একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং রাজবংশী তিনটি জাতিই দলিত জাতি, তাহলে কেন এরা যৌথভাবে বৃহত্তর দলিত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারল না। এর কারণ হল, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও রাজবংশীদের খুব কম মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছিলেন, কিন্তু নমঃশূদ্র জাতির অধিকাংশ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসে কৃষি জমি হারা ও বাস্তু হারা হওয়ার ফলে কৃষিজীবী রাজবংশী ও পৌণ্ড্ররা মনে করে যে, নমঃশূদ্ররা যদি তাদের কৃষি জমির উপরভাগ নিয়ে নেয় এবং সরকারি সংরক্ষণের ভাগ নেওয়ার জন্য। এছাড়াও দলিতদের মধ্যেও সামাজিক উচু-নিচু ভেদাভেদ বিদ্ধমান। আমরা যখন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কাছে ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রশ্ন করি যে, নমঃশূদ্র জাতি না কি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি সামাজিক দিক থেকে উচু, তখন অধিকাংশ সমীক্ষক বলেন, নমঃশূদ্ররা তো শূদ্রজাতি আমরা তো ক্ষত্রিয় জাতি। আবার বাজবংশীরা নিজেদের রাজার বংশধর বলে মনে করেন। নমঃশূদ্রদের প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের বংশধরেরা মনে করেন তারা মৈথলী ব্রাহ্মণের বংশধর এবং অধিকাংশ নমঃশূদ্র মনে করেন তারা নমঃস্য মুণির বংশধর। ফলে উক্ত তিনটি বৃহত্তর দলিত জাতির মধ্যে কখনও বৃহত্তর দলিত আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠেনি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের কারণে ও পূর্ববাংলার শরনার্থীদের কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যথেষ্ট মনোযোগী হওয়ার দরুণ নমঃশূদ্র জাতির মানুষেরা বাংলা কংগ্রেস থেকে বেড়িয়ে এসে ইন্দিরা কংগ্রেসের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে।[৩৩] যদিও ১৯৭১ সালের

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ভালো ফল করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও **১৯৭২** সালে "সর্বভারতীয় নমঃশূদ্র কল্যাণ পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করে নমঃশূদ্ররা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের পথে এগিয়ে যায়। আবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির পৃষ্ঠপোষকতায় "অনুসূচিত জাতি পরিষদ" গঠিত হওয়ার ফলেও নমঃশূদ্রদের বিরাট অংশ শ্রীমতী গান্ধিকে সমর্থন করে কংগ্রেসী রাজনৈতিক আন্দোলনে আন্দোলিত হয়।[৩৪] কাজেই **১৯৭২** সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে একদিকে যেমন কংগ্রেস বিপুল জয় পায়, আবার অন্যদিকে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত নির্বাচনী কেন্দ্র গুলোতেও কংগ্রেস বিপুল জয় পায়।

১৯৭২ থেকে **১৯৭৭** সাল পর্যন্ত কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় থাকাকালীন উদ্বাস্তুদের নিয়ে তেমন কোন গঠন মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত না থাকার দরুণ বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো নমঃশূদ্রদের মধ্যে আগের থেকে বেশি নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। এই সময় বামপন্থী নেতৃত্বরা অতিসচেতন ভাবে কৃষক, ভাগচাষী, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার এবং সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে, 'কৃষক সমিতি'র নেতৃত্বে জোতদার ও ধনী কৃষকদের বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কংগ্রেস শাসনে এই সময় দৈনন্দিন দ্রব্যমূল্য দিনের দিনের পর দিন বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য সংকট ও সমস্যা নিয়ে বামপন্থীরা যেমন সরব হয়েছিলেন তেমনই রুটি, জমি, বাসস্থান, বেকার সমস্যার কথা তুলে ধরে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষ ও নমঃশূদ্র তথা সাধারণ উদ্বাস্তুদের মধ্যেও বামপন্থীদের প্রভাব বিস্তার হয়েছিল। বামপন্থীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত কৃষকদের একটা অংশ বেশ কিছু জোতদার মহাজনের বিচার করে নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া নীতি গ্রহণ করে। সমস্ত মহাজনী ঋণ নাকচ বলে ঘোষণাও করে এবং ভাগচাষীরা আর বেগার খাটবে না ও জোতদারদের ভাগ দেবে না বলে ঘোষণা করে। ফলে পুলিশি ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে ধনী কৃষক ও জোতদাররা শ্রেণী কংগ্রেসের সমর্থনে বামপন্থী আন্দোলনরত কৃষকদের গ্রেপ্তার করে। এই আন্দোলনে নদীয়ার রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, হাসখালি, বগুলার নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু দরিদ্র কৃষক গ্রেপ্তার হয়।[৩৫] কাজেই উদ্বাস্তু ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষ ও বর্ণ ও জাতিভেদের বাইরেও দরিদ্র, কৃষক শ্রমিকদের নিয়ে শ্রেণী চরিত্রের শক্তি হিসাবে বামপন্থীদের আন্দোলন ও প্রচারে সংগঠিত সমর্থন জানায়। **১৯৭৭** সালের আগে সি.পি. আই.এম শহরের নাগরিকদের নিয়ে মজুরি ও মাইনে বাড়ানোর আন্দোলন করেছে, শহরে সস্তা সুযোগসুবিধে, যথা সস্তা পরিবহণের জন্য সংগ্রাম করেছে।[৩৬] এই প্রসঙ্গে সন্তোষ রাণা মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, "এটাই হচ্ছে বাংলার সমাজের গণতান্ত্রিকীকরণের সমস্যা। তার জন্য একটি

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হল কৃষকের হাতে জমি, কোনও অকৃষক পরিবার (যারা পারিবারিক শ্রম দিয়ে জমি চাষ করেন না) জমির মালিক হবে না"।[৩৭] মূলত কৃষকদের নিয়ে গ্রাম বাংলায় আন্দোলন করেছিল সি.পি.আই.এম.এল। এই যুক্তির ভিত্তি হিসাবে আমরা সন্তোষ রানার আরেকটি মন্তব্য তুলে ধরব। তাঁর মতে, "বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম মূল শক্তি হবে। গ্রামাঞ্চল কৃষক সংগ্রামের বিকাশ সামন্ত সামন্ততান্ত্রিক শক্তির আধিপত্য ভেঙ্গে ফেলবে এবং জাগ্রত ও সংগঠিত কৃষকেরা নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নেবেন। এইভাবে গ্রামাঞ্চলগুলি শাসকশ্রেণীর হাত থেকে মুক্ত হবে এবং কৃষক যুদ্ধের মধ্যে থেকে গড়ে ওঠা গণ-ফৌজ শেষ পর্যন্ত দেশব্যাপী বিজয় অর্জন করবে"।[৩৮] কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শহরে বামপন্থী ভদ্রলোকদের জমি ও কৃষিকাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকায় নিম্নবর্ণের কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থ ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিদ্বেষ বা বিরোধিতা ছিল না। অন্যদিকে জেলাগুলোতে কংগ্রেস অনুগামী জোতদার, জমিদারদের সঙ্গে কৃষকদের একই সঙ্গে 'বর্ণ ও শ্রেণী' উভয়ক্ষেত্রে ক্ষোভ বা অসন্তোষ ছিল। কাজেই উচ্চবর্ণের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকের নেতৃত্বে ভূস্বামী বনাম চাষী, জোতদার বনাম ভাগচাষী মধ্যে বিরোধিতার কারণে কৃষকদের কৃষি জমির বণ্টন, ভূমি সংস্কার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নানাবিধ কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চালকের আসনে সি.পি.আই.এম দেখা যায়। এর ফলেই পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তপসিলি জাতির ভোটারগণ ব্যাপক ভাবে সি.পি.আই.এম ও অন্যান্য বামপন্থী দলের সমর্থন করে। মূলত ক্ষমতায় আসার আগে দীর্ঘ দুই দশক ধরে বামপন্থী নেতৃত্ব কংগ্রেস সরকারের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মূল চালিকা শক্তিতে উপনীত হয়েছিল। উদ্বাস্তু সমস্যা দূরীকরণ ভিত্তিক কার্যক্রম ও বিভিন্ন দাবী – প্রস্তাব বামপন্থীদের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি এবং সংসদীয় ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিল।[৩৯] এই সময় নমঃশূদ্রদের বেশির ভাগ নেতৃত্ব বামপন্থীদের হয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন অংশগ্রহণ করে বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে।

ক্ষমতায় এসে সি.পি.আই.এম 'অপারেশন বর্গা' নামক যে কর্মসূচি চালু করেছিল যা প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থাকে বর্গাদারদের অনুকূলে পরিবর্তিত করে নেয়। গ্রামের পরিবারগুলির মধ্যে প্রায় ২৫% ই বর্গাদার। দশকের পর দশক ধরে বর্গাদাররা দুটো বিপদের সম্মুখীন হয়ে আসছিল; ১) প্রজাস্বত্বের অনিশ্চয়তা, যেহেতু তাদের স্বত্ব নথিবদ্ধ ছিল না। অথচ আইন অনুযায়ী তাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী হবারই

কথা। ২) জোতদারদের খাজনা হিসাবে ফসলের যে ভাগ দিতে হত তা খুবই বেশি এবং বেআইনি। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বাম সরকার ভাগচাষীদের আইনসম্মতভাবে নথিবদ্ধ করল। তারা যে জমি চাষ করে তা তাদের চিরস্থায়ী ইজারা দেওয়া হল, তার ওপর তাদের স্বত্ব নিশ্চিত হল। জমিতে উৎপাদিত ফসলের কতটা তারা রাখতে পারবে, তা আইন করে বেঁধে দেওয়া হল, ফলে তাদের আয় বাড়ল। এ-কাজ করার জন্য পার্টি এবং কিষাণ সভাগুলি ভাগচাষীদের রাজনীতিমনস্ক করে তুলেছিল, দলে টেনে এনেছিল।[৪০] এর ফলে বহুসংখ্যক নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু যারা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করার জন্য পাট্টা জমি পায়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সময়কালে অজয় মুখার্জি ও জ্যোতি বসু দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করেননি। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ও দণ্ডকারণ্য নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। মুষ্টিমেয় কিছু বামপন্থী নেতা ও সাংবাদিকেরা মুখ খোলেন।[৪১] বাম সরকারের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় একদিন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী, বিখ্যাত রিপোর্টার ‘হলধর পটল’ (আসল নাম উমাশঙ্কর হালদার)। যাইহোক রাম চ্যাটার্জি রায়পুরে পৌঁছনোর খবর মধ্যপ্রদেশ সরকারের পুলিশ পেয়েছিল। ফলে রায়পুর স্টেশন থেকেই কয়েকজন উদ্বাস্তু নেতা ও স্থানীয় পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে মানা উদ্বাস্তু শিবিরে যাওয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামবাবু পুলিশের গাড়িতে করেই মানা উদ্বাস্তু শিবিরে পৌঁছে তাদের এ ধরনের কথা বলেছিলেন- ‘আমরা বামপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছি। আমরা তখনও বলেছি এখনও বলছি পশ্চিমবাংলার মাটিতেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন চাই’। রামবাবু পুরো একটা দিন মানা শিবিরে ছিলেন। রামবাবুর বক্তব্য নিয়ে ‘সত্যযুগ’ পত্রিকায় রিপোর্ট বের হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাম চ্যাটার্জির কাছে কৈফিয়েত তলব করেছিলেন এবং রাজ্য সরকারের বিনা অনুমতিতে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে আসতে উসকানি দেওয়ায় রামবাবুকে তিরস্কার করেন। যে রামবাবুর পার্টি মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক হলেও আপাদমস্তক ছিলেন জ্যোতি বসুর অনুগত। জ্যোতি বসু এই সময় কেন্দ্র সরকার তথা মধ্যপ্রদেশ সরকারের এবং ভারতীয় রেলদপ্তরকে উস্বাস্তুদের আটকানোর জন্য আগাম ব্যবস্থা নিতে বলেননি। ফলে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন ১৫/২০ হাজার উদ্বাস্তু হাওড়া স্টেশন, প্রিন্সেপ ঘাট ময়দানে এসে গিয়েছে তখন তিনি কেন্দ্র ও মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং রেলদপ্তরের কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। মার্চ ও এপ্রিলে কলকাতা শহরের বাইরে, বিশেষ করে ২৪ পরগনার বারাসাত, বসিরহাট ও

হাসনাবাদে হাজার হাজার উদ্বাস্তু জড়ো হয়ে যায়। ঐ দুটি মাসে বিভিন্ন সময়ে দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে বেশি খরব প্রকাশিত হয়।[৪২] প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, এক সময় যে বামপন্থীরা উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য প্রেরণ করা নিয়ে বিধানসভা ও লোকসভায় প্রতিবাদের ঝড় তুলতেন আজ সেই বামপন্থীরা সরকারে এসে ভিন্নরূপ অবস্থান গ্রহণ করল। এর কারণ হিসাবে এমন একটা কথা হয়তো বলা যেতে পারে বামপন্থী শাসক দল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কথা চিন্তা করে দলিত নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের নিয়ে তারা আর ভারতীয় রাজনীতিতে সমালোচিত হতে চান না। এছাড়াও উক্ত উদ্বাস্তুদের কেন্দ্র করে সমগ্র দলিত তথা নমঃশূদ্ররা বামপন্থীদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই রাজনৈতিক সমীকরণটা বামেরা বেশ ভালো করেই অনুধাবন করতে পেরেছিল বলেই হয়তোও উদ্বাস্তুদের নিয়ে তারা আর ভাবিত হয় নি। এই কারণেই হয়তো পুলিশি অভিযান চালিয়ে কয়েক হাজার উদ্বাস্তুকে খড়্গপুরের দিকে এই সময় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবার কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু বারাসাত – বসিরহাট রোডের আশেপাশে এসে জড়ো হয়েছিল। আর কিছু সংখ্যক বাদুড়িয়া হাট সংলগ্ন ঘনবসতি এলাকায় রাজ্য সড়কের দু'পাশে সাময়িক ভাবে তাবু পাতলে সামাজিক উত্তেজনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। কারণ হল এই সকল অঞ্চল গুলো মুসলমান অধ্যুষিত হওয়ার জন্য দেশ ভাগের প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে মুসলিমরা উদ্বাস্তুদের 'সাম্প্রদায়িক আক্রমণ' হিসাবেই চিহ্নিত করে রেখেছিল। তবু পশ্চিমবঙ্গের সরকার উদ্বাস্তুদের গতি নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করে না।[৪৩] এর প্রমাণ আমরা পাই ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় উদ্বাস্তুদের অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দু – মুসলিমদের ব্যাপক দাঙ্গা হওয়া। যা আমরা এর আগেই উল্লেখ করেছি। তবে আমাদের ভাববার বিষয় যে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু যারা পূর্ববাংলার জঙ্গল ও জলাভূমিতে বসবাস করতে অভ্যস্ত থাকার কারণে তাদের পক্ষে পাহাড়ি ও পাথরে জমিতে কৃষি কাজ ও বসবাস করা জলবায়ুগত কারণেই অসম্ভব হয়ে পড়ে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাইতো নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যও চলে আসেন। এছাড়া বামপন্থীদের কিছু সংখ্যক নেতৃত্বের কথাও উঠে আসে যারা দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের বলেছিলেন, "আমরা ক্ষমতায় এলে আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হবে"। যেমনটা ক্ষমতায় এসে রাম চ্যাটার্জি মানা ক্যাম্পে গিয়ে বলেছিলেন।

১৯৭৮ সাসের মার্চ মাসের শেষের দিকে দণ্ডকারণ্যত্যাগী উদ্বাস্তুরা প্রায় ৪৫/৫০ হাজার এবং এপ্রিল মাসের শেষের দিকে কাতারে কাতারে উদ্বাস্তুরা এসে

হাসনাবাদ রেল স্টেশন ও ইছামতি নদীর তীরে এসে জমায়েত করে। এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ বনবিভাগ থেকে রাজ্য সরকারকে জানানো হয় যে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু বনবিভাগের বাগনা বিট অফিসের উল্টোদিকে মরিচঝাঁপি নামে চিহ্নিত বনাঞ্চলে নারিকেল কুঞ্জে জড়ো হয়ে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছে।[৪৪] আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুগণ ১৯৭৮ সালে দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসার জন্য দায়ী করা যায় দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পরিষদকেও। কারণ হল উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে গিয়ে পর্যাপ্ত কৃষি কাজের জন্য সেচের জল ও সার বা পরিকাঠামো না থাকার কারণেও। যেমন নিচু মানের জমি বণ্টন, জমির স্বল্পতা, পরপর দুবছর খরা, সেচের অভাব, জমির পাট্টা বিলিতে বিলম্ব ও চাকুরীতে সুযোগের অভাব ও নানাবিধ কারণে তারা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে এসে পশ্চিমবঙ্গের মরিচঝাঁপিতে ও পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও ২৪ পরগনা জেলাতেই বসবাস করার জন্য মনোনিবেশ করে। কিন্তু রাজ্য সরকার ছাপান প্রচারপত্রের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়ার আবেদন করে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন অসত্য তথ্য ও অমূলক আশ্বাস দিয়ে কুচক্রীরা আপনাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ও মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বিপদে ফেলে দিয়েছে। আপনাদেরকে যারা পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য বলেছিলেন সুন্দরবনে জমি আছে ওখানেই আপনারা থাকবেন, তাঁরা আজ কোথায়। তাঁদের কে চিনে রাখুন ও দূরে থাকুন। এই মর্মে জ্যোতি বসু আরও বলেন যে, "সুন্দরবনে নতুন করে কোন বসতি স্থাপন করা সম্ভব নয়। সুন্দরবনে বা মরিচঝাঁপিতে বসবাস বা চাষ যোগ্য কোন জমিও নেই। কাজেই রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে দণ্ডকারণ্যে যাতে আপনারা সুন্দর ভাবে পুনর্বাসন ও নাগরিকদের মতন সরকারি প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট এবং আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা ও সম্মানের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন সেই জন্য সব রকম চেষ্টা করা হবে"।[৪৫] এই মর্মে উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল বলেন আমরা আন্দামান, দণ্ডকারণ্য তো দূরের কথা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন জেলাতে আমাদের পাঠাতে চাইলে যাব না। এই সুন্দরবন অঞ্চলেই থাকব। যদি জোর করে রাজ্য সরকার ফেরৎ পাঠাতে চায়, তাহলে সরকার আমাদের শুধুমাত্র আমাদের মৃত দেহগুলো ফেরত পাঠাতে পারবে। উদ্বাস্তু নেতাদের কঠোর মনোভাব শোনার পড়ে রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব অমিয় কুমার সেন ১৯৭৯ সালে ১৭ মে মহাকরণে সাংবাদিকদের বলেন ঐ দ্বীপের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের বনদপ্তরের হাতে তুলে দেবে। পরের দিন ২২০০ উদ্বাস্তুকে হাসনাবাদে আনা হয়। এতদিনের টানাপড়নের মধ্যে হঠাৎ কী করে উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি থেকে আনা সম্ভব হল সেই সময় এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রী সেন বলেন, সতীশ মণ্ডলের ১৮০ জনের একটা

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে গ্রেপ্তারের পর এটা সম্ভব হয়েছে। ওরাই এতদিন ধরে বাঁধা সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে জনৈক রাজ্য সরকারের মুখপত্র জানান, শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতির কারণেই মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুরা চলে আসতে বাধ্য হয়। তাছাড়াও 'আমরা ওদের যেভাবে অনুরোধ করেছি তাতে ওরা সাড়া দিয়েছেন'। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ ওদের অন্তর স্পর্শ করেছে। উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল কোথায় তা তিনি বলতে পারেননি।[৪৬] কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছিল মরিচঝাঁপিতে তা হল সন্ধ্যায় সময় প্রায় ২৫ টি পুলিশ লঞ্চ মরিচঝাঁপি সীমানায় এসে জড়ো হয়। কাজেই ৮০০ পুলিশের সহযোগে মরিচঝাঁপি অপারেশনের জন্যেই নিযুক্ত করেন রাজ্য সরকার। এই সময় উদ্বাস্তু নেতা মণ্ডল জনতা পার্টির নেতাদের এবং রিপোর্টারদের তথ্য ও পরিসংখ্যানযুক্ত একটি সুলিখিত স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। সতীশ বাবু জানিয়েছিলেন যে মাত্র দিনচারেক আগে পান্নালাল দাসগুপ্ত ও শৈবাল গুপ্ত মশাইকে তাঁরা লুকিয়ে মরিচঝাঁপি এনেছিলেন। ঠিক ছিল পরের দিন ফিরে যাবেন। কিন্তু সতীশ বাবুরা রাতে খবর পেলেন যে পান্নাবাবু ও শৈবাল বাবুকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন জ্যোতি বাবু। গভীর রাতে উদ্বাস্তু নেতারা তাঁদের জানালেন, "তিন-চারটি বড় মাছধরার নৌকা জড়ো করে ওই দুই বৃদ্ধকে নৌকায় তুলে ভোরবেলা সন্দেশখালিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ওই সময়ে শৈবাল গুপ্তের বয়স ৭৭ বছর, আর পান্নালাল দাশগুপ্ত ৮০ পেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাঙালির সমাজজীবনের ওই দুই মহানুভব ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসুর সরকারের কাছে কতটা 'বিপজ্জনক' হয়েছেন"।[৪৭] রাজ্য সরকারের প্রবল অত্যাচারে সর্বহারা উদ্বাস্তুদের পশুর মতো বন্দী করে লঞ্চে বোঝাই করে হাসনাবাদ আনা হচ্ছে। সেখান থেকে ট্রাকে গাদা করে অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে উদ্বাস্তুরা অভিযোগ তোলেন। এই প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তু নেতা কাশীবাবু বলেন, "বামফ্রন্ট সরকার দাবী করেছে যে, উদ্বাস্তুরা স্বেচ্ছায় দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাচ্ছেন। জনতাপার্টি বলছে, জ্যোতি বসুর পুলিশ বর্বর জুলুম চালিয়ে মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের উৎখাত করছে। প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য সাংবাদিকদের মরিচঝাঁপিতে যেতে দেওয়ার জন্য কাশীবাবু সরকারের কাছে দাবী জানান"।[৪৮]

এই সময় প্রদেশ কংগ্রেস বাম সরকারের কাছে আবেদন করেন যে, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ওপর থেকে 'সরকারে অমানবিক অত্যাচার' এখনই বন্ধ করতে হবে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য মরিচঝাঁপির অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবী করেন এবং তিনি বলেছিলেন, "রাজ্য সরকার মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নিয়ে আসার জন্য বর্বর

অত্যাচার শুরু করেছেন। সি.পি.আই.এম এর কর্মীরা উদ্বাস্তু শিবিরে ঢুকে মারপিট করছে। তাদের জোর করে লঞ্চে তুলে দিচ্ছে। আবার এই সময় জনতা পার্টির নেতা স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য বাম সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, "সরকার দ্বারা নিযুক্ত আট টাকা দিন মজুরিতে সি.পি.আই.এম ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী জোর করে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ঘর ভেঙ্গে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আগুনে পুড়ে অথবা জলে পড়ে ৭০/৮০ টি শিশু মারা গেছে। বহু উদ্বাস্তুর যথাসবর্স্ব আগুনে পুড়ে বা জলে পড়ে খোয়া গেছে। ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে জোর করে লঞ্চে তুলে দিয়েছে। পারিবারের কে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার কোন খোঁজ নেই। উদ্বাস্তুদের অনেক জিনিসপত্র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী লুঠও করেছে।[৪৯] এই সময় যে রাজনৈতিক দলগুলো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় ছিলেন অর্থাৎ সি.পি.আই.এম, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর.এস.পি রা দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর ধরে বলে এসেছিলেন যে পূর্ববাংলার শরনার্থীদের পশ্চিমবঙ্গের রাইরে পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের নেতারাই কি দীর্ঘদিন ধরে প্রাচার করেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার মত পর্যান্ত জমি আছে। তারাই তো একসময় উদ্বাস্তুদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে, আন্দামান বা দণ্ডকারণ্যে যাওয়া মানে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার সমান। তবে এই সময় উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল যখন সেই কথাই বলেন তখন তাঁকে বাম সরকার চক্রান্তকারী বলেই চিহ্নিত করলেন। এখন প্রশ্ন হল দণ্ডকারণ্যে নানাভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত বিপদগ্রস্ত হয়ে কিছু উদ্বাস্তু যদি মনে করে থাকেন যে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট জমি আছে যারা এতদিন প্রচার করে আসছিল, তারাই যখন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এসেছেন তখন ওখানে গেলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তাহলে কি উক্ত উদ্বাস্তুরা বড় অন্যায় করেছেন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে এর আগেই আমরা সি.পি.আই.এম, ফরওইয়ার্ড ব্লক এবং আর.এস.পি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। কাজেই এখানে আমরা বামপন্থীদের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আন্দোলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম না।

মরিচঝাঁপিতে যে সকল উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র নেতারা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা হয় কংগ্রেস নতুবা জনতা পার্টির সহযোগিতায় আন্দোলন করেছিলেন। তাঁদের নিজেদের কোন রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। আবার একথাও বলা যেতে পারে সর্বহারা উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা সম্ভবও ছিল না। তাইতো তাঁরা বিভিন্ন সমাজসেবক মানুষের দ্বারা ও কংগ্রেস এবং জনতা পার্টির সহযোগিতায় আংশিকভাবে উদ্বাস্তু আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মরিচঝাঁপিতে যে সকল উদ্বাস্তু নমঃশূদ্ররা ছিলেন, তাঁরা যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের সর্বহারা কৃষি শ্রমিক অর্থাৎ বামপন্থীদের শ্রেণী চেতনায় অংশীদারী তেমনি আবার বর্ণগত দিক থেকে সমাজের প্রান্তিক ও পতিত মর্যাদার অধিকারী। প্রসঙ্গক্রমে বামপন্থীদের উদ্বাস্তু আন্দোলনের আদর্শ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পুনর্বাসন দান ও 'জবর দখল কলোনী' স্থাপনের আইনগত স্বীকৃতি ক্ষেত্রে মরিচঝাঁপির প্রান্তিক উদ্বাস্তুদের দাবীর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল বলে ধরা যায়। তা সত্ত্বেও বামপন্থী সরকার নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের পূর্বেকার কংগ্রেস সরকার মতোই নানাবিধ অজুহাতে তাঁদের দণ্ডকারণ্যে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বামেরা ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী উদ্বাস্তু ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের কৃষক ও শ্রমিকদের উপর তাঁদের রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার নিমিত্তে বিভিন্ন ধরণের সংস্কার ও পরিকল্পনার সূচনা করে যা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নবপ্রজন্মের নমঃশূদ্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় এসে ৩৬ দফা কর্মসূচীর গ্রহণের মাধ্যমে গরিব কৃষকদের উন্নয়ন ও ক্ষেত মজুরদের সারা বছর কাজ দেবার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এছাড়াও উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেবার ও গরিব কৃষকদের চাষের জমি পাট্টা দেওয়া এবং উদ্বৃত্ত, বেনামি জমি দখল, করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করার অঙ্গীকার করে।[৫০] কাজেই পশ্চিমবঙ্গের নিম্নজাতির গরিব মানুষের নিকট বাম সরকার অনেকটা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। মরিচঝাঁপির কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু বামপন্থী সরকারের উপর বিরূপ হলেও অধিকাংশ নমঃশূদ্র বামেদের হয়েই রাজনৈতিক আন্দোলনে এই সময় অংশগ্রহণ করেছিল। এর কারণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ১৯৮০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট কৃষিজমি বিতরনের পরিমান ছিল ৬.৭৩ লক্ষ একর, যা ১১,৯৮,১৭৬ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, উক্ত কৃষকদের মধ্যে তপসিলি কৃষক ছিল ৩৭ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫,৪৩,০১৬ জন। ১৯৮৪ সালে তপসিলি জাতির বর্গাচাষীদের যে নাম নথিবদ্ধ করা হয়, তা মোট নথিবদ্ধ বর্গাদারদের ২৯.৮৮ শতাংশ।[৫১]

নমঃশূদ্ররা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন না করতে পারলেও ১৯৮১ সালের ২০ শে মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার শান্তিনগর (পলতা) যুগনায়ক গুরুচাঁদ ঠাকুর অনুপ্রাণিত দত্তডাঙা সভায় নমঃশূদ্র জাগরণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব ও সম্মেলন পালিত হয়। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অংশগ্রহণ করেন, যেমন আসাম, আন্দামান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্য

থেকেও উক্ত সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হয়ে নমঃশূদ্র তথা অনুন্নত অবহেলিত মানুষের আর্থিক সামাজিক রাজনৈতিক শিক্ষা – সংস্কার ও পুনর্বাসন সমস্যা - সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়। এই সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সর্বভারতীয় নমঃশূদ্র সমাজ কল্যাণ পরিষদ। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগন হলেন, এই পরিষদের সভাপতি ডাঃ সুধীর কুমার বাগচী, সহসভাপতি ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ হালদার, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ হরেন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও মনোরঞ্জন বৈষ্ণব প্রমুখ। উক্ত সম্মেলনে ৫৪ জন সদস্য-সদস্যা নিয়ে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিতে সভাপতি হন শ্রী বিমলাংশু বিশ্বাস, সহসভাপতি শ্রী অজিত কুমার মৈত্র, সাধারণ সম্পাদক শ্রী হরিশচন্দ্র বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ শ্রী চিন্তাহরণ বিশ্বাস, স্মরণীয় সম্পাদক শ্রী বারীন্দ্র কুমার বিশ্বাস, শ্রী মহেন্দ্রনাথ তালুকদার আরও অনেকে ছিলেন।[৫২] সম্মেলন তিনদিন ধরে চলেও মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তদের দুরাবস্থা নিয়ে তেমন কোন প্রতিবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ হল মরিচঝাঁপি নমঃশূদ্র উদ্বাস্তদের উপর যে বর্বর আক্রমণ বামপন্থী সরকার করেছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সেই বর্বরচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে যারা সওয়াল করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিন্তু উক্ত সম্মেলনের কোন পদাধিকারী ব্যক্তির নাম আমরা উল্লেখ পাইনি।

যাই হোক "সর্বভারতীয় নমঃশূদ্র সমাজ কল্যাণ পরিষদ" কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনের ছাত্র ও যুব শাখা থেকে প্রকাশ্য অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবনা গুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

"১। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তপসিলি ও আদিবাসীদের উপর যে সব নির্যাতন, অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলছে তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ের জন্য আবেদন করা।

২। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনকে সমর্থন করা এবং শোষিত বঞ্চিত মানুষের মধ্যে লৌহদৃঢ় ঐক্য গঠন করা।

৩। আলোচনা চক্রের ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুন্নত মানুষের সমস্ত অভাব অভিযোগের পর্যালোচনা করা এবং তার প্রতিকারের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালানো।

৪। সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নমঃশূদ্র তথা অন্যান্য তপসিলি সমাজের ও আদিবাসী সহ সমস্ত মানুষকে সচেতন করা।

৫। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, কুসংস্কার ও পণপ্রথা বর্জন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং সমস্ত প্রকার সামাজিক ও অভ্যাসগত ব্যাধি দূর করে শোষণমুক্ত শক্তিশালী সমাজ গঠনে প্রচেষ্টা চালানো।

৬। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জাতির সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা।

৭। পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিভা বিকাশ, নিজেদের ব্যথা-বেদনা, সমস্যা অভাব অভিযোগ ও মতামত প্রকাশ করা এবং সামাজিক অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের আন্দোলনকে শক্তিশালী করা।

৮। সামাজিক কল্যাণে অর্থনৈতিক ও মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রাম কখনও যেন বিপথে বা ভুল পথে পরিচালিত না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা।

৯। নমঃশূদ্র জাতির সঠিক ইতিহাস রচনার জন্য সমাজে বুদ্ধিজীবী ও বিবেকবান ব্যক্তিদের দ্বারা অবিলম্বে গবেষণা শুরু করা।

১০। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য আবেদন পেশ করা।

১১। তপসিলি জাতি ও উপজাতির সার্টিফিকেট প্রদানকে ত্বরান্বিত করা এবং শিক্ষার জন্য সরকারি বৃত্তির অনুদানের মাত্রা বাড়ান এবং শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা চালানো।

১২। দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতি বিধানের জন্য প্রতিটি মানুষকে আত্মনিয়োগ ও ত্যাগ স্বীকার করতে আহ্বান জানানো।

১৩। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরী, আইন ও চিকিৎসা বৃত্তি প্রভৃতি পেশার সমাজের মানুষকে অনুপ্রাণিত ও নিযুক্তকরণে সাহায্য করা।

১৪। চাকুরি সংরক্ষণ যাতে সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয় তৎপ্রতি নজর রাখা এবং 'কোটা' পূরণের আবেদন করা এবং প্রয়োজন বোধে সংঘবদ্ধভাবে চাপ সৃষ্টি করা।

১৫। দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি রক্ষায় সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করা ও নিজ কর্তব্য পালন করা।

১৬। তপসিলি জাতি ও উপজাতি সমূহের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধন সৃষ্টি করা ও যৌথ আন্দোলন অগ্রসর হওয়া।

১৭। দেশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ববোধ জন্মানোর জন্য প্রচেষ্টা করা।

১৮। দেশাত্মবোধের উন্মেষ সাধন করা, দ্বন্দ্ব – কলহের যুক্তপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ মীমাংসা সহ অবস্থানের নীতিকে মেনে চলা ও মানুষের মর্যাদাবোধকে প্রতিষ্ঠা করা”।[৫৩] এই আহ্বান করেছিলেন উক্ত সম্মেলনের উপস্থিত নমঃশূদ্র জাতির ছাত্র- যুবকেরা। তবে বলা যেতেই পারে যে ছাত্র-যুবদের মধ্যে থেকে মরিচঝাঁপির নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের সরাসরি কোন বিরোধিতা করে রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে নামার কোন ঘোষণা করা হয়নি। আবার এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, বাম সরকার পশ্চিমবঙ্গে যে ভূমি সংস্কার নীতি নিয়েছিল সেক্ষেত্রে বেশির ভাগ উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র উপকৃত হওয়ার জন্যেই হয় তো এই সম্মেলন থেকে বামেদের বিরুদ্ধে তেমন কোন বিরোধী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়নি।

এবারে আমরা সংক্ষেপে সর্বভারতীয় নমঃশূদ্র কল্যাণ পরিষদের সভায় বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিদের সম্মিলিত গৃহীত প্রস্তাব গুলো নিম্নে উল্লেখ করব।

১। ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায়ের সম্বনয়ে রচিত ভারতের জাতীয় সংহতি রক্ষা করা করার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে বলা হয় আসামে বিদেশি হাটানোর নামে বাঙালি, নেপালি, উড়িয়া নানান জাতি ও ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে বিতাড়নের চক্রান্তের নিন্দা করা হয়। এবং পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের ভারতে যে কোন রাজ্য বসবাসে অধিকার দিতে হবে বলেও আহ্বান করা হয় কেন্দ্র সরকারের কাছে।

২। এই সম্মেলনে দাবী করা হয় ভারত সরকার তথা বিভিন্ন রাজ্য সরকার যেমন, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, আন্দামানে বসবাস রত নমঃশূদ্র জাতিকে অবিলম্বে তপসিলি জাতি হিসাবে ঘোষণা করা।

৩। সম্মেলনে ভারতীয় সাংবিধানিক নিয়মানুসারে তপসিলি জাতিদের সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষায় যথাযথ সংরক্ষণ দেওয়া দাবিও কেন্দ্র এবং সকল রাজ্য সরকারের নিকট করা হয়।

৪। এই সম্মেলনে সাম্প্রতিক গুজরাটে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের নামে হরিজন নির্যাতন ও হত্যা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টাকে নিন্দা করা হয়।

৫। সম্মেলন বাংলাদেশে প্রায় দেড় কোটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিতে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করা হয় কেন্দ্র সরকারের নিকট।

৬। উক্ত সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গে, দণ্ডকারণ্যে, আসামে এবং অন্যান্য রাজ্যে অবস্থানরত প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের জন্য প্রেরিত হয়েছিল, তাঁদের অনেকে এখনও সুষ্ঠ পুনর্বাসন পায়নি বলে অভিযোগ করা হয়।

৭। এই সম্মেলন যুগাবতার হরিচাঁদ ঠাকুর, যুগনায়ক গুরুচাঁদ ঠাকুর, দেশনায়ক মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, সমাজ বিপ্লবী রসিকলাল বিশ্বাস, জননায়ক বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, জননেতা ধনঞ্জয় রায়, মহাপ্রনাম যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, লোককবি সম্রাট রাজেন্দ্রনাথ সরকার, ড. বি.আর. আম্বেদকর, জননেতা সন্তোষ কুমার মল্লিক, চাঁদসী চিকিৎসক বিষ্ণুধর দাস, ঠাকুর পঞ্চাননের জন্মদিন সুষ্ঠভাবে পালনের জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়।

৮। উক্ত সম্মেলনে কবিগান প্রচারে ও সংরক্ষণে এবং চাঁদসী চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, সমন্বয় সাধনে এবং হরিচাঁদ সাহিত্য বা মতুয়া সাহিত্য প্রচারে ও মূল্যায়নে গুরুত্ব সহকারে সম্মেলনে উপস্থিত সকলের নিকট আহ্বান করা হয়।

৯। এই সম্মেলনে দাবী করা হয় বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকে তপসিলি ও আদিবাসীদের বিভিন্ন জননেতা ও মনীষীদের জীবনী ও রচনা সংযোজন করার কথা উল্লেখ করা হয়।

১০। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকা উদ্বাস্তু ছেলে মেয়েদের মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করতে পারে সে জন্য কেন্দ্র সরকারের নিকট দাবী পেশ করা হয়।

১১। সম্মেলনে ভারতের বিভিন অঙ্গরাজ্যের হত্যার ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করা হয়।

১২। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত নমঃশূদ্রদের নাগরিকত্ব পাওয়ার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ করা হয়।[54] উক্ত সম্মেলনে নমঃশূদ্র ও দলিত জাতির নানান বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করার বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হলেও কোনরূপ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা ঘোষণা করা হয় নি। কারণ হল দেশ ভাগের পরে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ায় তাঁদের পক্ষে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করে রাজনৈতিক আন্দোলনে নামা অসম্ভব ছিল বলেই হয়তো ঘোষণা করা হয়নি। আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নমঃশূদ্র জাতির মানুষ বিভিন্ন সামাজিক জাতিগত সম্মেলন ও মতুয়া মহাসংঘের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সময়ের নিরিখে একটা জাতিগত রাজনৈতিক সচেতনার জাগরণ ঘটিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু বলে রাখা প্রয়োজন যে, দেশ স্বাধীন ও দেশভাগের পরে নমঃশূদ্র জাতির নেতা নেত্রীরা আগের ন্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পারেন নি। দেশভাগের

আগে আম্বেদকরের নেতৃত্বে দলিতদের রাজনৈতিক আন্দোলনে একটা স্বতন্ত্র ভূমিকা ছিল। দেশভাগের ফলে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করার জন্যে তাদের মধ্যে পূর্বের ন্যায় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যেমন ভাবে আমরা বলতে পারি প্রমথরঞ্জন ঠাকুর কংগ্রেস দলের সহযোগিতায় এবং অপূর্বলাল মজুমদার বামেদের এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বামেদের সহযোগিতায় নির্দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পেরেছেন কমবেশি। যদি দলিতদের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল থাকত, তাহলে নমঃশূদ্ররা রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ বড় ভূমিকা রাখতে পারত, এর প্রমাণ আমরা দেশ ভাগের আগে পেয়েছি। এর আগেও আমরা এই বিষয়ে উল্লেখ করেছি। তবে মরিচঝাঁপির ঘটনা ও উক্ত নমঃশূদ্র কল্যাণ পরিষদের ফলেও ১৯৮২ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়ার চারটি সংরক্ষিত নমঃশূদ্র কেন্দ্র থেকে ৩ টি সি.পি.আই.এম এবং ১ টি ফরওয়ার্ড ব্লক জয় পায়।[৫৫] এই সময় পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্ররা জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনে কোনরূপ ভূমিকা রাখতে পারে নি বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আবার দেখা যায় ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ক্ষেতমজুর, কৃষিজীবী কারিগর মৎস্যজীবী তপসিলিদের প্রায় ৭১ হাজার জনকে বাস্তুজমির পাট্টা দেওয়া হয়, যা মোট প্রাপকের ৪০ শতাংশ ছিল।[৫৬] এর মধ্যে বড় একটা অংশ নমঃশূদ্র জাতির কৃষিজীবী ছিল। কাজেই ৮০'র দশকে ভারতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের আন্দোলন দেখা দিলেও পশ্চিমবঙ্গের নমঃশূদ্ররা বাম সরকারের শাসনে থাকার ফলে হয়তো তাঁরা জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের হয়ে আন্দোলন না করতে পারলেও শ্রেণীগত রাজনৈতিক দলের হয়েই রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল।

১৯৮৪ সালে কাঁশীরামজীর নেতৃত্বে দলিত রাজনৈতিক দল বহুজন সমাজ পার্টি গঠন হবার পর এবং কাঁশিরাম এ রাজ্যে ঘন ঘন সফরে আসার ফলে এ রাজ্যেও তার প্রভাব পড়ে এবং শ্রীমহেন্দ্রনাথ তালুকদারের নেতৃত্বে ১৯৮৫ কিংবা ১৯৮৬ সালে বি.এস.পি.-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা গঠিত হয়। ১৯৮৯ সাল থেকে এই দল সর্বপ্রথম এই রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। এরপর থেকে কী লোকসভা, কী রাজ্যসভা, কী পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই দল প্রতিযোগিতার আসরে রয়েছে।[৫৭] একথা বলা যেতে পারে যে বি.এস.পি.-র প্রতিষ্ঠাতা কাঁশীরাম মতুয়াদের কাছেই সর্বপ্রথম এসেছিল। তবে তিনি ঠাকুরনগর, ঠাকুরবাড়ীতে সমাবেশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কথিত আছে

যে পি. আর. ঠাকুর সমাবেশ করতে অনুমতি দেয়নি। এর কারণ হল পি.আর. ঠাকুর এই সময় রাজনৈতিক সন্ন্যাসে থাকার জন্যে কোন রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের ঠাকুর বাড়ীতে রাজনৈতিক সভা সমিতি করার অনুমতি দিতেন না। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে এই সময় বেশ কিছু নমঃশূদ্র তথা মতুয়া সদস্য বি.এস.পি.-র রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দেয়। সর্বোপরি এ কথা বলা যায় যে বি.এস.পি. পশ্চিমবঙ্গ শাখার শীর্ষ স্থানীয় নেতাগণ প্রায় সকলেই মতুয়া তথা নমঃশূদ্র জাতির ।

১৯৮৪ সালের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও এবং জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক নবজাগহণ সূচনা হলেও ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনার চারটি সংরক্ষিত নমঃশূদ্র অধ্যুষিত কেন্দ্রের মধ্যে ৩ টিতে সি.পি.আই.এম ও ১ টি'তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জয় পায়।[৫৮] বামপন্থীদের শ্রেণী চেতনার রাজনৈতিক আন্দোলনের নিকট অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তথা জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক চেতনার আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে প্রাধান্য পায় না।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের ফলেই নমঃশূদ্র তথা অন্যান্য দলিত জাতি তাঁদের নিজস্ব জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন প্রভাবই ফেলতে পারেনি । এর কারণ হল বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন প্রেক্ষাপট ছিল, দরিদ্র শ্রেণীর আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে উন্নতি করা। এই প্রসঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় নবদ্বীপ লোকসভার প্রাক্তন সি.পি.আই.এম সাংসদ আমাদের বলেন, "আমার দল সামাজিক ভেদাভেদকে গুরুত্ব দিত না, দল গুরুত্ব দিত অর্থনৈতিক বৈষম্যকে, কাজেই আমরা কোন নির্দিষ্ট দলিত জাতির সামাজিক আন্দোলনকে গুরুত্ব না দিয়ে সকল দলিত জাতিকে তাঁদের সামাজিক আন্দোলন ব্যতিত রেখে তাঁদেরকে আমরা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল করার জন্যে দল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন"।[৫৯] গাইঘাটার বামপন্থী প্রাক্তন কথাও নবদ্বীপ লোকসভার প্রাক্তন সি.পি.আই.এম সাংসদ কথার সঙ্গে মিলে যায়"।[৬০] আবার মতুয়া গবেষক তথা তখন বামপন্থী রাজনীতির অনুগামী নন্দদুলাল মোহন্ত বলেন, "আমাদের দল উপরে উপরে সামাজিক ভেদাভেদকে মানত না, কিন্তু দলের কোর কমিটিতে কোন দলিত মানুষ রাখতেন না"।[৬১] তিনি আরও বলেন, "আর্থিক দিক থেকে একই শ্রেণীতে থাকলেও দল তার রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্ব দিতেন উঁচু জাতির আর্থিক দুর্বল শ্রেণীর

মানুষকে । আমি দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছি, কিন্তু দল আমাদের সামাজিক সমস্যা তথা উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের জন্যে তেমন রাজনৈতিক আন্দোলন করেনি। তাইতো আমি আমার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করি, যে কারণের জন্যে আমি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলাম"।[৬২] আবার যখন ৮০'র দশকের শেষে এবং ৯০'র দশকের গোঁড়ায় দেশের ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবল ভাবে উত্থান ঘটলেও পশ্চিমবঙ্গের নমঃশূদ্রদের মধ্যে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি বলে মনে করা যেতে পারে। তাই তো উল্লেখ করা যায়, ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনার চারটি সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে ৩ টিতে সি.পি.আই.এম এবং ১ টিতে ফরওয়ার্ড ব্লক জয় পায়। এই নির্বাচনে চারটি কেন্দ্রে বি. জে.পি প্রার্থী দিতে পারলেও নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ কেন্দ্রে বি.এস.পি কোন প্রার্থী দিতে পারেনি, হাসখালি, রাণাঘাট পূর্ব, বাগদা কেন্দ্রে প্রার্থী দিলেই বি.জে.পির প্রাপ্ত ভোট থেকে বি.এস.পির প্রার্থীগণ অনেক কম ভোট পায়।[৬৩] মতুয়া মহাসংঘাধিপতি পি.আর. ঠাকুর ১৯৯০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর প্রয়াত হন। ২৮ শে ডিসেম্বর মতুয়া মহাসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ মহাসংঘধিপতির পদে শ্রী কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরকে মনোনীত করেন। ১৯৯০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ২০14 সালের ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত কলিপকৃষ্ণ ঠাকুর সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের দায়িত্ব পালন করেন।[৬৪] পি. আর. ঠাকুর দ্বারা অনুপ্রাণিত বেশ কিছুসংখ্যক নমঃশূদ্র নেতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হয়েই রাজনৈতিক আন্দোলন করে যায়। আমরা দেখতে পেলাম ৮৭'র বিধানসভা নির্বাচনে বাগদা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী অপূর্ব লাল মজুমদার এফ.বি.এল প্রার্থীকে হারিয়ে জয় পায়। কাজেই বলা যায় ৯১'র বিধানসভা নির্বাচনে উক্ত নমঃশূদ্র অধ্যুষিত চারটি কেন্দ্র থেকে বামপন্থী প্রার্থীগণ জয় পেলেও নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনার নমঃশূদ্ররা সকলেই বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমেছে একথা বলা যায় না। প্রায় দুই দশকের বাম শাসনেও নমঃশূদ্রদের একটি অংশ কংগ্রেস অনুগামী হয়েই তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলন করে যায়।

১৯৯০ দশকে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা ক্ষমতায় থাকার কারণে 'শ্রেণী সংগ্রাম' ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে তারা 'জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন' সম্পর্কে তাদের আন্দোলনের সঙ্গে মেলাতে ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করেছে। বলাবাহুল্য জাতি বা বর্ণ চরিত্রকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে

বামেরা কাজে লাগিয়েছে। শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে গ্রামের ক্ষেত মজুরদের সংগঠিত করার চেষ্টা বামপন্থীরা করেছে এবং তাদের বিশ্বাস ছিল যে, বর্ণাশ্রমী মানসিকতা প্রযুক্তি বিপ্লবী মানসিকতার মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তন হবে। বাস্তবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণী চেতনা ও বিপ্লবী মানসিকতার উন্মেষের জন্য দাস ও সামন্ত যুগের কাঠামো 'জাতিভেদ ও বর্ণ প্রথা'র বিদ্বেষ মোচনে ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কারের পথে বামেরা অগ্রসর হয়নি। নয়াবামপন্থীদের "এষ্টাবিলিশমেণ্ট ও হায়ারার্কি"র বিরুদ্ধে আন্দোলন ৭০'র দশকের প্রথম দিকেই স্থিমিত হয়ে যায়। আবার প্রগতিশীল বামপন্থীদের মধ্যে মার্কসবাদে বিশ্বাসী পার্টির কমরেডদের ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাতি দম্ভ না থাকলেও জাতবিচারের ক্ষেত্রটি বিদ্যমান থাকে, এবং ধর্মীয় গোঁড়ামী না থাকলেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাদের আস্থা ছিল।[৬৫] বামপন্থীদের শাসনকালের মধ্যবর্তী সময়ে অনেক বাম নেতা 'উপনয়ন' ও 'ব্রাহ্মণ ভোজন' অনুষ্ঠাণ পালনও করেন। নমঃশূদ্র বা চণ্ডালদের সংরক্ষণ পাওয়াকে বিদ্রুপ করা হয়, ডোমরা উচ্চবর্ণের গৃহে বা মন্দিরে প্রবেশাধিকার পায়নি।[৬৬] কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ৯০'র মতুয়া মহাসংঘের দায়িত্ব নেওয়ার পর, তাঁর নেতৃত্বে নমঃশূদ্র ও অন্যান্য দলিত ও আদিবাসীদের নিয়ে একটি 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' (Pressure Group) এবং একটি দলিত ধর্মীয় সামাজিক সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সংগঠন বা গোষ্ঠীগুলোর যৌথ দাবী ও প্রস্তাব সমূহকে গুরুত্ব দিয়ে নিজস্ব দলের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করেছিল, অন্যদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উক্ত গোষ্ঠীগুলো ধীরে ধীরে একটি 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' হিসাবে অবস্থান করেছিল।[৬৭] এইরূপ 'চাপসৃষ্টিকারী' গোষ্ঠীর সংজ্ঞা অধ্যাপক অমল কুমার মুখোপাধ্যায় এই ভাবে দিয়েছেন- "A pressure group is an organized social group whose members share common attitudes, beliefs or interests and seeks to influence public policies in the light of these attitudes or interest without ever trying to take over any responsibility for Governnment"।[৬৮] এই সংজ্ঞা থেকে একথা বলা যেতে পারে যে, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠিগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পার্টির সক্রিয় সদস্য না হলেও নিজস্ব সমাজ ও জাতির যৌথ দাবীকে সভা-সমিতি গঠন, পত্র – পত্রিকা ও হ্যান্ডবিল পত্রের প্রকাশের মাধ্যমে অন্তর্গঠিত ও সংগঠিত করার পন্থাকে উদ্দেশ্য সাধনের 'কৌশল বা প্রক্রিয়া, হিসাবে তুলে ধরা। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির দাবী, প্রস্তাব এবং শক্তিশালী প্রভাবের কারণেই

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন আইন সভা ও সিদ্ধান্ত নির্ণায়ক প্রতিনিধিত্বর মূলক সংস্থাগুলো তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়।[৬৯] মতুয়া মহাসংঘ এই সময় নমঃশূদ্র ও অন্যান্য দলিত ও আদিবাসীদের নিয়ে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবেই নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালায় বলে মনে করা যেতে পারে।

আবার এই সময় দেখা যায়, মতুয়া মহাসংঘ পশ্চিমবঙ্গের সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে এলেও নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনায় বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি জেলায় একাধিক শাখা সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নমঃশূদ্র ও নিম্নবর্ণের মধ্যে মতুয়া মহাসংঘের আঞ্চলিক শাখার মাধ্যমে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৭০] কাজেই আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, মতুয়া মহাসংঘ নমঃশূদ্র ছাড়াও অন্যান্য দলিত ও আদিবাসীদের সামনে নব আদর্শ তুলে ধরে পশ্চিমবঙ্গে 'একটি নবতম দলিত সংগঠন' হিসাবে উঠে এসেছে। মতুয়া মহাসংঘের ৬ নং ধারায় উল্লেখিত আছে, মহাসংঘের নারী- পুরুষ, জাতি-বর্ণ, নির্বিশেষে সকল সদস্যের সমানাধিকার ও সমকর্তব্য থাকবে, প্রতিটি মানুষকেই ভালবাসতে এবং ভালো করতে হবে। তাছাড়াও মতুয়া প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, 'মতুয়াদের মুক্তির অর্থ মোক্ষ নয়, মুক্তির অর্থ হল প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক বাধা থেকে মুক্তি অর্জন করা'। "মতুয়া মহাসংঘ সামাজিকভাবে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত মানুষের জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে তাদের ধর্মীয় আদর্শ, সমাজ সেবা এবং সামাজিক সুবিধা অর্জনের জন্য সংগ্রামে অরতীর্ণ হবে"।[৭১] সম-মতাবলম্বীদের স্বেচ্ছামূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মতুয়া মহাসংঘের আঙিনায় ঐক্যবদ্ধ করাই এই সংঘের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। মতুয়া মহাসংঘের প্রস্তাবনায় আরও উল্লেখ আছে যে, মহাসংঘ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলতে, মুষ্টিমেয় শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও ধনী শ্রেণী ছাড়াও, ধর্মীয় পরিমণ্ডলে আবদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদী কায়েমী স্বার্থে যারা জাতিভেদ, জন্মসূত্রে অর্জিত কুসংস্কার, সহজাত স্বভাব আঁকড়ে ধরতে চায় তাঁদের বিরুদ্ধে সময় সাপেক্ষ এবং 'বিচক্ষণতাপূর্ণ সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল ঠিক করা হবে।[৭২] কাজেই পরবর্তী সময়ে দেখা যায় উক্ত রীতি-নীতি আদর্শের মাধ্যমে নমঃশূদ্র তথা মতুয়া এবং অন্যান্য দলিত জাতি ও আদিবাসীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়।

বলাবাহুল্য যে মতুয়াদের সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণ করে ১৯৯৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের

বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার চারটি নমঃশূদ্র অধ্যুষিত সংরক্ষিত কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি আসন বামপন্থীরা জয় পেলেও নদীয়ার হাসখালি কেন্দ্রটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জয় পায়।[৭৩] আবার দেখা যায় ৯০'র দশকের শেষেও মহাসংঘ সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে না থাকলেও নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের একটা বড় সংখ্যা রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাইতো দেখা যায় ১৯৯৯ সালের ভারতের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নবদ্বীপ সংরক্ষিত কেন্দ্রে বি.জে.পি ও অল.ইন্ডিয়া.তৃণমূল কংগ্রের জোট জয় পায় এবং কৃষ্ণনগর কেন্দ্রেও জয় পায়।[৭৪] প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলতে পারি যে, নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলন এই সময় বহুজন সমাজ পার্টি হয়ে আন্দোলন না করলেও তারা অবামপন্থী রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশগ্রহণ করে।

পশ্চিমবঙ্গের দলিত সহ নিপীড়িত জাতির মানুষদের নিয়ে যে, নবদলিত আন্দোলনে প্রেক্ষাপট গঠন করার চেষ্টা করেছিল মতুয়া মহাসংঘ তার একটি প্রমাণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিক আইন সংশোধন করে বাঙালি উদ্বাস্তুদের বিদেশী আখ্যা দিয়ে নাগরিকত্বের সমস্ত অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করেন। উক্ত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে প্রথম বড়মা বীণাপাণি দেবী ও কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের নেতৃত্বে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে ২০০৪ সালে ২১ জন মতুয়া আমরণ অনশন শুরু করেন। অনশন সফল করার জন্যে মতুয়া সমাজের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য দলিত জাতির নেতানেত্রীগণ বিশেষ উদ্যোগ করেছিলেন। এই অনশন আন্দোলন সফল করার জন্যে কয়েক লক্ষ নমঃশূদ্র তথা মতুয়ারা বিভিন্ন দিনে ঠাকুরনগরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের নমঃশূদ্র ও সারা ভারতের নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের মধ্যে সাড়া ফেললেও এই সময় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় সরকারি আইনের সমর্থন করেন এবং ১৯৭১ সালের পরে আসা বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ কারী হিসাবে গণ্য করা হয়।[৭৫] আমরা আগেই আলোকপাত করেছি যে, নমঃশূদ্রদের বড় একটা অংশ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও ভারতে চলে আসে। ফলে আমরা বলতে পারি যে, মরিচঝাঁপির পরবর্তীকালে পুনরায় আর একবার পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা দলিত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করলেন।

আবার দেখা গেছে যে, ১৯৮০'র দশকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 'পশ্চিমবঙ্গে জাতিভেদ নেই' বলে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করতে অস্বীকার

করেছিলেন।[৭৬] উক্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর সামাজিক সংরক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন নি। ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের সময় দলিত লেখিকা উল্লেখ করেন, " পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব সামাজিক প্রেক্ষাপটের চিত্র হল ব্রাহ্মণ কায়স্থকে বিবাহ করেছেন, অথচ নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র, বাগদি বা মাহিষ্যদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত বিরল। জাতিভেদের উক্ত সুনিপুন বিভাজন শহরের ভদ্রলোক বামপন্থীদের মধ্যেও আছে বলে মনে করা যেতে পারে"।[৭৭] ফলে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ দিনের শ্রেণী শাসন কালেও উচ্চবর্ণের মানুষের সামাজিক তথা রাজনৈতিক ও সরকারি ক্ষমতার আধিপত্যবাদী মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি বললেও চলে। সুপার কম্পিউটারের যুগে এসে বামপন্থীরা বুঝতে পারেন যে শ্রেণী শাসন কাঠামোর ধারণা জাতি কাঠামোর বৈষম্য দূরীভূত করতে পারে না। এর কারণ হল, ১৯৯৯ সালে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা দলের জোটবদ্ধ হয়ে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বামের দলিত ভোট ব্যাঙ্কে ভাঙ্গন ধরে। এছাড়াও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে বেশ সারা ফেলে দেয়। একথাও সত্য যে ভারতের সর্বহারা শ্রেণীর সিংহভাগ মানুষ হল দলিত জাতির মানুষ, কাজেই বামেদের ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে, শ্রেণী সংগ্রামের সাথে সাথে দলিত জাতির সামাজিক বৈষম্য মোচনের আন্দোলনের পদক্ষেপ না নিলে দলিত ভোট ব্যাঙ্ক বামেদের হাত হাছারা হবে। তাইতো ২০০৩ সালের বামপন্থী সরকারি নীতি অনুযায়ী ঘোষণা করেন যে, জাতিগত সংমিশ্রণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে যুগলকে ৫০০০ টাকা বিবাহ ভাতা দেওয়া হবে। কাজেই ২০০৩-২০০৮ সালের মধ্যে ৮৪ জন যুগলকে বিবাহ ভাতা দেওয়া হয়। ফলে ২০০৮ সালে এসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জাতিগত সংমিশ্রিত বিবাহ ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি মনিটারিং কমিটি ও সভাপতি নিয়োগ করে বিষয়টার উপর নজর রাখার জন্য। কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিবাহ ভাতা ৫০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০০০ টাকা করেন।[৭৮] প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, বহুবছর আগে বাবা সাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন, ভারতীয় হিন্দু সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদ করতে হলে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটানো ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন উচ্চ বর্ণের নারীর সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ ও নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা। সেই পথই বিংশ শতকের গোঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারি নীতিনির্ধারকগণ জাতিভেদ ব্যবস্থার বৈষম্যকে মোচন করার লক্ষ্যে বৈবাহিক

সম্পর্কের মাধ্যমে জাতিভেদ কাঠামোর কড়াকড়ি থেকে মুক্ত সমাজ গঠনের দিকে নজর দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত নির্বাচনে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে মতুয়া তথা নমঃশূদ্রদের বিরাট সংখ্যক ভোতারের সমর্থন পায়। উক্ত সমর্থন তৃণমূল কংগ্রেস পায় এই কারণে সিঙ্গুর জমি আন্দোলনের সময় থেকেই মতুয়াদের বড়মা বীণাপাণি ঠাকুর মমতা ব্যানার্জীর আন্দোলনকে সমর্থন করেন "ফলে তাঁর বৃহত্তর মতুয়া ভক্ত তথা নমঃশূদ্ররা পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেয়। কাজেই বামপন্থীদের দলিত নমঃশূদ্র ভোট হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় তারা নমঃশূদ্রদের কাছে টানার নিমিত্তে মতুয়াদের ঠাকুরবাড়ির উন্নয়ন কল্পে নানাবিধ প্রকল্পের ঘোষণা করতে থাকেন রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যেই বলে মনে করা যেতে পারে"।[৭৯] এর উদাহরণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, "রাজ্যের প্রায় ২৩৫ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৭৪ টির ফলাফল তপসিলি জাতি-উপজাতির ভোটারদের উপরে নির্ভরশীল। তার মধ্যে মতুয়াদের উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়ার সিংহভাগ ভোট। তাঁরা সাম্প্রতিক তৃণমূলের দিকে ঝোঁকায় পঞ্চায়েতে সি.পি.আই.এমের তপসিলি ভোটব্যাঙ্কে ধস নেমেছে এবং বিপরীতে তৃণমূলের ফল ভালো হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সেই কারণেই লোকসভা ভোটের আগে মতুয়াদের মন পেতে বিমান বসুদের এলাকায় নিয়ে এসেছে সি.পি.আই.এম।[৮০] যদিও উক্ত অনুষ্ঠানে ঠাকুরবাড়ির কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না বা ঠাকুরবাড়ি থেকে কাউকেই প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান নি। মতুয়াদের দলিত ঐক্যবদ্ধ করণ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রেরণা নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ কার্যকর হয়। তবে রাজনৈতিক মহলের অনেকেই মনে করেছেন, মতুয়াদের তথা নমঃশূদ্রদের মধ্যে এখন অনেকেই প্রকাশ্যে তৃণমূলের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের আন্দোলনকে সমান্তরাল ভাবে চলার পক্ষেই ছিল। এর কারণ হল, "সিঙ্গুর – কাণ্ডের প্রতিবাদে মমতা ব্যানার্জির ২৬ দিনের অনশনের সময়ে মতুয়াদের বড়মা বীণাপাণি দেবী ধর্মতলার অনশন মঞ্চে গিয়েছিলেন। পরে মতুয়াদের পীঠস্থান গাইঘাটার ঠাকুরনগরে মমতা দলের তপসিলি জাতি-উপজাতি শাখার সম্মেলন করেন। গাইঘাটার তৃণমূল বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন ঠাকুরবাড়ির উন্নয়নে বিধায়ক তহবিল থেকে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা এবং সাংসদ তহবিল থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সি.পি.আই.এম কিছুই করেনি"।

মতুয়াদের গণপতি বাবু বলেন, " কেউ ঠাকুরবাড়ির উন্নয়ন এবং জনসেবামূলক কাজ করতে চাইলে তা পারে না। তবে মতুয়াদের মধ্যে সব রাজনৈতিক দলের সমর্থন রয়েছে। আমরা বলি, যাঁরা আমাদের স্বার্থে কাজ করেন, তাঁদের দেখবেন"। জ্যোতিপ্রিয়বাবুর অভিযোগ, সি.পি.আই.এম মতুয়াদের ভোট পেতে 'ঘৃণ্য' রাজনীতি করছে। বিমানবাবু অবশ্য সে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "মতুয়াদের সম্মেলনে আমরা বহু বার গিয়েছি। ভোটের কথা ভেবে নয় সমাজের কথা ভেবেই এখানে এসেছি"।[৮১] এখন আমাদের মনে একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক নয় কী? যে সময় ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে মতুয়ারা তথা নমঃশূদ্ররা আমরণ অনশন করেন, তখন কোনও বামপন্থী নেতা-নেত্রী তথা সি.পি.আই.এম নেতা-নেত্রীর উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়নি। আবার জ্যোতিপ্রিয়বাবুদের তৃণমূল কংগ্রেস আগে কখন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় ছিলেন না। কাজেই নমঃশূদ্ররা এই সময় সি.পি.আই.এম অপেক্ষা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনকেই অধিকভাবে বিশ্বাস ও সমর্থন করে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন সামনে রেখে সি.পি.আই.এম ও তৃণমূল কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লক মতুয়াদের ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে ঠাকুরবাড়ির বড়মাকে নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ও মেলা নিয়ন্ত্রণ চেয়ে রাজ্য সরকার আবেদনও করেন। কাজেই আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দীর্ঘ তিন দশক পরে এসে হঠাৎ করে কেন মতুয়াদের উপর এতটা মনযোগী হলেন। এর কারণ হল বামপন্থীরা বুঝতে পারেন যে, নমঃশূদ্র তথা মতুয়ারা ৯০'এর দশক থেকে অরাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিকারী একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। ফলে ওদের সমর্থন ছাড়া রাজ্য সরকার গঠন করা অসম্ভব নয়। নমঃশূদ্রদের জাতিগত একটা চেতনা বোধ সবসময় কাজ করে, যেমন নবদ্বীপের সি.পি.আই.এম সাংসদ অলকেশ দাসকে আর্থিক দুর্নীতির কারণে সি.পি.আই.এমের রাজ্য কমিটি শাস্তির বিধান ঘোষণা করেন। বিবান বসু নমঃশূদ্রদের ভোটের সংখ্যা মনে রেখে কমিটির নিকট অলকেশ বাবুর শাস্তির বিধান লঘু করার আবেদন জানায়। ফলে রাজ্য কমিটি নির্বাচনের আগে বড় কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে জেলা রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়বে। তাই আপাতত ঝুঁকি না-নিয়ে অলকেশ বাবুর 'পদাবনতি'র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৮২] এই ঘটনাকে তৃণমূল পন্থী নমঃশূদ্র নেতারা ভোট রাজনীতিতে কাজে লাগানোর জন্য তৎপর হয়ে পড়েন। তাঁরা নমঃশূদ্র তথা মতুয়া সমাজের মানুষদের বোঝাতে থাকেন বামপন্থীরা আমাদের শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক হিসেবেই দেখেন, তাঁদের কমরেড বা

একনিষ্ঠ নেতা হিসাবে দেখেন না। চাঁদপাড়ার মতুয়া গবেষক কথায়, "তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের ঠাকুরবাড়ির জন্য অনেক উন্নয়ন মূলক কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ও তাঁদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও কিছু কাজ করেছেন"।[৮৩] ফলে তৃণমূল পন্থী নমঃশূদ্র নেতাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে বহুসংখ্যক মতুয়া, নমঃশূদ্র ও অন্যান্য দলিত জাতির মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে চলে আসে।

আবার দেখা যায় যখন মতুয়া সমাজের নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তণ মন্ত্রী প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের নামে একটি রাস্তার উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ ওঠে। ১৪/৩/২০০৯ উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ব্লকের ঠাকুরনগর থেকে চাঁদপাড়া পর্যন্ত রাস্তার উদ্বোধন করে মতুয়াদের বড়মা বীণাপাণি দেবী। যেহেতু রাস্তাটি তৈরি করেছে তৃণমূল পরিচালিত গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি। ভোটের তারিখ ঘোষণা হওয়ার পর এমন ভাবে রাস্তার উদ্বোধন করায় ক্ষুব্ধ সি.পি.আই.এম। দলের বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোট পাওয়ার জন্য এ ধরণের রাজনীতি করছে। বনগাঁ কেন্দ্রের সি.পি.আই.এম প্রার্থী অসীম বালা বলেন, "এই ঘটনা জেলা প্রশাসনকে জানানো হবে, অসীম বাবু আরও বলেল, আমি নিজে গিয়ে বড়মার আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি, এই প্রসঙ্গে বড়মা বলেন "স্বামীর নামে রাস্তা করা নিয়ে রাজনীতি থাকতে পারে কিন্তু তৃণমূল আমাদের জন্য যেহেতু কাজ করছে, তাই রাস্তার উদ্বোধন করতে এসেছি"। পাশাপাশি বনগাঁ লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর বড়মার আশীর্বাদ নিয়ে ভোট প্রচারে নেমে পড়েন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন ভোটে জিতে মতুয়া ও তপসিলিদের জন্য উন্নয়নের কাজ করব।[৮৪] মতুয়াদের ভোট পাওয়ার নিমিত্তে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ২০ মার্চ ২০০৯ সালে রাজ্য সরকারের প্রশাসনের পুলিশ ও কেন্দ্র সরকারের রেল পুলিশের কাছে আবেদন করেন হাওড়া, শিয়ালদহ, বিধাননগর, দমদম, বারাসাত, দত্তপুকুর, অশোকনগর, হাবড়া, গোবরডাঙা, ঠাকুরনগর, বনগাঁ, রাণাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, গেদে, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার- সহ বিভিন্ন স্টেশনে পুলিশ রাখার। তবে পুলিশ বা রক্ষীরা যাতে অযথা তীর্থযাত্রীদের হয়রান না করেন, সে জন্যও প্রশাসনকেও অনুরোধ জানান তিনি।[৮৫] তবে আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন মতুয়াদের মেলার জন্য অধিক পরিষেবা ও সুবিধা দেওয়ার দাবিদার অনেক রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী প্রচারে তুলে ধরেন। যেমন রাজ্যের মন্ত্রী মোর্তাজা হোসেন দাবী করে কয়েকদিন আগেই রেল মন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবকে চিঠি দিয়ে তিনিই মেলার জন্য অধিক

ট্রেন পরিষেবা এনেছেন। পাল্টা দাবী করেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তিনি ভোট প্রচারে বলেন, জানুয়ারি মাসে মমতা ব্যনার্জী ঠাকুরবাড়ি গিয়ে বড়মাকে বলেছিলেন, এবার মেলায় অধিক ট্রেনের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কাজেই তিনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা ব্যনার্জীর জন্য মেলার সময় অধিক ট্রেন পায়া গেছে।[৮৬] ভোট প্রচারে রাজনৈতিক দলের যুক্তি পাল্টা যুক্তি চলতেই থাকে। আবার ২৪ মার্চ ২০০৯ সালে রাজ্যের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঠাকুর বাড়ি গিয়ে বড়মার পায়ে হাত দিয়ে মতুয়া মেলার দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিতে চায়। কিন্তু বড়মা সরাসরি না করে দেন।[৮৭] প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতেই পারে যে, উক্ত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বড়মার আশীর্বাদ পেয়েছিল। কিন্তু এই নির্বাচনের সময় মতুয়া মহাসংঘের সর্বভারতীয় সংঘাধিপতি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর অরাজনৈতিক সংঘ হিসাবেই পরিচালন করেন। তাইতো ঠাকুর বাড়ি থেকে কোন প্রার্থীই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নি। নির্বাচনের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য দিলে দেখা যায় রাণাঘাট ও বনগাঁ কেন্দ্র দুটিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদ্বয় জয় লাভ করেছেন। বনগাঁ লোকসভার জয়ী গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হলেও নমঃশূদ্র তথা মতুয়ারা বড়মার সমর্থনেই তৃণমূল প্রার্থীকেই অধিক ভোট দেন। আবার বনগাঁর সি.পি.আই.এম প্রার্থী অসীম বালা নমঃশূদ্র হলেও তাঁকে মতুয়া তথা নমঃশূদ্ররা ভোট কম দেন বলেই ধরে নেওয়া যেতেই পারে।

উক্ত লোকসভা নির্বাচনে জাতিভিত্তিক সংগঠনের কাছে শ্রেণী চেতনার রাজনৈতিক কাঠামো আঘাত পাওয়ার পরে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিকারীর মতাদর্শকে বেশি প্রাধান্য দেয়। আবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করার পরে বড়মার সঙ্গে মমতা ব্যনার্জির ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। কাজেই ২০১০ সালের প্রমথ দিকেই ঠাকুরবাড়ির একটা অংশ তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমে পড়েন। এরপর ২০১০ সালের ২৮ ডিসেম্বর পি.আর. ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে বড়মার নেতৃত্বে কলকাতা মেট্রো চ্যানেলে লক্ষ মতুয়া, নমঃশূদ্র ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে উপস্থিত হন। মেট্রো চ্যানেলের সমাবেশে মতুয়াদের নেতৃত্ব ছাড়াও অন্যান্য দলিত নেতানেত্রীরাও প্রতিবাদ জানান। উক্ত সমাবেশে মতুয়া মহাসংঘের প্রধান উপদেষ্টা বড়মা বীণাপাণি দেবী সভাপতিত্ব করেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মতুয়া মহাসংঘাধিপতি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, সহ-সংঘাধিপতি মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর, সাধারণ সম্পাদক শ্রী গণপতি বিশ্বাস এবং মহাসংঘের সভাপতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক

দলের নেতৃবৃন্দ সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম মন্ত্রী গৌতম দেব, জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মানস ভুঁইয়া, বি.জে.পি. দলের শ্রী তথাগত রায়, তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রী মুকুল রায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মঞ্চে উপস্থিত রেখে নমঃশূদ্র নেতা শ্রী সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস মতুয়া তথা নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব সহ নানান সমস্যার কথা সুদীর্ঘ ভাষণে তুলে ধরেন। সুকৃতিরঞ্জন বাবু নাগরিকত্ব সংশোধনের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ডাক দেন। যদিও সুকৃতি বাবুর রাজনৈতিক পরিচয় হল আর.পি.আই, তা সত্ত্বেও তিনি মতুয়াদের পক্ষ নিয়েই সমাবেশে উপস্থিত হন। নমঃশূদ্রদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকেলেও তাঁরা নিজেদের স্বার্থে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করার নজির অনেক সময়ই রেখেছে। সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বড়মা বীণাপাণি দেবীর সামনে যে তাঁরা রাজনৈতিক ব্যানার দূরে রেখে মতুয়াদের তথা নমঃশূদ্র অন্যান্য উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একযোগে দাবী জানাবেন – এইরূপ আশ্বাস তাঁরা সমাবেশ মঞ্চে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব আন্দোলনের দাবীতে কোন সংগঠিত আন্দোলনের পথে যায় নি। ফলে আমরা বলতে পারি যে, মতুয়া তথা নমঃশূদ্রদের ভোট পাওয়ার জন্যেই উক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[৮৮] মতুয়াদের সমাবেশের জন সংখ্যা দেখে তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঠাকুর বাড়ি থেকে মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর কে প্রার্থী করলে পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি হয় ঠাকুর বাড়িতে। ৮০'র দশকের অরাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে এসে ২০১১ সালে মতুয়া মহাসংঘ সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বড়মার বড় ছেলে কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর এই নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রচার করেননি আর ছোট ছেলে গাইঘাটা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে প্রচার করেন। তৃণমূল কংগ্রেস দল নির্বাচনের কৌশল হিসাবে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার তপসিলি সংরক্ষিত কেন্দ্রগুলিতে মতুয়া নমঃশূদ্রদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেন। নির্বাচনের প্রচারের সময় মতুয়া সংঘের সাংবাদিক বিবৃতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন করে বামপন্থী দলের ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি ক্ষোভ দেখান। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সমাজতাত্ত্বিকদের মতে নমঃশূদ্রদের ভোট দান প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল তা হল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন তাদের সমর্থন পেতে মরিয়া তখন তারা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। নমঃশূদ্রদের বড় অংশের নেতৃত্ব মনে করেন, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তাদের দাবীদাওয়া

পূর্ণ হবে। প্রসঙ্গক্রমে ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্রের মন্তব্যটা তুলে ধরা যেতে পারে, “গত ৩০ বছরে নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বেড়েছে। ফলে তরুণ প্রজন্ম ক্রমশ চাষবাসের পরিবর্তে চাকুরি, ব্যবসা বা অন্যান্য কাজে উন্নতি করেছেন। তারা মনে করেন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েতের কাজ, শিক্ষাকতা, সরকারি চাকরি, বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে তাদের তুলনায় উচ্চবর্ণের মানুষ অনেক বেশি সুযোগ পায়। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটের পরে ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটেও তার প্রভাব পড়েছে। আবার অধ্যাপক শিবাজী প্রতীম বসুর মতে বামপন্থীরা নমঃশূদ্র ও অন্যান্য তপসিলিদের উন্নয়নের বা তাদের প্রতিনিধিত্ব ও মর্যাদা দানের বিষয়টি দেরিতে ভেবেছে”।[৮৯] আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার ১১ টি সংরক্ষিত কেন্দ্রেই তৃণমূল কংগ্রেস জয় পায়। কাজেই মতুয়া মহাসংঘের প্রচারের মাধ্যমে নমঃশূদ্র ও অন্যান্য তপসিলি জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকার অর্জন করার নিমিত্তে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বেড়িয়ে এসে এই সময় তৃনমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, “কারাটদের এবার জাতপাতের বাস্তবতা মানতে হবে। কেননা, আসল ঘটনা ঘটে গিয়েছে রাজনীতির ভাষায়। দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর দাবি সেই ভাষায় যে গতিতে জায়গা দখল করে নিচ্ছে, তাঁকে উপেক্ষা করে কেবল উন্নয়নের বুলি দিয়ে ভোটে লড়া যাবে না”।[৯০] কাজেই আমরা বলতে পারি যে, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ক্ষমতায় এসে জাতিভিত্তিক প্রতিনিধিদের শুধুমাত্র নির্বাচনে জয় পাওয়া নিমিত্তে ব্যবহার করেছেন। শ্রেণী সচেতনতা বাড়লেই যে আমাদের জাতপাতের ধারণাটা সম অনুপাতে কমবে, এমনটা মনে করা ভুল। শ্রেণীর সঙ্গে জাতের সম্পর্কটা একটু জটিল। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেণী ও জাতের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, অন্তজ্য জাতের লোক সাধারণত দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তও বটে। তবে শ্রেণী বিভাজনের সিঁড়ি বেয়ে আপনি উপরে উঠতে পারেন অথবা পা পিছলে নীচেও পরে যেতে পারেন, কিন্তু তাতে আপনার জাত পরিচয় পাল্টাবে না – কারণ ওটা জন্মগত। তাই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর ব্রাহ্মণত্ব হারান না, কিন্তু উচ্চবিত্ত তপসিলি জাতির ভদ্রলোককে অনেক সময়ই জাতের কারণে হেনস্থা হতে হয়। এর সঙ্গে ভারতে এখনও জড়িয়ে আছে অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন। অর্থাৎ জন্মগত জাতপরিচয়ের সঙ্গে সম্মান, ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুযোগ

– সুবিধা বণ্টনের সম্পর্কটা অনেক নিবিড়, যেখানে অন্ত্যজ জাতিগুলি একটা চিরিস্থায়ী অনগ্রসর অবস্থানে থাকে। এর থেকেই জাতপাত –ভিত্তিক আত্মপরিচয়ের রাজনীতির সূত্রপাত।[৯১] জাতিগত বিভাজনের অসুবিধার ফলেই যে দলিত জাতি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে পারে না। সে কথা নমঃশূদ্র নেতারা বেশ ভালো ভাবেই আগেই থেকে সচেতন ছিলেন। কাজেই তৃণমূল নেতা মুকুল রায় মেট্রো চ্যানেলের সমাবেশ থেকে নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়া নমঃশূদ্রের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস জোট পালন না করায়ও মতুয়াদের একটা অংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আবার মতুয়ারা বুঝতে পারেন যে, অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মাধ্যমে তাদের নাগরিকত্বের সমস্যা সমাধান হবে না। তাইতো মতুয়া মহাসংঘ ও অন্যান্য দলিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘস্থানীয় আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আন্দোলনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২০১৪ সালে পুনরায় বড়মার অনুমতি নিয়ে ১৯ জন মতুয়া ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে আমরণ অনশন শুরু করেন। অনশন সফল করতে এগিয়ে এসেছিলেন, সমাজসেবী শ্রী পৃথ্বীশ দাসগুপ্ত, ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, শ্রী সুব্রত ঠাকুর। আমরণ অনশন যারা করেছিলেন, তারা হলেন শ্রী সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, ডাঃ সুকেশ চৌধুরী, ড. বিরাট বৈরাগ্য, শ্রী রূপক বিশ্বাস, অনির্বান হালদার, আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মতুয়া গোঁসাই।[৯২] উক্ত অনশনের সার্বিকভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যেমন দলে দলে ঠাকুরবাড়িতে এসে সমর্থন জানায়। আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রনিধিরা এবং চলচ্চিত্র জগতের কয়েকজন উপস্থিত হয়ে অনশনের সমর্থনে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। অনশন ৬ দিন চলার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা দল ঠাকুরবাড়ি এসে জানায় নাগরিকত্বের সমস্যা খুব দ্রুত সমাধান করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি দলের প্রতিশ্রুতি পেয়ে অনশন প্রত্যাহার করে নেয়।[৯৩] বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের সমস্যার সমাধানের জন্য বড়মার নির্দেশে দিল্লি ও কলকাতায় এর আগেও অনেক বার ধর্ণা ও সমাবেশ মতুয়া নমঃশূদ্ররা সংগঠিত করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিকট বারবার দাবিপত্রও দেওয়ার মধ্যে দিয়েও তাদের নাগরিকত্বের সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ কেন্দ্র থেকে বড় নাতি সুব্রত ঠাকুরকে তৃণমূল টিকিট দিক এমনই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন বীণাপাণি দেবী (বড়মা)। “ঠাকুরবাড়িতে বসে বড়মা বলেন, ‘সুব্রতর দাদু প্রমথ রঞ্জনও সাংসদ ছিলেন। আমি চাই, নাতিও এ বার লোকসভা ভোটে দাঁড়াক। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই

আমার আবেদন"। অপর দিকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় এ বিষয়ে বলেন, "প্রার্থী করার ব্যাপারে অনেকেরই অনেক মতামত থাকতে পারে। প্রার্থী মনোনীত করতে পারে দলের নির্বাচন কমিটি। কিন্তু মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন নেত্রী"।[৯৪] কিন্তু লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা যখন তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশ করলেন, তখন দেখা যায় সুব্রত ঠাকুরকে প্রার্থী না করে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের সভাপতি তথা বড়মার বড়ছেলে কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরকে বনগাঁ কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করেন তৃণমূল।[৯৫] ফলে ঠাকুরবাড়ির বড়ছেলে কপিল বাবুর সঙ্গে ছোটছেলের মঞ্জুলের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ গুরুতর আকার নেয় এই সময়। তৃণমূল সূত্রের খবর, মঞ্জুলের কিছু আচার-আচরণে খুশি ছিলেন না দলের জেলা নেতৃত্বের একাংশ। মঞ্জুলের বড়ছেলের নাম বনগাঁ কেন্দ্রের জন্য বড়মা প্রস্তাব করেও তা ভালো চোখে দেখেননি তাঁরা। যদিও সুব্রত এই সময় গাইঘাটার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কাজেই তৃণমূল তাঁকে নতুন কোন পদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও দলের মধ্যে প্রশ্ন ওঠায় সুব্রতকে প্রার্থী করা হয়নি।[৯৬] ফলে মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর এই সময় রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১২ মার্চ ২০১৪ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় হেড লাইন হয়, "জ্যোতিপ্রিয়র উপস্থিতিতে বরফ গলল কপিলের হয়ে প্রচারে নামছেন মঞ্জুল"। মঞ্চে দুই ভাইকে পাশে বসিয়ে জ্যোতিপ্রিয় মঞ্জুলকে বলেন, "গাইঘাটা এলাকায় কপিলবাবুর হয়ে প্রচারের দায়িত্ব আপনি নেবেন। কত বেশি ভোটে ওঁকে জয়ী করা যায়, সে জন্য যা যা করার আপনিই ঠিক করবেন। মঞ্জুলও সম্মতি জানিয়ে বলেন, আমি দাদার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে নেব। তখন কপিল বাবু বলেন, ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেই প্রচারে নামব। মঞ্চে বসেই দুইভায়ের আলাপআলোচনা করে বলেন, এটা আমাদের পারিবারিক সম্মানের বিষয়, কাজে সুব্রতও আমরা সকলে মিলেই নির্বাচনে প্রচার করব। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের আশঙ্কা ছিল পারিবারিক সমস্যার কারণে নির্বাচনে প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নেতৃত্বে সেই মেঘ কাটল।[৯৭] সাময়িক সময়ের জন্য ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক সমস্যা মিটলেও স্থায়ীভাবে সমস্যা মেটে না। এর কারণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র থেকে কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর নির্বাচনে জয়ী হন। কিন্তু ২০১৪ সালের ১৩ অক্টোবর কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর প্রয়াত হলে ১০১৫ সালে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘোষণা হলে সুব্রত ঠাকুর আবার প্রার্থী হওয়ার জন্য তৃণমূলের কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন। এবারেও তৃণমূল কংগ্রেস তাকে প্রার্থী না করে প্রয়াত কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরে পত্নী শ্রীমতী মমতা বালা ঠাকুরকে প্রার্থী করেন। আবার এর আগেই বড়মা কপিল বাবুর

মৃত্যুর পরেই সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতির পদে মনোনীত করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী মমতা ঠাকুরকে।[৭৮] ফলে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুর তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে বি.জে.পিতে যোগ দেন। সুব্রত বি.জে.পির টিকিটে প্রার্থী হয়ে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন এবং নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে মমতা ঠাকুর জয় পায় ও সুব্রত ঠাকুর তৃতীয় স্থান পান। এই নির্বাচনে শুধুমাত্র ঠাকুরবাড়ির পারিপারিক বিচ্ছেদ ঘটেনি সমগ্র নমঃশূদ্র মতুয়া সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন আড়াআড়ি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। দীর্ঘদিনের মতুয়া তথা নমঃশূদ্রদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন ভাগ হওয়ার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তাদেরকে ব্যবহার করতে নেমে পড়েন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই ধরে নেওয়ার কারণ হল, ঠাকুর বাড়ির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম হলেন, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। তিনি তার রাজনৈতিক জীবনে প্রথমে কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতি করে এম.এল.সি হয়েছিলেন, আবার ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়ে এম.এল.সি হয়ে গণপরিষদে গিয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কংগ্রেসের টিকিটে এম.এল.এ হয় এবং মন্ত্রীও হন। আবার এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেসে যোগ দেন এবং বাংলা কংগ্রেস ত্যাগ করে আবার জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। কাজেই তার রাজনৈতিক জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ সময়ের নিরিখে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করেছেন। ১৯৮০ দশকে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সন্ন্যাস নিয়ে মতুয়া মহাসংঘকে রাজনৈতিক মুক্ত সংগঠন করে সামাজিক আন্দোলনে নিয়োজিত করেন। ১৯৯০ সালে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের মৃত্যু হলে তার বড় ছেলে কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর সারাভারত মতুয়া মহাসংঘের দায়িত্ব নিয়ে বড়মার সহযোগিতায় ২০১১ সাল পর্যন্ত ঠাকুরবাড়িকে রাজনৈতিক মুক্ত রেখেছিলেন। ১৯৯০ এর দশক থেকেই মতুয়া মহাসংঘের সাংগঠনিক ঐক্য নমঃশূদ্র ও অন্যান্য দলিত জাতির মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করায় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে 'সামাজিক চাপ সৃষ্টিকারী পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর সংগঠনে পরিণত হয়' কাজেই নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় নমঃশূদ্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বৃহত্তর ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে সমাদর ও গুরুত্ব পায় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নিকটে। ফলে বামপন্থী শাসনকালে নমঃশূদ্ররা কোর কমিটিতে না থাকলে মতুয়া প্রভাবিত নমঃশূদ্ররা পঞ্চায়েত স্তরে নেতৃত্বের ভূমিকা রাখতে পেরেছে। ঠাকুরবাড়ির রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কারণে মতুয়াদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এবারে আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে নিম্নে আলোচনা করব।

নমঃশূদ্রদের মতো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দেরও রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর তেমন কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই বললেই চলে। তবে নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাধান্য পেয়েছে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও নাগরিকত্ব নিয়ে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বাস্তু বা পুনর্বাসন সমস্যা নিয়ে তেমন কোন প্রধান্য পায়নি। যদিও নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক আন্দোলন শাসক দলের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেই মিলেমিশে বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে। দেশভাগের পরে নমঃশূদ্ররা যেমন বসতি স্থাপন করা নিয়ে দিশাহীন হয়ে পড়েছিল পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে তেমন পরিস্থিতি ছিল না বললেই চলেই। পৌণ্ড্ররা আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কলকতার নিকটবর্তী জেলা ২৪ পরগনায় বসবাস করতেন। সামান্য কিছুসংখ্যক মানুষ খুলনা থেকে উঠে এসে নদীয়া ও ২৪ পরগনায় উদ্বাস্তু হয়ে বসবাস করেন। কাজেই পৌণ্ড্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নমঃশূদ্রদের মতন ছিল না। ফলে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্বে যে তিন জন তপসিলি মন্ত্রী ছিলেন তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র নস্কর (পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়), রাধানাথ দাস (দাগদি) এবং মোহিনীমোহন বর্মন (রাজবংশী) এই মন্ত্রী সভায় কোন নমঃশূদ্র প্রতিনিধি ছিলেন না। কাজেই বলা যায় নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর দেশভাগের প্রভাবটা পড়েছিল ব্যাপক হারে। আবার ২৩ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে ডাঃ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করলে ১৩ জন মন্ত্রী নিয়ে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেন। নতুন মন্ত্রী সভায় দুজন তপসিলি মন্ত্রী হন, তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র নস্কর ও মোহিণীমোহন বর্মন উক্ত মন্ত্রীসভা কার্যকর থাকে ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত।[৯৯] যে হেমচন্দ্র নস্কর এক সময় তপসিলিদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন, তিনি আবার ৪০ এর দশকের গোঁড়া থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনে চলে এসে মন্ত্রী হলেন। ফলত পৌণ্ড্রদের মধ্যে এই সময় থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হয়েই অধিকাংশ নেতা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫২ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত ২৪ পরগনা জেলায় পৌণ্ড্র জাতির নেতারা দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার আগে যে একটা জাতি চেতনার রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল তা থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পরে

অনেকটা সরে আসেন তাঁরা। এই সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে আন্দোলন করেন। যেমন আই.এন.সি. (Indian National Congress), সি.পি. আই. (Communist Party of India), আর.এস.পি. (Revolutionary Socialist Party), এম.এফ.বি. (Marxist Forward Block), এফ.বি. (Forward Block), পি.এস.পি. (Praja Socialist Party), কে.এম.পি.পি. (Kisan Mazdoor Praja Party)। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে থেকে কংগ্রেসের হয়ে ৬০% এবং কে.এম.পি.পি হয়ে ২০%, সি.পি.আই ও নির্দল হয়ে ১০% জনগণ রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিলেন।[১০০] পৌণ্ড্রদের অধিকাংশ নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে থাকলেও কিছুসংখ্যক নেতৃত্ব বামপন্থীদের হয়েও রাজনৈতিক আন্দোলন করেন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতিগত ঐক্যবদ্ধ করণ নিমিত্তে ১৯৫১ সালে এপ্রিল মাসে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব' পত্রিকা দিগম্বর সরদারের নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়। দেশ স্বাধীনতা লাভের পরে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামাজিক তথা রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাসিক রূপে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে প্রত্যেক মাসের শেষে। বাংলা ভাষায় প্রকাশকের দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ সনৎকুমার সরদার যিনি রাইচরণ সরদারের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৯৫২ সালে ডাঃ সনৎকুমার 'সরদার' পদবী পরিবর্তন করে 'বর্মন' পদবী ব্যবহার করেন।[১০১] পৌণ্ড্র জাতির মধ্যে সরদার পদবী থেকে বর্মন পদবী অনেকটা সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবে সম্মানের বলে তাঁরা মনে করেন।

'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব' পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা নির্মলেন্দু বর্মন বেলুড়ের বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পরিচালনার সুবিধার্থে ১০ বিঘা জমিদানের কথা। আবার এই পত্রিকার মধ্যে সমাজ থেকে মাদক দ্রব্য বর্জনে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবী করা হয়, ডাকযোগে বস্ত্রাদি আদান – প্রদান নিষিদ্ধ দাবী করা হয়, মাস্টার ডিগ্রীর পরীক্ষার তারিখ, রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুর মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজের স্বামী বিরজানন্দের প্রয়াণ সংবাদ, গ্রামীণ রাস্তাঘাটের উন্নতির সংবাদ প্রকাশ করা হত।[১০২] নমঃশূদ্রদের পত্র-পত্রিকাতে যেমন শুধুমাত্র নিম্নজাতের ও নিজের জাতের শিক্ষা ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির দাবীদাওয়া নিয়ে লেখাপত্র আমরা পেয়েছি। পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে যেমন এই সময় সমাজের নিম্নবর্ণের উন্নতির কথা পাওয়া গেল আবার বিদ্যামন্দিরের মান উন্নয়নে পৌণ্ড্রদের জমিদারের মাধ্যমেও তাঁরা সমাজের

সর্বস্তরের শিক্ষা প্রসারের অগ্রসরের কথাও আমরা জানতে পারলাম। পৌণ্ড্রদের মধ্যে জাতিগত উন্নয়নের মাধ্যমে জাতি চেতনার রাজনৈতিক আন্দোলন নমঃশূদ্রদের মতন সচেতনতার অভাব লক্ষ করা যায়। নমঃশূদ্ররা যেখানেই উদ্বাস্তু হয়ে বসতি স্থাপন করেছেন, সেখানেই তাঁরা নিজের মধ্যে থেকে চাঁদা তুলে বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা অর্জনে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে তাঁদের মধ্যে একটা জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলন সব সময় কমবেশি সক্রিয় থেকেছে। কিন্তু 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব' পত্রিকায় নানা সময়ে নানা বিষয়ে লেখার ধরণ পাল্টে গেছে, যেমন, পৌণ্ড্রদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের নিমিত্তে অতীত গৌরবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে বারবার। পত্রিকার পরিচালক কমিটির সকলেই পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্বে বিশ্বাস করতেন এবং তা প্রমাণ করার জন্য হিন্দু মহাকাব্যের অংশ তুলেও ধরতেন। আবার ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রসঙ্গ ও নির্বাচনে পৌণ্ড্রদের প্রতিনিধিত্বের জয়ের ও অংশগ্রহণের কোথাও তুলে ধরা হয়েছে। সম্পাদক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের উচ্চশিক্ষার অবস্থা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন, এ প্রসঙ্গে তিনি অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তুলে ধরে "চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট জাতির এই নিম্নগতির দৃষ্টি আকর্ষণ' করার প্রচেষ্টা করেন।[১০৩] পত্রিকার মাধ্যেও পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় হওয়ার দাবী বারবার করেছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকটও দাবী তুলে ধরা হয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নিকট পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদাওয়া পেশ করেও কোন লাভ হয়নি। যা ঊনিশ শতকের শেষ দিক থেকে পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন শুরু করেও ব্রাহ্মণ্যবাদের চক্রান্তের কারণেই তাঁরা দলিত অবদমিত জাতি হিসাবেই থেকে যায় বলে পৌণ্ড্রদের দাবী।

'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব, স্বজাতি- সেবক মাসিক পত্রিকার "কভারে ছাপা হত মহাভারতের কাহিনীর একটি দৃশ্য, যা শ্রীমদ্ভগবতীর ভাবনার সঙ্গেই বেশি সাযুজ্যপূর্ণ। ছবির বিষয়: কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি রূপে রথাশ্বচালনায় নিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের যোড়হস্ত অর্জুনের উপদেশ দান। উপদেশটির বামপাশে এভাবে লেখা:

ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যাত।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং তক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ।।

আর থাকত টাইটেল পেজের উপরে 'শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ' উচ্চারণে ইস্টদেবতার প্রতি নমস্ক্রিয়া"।[১০৪] ফলে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, পত্রিকার

কোথাও কোথাও বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদের জন্য তাঁরা ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয়ে পরিচিত হতে পাড়ছেন না। আবার দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী মহাকাব্যের ক্ষত্রিয় শক্তির মন্ত্র উল্লেখ করে নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় দেওয়া চেষ্টা করেন। পৌণ্ড্রদের শিক্ষিত মানুষেরা মনে করেন তাঁদের সামাজিক সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদ। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ মানুষ মনে করেন ক্ষত্রিয় জাতির পরিচয় পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাঁধা হল ব্রামণ্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। তাদের মনে করার কারণ সরকার পক্ষের রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতৃত্বে সব সময় দেখা যায় উচ্চবর্ণের মানুষের, আবার এদের মধ্যে সিংহভাগ নেতৃত্ব হলেন ব্রাহ্মণ জাতির মানুষ। তাইতো পৌণ্ড্রদের শিক্ষিত সমাজ মনে করেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ত্ব পাওয়া সম্ভব নয়। এর কারণ হল ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় বিখ্যাত পৌণ্ড্র জাতির প্রাক্তন কোলকাতার মেয়র ও মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর থাকা সত্ত্বেও পোদ/ পৌণ্ড্র থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয়ে পরিচিত করতে পারেন নি। তাইতো তাঁরা শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই ক্ষত্রিয়ত্ব পাবে বলে মনে করেন। কিন্তু পৌণ্ড্রদের মধ্যে এই সময় পর্যন্ত নমঃশূদ্রদের মতন কোন ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন লক্ষ্য করা যায় না।

পৌণ্ড্রদের মধ্যে সামাজিক আন্দোলন না গড়ে ওঠার করণ হল, "পৌণ্ড্র সমাজের নেতা শ্রীযুক্ত ক্ষীরোধবাবু ৫ আষাঢ় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বলেন, প্রায় ১৫ দিনব্যাপী অত্যাধিক বর্ষায় এবং হঠাৎ উপনয়ন সংস্কার শুভকার্য্য হওয়ায় সকল স্থানে যথাকালে যথোপযুক্তভাবে পঁহুছাইতে পারা যায় নাই। তা সত্ত্বেও ৫৬ জন পৌণ্ড্র উপবীত গ্রহণ করেন, ১০ জন কুলীন উপবীতদাতা আচার্য্যগুরু ও পুরোহিতগণ হইতে। পূর্ব হইতে সুবন্দোবস্ত করিতে ও জানাইয়া দিতে পারিলে আরও বহু লোক উপবীত গ্রহণ করিতেন। এখন চতুর্দ্দিক শত শত ব্যক্তির আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে। আগামী মাঘ বা ফাল্গুন মাসে পুনর্বার উপনয়ন সংস্কারের বৃহৎ আকারে ব্যবস্থা করা হইতেছে। যাঁহাদের উপবীত গ্রহণে আগ্রহ ও বাঞ্ছা আছে তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইবেন। ওঁ শান্তি"।[১০৫] পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের আশায় ব্রাহ্মণ গুরুদের দ্বারা উপনয়ণ ধারণ করে হিন্দু সমাজে নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় প্রমাণের দাবিদার হওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ভারতে নিম্নবর্ণের সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে এর প্রমাণ বহু আছে। পৌণ্ড্রদের শিক্ষিত তথা বেশিরভাগ মানুষই মনে করে ব্রাহ্মণ্যবাদী রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে সামাজিক

আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। আবার আমরা দেখতে পেলাম নমঃশূদ্রদের মতুয়া আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মীয় আচার – আচরন পালন করার ক্ষেত্রে তাঁরা ব্রাহ্মণতন্ত্রের রীতিনীতি ত্যাগ করেন। ফলে তাঁদের সামাজিক আন্দোলন সব সময় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে। এটা হওয়ার কারণ আছে, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর নিজের বংশকে মৈথলী ব্রাহ্মণ বংশের বলে দাবী করেছেন। প্রচলিত ধর্মীয় মতে নমঃশূদ্রদের চণ্ডাল ও চাঁড়াল বলা হয়ে থাকে। চণ্ডালদের বংশ পরিচয় কি ভাবে আমাদের সমাজে প্রচলিত করেছেন,

"শূদ্র বীর্য্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম লয়।
চণ্ডাল (চাঁড়াল) যার দোষে পতিত হয়।।
ব্রাহ্মণীয় গর্ভজাত বলে এই জন।
সে জন্য দশ দিন করে অশৌচ গ্রহণ।।
জল পাত্রাদি রহিত করিবে, কেননা।
মার্জ্জন করে দিলেও পরিশুদ্ধ হয় না"।।[১০৬]

কাজেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নমঃশূদ্রদের শিক্ষিত একটা বড় অংশ মনে করে তাঁরা ব্রাহ্মণ বংশের, আরেকটা অংশ মনে করেন তারা হীন পতিত চণ্ডাল। ফলে এঁদের উচ্চজাতির পরিচয় বহন করা থেকে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে জাতিগত সুযোগ সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছনোর রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা। আর পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জনের জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্ট রীতিনীতি পালনের মাধ্যমে প্রথাগত রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা।

তবে আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৫০'র দশকে পৌণ্ড্রদের অধিকাংশ রাজনৈতিক আন্দোলন চলেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। এ সম্পর্কে আমরা কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরব। স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত বিধায়ক কৌস্তভকান্তি করণ তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। সর্বভারতীয় কল্যানের রাজনীতিকে পাথেও করে তাঁর সমাজের ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। "শ্রীকরণ কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্য হইলেও আপন ব্যবহার মাধুর্য্যে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁহার মানসদৃষ্টিভঙ্গি ছিল উচ্চস্তরের। তিনি সমষ্টির মঙ্গলচিন্তায় সদাতৎপর থাকিতেন এবং দ্ব্যর্থহীনভাষায় তাঁদের কল্যানের

পথনির্দেশ করিতেন। সমষ্টির কল্যানের জন্য তিনি ব্যক্তগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া ক্ষয় – ক্ষতি স্বীকার করিতে কখনও দ্বিধাবোধ করেন নাই”।[১০৭] পৌণ্ড্র- মনীষা ৪র্থ খণ্ড থেকে আমরা উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তির গুনের কথা জানতে পারলাম। কিন্তু আমাদের বলে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক সচেতনতার মধ্যেই যে রাজনৈতিক আন্দোলন করে নিজজাতির সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি করা যায় তা কৌস্তভকান্তি করণের রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রদের লেখায় উঠে এসেছে। তপসিলি পৌণ্ড্রদের বেশির ভাগ নেতাই মনে করেন যে, ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণেই তাঁরা সমাজে রাজনৈতিক ভাবে হীন হয়ে থাকেন, তা ভুল প্রমানিত হয় করণ বাবুর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাবোধের মাধ্যমে। অর্থাৎ বলা যেতেই পারে ব্রাহ্মণ্যবাদের উপর সব সময় দোষ না চাপিয়ে পৌণ্ড্র তথা পশ্চিমবঙ্গের তপসিলিদের উন্নত রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেই নিজ জাতির ও পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষের উন্নতি হবে বলে আশা করা যেতেই পারে। আবার আমাদের একথাও উল্লেখ করতে হয় যে, হয়তো করণ বাবুর পক্ষে উক্ত চেতনাবোধের জাগরণ ঘটেছিল কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে। করণ বাবুর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বপক্ষের যুক্তি হিসাবে পৌণ্ড্র মনীষা ৪র্থ খণ্ড থেকে আমরা আরেকটি উক্তি তুলে ধরব, “তাঁহার সামাজিকতাবোধ ছিল অসাধারণ। বহুকাল হইতেই তিনি কঠোর সংগ্রাম করিয়া জীবনের পথে অগ্রসরমান ছিলেন। তাঁরার মধ্যে স্বাধীনচিত্ততা রাজনৈতিকবোধ ও বিশ্লেষণী বিচারশক্তি, চারিত্রিক মাধুর্য্য, নিঃস্বার্থপরতা, সত্যনিষ্ঠা সমবেদনশীলাদি বিবিধ সদগুণের সমাবেশ ঘটিয়েছিল”।[১০৮] বলা যেতে পারে যে, করণ বাবুর ক্ষেত্রে কোন প্রকার রাজনৈতিক সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়নি। তেমনিভাবেই বলা যায় রাজনৈতিক আন্দোলন অংশগ্রহণ করতে হলে সব সময় রাজনৈতিক সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়।

১৯৫৫ সালের ১৫ জানুয়ারি বঙ্গীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্র সমিতির উদ্যোগে গিরিশ মেমোরিয়াল হলে শ্রীপরেশনাথ কয়ালের সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। জানুয়ারি মাসের সভায় ছাত্র সমিতির সম্পাদক শ্রীশক্তিকুমার সরকার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বিশিষ্ট নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী পতিরাম রায় ওঃ কৌস্তভকান্তি করণের অকাল মৃত্যুতে দেশের ও জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, “শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদিগকে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে আহ্বান জানান এবং স্ত্রীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন”।[১০৯] আবার সমিতির

সভাপতি শ্রী চারুমোহন সরকার উল্লেখ করেন, এই ভাবে, " সামাজিক জীবনে আত্ম – সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং অতীতের কার্য্যকলাপ চিন্তা করিয়া বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ সামাজিক ও দেশজীবন গঠনের অনুরোধ জানান। তিনি "পোদ" নামটীর পরিবর্ত্তে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নামটী বৈধ করার যুক্তি দেখান এবং "দরিদ্র ছাত্রসপ্তাহ" পালন করিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার সমাজসেবার মাধ্যমে অনগ্রসর সমাজজীবনকে উন্নত করিবার জন্য আহ্বান জানান"।[১১০] নারীশিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি রাজনৈতিক আন্দোলন বিপুল মানুষের অংশগ্রহণ হবে, তাঁরা আশা করেন। কিন্তু নমঃশূদ্রদের মধ্যে এই নারীশিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলন ১৮৭০ দশক থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

সে যাইহোক উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত ও সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়।

১। "নিখিল বঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্রসমিতির ত্রয়োদশ অধিবেশনে, তপসিলি ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। এই ছাত্রাবাসের অভাবে তপসিলি সমাজের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা লাভের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া আছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে অনগ্রসর সমাজের ছাত্রদের জন্য নূতন ছাত্রাবাস নির্মাণ করিতে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে অধিকতর সুযোগ সুবিধা ও ছাত্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

২। এই অধিবেশন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রতি অবহেলাজনিত ব্যবহার বিশেষতঃ "পোদ" নামটির স্থলে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নামটি স্বীকার না করার জন্য দুঃখবোধ করিতেছি এবং অবিলম্বে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নামটা আইনতঃ সিদ্ধ করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি"।[১১১] এই সময় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান পরিবৃত্ত হয়ে দাঁড়ায় ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের ভিত্তিভূমি। আর নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্রে সামাজিক তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান পরিবৃত্ত ছিল উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করা।

এই সময় 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নামের বৈধ করণ করার জন্য "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নাম বৈধ করণ কমিটি" থেকে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করা হয়। আবেদনের বঙ্গীয় অনুবাদটা নিম্নে তুলে ধরা হল।

"মাননীয় রাষ্ট্রপতি - ভারতীয় ইউনিয়ন - নিউ দিল্লি।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গের ছয় লক্ষ অবহেলিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পক্ষ হইতে আমরা এই আবেদন পত্রখনি আপনার সুবিবেচনার ও জরুরী সুবিজ্ঞ হস্তক্ষেপের জন্য আপনার নিকট পেশ করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের তপসিলিভুক্ত অন্যতম 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' জাতিকে 'পোদ' এই নামে বিকৃত করিয়া রেকর্ডে দেখান হইয়াছে। তাহার ফলে আজকাল এই উন্নত যুগে আমরা হাটে বাজারে গ্রামে নগরেও জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নামের দ্বারা অভিহিত ও অপমানিত হই। তালিকাভুক্ত এই শব্দটি অশ্লীল ও অপমানের অর্থবহ। ইহা ভেদবুদ্ধি চালিত ও অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের ক্রমবর্ধমান তিক্ততা সৃষ্টি করিতেছে। আরও এই শব্দটি মনোবিজ্ঞানের গূঢ়রেষা (সাইকোলজিক্যাল কমপ্লেকস) জনিত চাপের সাহায্য করায় এই অনগ্রসর জাতির পরিপন্থীরূপে কার্য্য করিতেছে।

জাতির সর্ব্বধিক অনগ্রসরতার বিষয় বিবেচনা করিয়া সরকার সুবিবেচনা – প্রসূত হইয়া এই জাতির তপসিলি জাতিভুক্ত করিয়াছেন ও তদনুযায়ী উন্নতির জন্য আইনানুগ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু জাতির এই নামটি সংশোধন সুবিবেচক প্রার্থনা করিয়া এবং বহু বৎসর যাবৎ অপসারণের চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা সর্বদা এই বিদ্রুপকর নামটির ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও অসহায় বোধ করিতেছে।

অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির বাস্তব ভিত্তি মানবীয় ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। যাহাতে এই জাতিসমূহ উচ্চ শ্রেণী হইতে মানবীয় অধিকার পায়, এই উদ্দেশ্যে সরকার অস্পৃশ্যতা নিবারণ ইত্যাদি বহুবিধ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' এই জাতির আদি নাম এবং ইহা 'পোদ' রূপে রেকর্ড ভুক্ত করা হইয়াছে এবং সেই জন্য এই বিদ্রুপকর নামটি পরিবর্তনের অনুরোধ করিতেছি। এই 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নামটি বিজ্ঞান ও ইতিসাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও 'পোদ' শব্দটি 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' ভাষাতত্ত্বের বিকৃতরূপ। 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নামটি বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতির নামের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত নয়।

এই অবস্থায় আমরা প্রায় পাঁচ হাজার স্বাক্ষর যুক্ত আবেদন পত্র (প্রত্যেকের জন্য পৃথক ভাবে) বিভিন্ন জেলা ও থানা হইতে (পৃথকভাবে দেখান) আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি এবং আমাদের জাতীয় ও প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে সাম্য

ও সুবিচার প্রত্যাশায় আমাদের এই 'পোদ' নামটি 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' রূপে বৈধ করণের জন্য আপনার সদাশয় জরুরী হস্তক্ষেপের আশা করিতেছি।

বিনিত
শ্রী শক্তিকুমার সরকার (সম্পাদক)
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নাম বৈধকরণ কমিটি"।[১১২]

বলা যেতে পারে যে, পোদ বা পৌণ্ড্রদের নামের পরিবর্তন করণটা এখন সম্ভব হয় নি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সাব কাস্ট হিসাবে সরকারি দলিল ও তাঁদের জাতিগত পরিচয় পত্রে এবং জনগণার নথিও লেখা হয় না, বরং পোদ বা পৌণ্ড্র লেখা হয়। ফলে তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়েও রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেও জাতির নামের বৈধ করণ করার দিকে গিয়েও কোন সমাধান করতে পারে নি।

১৯৫৫ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী হাওড়ায় রাজনৈতিক সম্মেলনে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পৌণ্ড্র তথা অন্যান্য তপসিলি জাতির উপর কংগ্রেস গুরুত্ব দেয়। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। সারা পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির প্রতিনিধি ও কংগ্রেসের নেতৃগণ সম্মেলনে যোগদান করে বেশ কিছু পৌণ্ড্রদের তথা তপসিলি জাতির উন্নয়ন কল্পে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের তপসিলি জাতির মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বিশেষ ভূমিকা ছিল। উক্ত সম্মেলনে প্রধানত "অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, অর্থিক উন্নতি, শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতি, সরকারি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও সীমান্ত রক্ষীদলে তপসিলিদের নিয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়"।[১১৩] সম্মেলনে প্রায় সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় তপসিলিদের উন্নতির প্রেক্ষাপট নিয়ে। তবে বলা যেতে পারে তপসিলিদের মধ্যে কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক আন্দোলন তখনকার সময় বেশ প্রশংসা পায় এবং এটা সম্ভব হয়েছিল নিখিল বঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্রসমিতির ঐক্যবদ্ধ সমাবেশের ও সম্মেলনের ফলে। এই সময় ভারতের রাজনৈতিক বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস সত্যিই যদি দলের কর্ম সূচীতে নিরপেক্ষভাবে তপসিলি হিন্দুদের শিক্ষা – দীক্ষা ও অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সমপর্যায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে তাহলে হয়তো মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বিরাট সংখ্যক তপসিলি জাতির মানুষের রাজনৈতিক আন্দোলনের পৃথক কোন দল থাকত না বলে আমরা মনে করতে পারি। তাইতো দেখা যায় পৌণ্ড্রদের মধ্যে **১৯৬৭**

সালের আগে পর্যন্ত বেশির ভাগ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল কংগ্রেসি রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবেই।

যদিও পৌণ্ড্রদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ ষাটের দশকের গোঁড়া থেকেই বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিলেন। নমঃশূদ্রদের মধ্যে এই সময় দেখা যায় অধিকাংশ মানুষই কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেই উদ্বাস্তু ও রাজনৈতিক আন্দোলন করত। কিন্তু পৌণ্ড্রদের মধ্যে বামপন্থী চেতনার উন্মেষ নমঃশূদ্রদের থেকে অনেকটা আগেই ঘটে যায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল ষাটের দশকেই। কাজেই গরিব কৃষিজীবী পৌণ্ড্রদের মধ্যে বামদের রাজনৈতিক আদর্শ বেশ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। যদিও ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বামপন্থীদের মধ্যে নানাবিধ মতপার্থক্যের কারণে রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ভাগ হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফলে ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ২৪ পরগনার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত সংরক্ষিত ১২ টি আসনে মধ্যে কংগ্রেস জয় পায় ১ টি আসনে, সি.পি.আই.এম জয় পায় ৪ টি আসনে, এস.ইউ.সি ১ টি আসনে, এস.এস.পি ১ টি আসনে, বাংলা কংগ্রেস ৩ টি আসনে, জনসংঙ্ঘ ১ টি আসনে, নির্দল ১ টি আসনে জয় পায়।[114] ফলে আমরা বলতে পারি যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব এই সময় ছিল ব্যাপক। এই সময় থেকেই পৌণ্ড্রদের মধ্যে আঞ্চলিক বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও রাজনৈতিক আন্দোলন করার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে যা আমরা নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখতে পাইনি। নমঃশূদ্রদের মধ্যে একটা অংশের মানুষ সি.পি.আই ও সি.পি.আই.এম. এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করেছে, কিন্তু আর.এস.পি. ও এস.ইউ.সির হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করতে দেখা যায়নি। পৌণ্ড্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে ছিল সি.পি.আই, সি.পি.আই.এম, আর.এস.পি এবং এস.ইউ.সির রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে বিপুল সমর্থন জানায়। আর এই সময় নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে অধিক ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের আন্দোলন নিয়ে। যাইহোক পৌণ্ড্রদের মধ্যে জাতিগত রাজনৈতিক চেতনা থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে অধিক অংশগ্রহণ ছিল।

বামেদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে পৌণ্ড্রদের মেলবন্ধনের ফলেই ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ১৭ জন জয়ী বিধায়কের মধ্যে মাত্র ১ জন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে জয়ী হয়। সি.পি.আই. এম জয় পায় ৭ টি আসনে, আর.এস.পি জয় পায় ১ টি আসনে, এস.ইউ.সি জয় পায় ৩ টি আসনে, এস.এস.পি ১ টি আসনে, সি.পি.আই ১ টি আসনে, এবং বাংলা কংগ্রেস জয় পায় ৩ টি আসনে।[১১৫] মূলত পৌণ্ড্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিমুখ হয়ে পরে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে। উক্ত নির্বাচনে সি.পি.আই.এম তথা অধিকাংশ বামপন্থী দল নির্বাচনী ইস্তাহারে ‘শ্রেণী সংগ্রাম’ এবং ‘ভূমি সংস্কারে’র জন্য তাঁদের নির্বাচনী প্রচার করার নতুন ক্ষমতা পেয়ে যায়। এই সময় সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬৭ – ১৯৭০ সালের মধ্যে বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রায় ১ মিলিয়ন একর জমি খাস করতে সক্ষম হয়েছিল।[১১৬] উক্ত নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের তপসিলিদের মধ্যে দুটি বিপরীতার্থক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। কাজেই ভূমিহীন তপসিলি জাতির কৃষকদের একাংশ জমির মালিকানা পায় অন্যদিকে, বিত্তবান কৃষকদের একাংশ ভূমি সংস্কার নীতির বিরোধীতা করেন।[১১৭] আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, পৌণ্ড্রদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জমিদার ও কৃষি জমির মালিক ছিলেন, ফলে তাঁরা ভূমি সংস্কার নীতির বিরোধিতা করে। বহুসংখ্যক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ গরিব কৃষকগণ বামেদের ভূমি সংস্কার নীতির পক্ষে সওয়াল করে রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিল।

ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পৌণ্ড্রদের মধ্যে ১৯৬৯, ৭১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ব্যাপক হারে পড়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের পরে জাতীয় রাজনীতিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া ফলে ১৯৭২ সালের নির্বাচনে ১৫ জন বিধায়কের মধ্যে ১০ জন বিধায়ক কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়। সি.পি.আই.এমের ৩ জন বিধায়ক জয়ী হয় এবং সি.পি.আই’র ২ জন বিধায়ক জয় পায়।[১১৮] ফলে বলা যেতে পারে নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রদের মধ্যেও রাজনৈতিক ভাবে বামপন্থীর ভিত এই সময় নড়বড়েই ছিল। উক্ত নির্বাচনে অধিকাংশ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মানুষ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অধিকাংশ মানুষ এই সময় যদিও কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিল। কিন্তু দেশের জাতীয় রাজনীতি তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দ্রুত একটা বদল

আনার নিমিত্তে জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে ঐক্যস্থপনের চেষ্টা করে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, জয়প্রকাশ নারায়ণ বিহারের রাজনীতির প্রেক্ষাপটের বাইরে বেড়িয়ে এসে জাতীয় স্তরের রাজনীতির ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেস সরকার ও ইন্দিরা গান্ধীর অপসারণের দাবিতে দেশ জুড়ে এক আন্দোলন শুরু করবেন। ইন্দিরা গান্ধী এই সময়ে গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদস্বরূপ এবং দুর্নীতির উৎসমুখ বলে জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। দেশের যে প্রান্তেই তিনি প্রচার করতে গিয়েছিলেন সেখানেই বিপুল লোক হতে লাগল, বিশেষ করে দিল্লিতে এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানে, যেগুলো জনসংঘ বা সোশ্যালিস্টদের শক্ত ঘাটি ছিল। প্রধানত ছাত্র, মধ্যশ্রেণী, মাঝারি ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত সমাজের এক অংশের কাছ থেকে জয়প্রকাশের আন্দোলন বিপুল সমর্থন পায়। এ ছাড়াও প্রায় সব অ-বাম রাজনৈতিক দলই তাঁকে সমর্থন জানায়। এই সকল দলগুলি ১৯৭১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের নিকট পর্যদুস্ত হয়েছিল। তারাই জয়প্রকাশ নারায়ণের মধ্যে একজন জনপ্রিয় নেতা খুজে পায় যাঁর দৌলতে পরাজিত দলগুলি কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা জনসাধারণের নিকট থেকে অর্জন করতে পারবে বলে মনে করেন। আবার জে পি-ও ভাবলেন ঐক্যবদ্ধ বহুদলীয় সংগঠন না থাকলেও কংগ্রেসকে পরাজিত করা যাবে না।[১১৯] জে পি-র এই জনপ্রিয় আন্দোলনের পশ্চাতের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ১৯৭১ – ১৯৭৪ সালের মধ্যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মিশ্র অর্থনীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিনি পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রয়াত্ব ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বেশ কিছু নীতি গ্রহণ করেন, যা বাস্তবায়নে অক্ষম হয়। কাজেই বিরোধীরা ইন্দিরা গান্ধীর অক্ষমতা তুলে জনসাধারণ সামনে তুলে ধরে সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করে।[১২০] বলা যেতে পারে যে, জে পি-র আন্দোলনের এই উন্মাদণ বেশিদিন স্থায়ী হল না। ১৯৭৪ সালে শেষ দিক নাগাদ তাতে ভাটা পড়তে শুরু করে। ছাত্র সমাজ এবং শহরে গরিব মানুষদের বেশিদিন ধরে রাখতে পারলেন না। উক্ত আন্দোলনকে ইন্দিরা গান্ধী সাংসদ বহির্ভূত ধারাকে নিন্দা করে জে পি-কে আগামী নির্বাচনে বিহারে এবং দেশের সর্বত্রে উভয়ের শক্তিপরীক্ষার আহ্বান জানান।

উক্ত আন্দোলন ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল, এই সময়ের মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ কংগ্রেস বিরোধী জাতীয় স্তরের বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণ হিসাবে বসন্ত কুমার মণ্ডলের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, “আচার্য বিনোবাভাবে প্রবর্তিত ভূদান আন্দোলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অগ্রণী ভূমিকা

প্রশংসনীয়। যদিও ভূদান আন্দোলন অনেক স্পর্শকাতর মনে অস্পষ্টতার ইঙ্গিত এবং পশ্চিমবঙ্গে তার সার্থক রূপায়ন তেমনভাবে হয়নি তবুও জনমানসে ভূদান আন্দোলন রেখাপাত করেছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। পদব্রজে বিনোবাজীর সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের একনিষ্ঠ সেবকগণ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রাম ভূদান আন্দোলনের গ্রাম দান তালিকায় নথিভুক্ত হয়ে আছে। কাকদ্বীপ অঞ্চলের মধুসূদনপুর গ্রামের পল্লীকবি কিশোরী মোহন নস্কর সর্বোদয়ের একজন সংগঠক। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা এবং নিষ্ঠায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সংগঠন সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে। মধুসূদনপুর গ্রামটিও গ্রাম দানের তালিকায় নথিভুক্ত হয়ে আছে। পিছিয়ে পড়া মানুষের গ্রাম মধুসূদনপুরে খাদি মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। মুম্বাইয়ের ঘাটকোপরে সর্বোদয়ের প্রধান কার্যালয়ে কর্মী সম্মেলনে তিনি একাধিকবার যোগদান করেছেন। দেওনার কশাইখানা বারবার অবরোধ করেছেন। রামেশ্বরপুরের রেণুপদ কয়াল, জেলেবাড়ির বসন্তকুমার হালদার, মেদিনীপুরের ঈশানদাস অধিকারী, বিমল অধিকারী, প্রভাসচন্দ্র মিদ্দা আরও অনেকে তাঁর সহযাত্রী এবং সর্বোদয় ভাই”।[১২১] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নেপথ্য রয়েছে তাঁদের নিজস্ব ভূমি থাকার জন্য। আর নমঃশূদ্রদের যে নিজস্ব ভূমি তেমন না থাকার দরুন উক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি বলে মনে করা যেতে পারে। আবার পৌণ্ড্রদের ভূদান আন্দোলন ও বামপন্থীদের ভূমি সংস্কার নীতি এবং অতীতে কংসারি হালদারের তেভাগা আন্দোলনের ভূমিকা পৌণ্ড্র জনমনে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন এই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেশ ভূমিকা রাখে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে পৌণ্ড্ররা বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একযোগে কংগ্রেস সরকারের পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। এই নির্বাচনে ১৭ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রার্থী জয়ী হন এবং তাঁরা সকলেই বামপন্থী দলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন।[১২২] কাজেই আমরা বলতে পারি যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পৌণ্ড্ররা জাতিগত ভাবে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন করতে না পারলেও বামপন্থীদের সঙ্গে মিলিত ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। বামপন্থী সরকার গঠিত হওয়ার পশ্চাতে পৌণ্ড্ররা যেমন ভূমিকা রেখেছিলেন, তেমন আবার ১৯৭৯ সালের ১৪ মে ভোরে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের উপর বামপন্থী সরকারের পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে

জয়নগরের সাংসদ শক্তিকুমার সরকার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলেই সুন্দরবন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মৎস্যজীবীদের সংগঠন যা "বঙ্গীয় ফিস প্রডুয়েসর" সমিতি নামে পরিচিত। এবং গোসাবায় স্থাপিত হয় "এগ্রিকালচার রিসার্চ সেন্টার"। শক্তিকুমার সরকারের রাজনৈতিক আন্দোলনের আরেকটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল তিনি ভারতীয় রিপাবলিকান পার্টির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বে এসে বেশ সংখ্যক পৌণ্ড্র নেতার বামপন্থী ঘরনার রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বের করে জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসেন।[১২৩] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে থেকে গণেশ চন্দ্র মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত থেকে সাধারণ পৌণ্ড্রদের তথা দরিদ্র মানুষের হয়ে পক্ষ নিয়ে তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবীদের সাথে তাঁর যোগসূত্র গড়ে ওঠার ফলেই তিনি শিক্ষকতার সময় থেকেই জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের সংগঠিত করে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কাজেই তাঁকে কংগ্রেসের পুলিশ দ্বারা ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। গণেশ চন্দ্র মণ্ডল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির জাতিগত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে তিনি বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্ববিশেষ ভূমিকা রাখেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে ১৯৬৯ সালে তিনি গোসাবা কেন্দ্র থেকে আর.এস.পির প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। মণ্ডল গোসাবা কেন্দ্র থেকে আর.এস.পির প্রার্থী হিসাবে টানা সাত বার নির্বাচিত হন। গণেশ চন্দ্র মণ্ডল দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গের সংযুক্ত কৃষাণ সভার রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। কাজেই সুন্দরবন অঞ্চলের দরিদ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নিপীড়িত জাতির উন্নয়নে সারাজীবন কাজ করেছেন।[১২৪]

আমরা আমাদের গবেষণা পত্রে আগেই উল্লেখ করেছি যে, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মূল আদর্শ ছিল শ্রেণী চেতনা যা জাতিগত চেতনার থেকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হত। কাজেই ১৯৭৭ সালে বামপন্থী সরকার পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হওয়ার ফলে ১৯৯০ সালের মধ্যে পৌণ্ড্রদের মধ্যে তেমন কোন জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলন পরিলক্ষিত হয় না। আবার যখন ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল এবং ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সালে নিম্নজাতির রাজনৈতিক জোট দিল্লির ক্ষমতায় থাকার ফলে যে জাতীয় তথা প্রাদেশিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রভূমিতে বেশ পরিবর্তন আসে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যেমন ১৯৯০ সালে বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর'র ভারতরত্ন পাওয়া এবং (১৯৯২-১৯৯৭) কে. আর. নারায়ানান'র রাষ্ট্রপতি হিসাবে

মনোনীত হওয়ার ফলে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে পৌণ্ড্র জাতি তথা নিম্নজাতির মধ্যে জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপকতা বাড়িয়ে দেয় বলে মনে করা যেতেই পারে।[১২৫] প্রসঙ্গক্রমে আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, গত প্রায় ২১ বছর ধরে গড়িয়ার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ ছত্রাবাস ও গ্রন্থাগার পরিচালনের মাধ্যমে পৌণ্ড্র জাতির শিক্ষা বিস্তার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক হীনস্থানের কারণগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরে। ১৯৯১ সালের ১৪ এপ্রিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের পরিচালনায় ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের জন্ম শতবর্ষ বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করে পৌণ্ড্র জাতির সামাজিক তথা রাজনৈতিক উন্নয়নের উপর বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ বক্তব্য রাখেন।[১২৬] একথা বলা যেতে পারে যে, পরিষদ দ্বারা পালিত আম্বেদকরের জন্ম শতবর্ষ পালনের পর থেকে প্রতি বছর ১৫ই আগস্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সময় পৌণ্ড্র সমাজ ও রাজনৈতিক জাগরণের একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

পৌণ্ড্র সমাজের সামাজিক তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের সমসাময়িক সময়ে অন্যতম রূপকার ধূর্জটি নস্কর ২০০১ সালে 'সুন্দরবন আম্বেদকর সমিতি' স্থাপন করে পৌণ্ড্রজাতির ঐক্যবদ্ধ ভাবে নানাবিধ সামাজিক আন্দোলনের পক্ষে তিনি কাজ করে চলেছেন কিন্তু তিনি মতুয়া মহাসংঘের ন্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে মনোনিবেশ করেন নি বললেই চলে। 'সুন্দরবন আম্বেদকর সমিতি'র মূল কর্মসূচী হল, ক) প্রতিবছর ১৪ এপ্রিল ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের পবিত্র জন্মদিনকে উক্ত সমিতি জাতীয় স্তরে "আম্বেদকর দিবস" বলে ঘোষণা ও পালনের আহ্বান জানায়; খ) একইসাথে প্রতিবছর ১৪ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল "আম্বেদকর পক্ষ" ও বুদ্ধপূর্ণিমা দিবস থেকে পক্ষকালব্যাপী "বুদ্ধপক্ষ" পালন করার কথা সমিতি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, গ) অনগ্রসর সুন্দরবন অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের আধুনিকযুগের উচ্চশিক্ষার জন্য "সুন্দরবন আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার কথা সমিতি পক্ষ থেকে রাজ্যসরকারের নিকট দাবি জানানো হয়।[১২৭] প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় রাজনৈতিক আন্দোলনকে নমঃশূদ্ররা নিজের জাতির সামাজিক আন্দোলনের পক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছে, কাজেই নমঃশূদ্র জাতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির থেকে এগিয়ে আছে। এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের নমঃশূদ্রদের প্রাণপুরুষ পি.আর. ঠাকুরের নামে ২০১৩ সালেই সরকারি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পশ্চাৎতে নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের জাতিগত রাজনৈতিক চেতনার আন্দোলন

বেশ ভূমিকা রেখেছে। যা আমরা পৌণ্ড্রদের মধ্যে এই সময় জাতিগত চেতনার রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা দেখতে পাওয়া গেলো না।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক আন্দোলনের সংগঠন গুলো নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলনের সংগঠনের গুলো ন্যায় রাজ্য রাজনীতির প্রধান দলের সঙ্গে থেকেও নমঃশূদ্ররা রাজনৈতিক চেতনার ভূমিকা রাখতে পারলেও পৌণ্ড্ররা সেটা কিন্তু রাখতে পারেনি। এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ২০১১ সালের রাজ্য রাজনীতির পরিবর্তন আসার আগে থেকেই শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জি নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের পীঠস্থান ঠাকুরনগরে যাওয়ার মধ্যদিয়েই নমঃশূদ্রদের জাতিগত রাজনৈতিক চেতনার ঐক্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সময় সরকার পক্ষের বেশ সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর আগমনেও নমঃশূদ্রদের জাতিগত রাজনৈতিক চেতনার ভূমিকা বেশ গুরুত্ব পায় রাজ্য রাজনীতিতে। ঠাকুরবাড়ির মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর মন্ত্রীত্ব পাওয়া এবং উপেন বিশ্বাসের মন্ত্রীত্ব পাওয়ার ফলেই বোঝা যায় নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই যে তারা সংসদীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পেরেছে। যা কিন্তু আমরা পৌণ্ড্রদের সামাজিক আন্দোলনের সংগঠন গুলোতে রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের আগমন দেখতে পাওয়া যায়নি। এথেকেও আমরা বলতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্র জাতি থেকে নমঃশূদ্র জাতি বেশি ভূমিকা রেখেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত ১৬ টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ১১ টিতে পৌণ্ড্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিল। আবার সাধারণ আসন কুলপি ও ডায়মন্ড হারবার থেকে পৌণ্ড্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন। বলা যায় সর্বমোট ১৩ জন পৌণ্ড্র বিধায়কদের জয় এই নির্বাচনে পরিলক্ষিত হয়। উক্ত ১৩ জন বিধায়কের মধ্যে ৯ জন জয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে। আর ৪ টি আসনে সি.পি.আই.এম. সি.পি.আই. ও আর.এস.পি এবং এস. ইউ .সি. প্রত্যেকে ১টি করে আসন পায় ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে।[১২৮] উক্ত বিধানসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্র ন্যায় পৌণ্ড্ররা ব্যাপক হারে ভোট দেয় তৃণমূল কংগ্রেসকে। নমঃশূদ্রদের মধ্যে জাতিগত একটা রাজনৈতিক চেতনার আন্দোলন পরিলক্ষিত হলেও পৌণ্ড্রদের মধ্যে তা পরিলক্ষিত হয়নি বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আবার আমরা উল্লেখিত করতে পারি যে, ২০১৪ সালের ভারতের লোকসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্রদের এবং পৌণ্ড্রদের মধ্যে জাতিগত রাজনৈতিক চেতনার আন্দোলনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি। যেমন নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের মধ্যে একটা অংশ বি.জে.পির দিকে ঝুকে গেলে উক্ত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকেই দুটি জাতিই বিপুল হারে ভোট দিয়ে জয়ী করেন।

২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে সারদা নারদার ন্যায় অর্থনৈতিক অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও সি.পি.আই.এম ও কয়েকটি সহযোগী বাম দল ও জাতীয় কংগ্রেসের জোট সঙ্গীকে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভাবে পরাজিত করেন। এই পরাজিত করার কারণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, তপসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ৬৮ টি আসনের মধ্যে ৪৯ আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়। উক্ত নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস ও আংশিক বামফ্রন্ট জোটবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেও যথাক্রমে ১১ ও ৮টি করে আসনে জয় লাভ করে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলতেই পারি যে, উক্ত নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষাপটের বিচারে এটা স্পষ্ট যে, একসময় ৩৪ বছরের বামশাসনে তপসিলি ভোট যেভাবে বামেদের অনুকূলে ছিল তা এখন তার বিপরীত প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে। এই নির্বাচন থেকে পাওয়া গেল যে, তপসিলি জাতির ভোটের ৮৩.৮২ শতাংশ ভোট দক্ষিণপন্থী দলগুলির অনুকূলে গেছে।[১২৯] আমরা বলতে পারি যে, ঠিক অন্যান্য তপসিলি জাতির ন্যায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ভোট বিপুল হারে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়ে জয়ের ধারা বজার রাখে। ১৯৭১ সালের পর থেকে রাজ্য রাজনীতির পালাবদলের ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্ররা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা না রাখতে পারলেও প্রধান বিরোধী দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পেরেছে বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে।

মূল্যায়ন ও তাৎপর্য

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের দু'টি চিত্র, একটা হল স্বাধীনতার আগের আরেকটি হল, স্বাধীনতা লাভের ও দেশভাগের পরের চিত্র । ভারতীয় উপমহাদেশে জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলন করতে গেলে একই ভৌগোলিক অঞ্চলে একই জাতির মানুষের ঐক্যবদ্ধ থাকাটা বেশ জরুরি । স্বাধীনতার আগে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ যশোহর, ফরিদপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জে অধিক হারে বসবাস করার কারণে তাদের মধ্যে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে

জাতিগতভাবে ভূমিকা রাখতে পেরেছিল। এই পারার কারণ হল, হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে বেশ সংখ্যক নমঃশূদ্র শিক্ষিত মানুষ সামাজিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে বেশকিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করে জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবেশ করে । এর ফলে নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে একটা রাজনৈতিক সচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং তারা বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরাধীন দেশে নিজের জাতির জন্যে ভূমিকা রাখতে পেরেছিল।

দেশভাগের পরে পূর্বপাকিস্থানের থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে সব থেকে খারাপ অবস্থায় পরে নমঃশূদ্র জাতির উদ্বাস্তুরা। এই প্রসঙ্গে আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ছেলে প্রয়াত জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, "বাবা তো বাগেরহাটের মিটিং এ বলেছিলেন যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাগেরহাট ভারত ভুক্ত করলে বৃহত্তর নমঃশূদ্র জাতির লোকদের দেশান্তরীত উদ্বাস্তু হতে হতো না। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নেতা-নেত্রী এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বরা তা মেনে নিলেন না । তা সত্ত্বেও বাবা পাকিস্তানে থেকে গেলেন পরে নানান কারণে ভারতে চলে আসে। আমাদের জাতির মানুষ জলা জমিত বসবাস করতে অব্যস্থ। কিন্তু ভারত সরকার তাঁদের পুনরবাসন দেয় রুক্ষ পাহাড়ি অঞ্চলে । কাজেই তাঁরা বসবাস না করতে পেরে আনন্দাবান ও ভারতের বহু অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস শুরু করে। ফলে আমাদের মধ্যে আগের মতো সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তিনি আরও বলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এদেশে এসে আর.পি.আই ও বামপন্থীদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করেন এবং উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন ও বিভিন্ন সময়ে উদ্বাস্তু আন্দোলনের অভিমুখ নিজের রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে নিয়ে আসেন । কিন্তু ভারতে এসে তিনি নির্বাচনে জয়ী না হতে পারলেও কমবেশি দলিত রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর নিজের ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন"।[১৩০] আবার জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল একথাও বলেন যে, "প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ভারতে এসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে সাংসদ ও বিধায়ক এবং মন্ত্রীয় হওয়ার কারণে তাঁর নেতৃত্বে বেশ সংখ্যক নমঃশূদ্র ও মতুয়ারা রাজনৈতিক আন্দোলন করেন। পি. আর. ঠাকুরের কয়েকবার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করার কারণে ৭০এর দশকে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনে ভাটা পরে"।[১৩১] আবার দেখা গেছে যে, ৮০এর দশকে রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিয়ে মতুয়া মহাসংঘকে রাজনীতি মুক্ত করে সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্ত

করার নিমিত্তে তাঁদের পারিবারিক ধর্মীয় মতাদর্শ নমঃশূদ্র মধ্যে প্রচার করে সামাজিক আন্দোলন করার দিকে মনোনিবেশ করেন। কাজেই প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী বীণাপাণি ঠাকুরের ও বড়পুত্র কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর মতুয়া মহাসংঘকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের পীঠস্থান হিসাবে গড়ে তোলেন। কাজেই ২০০০ সালের পর থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে মতুয়া মহাসংঘকে বামপন্থী দল ও কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা দল বেশ গুরুত্ব দেয়। কাজেই ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্ররা সর্বভারতীয় তৃণমূলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।

মোছলন্দপুরের আর.পি.আই নেতা ও দলিত লেখকের কথায়, "দেশভাগের আগে নমঃশূদ্র জাতিকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। কাজেই নমঃশূদ্র জাতির পক্ষে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা রাখাটা সহজ হত। দেশভাগের ফলে মুসলিমদেরকে নমঃশূদ্ররা শত্রু বলে মনে করেন, কাজেই নমঃশূদ্র ও মুসলনমানেরা একে অপরের উপর বিশ্বাস করতে না পারায় তাঁদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐক্য গড়ে ওঠেনি। ফলে ভারতে এসে নমঃশূদ্ররা তেমন কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পারেনি। একথা মানতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে হলে, কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতি নিয়ে তো আর বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখা যায় না। তবে পশ্চিমবঙ্গের যে, সামাজিক কাঠামো তার উপর ভিত্তি করে নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলন একই পথে চলাটা বেশ কঠিন"।[১৩২] কাজে বলা যায়, রাজনৈতিক আন্দোলন সদাসর্বদা একই প্রেক্ষাপটে চলে না। এমন সময় আসতেই পারে নমঃশূদ্র ও মুসলমানরা একই সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে হয়তো পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখবে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, সি.পি.আই.এম ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমানে জোটবদ্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা।

আবার মতুয়াদের সংঘজননীর বলেন "দেশভাগের জন্যে আমার জাতির লোকেরা মুসলমানদের দায়ী করেন কিন্তু তা নয় দেশভাগের জন্যে দায়ী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও হিন্দুত্ববাদীদের জন্যেই দেশভাগ হয়েছিল। কাজেই আমাদের জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক তমকা এঁটে দেওয়ার কারণে নমঃশূদ্ররা ও মুসিলমানরা একত্রে মিলিত হয়ে আর কোনদিন

পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন করতে পারেনি। তবে হ্যাঁ রাজনৈতিক আন্দোলন করতে গেলে পারে জনসংখ্যার একটা প্রয়োজন হয়, যা আমার জাতির লোকেরা ভারতে এসে একত্রিত ছিলনা। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমার শ্বশুর মহাশয় ৫০এর এবং ৬০এর দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি। কারণ হল, ঠাকুর মহাশয় মন্ত্রী হতে পেরেছিলেন কিন্তু আমার জাতির উদ্বাস্তদের জন্যে যে সার্বিক সুযোগ সুবিধা সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে পারেননি"।[১৩৩] মতুয়াদের সংঘজননীর মতের সঙ্গে একটা জায়গায় আমরা একমত যে, পি. আর. ঠাকুর মন্ত্রী তো হয়েছিলেন এছাড়াও বাংলা কংগ্রেসের সহসভাপতি হয়েও তাঁর জাতির উদ্বাস্তদের পশ্চিমবঙ্গে রাখতে পারলেন না কেন, তাদেরকে কে অন্যান্য রাজ্যে গিয়ে বসতিস্থাপন করতে হলে। এমনটা প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠাটা স্বাভাবিক নয় কি? কাজেই পি. আর. ঠাকুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা নমঃশূদ্র জাতি কতটা উপকৃত হয়েছিল, তা আমরা নমঃশূদ্রদের তখনকার আর্থসাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের মুল্যায়নে দেখেয়েছি ।

আবার পলতা নিবাসী প্রাক্তণ বামপন্থী বিধায়ক দীর্ঘদিন ধরে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত থেকে মতুয়াদের জন্যে বৃদ্ধাশ্রম করে দেওয়া সত্ত্বেও বড়মা বীণাপাণি দেবী বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে কখনও নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের আহ্বান করেন নি। কাজেই ঠাকুরবাড়ির বরাবরি বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সামাজিক আন্দোলন যুক্ত করতে চায়নি। ঠাকুরবাড়ির রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, সরভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এবং ভারতীয় জনতা দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করেছেন এবং কম বেশি রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতেও পেরেছেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির কোন সদস্যেই বামপন্থী রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি ।

চাঁদপাড়া নিবাসী গাইঘাটার প্রাক্তন বামপন্থী বিধায়ক আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় বলেন যে, "পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যেটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে, তা বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায়। কারণ হল দেশভাগের পরে নমঃশূদ্ররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে উদ্বাস্ত হয়ে বসবাস করার কারণে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সচেতনা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। ১৯৬০ এর দশক থেকে বামপন্থীরা নমঃশূদ্র উদ্বাস্তদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকারের উদ্বাস্ত নীতির ও বাসস্থানের জন্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল

করেন। ৭০ এর দশকে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নমঃশূদ্ররা ওতপ্রোত ভাবে অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতিতে সরকার পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে বেশ ভূমিকা রাখতে পেরেছে। তবে মরিচঝাঁপিতে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের উপর যে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বামপন্থী সরকার নিয়েছিল, তার ফলে বেশ সংখ্যক নমঃশূদ্র নেতৃত্ব বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে যায়। তারা সরে গিয়ে বামপন্থী বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করেন। একটা দলিত জাতির সকল মানুষ যে, ভারতের ন্যায় বহুদলীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করবে এমনটা ভাবা আমাদের ঠিক হবে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিমুখ ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে, কাজেই নমঃশূদ্রদের সার্বিকভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরাট ভূমিকা রয়েছেই। তবে বলে রাখা প্রয়োজন যে, নমঃশূদ্র জাতির বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতৃত্ব বার বার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করার কারণে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকার ধারাবাহিকতা থাকেনি”।[১৩৪] আমরা চাঁদপাড়া নিবাসী গাইঘাটার প্রাক্তন বামপন্থী বিধায়ক একটা জায়গায় একমত যে, নমঃশূদ্র নেতাদের রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করার প্রসঙ্গে, যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায় প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, অপূর্বলাল মজুমদার, নন্দদুলাল মোহন্ত, বিরাট বৈরাগ্য সুশীল বিশ্বাসের নাম, এছাড়াও আরও অনেকের নাম আছে তালিকাতে। তবে পরিশেষে বলা যায় বামপন্থী দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতৃত্বে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ না থাকলেও গণরাজনৈতিক আন্দোলনে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেই ছিল। আবার ২০০৬ সালের পরে এসে নমঃশূদ্ররা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

অপর দিকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষদের রাজনৈতিক আন্দোলনও স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দুটি চিত্র লক্ষ্য করা যায়। তবে হ্যাঁ নমঃশূদ্রদের মতন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দেশভাগের তেমন একটা আঘাত পায়নি। কাজেই পৌণ্ড্রদের স্বাধীনতার আগের আর পরের রাজনৈতিক আন্দোলনের তেমন কোন বড় পার্থক্যের চিত্র আমরা লক্ষ্য করতে পারিনি। তাইতো নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে পার্থক্য ছিল এবং আছে। এই পার্থক্যটা থাকার মূলকারণ হল উক্ত জাতির মধ্যেও সামাজিক উঁচু-নীচু ভেদাভেদ বিদ্যমান। আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় সামাজিক দিক থেকে নমঃশূদ্ররা উঁচু না কি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা উঁচু এই প্রশ্নের উত্তরে বেশির ভাগ নমঃশূদ্র জাতির মানুষ উত্তর দিয়েছেন তাঁরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক দিক থেকে উঁচু, আবার বেশির ভাগ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বলেছেন, তাঁরা নমঃশূদ্র জাতির থেকে সামাজিক দিক থেকে উঁচু। এই প্রসঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের যুক্ত হল, আমরা তো জাতিতে ক্ষত্রিয় আর নমঃশূদ্ররা জাতিতে শূদ্র। আর নমঃশূদ্রদের যুক্তি হল, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কি করে ক্ষত্রিয় হয় ওঁদের জনগণনায় এখনও পোদ/পৌণ্ড্র লেখা হয়, ওঁদের ক্ষত্রিয় জাতির সন্মান দেওয়া হয়নি।[১৩৫] এই প্রসঙ্গে আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নমঃশূদ্র জাতির যেসকল মানুষের পদবী ঠাকুর তাঁরা নিজেদের মৈথলীর ব্রাহ্মণ মনে করেন।[১৩৬] কাজেই উক্ত দলিত জাতি দুটি নিজেদের মতন করে সমাজে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ তৈরি করে রেখেছেন। তবে দলিত জাতির মানুষ সব সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভাবে নিজেদের। আর উক্ত কারণের জন্যেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্ররা নিজ নিজ সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন একত্রে পরিচালিত হতে পারেনি।

নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে উদ্বাস্তুদের পুনরবাসন ও নাগরিকত্বের দাবী। কাজেই নাগরিকত্ব ও পুনরবাসন নিয়ে নমঃশূদ্র জাতির যে ধরণের আন্দোলন করতে হয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে কিন্তু ততোটা আন্দোলন করতে হয় না। ফলে বলা যেতে পারে যে, দেশভাগের ও স্বাধীনতার পরে নমঃশূদ্র নেতৃত্বদের পশিমবঙ্গে এসে, ১৯৫৬ সালের ন্যাশনাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষদের স্থায়ী পুনরবাসনের জন্যে 'উদ্বাস্তু' এবং 'শরনার্থী' কথাটির পরিবর্তন আনা হয়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের SBBS (সারা ভারত বাস্তুহারা সমিতি) এবং UCRC (United Central Refugee Council) এর চাপে এই বাস্তুহারা মানুষদেরকে 'Displaced Person' হিসেবে Permanet Settlement এর ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেশ ভাগের পর থেকে এটা শুধু আলচনাতেই আছে। সরকারি স্বাকৃতি এখনও পর্যন্ত নেই কথাও। এখনও বহু মানুষের জুতোর সুকতলা খুলে যায় শুধু জাতিগত সংশাপত্র, ভোটার তালিকাতে নাম তুলতে এবং একফালি জমি রেজিস্ট্রেশন করতে বা ব্যাঙ্ককে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে। দেখা গেছে কোন আধিকারিক ডকুমেন্টেস'র অভাবে কাজ করে দিতে পারেন না। যে সকল সহৃদয় সরকারি অফিসার কাজ করে দেন, পরে দেখা গেছে

রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অনেকের ভোটার আইডি কার্ড থাকলেও ‘Foregners’ অ্যাক্টে অভিযুক্ত করা হয়, এমনকি আধার কার্ড থাকলেও । কাজেই কোনভাবে উক্ত ডকুমেন্ট গুলো পেলেও তার যথোপযুক্ত ‘Ground’ পাওয়া না যাওয়ায় তারা ভুগছেন। সরকারি চাকরি পেলে তার ভেরিফিকেশনে হয় আকটে যাচ্ছে না হলে অন্যপথে কাজ করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই তথ্যগুলো আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় নমঃশূদ্র জাতির উদ্বাস্তু মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি। উদ্বাস্তু মানুষ আরও বলেন, “উপরিউক্ত সমস্যাগুলো আমাদের ভয়ংকর ভাবে মানসিক যন্ত্রণা দেয়। আমরা যারা ভোগ করি তারা জানি যে কি যন্ত্রণা। কোন সরকারি অফিসে গেলে আত্ম বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে পারি না”।[১৩৭] অন্যদিকে পৌণ্ড্রজাতির বেশির ভাগ মানুষের উক্ত সমস্যায় পরতে হয় না। তাইতো হেমচন্দ্র নস্করকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের ন্যায় উদ্বাস্তু আন্দোলন করতে হয়নি। ফলে পৌণ্ড্ররা স্বাধীনোত্তর পশ্চিমঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে নমঃশূদ্রদের ন্যায় আন্দোলন করতে হয়নি।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ দেশভাগের আগে পরে অনেকটা স্বাধীন ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হতে পেরেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাঙ্গে নিজেদের কে নিয়োজিত করে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রীও হয়েছেন। নমঃশূদ্র জাতির কোন মানুষ ২০১৬ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে পারেননি।[১৩৮] আবার দেখা গেছে পৌণ্ড্রজাতির একটা অংশের মানুষ ৬০এর দশকের পর থেকে এস.ইউ.সি.আই ও আর.এস.পির হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করে ভূমিকা পশ্চিমঙ্গের রাজনীতিতে ভুমিকাও রাখতে সক্ষম হয়েছেন। জয়প্রকাশ নারায়নের ভূ-দান আন্দোলনের সঙ্গে মিলিত হয়েও পশিমবঙ্গের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখেই ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে শক্তি কুমার সরকার জয়নগর কেন্দ্র থেকে ভারতীয় লোক দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে। ১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলের সময় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বামপন্থী রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।[১৩৯] আবার ২০০৮ সালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ারা সর্বভারতীয় তৃনমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে মিলিত ভাবে আন্দোলন করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাপরিষদ তৃণমূল কংগ্রেস দখল করার মধ্যে আমরা বুঝতে পারি সংখ্যাগরিষ্ঠ পৌণ্ড্ররা পরিবর্তনের রাজনৈতিক আন্দোলন ভূমিকা রাখতে পেরেছে। যেহেতু নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতিরও নিজস্ব কোন

রাজনৈতিক দল নেই, তাই তারা নিজ জাতির হয়ে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতেও পারেনি।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলে এই যে, নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ স্বাধীনতার আগে কমবেশি নিজ নিজ জাতির স্বার্থে জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পারলেও স্বাধীনতার পরে তা কিন্তু পারেনি। মতুয়া মহাসংঘের মাধ্যমে অনেক আগে থেকেই নমঃশূদ্ররা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সরকার পক্ষের ও সরকার বিপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখলেও জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের পক্ষনিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের মধ্যে তেমন শক্ত সামাজিক সংগঠন না থাকায় সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ভূমিকা রাখা তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। অতি সাম্প্রতিক কালে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসংঘের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে একটা সামাজিক আন্দোলনের চেতনা লক্ষ্য করা গেছে। নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা স্বাধীনতার পরে সরকার পক্ষের ও সরকার বিপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখলেও জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

নির্দেশিকা

১) Hindustan Standard, 2 June, 1939।

২) শংকর ঘোষ, 'হস্তান্তর' স্বাধীনতার অর্ধশতক, আনন্দ, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ২১৭।

৩) দেবী চট্টোপাধ্যায়, নিম্ন জাতির মানুষ ও দেশভাগ, (সম্পাদনা) আশিস হীরা, দেশভাগে নিম্নবর্ন, গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০, পৃঃ ১৭।

৪) Sekhar Bandyopadhyay & Anasua Basu Roy Chowdhury, 'Partition, Displacement and the Decline of the Scheduled Caste Movement in West Bengal', Uday Chandra, Geir Heierstad Kenneth Bo Nielesh edited, The Politics in West Bengal, Routledge, New Delhi, 2016, পৃঃ ৬৪-৬৫।

৫) জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, (চতুর্থ খণ্ড), চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ১৯৯-২০০।

৬) সন্তোষ রাণা, কুমার রাণা, পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০৯, পৃঃ ২৩।

৭) ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ২৯৭।

৮) প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রান্তিক মানব, প্রতিক্ষর, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ২৭।

৯) শঙ্কর ঘোষ, 'হস্তান্তর' স্বাধীনতার অর্ধশতক, আনন্দ, কলিকাতা, ২০০২, পৃঃ ২১৭।

১০) সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, 'বঙ্গ সংহার এবং' আনন্দ কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ১৮৫।

১১) কপিলকৃষ্ণ বিশ্বাস, 'আন্দামানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের ভূমিকা' নিখিল ভারত, ৩১তম বর্ষ, ৪র্থ ৫ম সংখ্যা, জুলাই-অক্টোবর, ২০০৯, পৃঃ ৪-১০।

১২) অমৃত বাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ, ১৯৫১, কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, 'ঠাকুর নগর পত্তনের ইতিহাস' নিখিল ভারত, ৩০ তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০৮, পৃঃ ৬।

১৩) নীলেন্দু সেনগুপ্ত, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ঃ জীবন ও সময়কাল, আনন্দ, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ১০০-১০১।

১৪) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৫.০১.২০০৫।

১৫) কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, আন্দামানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে প্রথম রঞ্জন ঠাকুরের ভূমিকা, নিখিল ভারত, ৩১ তম বর্ষ, ৪ র্থ ৫ ম সংখ্যা, জুলাই-অক্টোবর, ২০০৯, পৃঃ ৪-৬।

১৬) কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, আন্দামানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে প্রথম রঞ্জন ঠাকুরের ভূমিকা, প্রাগক্ত, পৃঃ ৪-৬।

১৭) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বর্তমানের মতুয়াদের সংঘজননীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৮) রণজিৎ রায়, 'ধবংসের পথে পশ্চিমবঙ্গঃ কেন্দ্র- রাজ্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ৯৪।

১৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বর্তমানের মতুয়াদের সংঘজননীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২০) কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, পি.আর. ঠাকুর যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, নিখিল ভারত, মে-জুন, ২০০৯, ৩১তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৬।

২১) প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রান্তিক মানব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫।

২২) সুরেন্দ্রনাথ সরকার, প্রাণের দেবতা যোগেন্দ্রনাথ, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর (বিশ্বাস) সম্পাদিত, শতবর্ষের আলোকে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ১৩০-৩৩।

২৩) অমর বিশ্বাস, 'স্বাধীনতোত্তর পশ্চিম বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ', কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর (বিশ্বাস) সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬।

২৪) অমর বিশ্বাস, 'স্বাধীনতোত্তর পশ্চিম বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ', কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর (বিশ্বাস) সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬।

২৫) Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947, Second Edition (Whit a new Postscript), Oxford University press, New Delhi, 2011, পৃঃ ২৫৯।

২৬) West Bengal Assembly Proceedings, Vol-XX, No-I, Discussion on Dandakaranya Scheme, Session June-Julay, 1958, Hara Krishna konar's speech on 10th June, 1958. পৃঃ ৩৩২।

২৭) বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, ভারতবর্ষ স্বাধনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, আনন্দ, (ষষ্ঠ মুদ্রন), কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ২৪৭।

২৮) বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, ভারতবর্ষ স্বাধনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৯।

২৯) জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, (সপ্তম খণ্ড), চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ ১৩৪।

৩০) ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৮।

৩১) ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৮।

৩২) ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৮।

৩৩) প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি, মতুয়া মহাসংঘ, ঠাকুরনগর, ১৯৯৫, পৃঃ ২১৫।

৩৪) ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৪।

৩৫) সন্তোষ রাণা, সমাজ শ্রেণী রাজনীতি-প্রবন্ধ সংকলন, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ ১২৫।

৩৬) বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, ভারতবর্ষ স্বাধনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগক্ত, পৃঃ ৩৭৭।

৩৭) সন্তোষ রাণা, সমাজ শ্রেণী রাজনীতি-প্রবন্ধ সংকলন, প্রাগক্ত, পৃঃ ১০৪।

৩৮) সন্তোষ রাণা, সমাজ শ্রেণী রাজনীতি-প্রবন্ধ সংকলন, প্রাগন্ত, পৃঃ ১০৬।

৩৯) মনোশান্ত বিশ্বাস, বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ২৯৯-৩০০।

৪০) বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, ভারতবর্ষ স্বাধনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগক্ত, পৃঃ ৩৭৪-৭৫।

৪১) সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, একালের কারবালা, মধুময় পাল (সম্পাদিত) মরিচঝাপি ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯, পৃঃ ১২৩।

৪২) সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, একালের কারবালা, প্রাগক্ত, পৃঃ ১২৩-২৪।

৪৩) সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, একালের কারবালা, প্রাগক্ত, পৃঃ ১২৪-২৫।

৪৪) সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, একালের কারবালা, প্রাগক্ত, পৃঃ ১২৫।

৪৫) জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুঃ কারা এবং কেন? বঙ্গদর্পন প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ১০৫-৬।

৪৬) জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুঃ কারা এবং কেন? প্রাগক্ত, পৃঃ ১০৯।

৪৭) সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, একালের কারবালা, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৪৯-৫০।

৪৮) যুগান্তর, ১৬ মে, ১৯৭৯।

৪৯) যুগান্তর, ১৭ মে, ১৯৭৯।

৫০) বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, ভারতবর্ষ স্বাধনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগক্ত, পৃঃ ৩৭৫।

৫১) ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার’ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৪।

৫২) ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগক্ত, পৃঃ ২৯৮।

৫৩) ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগক্ত, পৃঃ ৩০০-৩০১।

৫৪) ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, প্রাগক্ত, পৃঃ ৩০২-৩০৩।

৫৫) Statistical Report on General Elections, 1982 to the Legislative Assembly of West Bengal, Elections Commission of India, New Delhi, 1982, পৃঃ ৩১৮-২০।

৫৬) স্নেহময় চাকলাদার, পশ্চিমবঙ্গে জাত ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বামফ্রন্ট সরকারের নীতি, সুজিত সেন (সম্পাদিত) ‘জাতপাতের রাজনীতি’ পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৯৭।

৫৭) শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, এদেশের রাজনীতি ও বহুজন সমাজ,(প্রথম খণ্ড) চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ৩৩০।

৫৮) Statistical Report on General Elections, 1987 to the Legislative Assembly of West Bengal, Elections Commission of India, New Delhi, 1987, পৃঃ ৩২২-২৩।

৫৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঠাকুরনগর নিবাসী ও নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তণ সি.পি.আই.এমের সাংসদের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬০) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাঁদপাড়ার নিবাসী ও গাইঘাটার প্রাক্তণ সি.পি.আই.এমের বিধায়কের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬১) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাঁদপাড়ার নিবাসী প্রবীণ মতুয়া গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬২) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাঁদপাড়ার নিবাসী প্রবীণ মতুয়া গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬৩) Statistical Report on General Elections, 1991 to the Legislative Assembly of West Bengal, Elections Commission of India, New Delhi, 1991, পৃঃ ৩২৬-২৬।

৬৪) ড. বিরাট বৈরাগ্য, “মতুয়া আন্দোলন ও বড়মা বীণাপাণি দেবী” শ্রীজগদীশ হালদার, ড. সমীর চন্দ্র দাস,(সম্পাদিত) ১০২তম জন্মবর্ষে – বড়মা বীণাপাণি দেবীঠাকুরাণীর বিশেষ স্মারক সংখ্যা ২৪শে অক্টোবর, শুভ মহা অষ্টমী-২০২০, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা, শ্রীধাম ঠাকুরনগর, ঠাকুরবাড়ী, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ২০২০, পৃঃ ৬৩।

৬৫) ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বর্ণাশ্রমী মানসিকতা বনাম শ্রেণী চেতনা, সুজিত সেন (সম্পাদিত) প্রাগক্ত, পৃঃ ৩৪-৩৯।

৬৬) Sekhar Bandyooaphyay, Caste, Culture and Hegimony : Social Dominance in Colonial Bengal, Sage, New Delhi, 2004, পৃঃ ২৪৭।

৬৭) W.J.M. Mackenzic, Pressure Groups in British Government in British Journal of Sociology, Vol-vi, 1955, Page – 136 and also key, O.K. – Politics, Parties and Pressure Groups, New York, 1964, পৃঃ ১৫০-৫১।

৬৮) Amal Kumar Mukhopadhyay, Political Sociology : An Introductory Analysis, K.P.Bagchi, Calcutta, 1977, পৃঃ ১৫৩।

৬৯) Amal Kumar Mukhopadhyay, Political Sociology : An Introductory Analysis, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯-৬০।

৭০) মতুয়া মহাসংঘের বার্ষিক সম্মেলন সম্পাদকের প্রতিবেদন, ১৯৯২, পৃঃ ১৭-১৮।

৭১) 'মতুয়া মহাসংঘের সংবিধান বা গণতন্ত্র' মতুয়া মহাসংঘ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৮।

৭২) 'মতুয়া মহাসংঘের সংবিধান বা গণতন্ত্র' প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩-৪।

৭৩) Statistical Report on General Elections, 1991 to the Legislative Assembly of West Bengal, Elections Commission of India, New Delhi, 1991, পৃঃ ৩৩১-৩৩।

৭৪) Statistical Report on General Elections, 1999 to the Thirteenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results), Elections Commission of India, New Delhi, 1999, পৃঃ ২৫৫-৫৬।

৭৫) Sumanta Banerjee, - Bengal Left : From Pink to saffron, EPW, Vol, 38, no. 9, 2003.এবং ড. বিরাট বৈরাগ্য, "মতুয়া আন্দোলন ও বড়মা বীণাপাণি দেবী" শ্রীজগদীশ হালদার, ড. সমীর চন্দ্র দাস,(সম্পাদিত) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫-৫৬।

৭৬) Sandip Bandyopadhyay, Who are the Matuas, Frontier, Vol. 47, no.37, March, 2011.

৭৭) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়ার বগুলার নিবাসী দলিত লেখিকার থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৭৮) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ অক্টোবর, ২০০৮।

৭৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাঁদপাড়ার নিবাসী প্রবীণ মতুয়া গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৮০) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ অক্টোবর, ২০০৮।

৮১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ অক্টোবর, ২০০৮।

৮২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ জানুয়ারি, ২০০৯।

৮৩) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাঁদপাড়ার নিবাসী প্রবীণ মতুয়া গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৮৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মার্চ, ২০০৯।

৮৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ মার্চ, ২০০৯।

৮৬) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ মার্চ, ২০০৯।

৮৭) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ মার্চ, ২০০৯।

৮৮) ড. বিরাট বৈরাগ্য, "মতুয়া আন্দোলন ও বড়মা বীণাপাণি দেবী" শ্রীজগদীশ হালদার, ড. সমীর চন্দ্র দাস,(সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬-৫৭।

৮৯) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল, ২০১০।

৯০) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

৯১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

৯২) ড. বিরাট বৈরাগ্য, "মতুয়া আন্দোলন ও বড়মা বীণাপাণি দেবী" শ্রীজগদীশ হালদার, ড. সমীর চন্দ্র দাস,(সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

৯৩) ড. বিরাট বৈরাগ্য, "মতুয়া আন্দোলন ও বড়মা বীণাপাণি দেবী" শ্রীজগদীশ হালদার, ড. সমীর চন্দ্র দাস,(সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।

৯৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

৯৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ মার্চ, ২০১৪।

৯৬) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ মার্চ, ২০১৪।

৯৭) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মার্চ, ২০১৪।

৯৮) ড. বিরাট বৈরাগ্য, "মতুয়া আন্দোলন ও বড়মা বীণাপাণি দেবী" শ্রীজগদীশ হালদার, ড. সমীর চন্দ্র দাস,(সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

৯৯) Rup Kumar Barman, Changing Nature of Caste in Post-Colonial India : A Study of Scheduled Caste Communities of West Bengal, UGC, Sponsored MRP Project, 2014-2016.

১০০) Dilip Banerjee, Election Recorder, Book Front Publication Forum, Calcutta, 1990, পৃঃ ২৫-৩১।

১০১) দিগম্বর সরদার, 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব, ক্যানিং, ১৯৫১।

১০২) দিগম্বর সরদার, 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব, ক্যানিং, ১৯৫১।

১০৩) সনৎ কুমার নস্কর, 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব', এক বিস্মৃতি প্রায় স্বজাতিসেবক পত্রিকা, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ৪।

১০৪) সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র – মনীষা (৩য় খণ্ড), মহাসঙঘ, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ১২।

১০৫) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে নব জাগরণ (উপনয়ন সংস্কার প্রবর্ত্তনের শুভ সমাচার), প্রকাশক ও সম্পাদক – শ্রীসনৎকুমার সরদার ওঁ শ্রীপতিকুমার সরদার (ডায়মন্ড হারবার, ২৪ পরগনা), পরিচালক, পণ্ডিত শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষন, শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬।

১০৬) সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র – মনীষা (৩য় খণ্ড), মহাসঙঘ, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ১৯১।

১০৭) সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র – মনীষা (৪র্থ খণ্ড), পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসঙঘ, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ১৯৬।

১০৮) সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র – মনীষা (৪র্থ খণ্ড), প্রাগক্ত, পৃঃ ১৯৭।

১০৯) সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র – মনীষা (৪র্থ খণ্ড), প্রাগক্ত, পৃঃ ২০১।

১১০) সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র – মনীষা (৪র্থ খণ্ড), প্রাগক্ত, পৃঃ ২০১।

১১১) সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র – মনীষা (৪র্থ খণ্ড), প্রাগক্ত, পৃঃ ২০২।

১১২) সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র – মনীষা (৪র্থ খণ্ড), প্রাগক্ত, পৃঃ ১৯৯-২০০।

১১৩) সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র – মনীষা (৪র্থ খণ্ড), প্রাগক্ত, পৃঃ ২০৫।

১১৪) Dilip Banerjee, Election Recorder, প্রাগক্ত, পৃঃ ১২২-২৭।

১১৫) Dilip Banerjee, Election Recorder, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৬৩-৭০।

১১৬) জ্যোতি বসু, যত দূর মনে পড়ে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ২৬৬।

১১৭) Rup Kumar Barman, Contested of Regionalism, Abhijit Publications, New Delhi, 2007. পৃঃ ১২৭-২৯।

১১৮) Dilip Banerjee, Election Recorder, প্রাগক্ত, পৃঃ ২৪৯-৫৩।

১১৯) বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, ভারতবর্ষ স্বাধনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাহক্ত, পৃঃ ২৯৬।
১২০) বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি, ভারতবর্ষ স্বাধনতার পরে ১৯৪৭ – ২০০০, প্রাগক্ত, পৃঃ ৩২১।
১২১) বসন্তকুমার মণ্ডল, সেদিনের কথা (প্রথম খণ্ড), পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ২১০-১১।
১২২) Dilip Banerjee, Election Recorder, প্রাগক্ত, পৃঃ ২৯০-৯৭।
১২৩) শ্যামলকুমার প্রামাণিক, পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ ১৮৫।
১২৪) শ্যামলকুমার প্রামাণিক, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৯০।
১২৫) Rup Kumar Barman : Changing Nature of Caste in Post – Colonial India : A Study of Scheduled Caste Communities of West Bengal , UGC Sponsored MRP Project, 2014-2016.
১২৬) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের প্রচারপত্র, ১৯৯১।
১২৭) সুন্দরবন আম্বেদকর সমিতির (২০০১) প্রচারপত্র, ২০১০।
১২৮) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ২০১১ – বাংলার রায়, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ১৬০-১৮১।
১২৯) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন,গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ১৩০-১৫৫।
১৩০) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়ার নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পুত্র প্রয়াত জগদীশ চন্দ্র মণ্ডলের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।
১৩১) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়ার নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পুত্র প্রয়াত জগদীশ চন্দ্র মণ্ডলের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।
১৩২) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরের নিবাসী আর.পি.আই নেতা ও দলিত লেখকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।
১৩৩) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বর্তমানের মতুয়াদের সংঘজননীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।
১৩৪) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়া নিবাসী গাইঘাটার প্রাক্তণ সি.পি.আই.এমের বিধায়কের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৩৫) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৫০ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৩৬) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০ জন ঠাকুর পদবীর নমঃশূদ্রদের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৩৭) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৫০ জন উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৩৮) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় লেখক ও গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৩৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় লেখক ও গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

উপসংহার

উপরিউক্ত প্রথম পরিচ্ছেদে জটিলতর ভারতের হিন্দু সমাজের কাঠামোগত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রচীন ভারতের হিন্দুসমাজে যেমন পেশা ও কর্মের ধরনের উপর নির্ভর করেও কমবেশি জাতিভেদ ব্যবস্থা ছিল, যা বিশেষ করে প্রাচীন কালেই আবার হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণের প্রেক্ষাপটে তৈরি, এই ভাবে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান ব্রাহ্মণই হবে, ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান ক্ষত্রিয়ই হবে। বৈশ্য ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান বৈশ্য হবে আর শূদ্রের ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান শূদ্র হবে এই ভাবেই আমাদের সমাজে পাকাপাকি ভাবে পেশা থেকে বেরিয়ে এসে জন্মগত জাতিভেদের কাঠামো স্থায়িত্ব পায়। মনু ভারতের হিন্দুসমাজের উক্ত চতুর্বর্ণের বাইরের আর কোনো বর্ণকে তিনি স্বীকার করেননি। মনু স্বীকার না করলেও তাতে কিন্তু হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ বা অস্পৃর্শ্য নামে পঞ্চমবর্ণের অস্তিত্ব তৈরি হয়, যা কালক্রমে পঞ্চমবর্ণ থেকে হাজার হাজার জাতির উৎপত্তি হয়। পঞ্চমবর্ণের অন্তর্গত এই হাজার হাজার জাতিই ভারতের হিন্দু সমাজে কালক্রমে কখনও ‘ডিপ্রেস ক্লাস’ ‘হরিজন’ ‘সিডিউল কাস্ট’ বা ‘দলিত’ জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়। প্রাচীন যুগেই আবার মনু সংহিতায় বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে চতুর্বণের পেশা ও সামাজিক উচু-নিচু এবং নারীদের সাময়িক অস্পৃশ্যতা তুলে ধরে আমরা হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা তুলে ধরে একটা চিত্র লিপিবদ্ধ করেছি। আমরা এই পরিচ্ছেদে বৈদিক, সিন্ধু সভ্যতা, হরপ্পা থেকে শুরু করে প্রাক আবার মধ্যকালীন ভারতের হিন্দুসমাজের জাতিভেদ ব্যবস্থা যা কখনও কঠিন আবার কখনও কোমল হয়েছে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। এছাড়া এই পরিচ্ছেদে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় হিন্দুসমাজের উপর যেসকল দিক থেকে প্রভাব পড়ে, তা আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, অস্পৃশ্য দলিতদের উপরে তখনকার সমাজ কী ধরনের ব্যবহার করত। যদিও ব্রিটিশ শাসকেরা প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় হিন্দু সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ না করার ঘোষিত অবস্থান থেকে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে তারা অল্পদিনের মধ্যেই সরে আসে এবং বিভিন্ন দিক থেকে হিন্দু সামাজিক রীতি-নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এই জড়িয়ে পড়ার কারণ হল, তখনকার শাসকেরা নিজেদের স্বার্থে প্রশাসনিক সাফল্যের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে ও তার আচার-আচরণ, রীতি-নীতিকে বোঝার কাজকে সহজ করতে জাতি-বর্ণের কাঠামোকে অনুধাবন করবার নিমিত্তেই মনোনিবেশ করে, তা আমরা আলোচনায় তুলে ধরেছি। দেখা গেছে যে, ভারতের সমাজের পটভূমি থেকে জাতি এই সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান

তুলে আনার প্রচেষ্টায় শাসকেরা জনগণনা শুরু করেন। এই শাসককুলের জনগণনার প্রধান লক্ষ্য ছিল, জাতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের। ১৮৮১ সাল থেকে ক্ষেত্রস্থল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, সর্বভারতীয় পটভূমিতে বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, জীবিকার ধরন, রীতি-নীতি, জাতি কাঠামোয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির সামাজিক অবস্থানের নির্ণয়ের চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের জাতিভেদ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞান লাভের লক্ষ্যে আমরা অগ্রসর হব। জনগণনার ফলে, কিছু সংখ্যক নিম্নজাতির মানুষের মধ্যে নিজ নিজ জাতির সামাজিক অবস্থান প্রশাসনিক এই নথিভুক্তির পথ ধরেই উন্নত করার প্রচেষ্টা করে।[১] কাজেই নানা ধরণের টানাপোড়েন দেখা যায়, যার প্রভাব সমাজ, রাজনীতি ও তত্ত্বগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে সকল ছাপ রাখে, তা আমরা আলোকপাত করেছি, যা আমরা নমঃশূদ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরব।

আমাদের দেশের স্বাধীনতার পাঁচ–ছয় দশক আগে থেকেই অবদমিত জাতিদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জোরালো উপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করে স্বাধীন ভারতের পরিমণ্ডলে অবদমিত জাতির রাজনৈতিক অবস্থান বোঝার চেষ্টা করেছি। ১৯০৯ সালে মোন্টেমর্লে অ্যাক্ট পাশ হওয়ার দরুন অবদমিত জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের অক্সিজেন পায়। তার অনেকটাই, আগামী দিনে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অবদমিত জাতিদের সুরক্ষার জন্য যে রক্ষাকবচ সুনিশ্চিত পাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হয়েছিল। দেখা গেছে যে, ১৯১৯ সালে সাউথবরো কমিটির কাছে প্রতিবেদনের সময় থেকেই আম্বেদকরের রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন, এবং একদিকে যেমন তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে জোরালো টানাপোড়নের সঙ্গে লিপ্ত হন, ও অন্যদিকে গান্ধী তথা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তীব্র সংঘাতের পথে চলে যান। আমরা এও উল্লেখ করেছি যে, তিরিশের দশকে আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন এই লড়াই অস্পৃশ্য জাতি বা ডিপ্রেসড ক্লাসের দাবি-দাওয়ার বিষয়টিকে ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে তুলে নিয়ে আসে।[২] উক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকে আধুনিক রাজনীতির পরিভাষায় বলা হয়, সংগঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে অবদমিত জাতির লড়াই, যা আধুনিক ভারতের সেই সময়ের ইতিহাস তৎকালীন ঘটনাবলিকে অনেকটাই নথিভুক্ত করা হয়েছে, আমরা তা ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লিপিবদ্ধ করেছি। এর ফলে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে, প্রচলিত রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার পাশাপাশি দলিত গবেষক ও দলিত দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা প্রাপ্ত ফলের মধ্যে

বেশ ফারাক থেকেই যায়, এছাড়া তুলে ধরেছি যে, ‘দলিত’ মানুষের চোখে সেই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। তা সত্ত্বেও সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসেও প্রাপ্ত স্থান থেকে পাওয়া যায়, ‘দলিত’ নারীদের রাজনৈতিক ইতিহাস। কাজেই পরবর্তীকালে নারীদের তাগিদেই সেই রাজনৈতিক ইতিহাস খননের দাবি ওঠে ও তার প্রক্রিয়াও শুরু হয়।[৩] তাইতো আমরা প্রাচীন, মধ্যকালীন এবং আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে দলিত নারীদের অবস্থান এই পরিচ্ছেদে তুলে ধরেছি। এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, দলিত পুরুষদের থেকেও যে বিপুল ভাবে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে দলিত নারীদের অবস্থান সমাজের একেবারে তলানিতে রাখা হয়েছিল।

আমরা আমাদের গবেষণা পত্রের এই পরিচ্ছেদে, ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ‘দলিত’ শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। এর কারণ হল, ভারতের সমাজে ‘দলিত’দেরকে সময়ের নিয়মে ও আন্দোলনের ধরনের দিকে লক্ষ দিয়েই তাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিতি পেতেছে। কাজেই আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে, দলিতদের নামের পরিবর্তন ঘটলেও তাদের সামাজিক ও রাজনীতিক আঙিনায় সম্মানের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। তাইতো আমরা ‘দলিত’ পরিচিতির নানা দিক থেকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি। যাতে করে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের জাতি-বর্ণ চেতনার রাজনীতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ‘দলিত’রা কেন বা কী কারণে প্রভাব বিস্তার করেছে, উক্ত দলিত শব্দের ব্যবহারের মধ্যদিয়ে, সেটাও বিস্তারিত ভাবে আমরা তুলে ধরেছি। এর কারণ হল, ভারতের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক পরিকাঠামোর অভ্যন্তরে রচিত তা ভারতের রাজনীতিতে স্পষ্টতই দেখা গেছে যা ‘দলিত’ জাতি সমূহের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সম্মানের যে অক্লান্ত লড়াই করতে হয়েছে, যার ফলে যে কয়েক হাজার বছরের বর্ণ হিন্দুদের একক আধিপত্যের ভিত্তিতে ক্রমাগত আঘাত হেনেই চলেছে। এই আঘাত হানার সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের ইতিহাস আজকের দিনেও দলিত মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে লিপিবদ্ধ হয়নি-যেটুকু হয়েছে, তা প্রচলিত ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারায় এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে ঘটনাবলীর পেশ করা উপস্থাপন মাত্র। এই গবেষণায় ইতিহাসের সেই অন্ধকার থেকে ‘দলিত’ নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতিসম্মুহের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিচয় তুলে আনার প্রয়াস করা হয়েছে গবেষণামূলক প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনার করার সময় আমরা লক্ষ্য করলাম যে, দলিত জাত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত জাতি দু'টির সামাজিক ইতিহাসটা একনয়। উপরিউক্ত দলিত জাতির দু'টির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর কয়েকটি প্রামাণ্যগ্রন্থ ছাড়া তেমন কোন গন্থ নেই। ফলে দুটি জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে, প্রামাণ্যগ্রন্থের ও তথ্যের প্রয়োজন হয়। যেমন আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির উক্ত আলোচ্য বিষয়ের গ্রন্থের থেকে নমঃশূদ্র জাতির অধিক সংখ্যক গ্রন্থ আমরা পেয়েছি। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষেরা নিজের মতো করে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন। সেই সমস্ত গ্রন্থ থেকে এবং কিছু সংখ্যক গবেষকের গবেষণা ও আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে যেসকল তত্ত্ব ও তথ্যের সাহার্য্যে আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনায় আমরা নমঃশূদ্রদের সামাজিক পরিচয় পেয়েছি অতিশূদ্র ও চণ্ডাল বা চাঁড়াল হিসাবে, যাদেরকে হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণের বাইরে রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনকালের শেষের দিকে মতুয়া ধর্মগুরু গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে নমঃশূদ্ররা অস্টোলিয়ান খ্রীষ্টান পাদরী মীড সাহেবের সহযোগিতায় ভারতের প্রথম আদমসুমারি থেকেই বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ঐতিহাসিকদের তথ্য তুলে ধরে তারা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন, এই মর্মে যে তারা চণ্ডাল নয় তারা নমঃশূদ্র। প্রথম ও দ্বিতায় আদমসুমারিতে নমঃশূদ্রদের চণ্ডাল হিসেবেই কর্তৃপক্ষ তালিকাতে নথিভুক্ত করেন। নমঃশূদ্রদের নিকট বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় আদমশুমারিতে নমঃশূদ্র হিসেবে নথিভুক্ত করা, তাইতো তারা বিভিন্ন সামাজিক সমিতি এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করে তারা সরকারি দলিলে পাকাপাকি ভাবে নমঃশূদ্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের হিন্দু সমাজ কাঠামোর চতুর্বর্ণের বাইরে রাখা হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আদমশুমারিতে পোদ নামে কর্তৃপক্ষ নথিভুক্ত করেন। যেমন ভাবে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এবং ধর্মীয় ও ঐতিহাসিকদের তথ্য তুলে ধরে চণ্ডাল থেকে নমঃশূদ্র হয়েছিল, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সেই ভাবে পোদ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হওয়ার জন্য আদমশুমারি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এখনও আদমশুমারিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পোদ/পৌণ্ড্র হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। কাজেই বলা যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে একজন গুরুচাঁদ ঠাকুর ন্যায় নেতৃত্ব ছিল না এবং তাদের সামাজিক

আন্দোলন নমঃশূদ্রদের মতন সুসংগঠিত ছিল না বা এখনেও গড়ে ওঠেনি। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, পোদ বা পৌণ্ড্রদের কেন আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি হিসেবে তুলে ধরলাম, এর কারণ হল, সাংস্কৃতিয়াজেশন। ভারতের অনেক দলিত জাতিই সরকারিভাবে যে নামে তালিকাভুক্ত থাকেন, সেটা ব্যাবহার না করে সম্মানীয় শব্দ ব্যাবহার করেন। ঠিক 'পোদ' বা পৌণ্ড্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি হিসেবে সমাজে পরিগণিত হয়। তবে 'চণ্ডাল' থেকে 'নমঃশূদ্র' এবং পোদ থেকে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' হলেও আমাদের সমাজের যে জাতিভেদ কাঠামো তাতে করে উক্ত দলিত জাতির সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে কি? না পাবে না তা একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন। সামাজিক সম্মান পেতে হলে জাতিগত একটা পরিচয় লাগেই কিন্তু বর্তমানে সুশিক্ষিত হলে ও সুকর্মের সঙ্গে লিপ্ত থাকলে সম্মান পাওয়া যায়। আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষা ও বিভিন্ন সরকারি তথ্যের থেকে জানতে পেরেছি নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার এবং সরকারি উচ্চ পদে নিযুক্তির সংখ্যাটা বেশ আশা জনক। নমঃশূদ্র জাতির থেকে পৌণ্ড্রজাতির মানুষেরা শিক্ষার শতাংশের হারে এগিয়ে থাকলেও সরকারি উচ্চপদের ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্ররা অনেকটা এগিয়ে।[৪] এর কারণ হল দেশভাগের ফলে কৃষি জমি হারা নমঃশূদ্রজাতির মানুষেরা শিক্ষায় ও চাকরির পাওয়ার ক্ষেত্রে সংরক্ষণকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে চলেছে। কাজেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বেশ সংখ্যক মানুষ প্রশ্ন তোলেন তাঁদের সংরক্ষণের ভাগের সরকারি চাকরির উপর নমঃশূদ্ররা ওপারবাংলা থেকে এসে ভাগ বসিয়েছে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষ মূলত কৃষিজীবী । পৌণ্ড্রদের একটা বড় অংশের মানুষ মাছ ধরার পেশায় যুক্তছিলেন এবং আছেন। এর প্রমাণ আমরা পাই, একসময় 'পৌণ্ড্র' অধ্যুষিত কোলকাতার কিছু জায়গার নাম থেকে যেমন, তপসিয়া, বেলেঘাটা, টেকরা, চিংরীঘাটা ও কৈখালী।[৫] শহরের সম্প্রসারণ হওয়ার মধ্যে দিয়েই কৃষিজীবী পৌণ্ড্রদের সুন্দর বনের দিকে চলে যেতে হয়। ফলে সেখানে গিয়েও তাঁদেরকে কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরার পেশাটাও ধরে রাখতে হয়েছে আর্থিক কারণে। সুন্দর বনের প্রাকৃতিক কারণেই পৌণ্ড্রদের কঠোর পরিশ্রমিক ও সাহসী জাতিতে পরিণত করেছে। আবার অধিকাংশ নমঃশূদ্ররা পূর্ববঙ্গে থাকার সময় থেকে জলাজমিতে বসবাস করার কারণে তাদের কৃষিকাজ ও মাছ ধরার পেশার সঙ্গে যুক্ত করেছে।[৬] এর প্রমাণ পাওয়া যায় নমঃশূদ্রজাতির প্রাক্তন একজন আই.পি.এস (সি.বি.আই. অধিকর্তা) আধিকারিকের বক্তব্যে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্যে তারঁ কাছে

গেলে তিনি আমাদের জায়িয়েছেন যে, নমঃশূদ্রজাতির একটা অংশের মানুষ মাছ ধরা ও ব্যবসার জন্যে নৌকার ব্যবহার করতেন ব্যাপক হারে, তাইতো দাঁড় টানতে টানতে তাদের বুকের ছাতি বীরপুষেদের এবং যোদ্ধা শ্রেণীর ন্যায় হয়।[৭] পশচিমঙ্গে এসেও তারা জলা জমিতে বসবাস করার জন্যে কৃষি কাজের সাথে সাথে কিছু সংখ্যক মানুষ মাছের চাষ করেন। এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি সাংবিধানিক সংরক্ষণের মাধ্যমে উক্ত জাতি দুটি শিক্ষা অর্জন করে সরকারি ও বেসরকারি চাকরি করে আগের থেকে তাঁদের আর্থিক অবস্থার অনেক বড় উন্নতি হয়েছে। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ২০০ জন মানুষের উপর আমরা যে, ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি, তাদের মধ্যে থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন আগের থেকে বর্তমানে তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থান অনেক উন্নতি হয়েছে।[৮]

নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের তুলনামূলক তেমন কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই। ফলে আমরা আমদের ক্ষেত্রসমীক্ষার ও সরকারি দলিল দস্তাবেজের তথ্যকে ব্যবহার করে উপরের আলোচ্য অংশটা প্রস্তত করেছি। পরাধীন ভারতের জাতি-ভিত্তিক রাজনীতিতে পৌণ্ড্রজাতি এবং নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস মোটামুটি ভাবে একই ধারায় ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু দেশভাগের পরের দুই দশকে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বেশ বেশি ছিল। নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক অবস্থানের ইতিহাস স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে (১৯৪৭-১৯৭১ –এর অংশগ্রহণের পর্যায়) ঠিক কেমন ছিল এবার আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করব। আমরা উপরিউক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিষয় নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলাম নমঃশূদ্র ও পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থ-সামাজিক জীবনে যেসকল সমস্যা ছিল বা আছে তা ঠিক কতটা বেদনাদায়ক বা সুখকর ছিল। এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, ১৯৬৪ সালের জাতিদাঙ্গা এবং ১৯৭০-এর দশকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্ত সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। কাজেই দেশভাগের কারণে যেমন খুলনার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজনৈতিক নেতা পতিরাম সরকার ও রাজেন্দ্রনাথ সরকারের মতন ব্যক্তিদের ভারতে চলে আসতে হয়েছিল। ঠিক তেমন ভাবে অধিকাংশ নমঃশূদ্র নেতাদের ভারতে চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু ৬০ এবং ৭০ এর দশকে ধারাবাহিক ভাবে নমঃশূদ্র জাতির মানুষদের ভারতে চলে আসতে হয় উদ্বাস্ত হিসেবে। নমঃশূদ্র জাতির অধিকাংশ উদ্বাস্তরা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও ২৪ পরগনাতে বসতি স্থাপন করে। উপযুক্ত নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার না থাকার কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্ররা অনেকটা পিছিয়ে যায়।[৯]

কোন জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে বর্তমানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের ব্যাখ্যা করাটা বৈজ্ঞানিক ভাবে তুলনামূলক পর্যালোচনা যথোপযুক্ত। নমঃশূদ্র জাতির আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে হরিচাঁদ গুরুচাঁদের মতুয়া আদর্শ স্ববিশেষ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় লক্ষ করেছি যে, মতুয়াদের মধ্যে এক শ্রেণীর গুরুদেবের আবির্ভাব হয়েছে, এরা শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে তাঁদের কাছ থেকে প্রণামি গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বর্তমানের মতুয়াদের সংঘজনী কে প্রশ্ন করা হলে তিনি আমাদের জানান যে, উক্ত শোষক ধর্ম গুরুর প্রাধান্যের কথা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেননি। কাজেই এরা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের সমাজসেবার ধর্মীয় আদর্শ বুঝতে পারেননি। তিনি বলেন মতুয়া ধর্মের আদর্শ শুধু ডাংকা বাজানো বা সাধুসেবা দেওয়া নয়। সমাজের পতিত মানুষকে সামাজিক ও আর্থিক ভাবে উন্নত করার লক্ষ্যে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই কাজ করাকেই মতুয়া ধর্মের মূল আদর্শ। এখন কিছু ভেকধারি সাধুদের আচরণের ফলে মতুয়া আদর্শ অবনমিত হচ্ছে। সংঘজনী আরও, বলেন শাশুরীমা ঠাকরাণী জলপড়া ও চালপড়া এবং তুকতাক দিয়ে ভক্তদের নিকট থেকে প্রণামী নিতেন। আমি এই নীতিতে বিশ্বাসী নই। কারণ হল আমিও তো শোষক ধর্মগুরুদের ন্যায় হয়ে যাবো যা কিনা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর কঠোর ভাবে প্রতিবাদ করতেন, মতুয়াদের মধ্যে উক্ত ধর্মীয় গুরুদের কারণেই মতুয়া সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে কাজেই সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পরছে। তিনি বলেন, আমি বৌদ্ধকে মানি, রাজা রামমোহন রায়কে ও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। যাঁরাই সমাজ সংস্কারের কাজ করবেন আমি তাঁদের প্রদ্ধা করি।[১০] ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় দেখতে পেয়েছি নমঃশূদ্রদের একটা অংশ পুরোহিত তন্ত্রকে না মেনে নিজের আদর্শের মধ্যে দিয়ে পিতা মাতার শ্রাদ্ধর ক্রিয়াকর্ম করে এবং বিবাহের ক্ষেত্রেও নিজের মতন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নৈহাটির একজন মতুয়া গবেষক, উক্ত সকল ক্রিয়াকর্ম গুলো মতুয়া মতে করে থাকেন। কিন্তু আমরা এও দেখেছি যে, অধিকাংশ নমঃশূদ্রই হিন্দু রীতি নীতি ও পুরোহিত তন্ত্র মেনে পিতা মাতা শ্রাদ্ধ থেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং বিভিন্ন পুজো পার্বন সবই প্রচলিত সংস্কার মেনেই করেন।[১১] তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী নমঃশূদ্র জাতিতে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ হয়েছেন। কাজেই বলা যায় যে, নমঃশূদ্রদের মধ্যে যেমন রাজনৈতিক মতপার্থক্যের মানুষ আছেন আবার তাদের

মধ্যে ধর্মীয় মতের পার্থক্যের মানুষ ও আছেন। ফলে আমরা যদি মনে করি নমঃশূদ্রদের মধ্যে কোন ধর্মীয় পার্থক্য নেয় তা হলে আমাদের ভুল হবে।

আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেখতে পেয়েছি যে, এঁদের একটা অংশের মানুষ চরম হিন্দু ধর্মের পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধী তাঁরা নিজেদের পিতা মাতার শ্রাদ্ধ এবং বিবাহ বন্ধন ও পুজো পার্বন পালন করেন নিজেদের মতন করে। যেমন যেমন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসংঘের কয়েকজন সদস্য ও কয়েকজন অধ্যাপক, স্কুল শিক্ষক এবং আরও অনেকে আছেন এই মতের মানুষ। এছাড়াও এদের মধ্যে একটা অংশের মানুষ বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী। তবে নমঃশূদ্রদের মতন এদের অধিকাংশ মানুষ হিন্দু রীতি নীতি ও পুরোহিত দিয়েই সামাজিক ক্রিয়াকর্ম পুজো পার্বন করে। নমঃশূদ্রদের মতন মতো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যেও ধর্মীয় মতপার্থক্য বিদ্যমান এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্যও বিদ্যমান।

আমরা তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখতে পেলাম ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯ এবং ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে কোন প্রার্থীই জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের টিকিটে নির্বাচিত হতে পারেননি। নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জাতিগত সংরক্ষিত আসন ও সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম ১৯৭১ সালে থেকে ১৯৯৯, ২০০৯ সাল পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নমঃশূদ্রদের থেকে অনেকটা এগিয়েছিল। ১৯৮৯, ১৯৯১, ২০০৪ ও ২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে থেকে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে এগিয়েছিল। আবার নির্বাচিত জয়ী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯৯, ২০০৪ এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অনেক বেশি সংখ্যায় এগিয়েছিল। নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়ে থাকার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অধিকাংশ মানুষই দুই ২৪ পরগনায় স্থায়ী বসবাসরত নাগরিক এবং সংরক্ষিত আসন গুলোও পৌণ্ড্র অধ্যুষীত দুই ২৪ পরগনায় অধিক ছিল। ২০১৪ সালের নির্বাচনে এসে দেখা গেল নমঃশূদ্র অধ্যূষিত ২ টি সংরক্ষিত কেন্দ্র আর ২ টি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত কেন্দ্র, কাজেই উত্তর আচরণ বাদের তত্ত্বানুসারে গণতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনৈতিক নির্বাচনে ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সব রাজনৈতিক দলই জাতিগত বসবাসরত সংখ্যার উপর নির্ভর করে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রার্থী দিয়ে থাকেন। ফলে রাণাঘাট ও বনগাঁ লোকসভা

কেন্দ্রে রাজ্যের ও দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নমঃশূদ্র জাতির মানুষদের প্রার্থী করেন, ঠিক আবার মথুরাপুর ও জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র দুটিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষদের প্রার্থী করেন। এছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নমঃশূদ্র জাতির অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে এবং নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার না থাকার কারণে এদের ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অংশগ্রহণ করা একটা বড় বাঁধা ছিল। কাজেই ২০০৩ সালের ভারত সরকারের নাগরিকত্ব বিল কার্যকর না হওয়ার জন্য নমঃশূদ্রের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে এসে ভারতের ভোটাধিকার পেয়ে যায়, ফলে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে সংসদীয় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে এগিয়ে যায়। আবার আরও একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নমঃশূদ্ররা মতুয়া মহাসংঘের নেতৃত্বে সংবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে সংখ্যায় বেশি অংশগ্রহণ করে থাকেন।[১২] শুরুতে যদিও মতুয়া মহাসংঘের নীতি ছিল অরাজনৈতিক তবে ২০০৯ সালের পরে তা রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। ফলে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে মতুয়া মহাসংঘ তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক মিছিল ও মিটিংয়ে অংশগ্রহণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে অনেকটা এগিয়ে যায়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই মতুয়াদের ঠাকুর বাড়ি দুটি রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে নমঃশূদ্রদের প্রধান রাজনৈতিক দল বি.জে.পি ও তৃণমূল কংগ্রেসের হয়েই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। বনগাঁ লোকসভার কেন্দ্রের সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের হঠাৎ মৃত্যুতে মতুয়া মহাসংঘ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মমতা ঠাকুরের নেতৃতাধীন মতুয়া মহাসংঘ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক দলের পক্ষ নিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের নেতৃতাধীন মতুয়া মহাসংঘ বি.জে.পির রাজনৈতিক দলের পক্ষ নিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। দেখা যায় নমঃশূদ্রদের অনেক আগে থেকেই একটা রাজনৈতিক সচেতন ছিল।[১৩] কাজেই সচেতন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ঠাকুর বাড়ীর দুটি রাজনৈতিক শিবিরে অংশগ্রহণ করার ফলে নাগরিকত্ব লাভের আশায় আগের থেকে বেশি সংখ্যায় মানুষ সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসংঘের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক মানুষ সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে

রাজনৈতিক অংশগ্রহণে ক্ষেত্রে সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন করতে থাকেন।[১৪] যদিও নমঃশূদ্রদের পৌণ্ড্রদের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটা ওতটা সংবদ্ধ ছিল না। কাজেই সংসদীয় রাজনীতিতে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অংশগ্রহণ তেমন একটা দেখা যায় না। আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্র-ছাত্রদের মধ্যে পৌণ্ড্র জাতির সামাজি ও রাজনৈতিক অবহেলিত হওয়া ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে, তাদের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিভূমি গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রেরনা দিয়ে চলেছে।[১৫] আমরা দেখতে পেলাম উপরিউক্ত যেকটা লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন, এক্ষেত্রে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সংখ্যায় অনেকটা এগিয়ে।

আমরা উল্লেখ করেছি **১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০১, ২০১১ ও ২০১৬** সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণ নিয়ে।

আমরা দেখতে পেলাম উপরিউক্ত নির্বাচন গুলোতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে কোন প্রার্থীই জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের (যেমন বি.এস.পি. ও আর.পি.আই) টিকিটে নির্বাচিত হতে পারেননি। নদীয়া, দুই ২৪ পরগনায় জাতিগত সংরক্ষিত আসন ও সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম **১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০১** সাল পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নমঃশূদ্রদের থেকে অনেকটা এগিয়েছিল। শুধুমাত্র **২০১১** ও **২০১৬** সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে থেকে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে এগিয়েছিল। আবার নির্বাচিত জয়ী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে **১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০১** সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অনেক বেশি সংখ্যায় এগিয়েছিল। নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়ে থাকার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অধিকাংশ মানুষই দুই ২৪ পরগনায় স্থায়ী বসবাসরত নাগররিক এবং সংরক্ষিত আসন গুলোও পৌণ্ড্র অধ্যুষীত দুই ২৪ পরগনায় অধিক ছিল। **২০১১** সালের নির্বাচনে এসে দেখা গেল নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে **১০** টি সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্র আর **১১** টি বিধানসভা কেন্দ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে ছিল। এছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে নমঃশূদ্রদের অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশ থেকে এসে নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ছরিয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে এবং নাগরিকত্ব এদের ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করা একটা বড় বাঁধা ছিল, যার কারণ আমরা আগেই

উল্লেখ করেছি। কাজেই ২০১১ সালের পর থেকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও সামাজিক আন্দোলনের মধে দিয়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নমঃশূদ্ররা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে এগিয়ে যায়।

তবে আমরা উল্লেখ করব নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সাধারণ পেশার এবং বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ২০০ জন মানুষের উপর প্রশ্নমালা তৈরি করে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি। রাজনৈতিক কর্মী থেকে সাধারণ পেশার মানুষ সকলেই বলেছেন, উক্ত জাতি দুটির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক নেতা-নেত্রীর গুরুত্ব তেমন কোন বৃদ্ধি পায়নি। এদের সকলের বক্তব্য থেকেই উঠে এসেছে, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, জগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও হেমচন্দ্র নস্কারের মতো নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি থেকে এখন পর্যন্ত তেমন গনজননেতা উঠতে পারেননি।[১৬] যেমন বামফ্রন্ট থেকে রাজ্যস্তরের দলের সিদ্ধান্ত নেওয়া কোর কমিটির কমিটির কোন নেতা ছিল না, আবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন নেতা বা নেত্রী উক্ত জাতির থেকে নেই।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি দুটি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশী দলিত জাতি ছাড়া অন্যান্য দলিত জাতির তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে। তবে আমরা জাতিগত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রভূমি নিয়ে গবেষণা করায় বেশ জ্ঞান অর্জন করতে পারলাম। তবে লোকসভায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার সময় সীমা ধরেছি ১৯৭১-২০১৬ সাল পর্যন্ত। নমঃশূদ্র জাতি অধ্যুষিত নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রে ১৯৭১-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বামপন্থী দলের সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার কারণে ওঁদের জাতির থেকে মন্ত্রী হওয়ার কোন সুযোগ পায়নি। কারণ হল লোকসভায় কোন দিনই বামপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তাইতো তাঁরা কেউই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি বা অন্যকোনো মন্ত্রীও হতে পারেননি। বামপন্থী নমঃশূদ্র সাংসদের পক্ষে তাঁদের নিজের জাতির ও উদ্বাস্তুদের নিয়ে লোকসভায় নিজের কোন মতামত দিতে পারেন। কারণ হল, বামপন্থীদের রাজনৈতিক কিছু অনুশাসন থাকে তার বাইরে বেড়িয়ে কোন কাজ সাংসদরা করতে পারে না। তবে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভা ঘোষ গোস্বামী ভারতের লোকসভায় যে ভূমিকা দেখতে পেয়েছি, তা হল শ্রেণী সংগ্রাম নিয়ে তর্কবিতর্কে বেশির ভাগ সময় মতামত দিয়েছেন। বিভা দেবী নিজেও বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেত্রীত্ব স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেও পরে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে কোনরূপ গঠনমূলক কাজের নিদর্শন আমরা পাইনি।

বিভা ঘোষ গোস্বামীর বাবা ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী কাজেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ফলে শৈশব কাল থেকেই বিভা দেবী জাতি-ভিত্তিক আন্দোলন থেকে শ্রেণীগত সচেতনার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। সাংসদ বিভা দেবী হয়তো তাঁর জাতির সমস্যা নিয়ে লোকসভা কোনরূপ ভূমিকা পালন না করলেও দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার নিয়ে লোকসভায় বহুবিতর্কে অংশগ্রহণ করে নিজের তেজস্বী বক্তব্য রাখতে কোন জড়তা বোধ করতেন না। বিভা ঘোষ গোস্বামী যেহেতু নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে থেকে ওঠে আসা রাজনৈতিক নেত্রী ছিলেন না, সেহেতু তিনি নমঃশূদ্র জাতির অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত তেমন কোন ধারণাও ছিল না। তাইতো তিনি লোকসভায় সবসময় জাতিগত রাজনৈতিক চেতনা থেকে শ্রেণীগত রাজনৈতিক চেতনার প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পেরেছেন। মথুরাপুর কেন্দ্রের সাংসদ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ মধুরজ্যা হালদার (১৯৭১-১৯৭৭) ও মুকুন্দ কুমার মণ্ডল (১৯৭৭- ১৯৮৪) বামপন্থী সাংসদ হওয়ার কারণে বিভা ঘোষ গোস্বামীর মত লোকসভায় কোনরূপ জাতিগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেননি। ওঁনারা যা ভূমিকা লোকসভা রেখেছেন তা হল দরিদ্র শ্রেণীর জন্যে ও শ্রেণী চেতনা রাজনীতিতে। জয়নগর কেন্দ্রেও পৌণ্ড্রজাতির মানুষ শক্তি কুমার সরকার (১৯৭১-১৯৭৭ এর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে) ও (১৯৭৭-১৯৮০ পর্যন্ত ভারতীয় লোকদলের টিকিটে) নির্বাচিত হয়ে তাঁর নিজের জাতিগত উন্নয়ন ও এলাকার উন্নতি জন্যে লোকসভার অধিবেশনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বামপন্থী সাংসদ সনৎ কুমার মণ্ডল জয়নগর কেন্দ্র থেকে টানা ১৯৮০- ২০০৯ সাল পর্যন্ত সাংসদ ছিলেন। সনৎ কুমার মণ্ডলও বিভা ঘোষ গোস্বামীর ন্যায় শ্রেণী চেতনার ক্ষেত্রে লোকসভায় ভূমিকা রেখেছেন, জাতিগত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি। আবার মথুরাপুর কেন্দ্রের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাংসদ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ মনোরঞ্জন হালদার ১৯৮৪-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সরকারের পক্ষের সাংসদ হওয়ার দরুন লোকসভায় জাতিগত ও নিজের সাংসদ এলাকার উন্নয়নের জন্যে দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে বাম সাংসদদের থেকে বেশ ভালো ভূমিকা পালন করেছেন। বিভা ঘোষ গোস্বামীর রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরে নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই. (এম)র টিকিটে অসীম বালা ১৯৮৯-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সাংসদ হয়েছিলেন। নমঃশূদ্র জাতির মানুষ অসীম বালার বাড়ি ঠাকুরনগরে তিনি নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলন ও প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের উদ্বাস্তু ও মতুয়া আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু বালা বাবু

লোকসভায় কখনও নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের জন্যে কোন পদক্ষেপ করেননি। এক্ষেত্রে আমরা ১৯৮৯-১৯৯৯ সালের মধ্যে কতগুলো লোকসভার অধিবেশনে এবং বিতর্ক সভার সরকারি তথ্য থেকে জানতে পারি। এই সময়ের মধ্যে নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদ নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সঙ্গে যখন আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্ন করি যে, আপনি কি স্বাধীনভাবে লোকসভায় আপনার জাতির হয়ে কোন বিল উত্থাপন করতে পেরেছেন? উত্তরে প্রাক্তন সি.পি.আই.এমের সাংসদ বলেন, "আমি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারতাম কিন্তু দলের নীতির বাইরে বেরিয়ে কোন কাজ বা মতামত ও বিল উত্থাপন করতাম না"।[১৭] কাজেই সি.পি.আই.এমের সাংসদের কথাই বামপন্থী রাজনৈতিক দলের রীতি নীতি নমঃশূদ্র ও মতুয়াদের জন্য কি ছিল তা তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ব্যাখ্যার উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, "আমার দল দরিদ্র মানুষের স্বার্থের জন্যে কাজ করেন, কাজেই আমার জাতির অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র, ফল, আমার দলের দ্বারা নমঃশূদ্র জাতির মানুষ ব্যাপক ভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবে উন্নতি ঘটেছে বলে মনে করি।[১৮] শুধু মনে করি বললে হয় না তথ্য প্রমাণ দিতে হয়, উত্তরে তিনি বলেন, "বিভিন্ন সালের পঞ্চবার্ষিকীর রিপোর্ট ও সরকারি দলিল-দস্তাবেজ দেখলেই তার প্রমাণ পাবেন"।[১৯] আমরা প্রশ্ন করি, "ওগুলো তো কেন্দ্র সরকারের পরিকল্পনার রিপোর্ট আপনারা রাজনৈতিক দল কেন্দ্র সরকারে মূল ক্ষমতায় কোন থাকেননি, তাহলে কেন দাবি করছেন যে, নমঃশূদ্র ও মতুয়াদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনি সাংসদ থাকালীন তাঁদের সামাজিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ব্যাপক ঘটেছে"।[২০] কিন্তু আমরা বিভিন্ন সরকারি তথ্য প্রমাণ থেকে জানতে পেরেছি যে, বামপন্থী নমঃশূদ্র সাংসদগণ লোকসভায় সামাজিক ভেদাভেদ নিয়ে তেমন কোন বিতর্কে অংশগ্রহণ বা ভূমিকাও রাখতে পারেননি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে থেকে পৌণ্ড্র জাতির মানুষ রাধিকা রঞ্জন প্রামানিক (১৯৮৯-২০০৪ সাল পর্যন্ত সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত হন) ও বাসুদেব বর্মন (২০০৪-২০০৯ সাল পর্যন্ত সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত) কাজেই উক্ত দুজন বামপন্থী সাংসদ লোকসভায় জাতিগত উন্নয়নের চেয়ে শ্রেণীগত উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে বি.জে.পি ও তৃণমূলের জোট প্রার্থী আনন্দ মোহন বিশ্বাস নির্বাচিত হন। কাজেই কেন্দ্রে সরকারের অল্পকিছু দিনের জন্য সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, বি.জে.পি জোট সরকার সঙ্গে ছিলেন, মমতা ব্যানার্জী রেলমন্ত্রী হন। ফলে সাংসদ আনন্দ মোহন বিশ্বাস লোকসভায় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া রাখতেন এবং

নিজের কিছু মতামতা স্বাধীনভাবে দিতে পারতেন, যা কিনা বামপন্থী সাংসদ নমঃশূদ্ররা দিতে পারেনি।[২১] ২০০৩ সালে নতুন নাগরিকত্ব আইন আসার ফলে নমঃশূদ্রদের বিরাট অংশের মানুষ নাগরিকত্ব না থাকায় নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েন। এই সময় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ আনন্দ মোহন বিশ্বাস নমঃশূদ্রদের হয়ে লোকসভায় কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি এবং সাধারণত নমঃশূদ্র সমস্যার কোন সুহারা দিতেও পারেননি। এর কারণ হল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস বি.জে.পির জোট সরকারে ছিলেন না। সাংসদ আনন্দ মোহন বিশ্বাস নমঃশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলনের কথা মাথায় রেখেই জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক কাঠামোর শক্তভূমি রচনা করার ক্ষেত্রে তাঁর সাংসদ এলাকার নমঃশূদ্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁদের মতামত শুনে লোকসভায় নিজের জাতির হয়ে সওয়াল হয়েছেন।[২২] এর প্রমাণ আমরা পাই ১৯৯৯-২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি যে সকল বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করেছেলেন সেই সরকারি দলিল দস্তাবেজ ও সরকারী রিপোর্ট থেকে। ২০০৩ সালের এন.ডি.এ সরকারের নতুন নাগরিকত্ব আইনের ফলে ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আবার নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই.এম প্রার্থী নমঃশূদ্র জাতির মানুষ নির্বাচিত হন। সি.পি.আই.এম সাংসদ তাঁর নির্বাচনের প্রচারে সময় বলেছিলেন, "আমরা বামপন্থীরা যদি কেন্দ্রে সরকার গড়ি, তাহলে নাগরিকত্বের ২০০৩ সালের আইনের সংশোধন করে নমঃশূদ্রদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে"।[২৩] কিন্তু নির্বাচনের পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সরকার গঠন করার জন্যে প্রয়োজনীয় লোকসভার সাংসদ না থাকার কারণে সরকার গড়তে সমস্যা দেখা দিলে বামপন্থী দলগুলো বাইরে থেকে সমর্থন করে কংগ্রেস দলকে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। ২০০৪-২০০৯ সালের মধ্যে লোকসভার অধিবেশনে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদ যতবার বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন, কোন বারই তিনি নমঃশূদ্রদের নাগরিকত্ব নিয়ে কথা বলেননি। নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদ কথায়, "আমরা তো বামপন্থী দলের সাংসদ আমরা তো নমঃশূদ্রদের সাংসদ হতে পারি নি। কাজেই দলীয় অনুশাসনের বাইরে বেড়িয়ে নিজের জাতির সমস্যা নিয়ে কথা বলা যায় না। তাইতো লোকসভায় জাতিগত দাবি-দাওয়া নিয়ে সওয়াল না হতে পারলেও দরিদ্র শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি করার লক্ষ্যে সওয়াল হতে পেরেছেন"।[২৪]

আবার সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের গ্রামের আন্দোলনের মাধ্যমে এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষের অধ্যুষিত লোকসভা আসনের ১০০ শতাংশ লোকসভা

আসন পায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। কাজেই দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জী নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির লোকসভার সাংসদদের বিশেষ স্বাধীনতা দিয়ে লোকসভার বিতর্কে সভায় অংশগ্রহণের অধিকার দেয়। ফলে রাণাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের নমঃশূদ্র জাতির মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ এবং বনগাঁ কেন্দ্রের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও জয়নগর কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী সাংসদ এবং মথুরাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ লোকসভা কেন্দ্রের উন্নতি ঘটানোর জন্যে লোকসভার অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে পেরেছেন বলে তাঁরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন।[২৫] তবে মথুরাপুর লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ বলেন, “আমি তো সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কোন নির্দিষ্ট দলিত জাতির সাংসদ নোই, আমি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ হতে পারি, তার মানে এই নয় যে, শুধুমাত্র লোকসভায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের উন্নয়নের কথা বলবো। আমি আমার সাংসদ এলাকার সকল মানুষের জন্যেই কাজ করি।[২৬] কিন্তু বিরোধী প্রার্থীর আমাদের বলেন, “মথুরাপুর লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ভোটের আগে প্রচারে বলেছিলেন, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির জন্যে বিশেষ বিশেষ উন্নয়ন মূলক কাজ করবো। কাজেই উনি নির্বাচিত হওয়ার পরে এখন বলছেন সব জাতির মানুষের জন্যেই কাজ করেছি। আমার যতদূর জানা আছে ওঁনি লোকসভায় ওঁনার এলাকার জন্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রস্তাব রাখতে পারেননি”।[২৭] তবে বলা যেতে পারে চৌধুরী মোহন জাঁতুয়া একজন নিষ্ঠাবান তৃণমূল সাংসদ হিসাবে তাঁর ভূমিকা লোকসভায় রেখেছেন। ২০১৪ সালে নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনার ৪ টি সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে নমঃশূদ্র জাতির তাপস মণ্ডল রাণাঘাট ও কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর বনগাঁ এবং জয়নগর ও মথুরাপুর কেন্দ্র থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রতিমা মণ্ডল ও চৌধুরী মোহন জাটুয়া, ৪ জন সাংসদই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হন। এই ৪ জন সাংসদ লোকসভায় বামপন্থী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র সাংসদের থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের উক্ত জাতি দুটির সাংসদগণ নিজ নিজ জাতির ও এলাকার উন্নতির জন্যে লোকসভায় স্বাধীনভাবে অধিক ভূমিকা রেখেছেন। বনগাঁ কেন্দ্রের মতুয়া তথা নমঃশূদ্র জাতির মানুষ মমতা ঠাকুর সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ নিজের এলাকার উন্নতির জন্যে সাংসদ তহবিল ব্যয়ে লোকসভার অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে দলিত সাংসদ জাতির সাংসদ নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় গিয়েছিলেন তাঁদের সবার থেকে অধিক ভূমিকা রেখেছেন।[২৮]

আবার আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে যে, সকল ভূমিকা রেখেছেন তার মূল্যায়ন করব।

১৯৭১-১৯৭৭ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দুটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসন জারী থাকার দরুন কোন বিধায়ক বা মন্ত্রী বিধানসভায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতার আমূল পালাবদল ঘটে। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। বামফ্রন্ট সরকার জমিদারী প্রথা ও ভূমিসংস্কার করে দরিদ্র জনগণের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। উক্ত সংস্কারের ফলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় তথা নমঃশূদ্র জাতির দরিদ্র ও ভূমিহীন মানুষেরা ব্যাপক লাভবান হন। তাইতো ১৯৭৮-১৯৮৯ সালের মরিচঝাঁপিতে বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপক অত্যাচারের শিক্ষার হওয়া সত্ত্বেও নমঃশূদ্ররা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তেমন জোড়তোর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। কারণ হল বেশির নমঃশূদ্র বিধায়ক বামপন্থী দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বেশির ভাগ নমঃশূদ্র রাজনৈতিক ব্যক্তিগন বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে থাকার দরুন কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু দরদী বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীর আহ্বানে বামফ্রন্ট সরকারের বিরদ্ধে যেতে চাননি। ১৯৭৭-২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সরকারে একটানা ৩৪ বছর থাকার কারণে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিধায়কগণ জাতিগত তথা নিজের এলাকার উন্নতির জন্যে তেমন কোন ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। আর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষ বামফ্রন্টের বিধায়ক ও মন্ত্রীগণ তারা তো নিজ নিজ জাতির উন্নতি এবং আলাদা ভাবে জাতিগত সমস্যা সমাধানের জন্যে বিধানসভায় কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি। উক্ত দুটি দলিত জাতির বিধায়কগণ ও মন্ত্রীগণ যা ভূমিকা বিধানসভায় রেখেছেন, তা বামপন্থী দলের রীতি নীতি মেনেই রেখেছেন। এর আগেও আমরা বার বার উল্লেখ করেছি যে, বামপন্থী দলের মূল আদর্শ হল, শ্রেণী সংগ্রাম করা জাতিগত সমস্যা নিয়ে আলাদা কোন ভূমিকা পালন করা হবে না। বামেদের বিশ্বাস ছিল শ্রেণী সংগ্রাম কার্যকর হলে জাতিগত সমস্যা আর পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখাগেছে উপরে উপরে যদিও জাতিগত ভেদাভেদ না মানলেও বামেদের মন্ত্রীসভায় নামের তালিকার পদবী লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, তাঁরা জাতিগত উচ্চু-নিচ্চু ভেদাভেদ প্রাধান্য দেয়েছিল কি না? উত্তরে বলা যায় হ্যাঁ দিয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় উল্লেখ করেছেন, এই ভাবে “ কান্তি

বিশ্বাস স্কুল শিক্ষামন্ত্রী হলে, কান্তি গাঙ্গুলী বলেছিলেন এই রে এবার চণ্ডালের শিক্ষা নীতি আমাদের মেনে চলতে হবে”।[২৯] এই যদি একজন বামপন্থী উচ্চবর্ণের মন্ত্রীর মনোভাব হয়। তাহলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র জাতির বাম বিধায়কগণ বিধানসভায় কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন কী? তবে বলা যেতে পারে বামফ্রন্টের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক মানুষের রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি পায় কিন্তু নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র জাতি থেকে রাজ্যস্তরের গুরুত্বপূর্ণ কোনো নেতা-নেত্রী উঠতে পারেননি। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের অবসান ঘটিয়ে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়। মমতা সরকারের রীতি নীতি হয়ে দাঁড়ায় দলিত জাতির ও সংখ্যালঘু জাতির সার্বিক উন্নয়নের এবং আদিবাসীদের ধারাবাহিক উন্নতি করা। তবে ২০১১ সালের পরে যে সকল নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়কেরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জাতির জন্য বিধানসভা বক্তব্য রাখতে পেরেছেন। আমাদের সমীক্ষিত ৩টি জেলার নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়কদের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার থেকে ওঠে আসা একমাত্র তৃণমূলের কংগ্রেসের মন্ত্রী ও ঠাকুর বাড়ীর সদস্য দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীর জন্যে স্বাধীনভাবে বিধানসভায় ভূমিকা রাখতে পারেননি বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মন্ত্রী বা বিধায়কগণ এমন কোন কথা বলেন নি, তাঁরা বলেছেন তৃণমূল দলের বিধায়ক হওয়ার জন্যে আমরা স্বাধীনভাবে বিধানসভায় নিজ নিজ জাতির এবং এলাকার উন্নতির জন্যে বিধানসভায় ভূমিকা রাখতে পেরেছি।[৩০] কাজেই বলা যেতে পারে ৫ বছরের তৃণমূল সরকারের আমলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়ক ও মন্ত্রীরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জাতির এবং এলাকার জন্যে বিধানসভায় যে ভূমিকা রাখেন তা আগামী দিনের কী ভূমিকা রাখবেন সেটাই আমাদের দেখবার বিষয় হয়ে থাকবে। তবেই আমরা ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে ৫ বছরের তৃণমূল সরকারের নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিধায়কগণের বিধানসভায় ভূমিকা নিয়ে পুংখানুপুঙ্ক ভাবে তুলনা করতে পারি না। ১৯৭১-২০১৬ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্র মন্ত্রিত্বের সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে থাকলে বিধায়কের সংখ্যার দিক থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে পিছিয়ে, কাজেই বলা যেতে পারে পৌণ্ড্রদের থেকে নমঃশূদ্ররা বিধানভায় খানিকটা অধিক ভূমিকা রাখতে পেরেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নদীয়া ও উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নমঃশূদ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অংশগ্রহণের নিয়ে

আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যে সকল তথ্য পেয়েছি, তা তুলে ধরেছি। তাইতো মূল্যায়নে এসে একথা উল্লেখ করতে হয় যে, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নমঃশূদ্র জাতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী – পুরুষের থেকে রাজনৈতিক দল পরিবর্তনের সংখ্যা অনেক বেশি আমরা পেয়েছি। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রাজনৈতিক দল পরিবর্তন নমঃশূদ্র জাতির ক্ষেত্রে অধিক হওয়ার কারণ হন, বাংলাদেশ থেকে এসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মতন গোষ্টিবদ্ধ ভাবে একই গ্রামে বসবাস না করতে পারার জন্যে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতে হলে রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক দলের সমর্থক না হলে ক্ষমতা ভোগ করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন নির্ভর করে অনেকটা গ্রামের বৃহত্তর শরিকির ও পরিবারেরে উপরে। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় আমরা জানতে পেরেছি, নির্বাচনের সময় বৃহত্তর পরিবারের চাপে পরে ছোট পরিবারের সদস্যদের নিজের রাজনৈতিক দলের ভোট নিতে পারে না, তারা বৃহত্তর পরিবারের রাজনৈতিক দলকে ভোট দিতে বাধ্য থাকেন। এই বাধ্য থাকার আরেকটি কারণ হল, পাশাপাশি বসবাস ও চাষের জমি থাকার জন্য বৃহত্তর পরিবারের কথা যদি ছোট পরিবার না শোনেন তা হলে তাদের চাষের ও বসবার করার ক্ষেত্রে হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই ছোট পরিবার গুলো বৃহত্তর সদস্য ভুক্ত পরিবারগুলোর সঙ্গেই গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। আর পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষেত্রেও সাধারণ জাতি থেকে বেশিই পাওয়া গিয়েছে। তবে নমঃশূদ্র জাতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির থেকে অধিক বার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেছেন, সে তথ্যও আমরা পেয়েছি। উল্লেখ্য যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সমিতির ও জেলা পরিষদের সদস্যদের রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করাটা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগের জন্যেই করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় নমঃশূদ্র জাতির একজন নির্বাচিত সদস্যের কথা তিনি নদীয়ার তেহট্ট-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যের কথা, তিনি সি.পি.আই.এমে থাকার সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের উপর রাজনৈতিক ভাবে অত্যাচার করতেন, আবার তৃনমুলে কংগ্রেসে এসেও সেই একই রাজনইতিকন কৌশল অবলম্বন করেই চলেছেন।[৩১] এই সমিতির অন্তর্গন্ত আরেক জন সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত সদস্যের কথাই, আমি তো দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু কখনও রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করি নি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এস.সি.পি.আই করতাম তখন নমঃশূদ্র জাতির মানুষ হওয়ার জন্যে উচ্চ জাতির নেতৃত্বের কাছ থেকে জাতিগত কারণে অনেক অপমান হয়েছি তবু রাজনৈতিক দল পরিবর্তন

করেনি।[৩২] ওনার প্রসঙ্গে আরেক জন সি.পি.আই.এমের নেতা বলেন, ওনি তো পাট্টায় অনেক জমি পেয়েছিলেন, কাজেই ওনার পক্ষে রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।[৩৩] আবার দেখা গেছে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সি.পি.আই.এমের নির্বাচিত সদস্য রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করে তৃণমূল কংগ্রেস চলে আসেন, এবং তিনি পরে ঐ সমিতির সভাপতি পদে বসেন। ওনার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন সম্পর্কে তৃণমূলের একজন নির্বাচিত সদস্য বলেন, ওনি তো আমাদের দলকে ভালো বেসে আসেননি ক্ষমতা ভোগ করার জন্যে এসেছেন। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় দেখতে পেয়েছি, পরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃনমূল কংগ্রেসে অন্যান্য সদস্যরা তার বিরুদ্ধে প্রচার করে ওনাকে পরাজিত করেন। এই সমিতি অন্তর্গত তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্য ক্ষমতার লোভে বি.জে.পিতে গিয়েও আমার তৃণমূল কংগ্রেসে ফেরৎ আসেন।[৩৪] দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত ক্যানিং -১ পঞ্চায়েত সমিতির সি.পি.আই.এমের টিকিটে নির্বাচিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ ২০১১ সালের রাজ্য রাজনীতির পালাবদলের সঙ্গে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এবং পরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসেরে টিকিটে জেলা পরিষদে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার দেখা গেছে বগরাহাট-২ পঞ্চায়েত সমিতির পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সি.পি.আই.এমের নির্বাচিত সদস্য পরে তিনি ক্ষমতার লোভে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৩৫] কাজেই ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত স্তরে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে যা আমরা জানতে পেরেছি, তা হল উক্ত জাতি দুটির নিকট রাজনৈতিক আদর্শ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করাটাই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। তাইতো উল্লেখ করা যায়, ২০১২ সালের পঞ্চায়েত সংশোধিত নির্বাচনী আইনে পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে ৫০ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি তপশিলি জাতি – উপজাতিদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন বরাদ্দ রাখা হয়। এছাড়াও ওবিসিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নেতৃত্বের কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন এসেছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল বাধ্য হয়েছিল তপশিলি জাতি – উপজাতি, ওবিসি ও মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত আসনগুলোতে সেই সেই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দিতে। ১৯৯৩ –র নির্বাচনের পর লক্ষ করা যায় যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উঁচু-জাত, এবং নিচু জাত, মহিলা এবং পুরুষ, তপশিলি জাতি – উপজাতিভুক্ত মানুষ অপেক্ষাকৃত যুবক এবং বৃদ্ধ, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং পুরোপুরি অনভিজ্ঞ দরিদ্র এবং ধনী সকল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের প্রতনিধিত্ব

ঘটেছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থায়। ১৯৯৩ সালের পর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এলিট চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘতেছিল। ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তপশিলি জাতি – উপজাতি ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল যথেষ্টই কম। এক্ষেত্রে সংরক্ষণের আগে নমঃশূদ্র জাতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সদস্যদের বেশ পিছিয়ে ছিল। সংরক্ষণ ফলে নমঃশূদ্রদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সংরক্ষণের আগে থেকেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নমঃশূদ্র জাতির থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। পঞ্চায়েত স্তরে দলিতদের জন্য সংরক্ষণ করার ফলে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অন্যান্য দলিত জাতির থেকে অনেকটা এগিয়ে যায়। কিন্তু ১৯৯৩ সালের নির্বাচনের পর থেকে সাবেকি নেতৃত্বের কাঠামোর পরিবর্তে নতুন নেতৃত্বের কাঠামোর উদ্ভব ঘটে, সংরক্ষণের পূর্বে তপশিলি জাতি – উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পঞ্চায়েতের কাজে প্রতিনিধিত্ব তাদেরে জনসংখ্যায় অনুপাত অনুসারে ছিল না। কিন্তু পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে তপশিলি জাতি – উপজাতি এবং মহিলাদের আসন সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে এই জাতি সমূহের যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্বের ঘটেছে সংবিধান সংশোধনের পর পঞ্চায়েতের কাজে মহিলা, তপশিলি জাতি – উপজাতিভুক্ত মানুষের অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য এসেছে।[৩৬] ফলে উক্ত ৩টি জেলায় অন্যান্য দলিত জাতির থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির সদস্যরা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত স্তরে ব্যাপক এগিয়ে যায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রজাতি জাতির সদস্যরা বেশ এগিয়ে আছেন। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নেতৃত্বে দেওয়ার ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সদস্যরা প্রায় সমসংখ্যক পেয়েছি।

তাইতো বলা প্রয়োজন, স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নারী-পুরুষদের রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো সমস্যা যদি থাকে, তবে তা আছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নতুন আসা সদস্যাদের নিয়ে, এবং তা হল প্রধানত অশিক্ষা এবং অনভিজ্ঞতাপ্রসূত সমস্যা, কিন্তু অন্যান্য দলিত জাতি অপেক্ষা অনেকটা এগিয়ে আছেন উক্ত দুটি দলিত জাতি। তবে প্রথাগত স্কুল কলেজের শিক্ষা অপেক্ষা মনে হয় রাজনীতিতে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বেশি, যা অর্জন করতে হয় কঠিন বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এ রকম অনেক সদস্যা আছেন যাঁদের প্রথাগত শিক্ষা স্কুলের নীচু শ্রেণীর মধ্যে সীমিত হলেও পরবর্তীকালে অনেকখানি শিক্ষা তাঁরা নিজগুণে ও চেষ্টায় অর্জন করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার

জয়নগর ব্লক-১-এর অন্তর্গত সি.পি.আই.এমের গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রবীণ সদস্য নিজেই জানিয়েছেন যে তিনি কোনোদিন স্কুলের দরজার ভিতরে পা রাখেননি, কিন্তু পরবর্তী জীবনে বাড়িতে বসে তিনি অনেকখানি পড়াশুনা শিখেছেন। ইনিও খুব সপ্রতিভ এবং স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেক খবরই রাখতেন। ইচ্ছা এবং উদ্যোগের সমন্বয়ে অশিক্ষা ও অনভিজ্ঞতার সমস্যাকে অচিরেই অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। বড়ো কথা হল এই যে পঞ্চায়েতের সদস্যারা তাঁদের এই সমস্যা সম্পর্কে খুবই সচেতন। আর এদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনারও কোনো অভাব নেই। উক্ত জাতি দুটির অনেক নারী-পুরুষ নানাভাবে বলেছেন, তা একজন নদীয়া জেলার নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সি.পি.আই.এমের মহিলা সদস্যা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "সংসারের কাজের বাইরে এসে একবার যখন পঞ্চায়েতে এসেছি, আর ফিরে যাব না। লক্ষ্য এখন সামনের দিকে।"[৩৭] এ বিষয়ে তাঁরা দৃঢ়মনস্ক। মনে হয় বাড়ির আবদ্ধ পরিবেশের বাইরে এসে এক ধরনের মুক্তির স্বাদ তাঁরা অনুভব করছেন। এই অনুভব ও দৃঢ় মনস্কতাই মহিলা সদস্যাদের চলার পথে বড়ো পাথর। আবার নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বেশিরভাগ নারী-পুরুষ পঞ্চায়েতের সদস্যা ও সদস্যদের কথায় 'পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক ভাবে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা বিধানসভা ও লোকসভার রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট রাজনৈতিক অবিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছি'।৩৮ এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পেলাম যে, ১৯৯৩ সালের আগে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নমঃশূদ্র জাতির অংশগ্রহণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অনেক কম সংখ্যাগত দিক থেকে, আবার নেতৃত্বের দিক থেকেও কম। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে ১৯৯৩ সালের আগে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অনেকটা সংখ্যাগত দিক থেকে এগিয়ে ছিলেন। ১৯৯৩ সালের পরে নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রায় সমানিপাতিক হয়ে যায়। এর পরে অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি 'পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ভূমিকা' নিয়ে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের দু'টি চিত্র, একটা হল স্বাধীনতার আগের আরেকটি হল, স্বাধীনতা লাভের ও দেশভাগের পরের চিত্র। ভারতীয় উপমহাদেশে জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলন করতে গেলে একই ভৌগোলিক অঞ্চলে একই জাতির মানুষের ঐক্যবদ্ধ থাকাটা বেশ জরুরি। স্বাধীনতার আগে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ যশোহর, ফরিদপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জে অধিক হারে বসবাস করার কারণে তাদের মধ্যে সামাজিক

আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে জাতিগতভাবে ভূমিকা রাখতে পেরেছিল। এই পারার কারণ হল, হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে বেশ সংখ্যক নমঃশূদ্র শিক্ষিত মানুষ সামাজিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে বেশকিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করে জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবেশ করে । এর ফলে নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে একটা রাজনৈতিক সচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং তারা বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যামে পরাধীন দেশে নিজের জাতির জন্যে ভূমিকা রাখতে পেরেছিল।

দেশভাগের পরে পূর্বপাকিস্থানের থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে সব থেকে খারাপ অবস্থায় পরে নমঃশূদ্র জাতির উদ্বাস্তুরা । এই প্রসঙ্গে আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ছেলে প্রয়াত জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, “বাবা তো বাগেরহাটের মিটিং এ বলেছিলেন যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাগেরহাট ভারত ভুক্ত করলে বৃহত্তর নমঃশূদ্র জাতির লোকদের দেশান্তরীত উদ্বাস্তু হতে হতো না। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নেতা-নেত্রী এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বরা তা মেনে নিলেন না । তা সত্ত্বেও বাবা পাকিস্তানে থেকে গেলেন পরে নানান কারণে ভারতে চলে আসে । আমাদের জাতির মানুষ জলা জমিত বসবাস করতে অব্যস্থ। কিন্তু ভারত সরকার তাঁদের পুনরবাসন দেয় রুক্ষ পাহাড়ি অঞ্চলে । কাজেই তাঁরা বসবাস না করতে পেরে আনন্দাবান ও ভারতের বহু অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস শুরু করে। ফলে আমাদের মধ্যে আগের মতো সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তিনি আরও বলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এদেশে এসে আর.পি.আই ও বামপন্থীদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করেন এবং উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন ও বিভিন্ন সময়ে উদ্বাস্তু আন্দোলনের অভিমুখ নিজের রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে নিয়ে আসেন । কিন্তু ভারতে এসে তিনি নির্বাচনে জয়ী না হতে পারলেও কমবেশি দলিত রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর নিজের ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন”।[৩৯] আবার জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল একথাও বলেন যে, “প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ভারতে এসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে সাংসদ ও বিধায়ক এবং মন্ত্রীয় হওয়ার কারণে তাঁর নেতৃত্বে বেশ সংখ্যক নমঃশূদ্র ও মতুয়ারা রাজনৈতিক আন্দোলন করেন। পি.আর. ঠাকুরের কয়েকবার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করার কারণে ৭০এর দশকে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনে ভাটা পরে”।[৪০] আবার দেখা গেছে যে, ৮০এর দশকে

রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিয়ে মতুয়া মহাসংঘকে রাজনীতি মুক্ত করে সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্ত করার নিমিত্তে তাঁদের পারিবারিক ধর্মীয় মতাদর্শ নমঃশূদ্র মধ্যে প্রচার করে সামাজিক আন্দোলন করার দিকে মনোনিবেশ করেন। কাজেই প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী বীণাপাণি ঠাকুরের ও বড়পুত্র কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর মতুয়া মহাসংঘকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের পীঠস্থান হিসাবে গড়ে তোলেন । কাজেই ২০০০ সালের পর থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে মতুয়া মহাসংঘকে বামপন্থী দল ও কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা দল বেশ গুরুত্ব দেয়। কাজেই ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নমঃশূদ্ররা সর্বভারতীয় তৃণমূলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।

মোছলন্দপুরের আর.পি.আই নেতা ও দলিত লেখকের কথায়, “দেশভাগের আগে নমঃশূদ্র জাতিকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। কাজেই নমঃশূদ্র জাতির পক্ষে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা রাখাটা সহজ হত। দেশভাগের ফলে মুসলিমদেরকে নমঃশূদ্ররা শত্রু বলে মনে করেন, কাজেই নমঃশূদ্র ও মুসলনমানেরা একে অপরের উপর বিশ্বাস করতে না পারায় তাঁদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐক্য গড়ে ওঠেনি। ফলে ভারতে এসে নমঃশূদ্ররা তেমন কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পারেনি। একথা মানতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে হলে, কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতি নিয়ে তো আর বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখা যায় না। তবে পশ্চিমবঙ্গের যে, সামাজিক কাঠামো তার উপর ভিত্তি করে নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলন একই পথে চলাটা বেশ কঠিন”।[৪১] কাজে বলা যায়, রাজনৈতিক আন্দোলন সদাসর্বদা একই প্রেক্ষাপটে চলে না। এমন সময় আসতেই পারে নমঃশূদ্র ও মুসলমানরা একই সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে হয়তো পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখবে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, সি.পি.আই.এম ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমানে জোটবদ্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা।

আবার মতুয়াদের সংঘজননীর বলেন “দেশভাগের জন্যে আমার জাতির লোকেরা মুসলমানদের দায়ী করেন কিন্তু তা নয় দেশভাগের জন্যে দায়ী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও হিন্দুত্ববাদীদের জন্যেই দেশভাগ হয়েছিল। কাজেই আমাদের জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক তমকা এঁটে

দেওয়ার কারণে নমঃশূদ্ররা ও মুসিলমানরা একত্রে মিলিত হয়ে আর কোনদিন পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন করতে পারেনি। তবে হ্যাঁ রাজনৈতিক আন্দোলন করতে গেলে পারে জনসংখ্যার একটা প্রয়োজন হয়, যা আমার জাতির লোকেরা ভারতে এসে একত্রিত ছিলনা । ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমার শ্বশুর মহাশয় ৫০এর এবং ৬০এর দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি। কারণ হল, ঠাকুর মহাশয় মন্ত্রী হতে পেরেছিলেন কিন্তু আমার জাতির উদ্বাস্তুদের জন্যে যে সার্বিক সুযোগ সুবিধা সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে পারেননি”।[৪২] মতুয়াদের সংঘজননীর মতের সঙ্গে একটা জায়গায় আমরা একমত যে, পি. আর. ঠাকুর মন্ত্রী তো হয়েছিলেন এছাড়াও বাংলা কংগ্রেসের সহসভাপতি হয়েও তাঁর জাতির উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে রাখতে পারলেন না কেন, তাদেরকে কে অন্যান্য রাজ্যে গিয়ে বসতিস্থাপন করতে হলে। এমনটা প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠাটা স্বাভাবিক নয় কি? কাজেই পি. আর. ঠাকুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা নমঃশূদ্র জাতি কতটা উপকৃত হয়েছিল, তা আমরা নমঃশূদ্রদের তখনকার আর্থসাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের মুল্যায়নে দেখেয়েছি।

আবার পলতা নিবাসী প্রাক্তণ বামপন্থী বিধায়ক দীর্ঘদিন ধরে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত থেকে মতুয়াদের জন্যে বৃদ্ধাশ্রম করে দেওয়া সত্ত্বেও বড়মা বীণাপাণি দেবী বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে কখনও নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের আহ্বান করেননি। কাজেই ঠাকুরবাড়ির বরাবরি বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সামাজিক আন্দোলন যুক্ত করতে চায়নি। ঠাকুরবাড়ির রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, সরভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এবং ভারতীয় জনতা দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করেছেন এবং কম বেশি রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতেও পেরেছেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির কোন সদস্যেই বামপন্থী রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি।

চাঁদপাড়া নিবাসী গাইঘাটার প্রাক্তন বামপন্থী বিধায়ক আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় বলেন যে, “পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যেটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে, তা বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায়। কারণ হল দেশভাগের পরে নমঃশূদ্ররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে বসবাস করার কারণে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সচেতনা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। ১৯৬০ এর দশক থেকে বামপন্থীরা নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকারের উদ্বাস্তু নীতির ও বাসস্থানের জন্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল

করেন। ৭০ এর দশকে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নমঃশূদ্ররা ওতপ্রোত ভাবে অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতিতে সরকার পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে বেশ ভূমিকা রাখতে পেরেছে। তবে মরিচঝাঁপিতে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের উপর যে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বামপন্থী সরকার নিয়েছিল, তার ফলে বেশ সংখ্যক নমঃশূদ্র নেতৃত্ব বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে যায়। তারা সরে গিয়ে বামপন্থী বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করেন। একটা দলিত জাতির সকল মানুষ যে, ভারতের ন্যায় বহুদলীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করবে এমনটা ভাবা আমাদের ঠিক হবে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিমুখ ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে, কাজেই নমঃশূদ্রদের সার্বিকভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরাট ভূমিকা রয়েছেই। তবে বলে রাখা প্রয়োজন যে, নমঃশূদ্র জাতির বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতৃত্ব বার বার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করার কারণে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকার ধারাবাহিকতা থাকেনি”।[৪৩] আমরা চাঁদপাড়া নিবাসী গাইঘাটার প্রাক্তন বামপন্থী বিধায়ক একটা জায়গায় একমত যে, নমঃশূদ্র নেতাদের রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করার প্রসঙ্গে, যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায় প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, অপূর্বলাল মজুমদার, নন্দদুলাল মোহন্ত, বিরাট বৈরাগ্য সুশীল বিশ্বাসের নাম, এছাড়াও আরও অনেকের নাম আছে তালিকাতে। তবে পরিশেষে বলা যায় বামপন্থী দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতৃত্বে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ না থাকলেও গণরাজনৈতিক আন্দোলনে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেই ছিল। আবার ২০০৬ সালের পরে এসে নমঃশূদ্ররা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

অপর দিকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষদের রাজনৈতিক আন্দোলনও স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দুটি চিত্র লক্ষ্য করা যায়। তবে হ্যাঁ নমঃশূদ্রদের মতন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দেশভাগের তেমন একটা আঘাত পায়নি। কাজেই পৌণ্ড্রদের স্বাধীনতার আগের আর পরের রাজনৈতিক আন্দোলনের তেমন কোন বড় পার্থক্যের চিত্র আমরা লক্ষ্য করতে পারিনি। তাইতো নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে পার্থক্য ছিল এবং আছে। এই পার্থক্যটা থাকার মূলকারণ হল উক্ত জাতির মধ্যেও সামাজিক উঁচু-নীচু ভেদাভেদ বিদ্যমান। আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় সামাজিক দিক থেকে নমঃশূদ্ররা উঁচু না কি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা উঁচু এই প্রশ্নের উত্তরে বেশির ভাগ নমঃশূদ্র জাতির মানুষ উত্তর দিয়েছেন তাঁরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক দিক থেকে উঁচু, আবার বেশির ভাগ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বলেছেন, তাঁরা নমঃশূদ্র জাতির থেকে সামাজিক দিক থেকে উঁচু। এই প্রসঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের যুক্ত হল, আমরা তো জাতিতে ক্ষত্রিয় আর নমঃশূদ্ররা জাতিতে শূদ্র । আর নমঃশূদ্রদের যুক্তি হল, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কি করে ক্ষত্রিয় হয় ওঁদের জনগণনায় এখনও পোদ/পৌণ্ড্র লেখা হয়, ওঁদের ক্ষত্রিয় জাতির সন্মান দেওয়া হয়নি।[৪৪] এই প্রসঙ্গে আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নমঃশূদ্র জাতির যেসকল মানুষের পদবী ঠাকুর তাঁরা নিজেদের মৈথলীর ব্রাহ্মণ মনে করেন।[৪৫] কাজেই উক্ত দলিত জাতি দুটি নিজেদের মতন করে সমাজে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ তৈরি করে রেখেছেন । তবে দলিত জাতির মানুষ সব সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভাবে নিজেদের । আর উক্ত কারণের জন্যেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্ররা নিজ নিজ সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন একত্রে পরিচালিত হতে পারেনি ।

নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে উদ্বাস্তুদের পুনরবাসন ও নাগরিকত্বের দাবী। কাজেই নাগরিকত্ব ও পুনরবাসন নিয়ে নমঃশূদ্র জাতির যে ধরণের আন্দোলন করতে হয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে কিন্তু ততোটা আন্দোলন করতে হয়না। ফলে বলা যেতে পারে যে, দেশভাগের ও স্বাধীনতার পরে নমঃশূদ্র নেতৃত্বদের পশিমবঙ্গে এসে, ১৯৫৬ সালের ন্যাশনাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষদের স্থায়ী পুনরবাসনের জন্যে 'উদ্বাস্তু' এবং 'শরনার্থী' কথাটির পরিবর্তন আনা হয়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের SBBS (সারা ভারত বাস্তুহারা সমিতি) এবং UCRC (United Central Refugee Council) এর চাপে এই বাস্তুহারা মানুষদেরকে 'Displaced Person' হিসেবে Permanet Settlement এর ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেশ ভাগের পর থেকে এটা শুধু আলচনাতেই আছে। সরকারি স্বাকৃতি এখনও পর্যন্ত নেই কথাও। এখনও বহু মানুষের জুতোর সুকতলা খুলে যায় শুধু জাতিগত সংশাপত্র, ভোটার তালিকাতে নাম তুলতে এবং একফালি জমি রেজিষ্ট্রেশন করতে বা ব্যাঙ্ককে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে। দেখা গেছে কোন আধিকারিক ডকুমেন্টেস'র অভাবে কাজ করে দিতে পারেন না। যে সকল সহৃদয় সরকারি অফিসার কাজ করে দেন, পরে দেখা গেছে

রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অনেকের ভোটার আইডি কার্ড থাকলেও 'Foregners' অ্যাক্টে অভিযুক্ত করা হয়, এমনকি আধার কার্ড থাকলেও। কাজেই কোনভাবে উক্ত ডকুমেন্ট গুলো পেলেও তার যথোপযুক্ত 'Ground' পাওয়া না যাওয়ায় তারা ভুগছেন। সরকারি চাকরি পেলে তার ভেরিফিকেশনে হয় আকটে যাচ্ছে না হলে অন্যপথে কাজ করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই তথ্যগুলো আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় নমঃশূদ্র জাতির উদ্বাস্তু মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি। উদ্বাস্তু মানুষ আরও বলেন, "উপরিউক্ত সমস্যাগুলো আমাদের ভয়ংকর ভাবে মানসিক যন্ত্রণা দেয়। আমরা যারা ভোগ করি তারা জানি যে কি যন্ত্রণা। কোন সরকারি অফিসে গেলে আত্ম বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে পারি না"।[৪৬] অন্যদিকে পৌণ্ড্রজাতির বেশির ভাগ মানুষের উক্ত সমস্যায় পরতে হয় না। তাইতো হেমচন্দ্র নস্করকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের ন্যায় উদ্বাস্তু আন্দোলন করতে হয়নি। ফলে পৌণ্ড্ররা স্বাধীনোত্তর পশ্চিমঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে নমঃশূদ্রদের ন্যায় আন্দোলন করতে হয়নি।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ দেশভাগের আগে পরে অনেকটা স্বাধীন ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হতে পেরেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাঙ্গে নিজেদের কে নিয়োজিত করে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রীও হয়েছেন। নমঃশূদ্র জাতির কোন মানুষ ২০১৬ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে পারেননি।[৪৭] আবার দেখা গেছে পৌণ্ড্রজাতির একটা অংশের মানুষ ৬০এর দশকের পর থেকে এস.ইউ.সি.আই ও আর.এস.পির হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করে ভূমিকা পশ্চিমঙ্গের রাজনীতিতে ভুমিকাও রাখতে সক্ষম হয়েছেন। জয়প্রকাশ নারায়নের ভূ-দান আন্দোলনের সঙ্গে মিলিত হয়েও পশিমবঙ্গের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখেই ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে শক্তি কুমার সরকার জয়নগর কেন্দ্র থেকে ভারতীয় লোক দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে। ১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলের সময় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বামপন্থী রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।[৪৮] আবার ২০০৮ সালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ারা সর্বভারতীয় তৃনমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে মিলিত ভাবে আন্দোলন করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাপরিষদ তৃণমূল কংগ্রেস দখল করার মধ্যে আমরা বুঝতে পারি সংখ্যাগরিষ্ঠ পৌণ্ড্ররা পরিবর্তনের রাজনৈতিক আন্দোলন ভূমিকা রাখতে পেরেছে। যেহেতু নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতিরও নিজস্ব কোন রাজনৈতিক দল নেই, তাই

তারা নিজ জাতির হয়ে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতেও পারেনি।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলে এই যে, নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষ স্বাধীনতার আগে কমবেশি নিজ নিজ জাতির স্বার্থে জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পারলেও স্বাধীনতার পরে তা কিন্তু পারেনি। মতুয়া মহাসংঘের মাধ্যমে অনেক আগে থেকেই নমঃশূদ্ররা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সরকার পক্ষের ও সরকার বিপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখলেও জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের পক্ষনিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের মধ্যে তেমন শক্ত সামাজিক সংগঠন না থাকায় সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ভূমিকা রাখা তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। অতি সাম্প্রতিক কালে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসংঘের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে একটা সামাজিক আন্দোলনের চেতনা লক্ষ্য করা গেছে। নমঃশূদ্রদের ন্যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা স্বাধীনতার পরে সরকার পক্ষের ও সরকার বিপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখলেও জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

নির্দেশিকা

১) Ishita Banerjee-Dube (Edited), Caste in History, Oxford Univesity Press, New Delhi, 2008, পৃঃ ১০৮।

২) Debi Chatterjee, Ideas and Movements Against Caste in India, Ancient to Modern Times, প্রাগক্ত, পৃঃ ২১৩-২২৯।

৩) Sharmila Rege, 'A Dalit Feminist Standpoint' Anupama Rao (Edited) Gender and Caste, Sage, New Delhi, পৃঃ ৯৫-৯৮, Sharmila Rege, Writing Casto/Writing Gender: Narrating Dalit Women's Testimonios, Zubaan, New Delhi, ২০০৬।

৪) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০০ জন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৫) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ১০ জন মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৬) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়াদের সংঘজনীর থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৭) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নমঃশূদ্র জাতির গবেষক, ঠাকুরনগর নিবাসীর থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৮) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসংঘের নেতৃত্বদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের নেতৃত্বদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১০) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার থেকে ২০০ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষের থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১১) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার নমঃশূদ্র জাতির ২০ জন মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১২) গবেষক উত্তর ২৪ পরগনার নমঃশূদ্র জাতির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রীর এবং প্রাক্তন আই.পি.এস. অধিকর্তার উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৩) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০০ জন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৪) গবেষক উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়ার নমঃশূদ্র জাতির প্রবীণ মতুয়া গবেষকের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৫) গবেষক মতুয়াদের বর্তমানের মতুয়া মহাসংঘের সংঘজনীর উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৬) গবেষক নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০০ জন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৭) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদের (১৯৮৯-১৯৯৯) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৮) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদের (১৯৮৯-১৯৯৯) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

১৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদের (১৯৮৯-১৯৯৯) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২০) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদের (১৯৮৯-১৯৯৯) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২১) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাঁদপাড়ার প্রবীণ মতুয়া গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২২) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চাঁদপাড়ার প্রবীণ মতুয়া গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৩) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে রাণাঘাট লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের (২০০৯-২০১৪) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৪) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নবদ্বীপ লোকসভার কেন্দ্রের সি.পি.আই.এমের সাংসদের (২০০৪-২০০৯) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৫) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমীক্ষিত ৩ টি জেলার সংরক্ষিত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের (২০০৯-২০১৪) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৬) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মথুরাপুর লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের (২০০৯-২০১৪) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৭) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মথুরাপুর লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের (২০০৯-২০১৪) থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৮) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বর্তমানের মতুয়াদের সংঘজননীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

২৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতুয়া গবেষক ও নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যলয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩০) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমীক্ষিত ৩ টি জেলার সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ও মন্ত্রীদের (২০১১-২০১৬), কেবলমাত্র ঠাকুর বাড়ীর প্রাক্তন মন্ত্রী বাদে, পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩১) বেষক নদীয়া জেলা পরিষদের ক্ষে সমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩২) গবেষক নদীয়া জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩৩) গবেষক নদীয়া জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩৪) গবেষক উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩৫) গবেষক দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩৬) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৩, গ্রাম বাংলার রায়, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৪৪২।

৩৭) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩৮) গবেষক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৩৯) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়ার নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পুত্র প্রয়াত জগদীশ চন্দ্র মণ্ডলের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪০) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়ার নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পুত্র প্রয়াত জগদীশ চন্দ্র মণ্ডলের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪১) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরের নিবাসী আর.পি.আই নেতা ও দলিত লেখকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪২) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বর্তমানের মতুয়াদের সংঘজননীর থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৩) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়া নিবাসী গাইঘাটার প্রাক্তণ সি.পি.আই.এমের বিধায়কের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৪) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৫০ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৫) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০ জন ঠাকুর পদবীর নমঃশূদ্রদের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৬) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৫০ জন উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৭) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় লেখক ও গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

৪৮) গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় লেখক ও গবেষকের থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

১) Bajpai, R. Constituent Assembly debates and minority rights. *Economic and Political Weekly*, 1837-1845.

২) Bandyopadhyay, Sandip. Who are the Matuas, Frontier, Vol. 47, no.37, March, 2011.

৩) Bandyooaphyay, Sekhar. Caste, Culture and Hegimony : Social Dominance in Colonial Bengal. Sage. New Delhi: 2004.

৪) Bandyopadhyay, Sekhar. Caste, Protest and Identity Colonial India, The Namasudra of Bengal, 1872-1947(2nd ed.). New Delhi: Oxford University press.New Delhi : 2011.

৫) Bandyopadhyay, Sekhar & Basu Roy Chowdhury, Anasua. Partition, Displacement and the Decline of the Scheduled Caste Movement in West Bengal. Routledge. India: 2015.

৬) Banerjee, D. (2012). Election Recorder: an analytical reference. Star Publishing House. Calcutta.

৭) Banerjee, Sumanta. Bengal Left: From Pink to saffron. EPW, 38(9).2003.

৮) Barman, R. K. ‘Right-Left-Right’and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assembly Elections (from 1920 to 2016). *Contemporary Voice of Dalit*, *10*(2), 216-231.2018.

৯) Barman, Rupkumar. ‘Right-Left-Right’ and caste politics: The Schedules Castes in West Bengal Assembly Election, from 1920 to 2016, Contemporary Voice of Dalit, Vol.10, issue.2. 2018.

১০) Bhattacharya, Amit “Who are the OBCs?” Archived from the Original on 27 June 2006, Retrieved 19 April 2006, Times of India, 8 April 2006.

১১) Basham, A. L., & Rizvi, S. A. A. The wonder that was India. Rupa. New Delhi: 1956.

১২) Census of India, Bengal. Report. chpter- XI. 1911.

১৩) Census of India, 2001, Primary Sensus Abstract, Vol.13, 2nd Edition. Primary Census Abstract Date, 2011, Table A-10.

১৪) Chakravarty, Krishna. Leadership; Faction, and Panchayati Raj : A Case Study of West Bengal, Rawat Publications. Jaipur : 1993.

১৫) Chatterjee, Joya. Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition. Cambridge University Press. New Delhi: 1932.

১৬) Chatterjee, Biswajit & Chatterjee, Debi (eds.). Dalit Lives and Dalit Visions in Eastern India, Centre for Rural Resources ও Centre for Ambedkar Studies, Jadavpur University: 2007.

১৭) Chatterjee, Debi. Ideas and Movements Against Caste in India, Ancient to Modern Times. Abhijeet Publications. New Delhi: 2010.

১৮) Chandra, Uday, Geir Heierstad, Geir, Kenneth Bo Nielesh, Kenneth Bo(eds.). The Politics in West Bengal. Routledge. New Delhi: 2016

১৯) Cohn, Bernard S. Colonialism and Its Froms of Knowlege: The Britsh in India. London: Princeton University Press. London: 1966.

২০) Dasgupta, A. In the Citadel of Bhadralok Politicians: The Scheduled Castes in West Bengal. *Journal of Indian Political Economy*, 445-458.2000.

২১) Datta, Bhupendranth. Studies in Indian Social polity Calcutta: Nahabharat

i. Publishers. Calcutta: 1983.

২২) Datta, Ratul (ed.). Bengal Vote in Lok Sabha Election (Since Independence). Deys. Kolkata: 2019.

২৩) Dutta, V.P. India’s Foreign policy in a Changing World, Paperback, New Delhi, 1999, Page, 15. West Bengal Assembly Proceedings, West Bengal Legislative Assembly 22nd Session, July August 1979, Vol-22, No-I Page-419-420, NLC.

২৪) Davids, T. W. R. Dialogues of the Buddha: Translated from the Pali of the DīghaNikāya (Vol. 2). Motilal Banarsidass. Delhi: 2000.

২৫) Dasgupta, A. In the Citadel of Bhadralok Politicians: The Scheduled Castes in West Bengal. *Journal of Indian Political Economy. 2000.*

২৬) Dube, S. C. Indian Society.National Book Trust, New Delhi: 1990

২৭) Election Commission of India, & India. Parliament. Lok Sabha. (1996). *Statistical Report on General Elections, 1996 to the Fifth Lok Sabha: Detailed results* (Vol. 1). Election Commission of India.

২৮) Election Commission of India, & India. Parliament. Lok Sabha. (1996). *Statistical Report on General Elections, 1996 to the Sixth Lok Sabha : Detailed results* (Vol. 1). Election Commission of India.

২৯) Election Commission of India, & India. Parliament. Lok Sabha. (1996). *Statistical Report on General Elections, 1996 to the Eleventh Lok Sabha: Detailed results* (Vol. 3). Election Commission of India.

৩০) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections.1977 to the Sixth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results). New Delhi : 1978.

৩১) Election Commission of India. Statistical Report on General Election.1977 to the Legislative Assembly of West Bengal. New Delhi: 1977.

৩২) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections, 1972 to the Legislative Assembly of West Bengal, New Delhi, 1973.

৩৩) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, New Delhi, 1973.

৩৪) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections, 1971 to the Legislative Assembly of West Bengal, New Delhi, 1973.

৩৫) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections, 1987 to the Legislative Assembly of West Bengal, New Delhi, 1987.

৩৬) Election Commission of India. Statistical Report on General Election, 2001 to the Legislative Assembly of West Bengal. New Delhi, 2001

৩৭) Election Commission of India, General Elections Result, 1957,1967. And West Bengal Assembly Proceedings, who's who, 1957,1962, West Bengal Legilative Assembly, Secretariat, Calcutta, 1957 & 1962, NLC.

৩৮) Lok Sabha Debates, 1971 to 1977, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Various, 1971 to 1977.

৩৯) West Bengal Legilative Assembly Proceedings

৪০) Who's Who : 1962 – 1967, Government of West Bengal Press, Calcutta, NLC.

৪১) Govt. of West Bengal, West Bengal Legilative Assembly Proceedings, Who's Who : 1969, W.B. Govt. Printing Press, Alipur, 1969, NLC.

৪২) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections.1980 to the Seventh Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results).New Delhi : 1981.

৪৩) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections. 1991 to the Legislative Assembly of West Bengal. New Delhi : 1991.

৪৪) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections.1989 to the Ninth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results).New Delhi : 1990.

৪৫) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections.1991 to the Tenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results).New Delhi : 1992

৪৬) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections.1998 to the Twelfth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results).New Delhi : 1998.

৪৭) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections.1999 to the Thirteenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results).New Delhi : 1999.

৪৮) Election Commission of India. Statistical Report on General Elections. 2001 to the Legislative Assembly of West Bengal. New Delhi : 2001.

৪৯) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections.2004 to the Fourteenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results).New Delhi : 2004.

৫০) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections.2009 to the Fifteenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results). New Delhi : 2009.

৫১) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections.2014 to the Sixteenth Lok Shabha, Volume-I, (National and State Abstracts & Detailed Results).New Delhi : 2014.

৫২) Election Commission of India.Statistical Report on General Elections.2016 to the Legislative Assembly of West Bengal.New Delhi : 2016.

৫৩) Election Commission of India. West Bengal Assembly Election Result, 2016, 2006. List of Member's of the West Bengal Legislature, Who's Who: 2016, Govt. Printing Press. Alipur : 2016.

৫৪) Ghurye, G. S. Caste and Race in India. Kegan Paul, Trench Trubner & Co. London: 1932.

৫৫) Gill, S. S. *The dynasty: a political biography of the premier ruling family of modern India.* Harper Collins Publishers. India: 1996.

৫৬) Government of West Bengal. Information on West Bengal Panchayats. State Institute of Panchayats and Rural Development. Kalyani, Nadia, West Bengal: 2014.

৫৭) Government of Bengal.Appoinment (Reforms). Faridpur District.File No. IR-90, B, August 1933. Progs, No, S-870-886. WBSA.

৫৮) Government of India, Reforms Office File No. 199/R/1932, Faridpur Districk Depressed Classes Association to GI, 22 Sept.1932

৫৯) Government of Bengal, Home (Constituation and Elections) File No. R.R. 3E- 27 May, 1937, Prog. No. -1-13 and 10/37, WBSA

৬০) Government of Bengal.Appoinment (Reforms). Faridpur District.File No. IR-90, B, August 1933. Progs, No, S-870-886. WBSA.

৬১) Government of Bengal.Appoinment (Reforms). Faridpur District.File No. IR-90, B, August 1933. Progs, No, S-870-886. WBSA.

৬২) Hardy, P. Islamic Mysticism in India, Sources of Indian Tradition. (Vol I).

a. Columbia University Press. 1988

৬৩) Hoey, W., & Oldenberg, H. Buddha: his life, his doctrine, his order. Kolkata: Kessinger publishing LLC, Kolkata: 2003.

৬৪) Hutton, J. H. Caste in India. Oxford University Press. London: 1963.

৬৫) Kashyap, Subhash C. 'Our Parliament' : an Introduction to the Parliament of India (pp. 19-21). National Book Trust. New Delhi: 2011.

৬৬) Key, O.K. – Politics, Parties and Pressure Groups, New York, 1964.

৬৭) Khan, I. A. Akbar's personality traits and world outlook: A critical reappraisal. Social Scientist. 1992

৬৮) Kothari, Rajni. Caste in Indian Politics (pp. 23). Hyderabad: Orient Black Swan. Hyderabad: 2008.

৬৯) Kosambi, Damodar Dharmanand. An introduction to the study of Indian history. Popular Book Depot, Bombay: 1956.

৭০) Kumar, R. Election commission of India-institutionalizing democratic uncertainties. Oxford University Press. New Delhi: 2019.

৭১) Kumar, G., & Ghosh, B. (1996). *West Bengal Panchayat Elections, 1993: A Study in Participation*. Concept Publishing Company.

৭২) Lienten, G. K. "Caste, Gender and class in panchayat: case of Bardhaman, West Bengal", EPW, 18 July, 1992.

৭৩) Lok Sabha Secretariat. Lok Sabha Debates, 2015 to 2019, New Delhi, Vol and Contains No Various, 2015 to 2019.

৭৪) Lok Sabha Secretariat. Lok Sabha Debates, 1977 to 1979. New Delhi. Vol and Contains No Various, 1977 to 1979.

৭৫) Lok Sabha Secretariat. Lok Sabha Debates, 1980 to 1984, New Delhi, Vol and Contains No Various, 1980 to 1984.

৭৬) Lok Sabha Secretariat. Lok Sabha Debates, 1980 to 1984, New Delhi. Vol and Contains No Various, 1980 to 1984.

৭৭) Lok Sabha Secretariat. Lok Sabha Debates, 1985 to 1989.New Delhi. Vol and Contains No Various, 1985 to 1989.

৭৮) Lok Sabha Secretariat. Lok Sabha Debates, 1985 to 1989.New Delhi, Vol and Contains No Various, 1985 to 1989.

৭৯) Lok Sabha Secretariat. Lok Sabha Debates, 1991 to 1996.New Delhi, Vol and Contains No Various, 1991 to 1996.

৮০) Lok Sabha Debates, 1996 to 1997 December, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Various, 1996 to 1997 December.

৮১) Lok Sabha Debates, 1996 to 1997 December, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Various, 1996 to 1997 December.

৮২) Lok Sabha Debates, 1998, to 1999 April, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Various, 1996 to 1997 April.

৮৩) Lok Sabha Debates, 1998 to 1999 April, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Various, 1998 to 1999 April.

৮৪) Lok Sabha Debates, 1999 to 2004, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Various, 1999 to 2004 April

৮৫) Lok Sabha Debates, 2004 to 2009, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Various, 2004 to 2009.

৮৬) Lok Sabha Debates, 2009 to 2014, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Various, 2009 to 2014.

৮৭) Lok Sabha Debates, 2009 to 2014, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Various, 2009 to 2014.

৮৮) Lok Sabha Debates, 2015 to 2019, Lok Sabha Secretariat New Delhi, Vol and Contains No Various, 2015 to 2019.

৮৯) Mackenzic, W.J.M. Pressure Groups in British Government in British Journal of Sociology, Vol-vi, 1955

৯০) Mukherjee, Nirmal & Bandopadhyay, Debabrata. New Horizon for West Bengal's Panchayats. Government of West Bengal, 1993.

৯১) Mukhopadhyay, Amal Kumar Political Sociology : An Introductory Analysis. K. P. Bagchi. Calcutta :1977.

৯২) Müller, F. M. The Sacred Books of the East. London: Clarendon Press, London: 1886.

৯৩) Palshikar, S., Suri, K. C., & Yadav, Y. (Eds.). *Party competition in Indian states: Electoral politics in post-Congress polity* (Vol. 26). New Delhi: Oxford University Press. New Delhi: 2014.

৯৪) Rege, Sharmila. A Dalit Feminist Standpoint', Gender and Caste. Sage : 2006.

৯৫) Risley, H. H. The Tribes & Castes of Bengal. Bengal Secretariat Press. Kolkata: 1891.

৯৬) Secretariat, L. S. Council of Ministers. New Delhi: 1947-2004.

৯৭) Secretariat, L. S. The Constitution of India. New Delhi: 2016.

৯৮) Secretariat, L. S. The Constitution of India. New Delhi: 2022.

৯৯) Shankar, B. L., & Rodrigues, V. *The Indian parliament: A democracy at work.* Oxford University Press. New Delhi: 2011.

১০০) Sharma, R. S.Śūdras in ancient India: A social history of the lower order down to circa AD 600. Delhi: Motilal Banarsidass, Delhi, 1990.

১০১) Sirser, Jawhar. Parliament Elections in West Bengal. W. B. Govt. Printing Press. Alipur : 1999.

১০২) Swami Madhavananda & Sri Shankaracharya. Brihadaranyak Oponishadbhasya 4.5.1. Advaita Ashrama: 1965.

১০৩) Thakur KK, Chatterjee B, Chatterjee D. Dalits of East Bengal: Before and after the Partition. Dalit Lives and Dalit Visions in Eastern India. 2007:26-38.

১০৪) Thapar, R. A history of India (Vol. 1).UK: Penguin, UK: 1990

১০৫) Usuda, M. Pushed towards the Partition: Jogendranath Mandal and the Constrained Namasudra Movement. Caste

System, Untouchability and the Depressed. Manohar. Delhi: 1997.

১০৬) Webster, Neil. Panchayati Raj and Decentralisation of Development Planning in West Bengal: A case study. K.P. Bagchi & Company. Calcutta: 1992.

১০৭) Wester-gaard, Kristeen. People's Participation. Local Government and Rural Development Research. Copenhagen: 1986.

১০৮) West Bengal Panchayet Act. 1957. Sec. 7.

১০৯) West Bengal Panchayet Act, 1957. Sec. 17. & West Bengal Zela Parishads Act, 1963, Sec. 52.

১১০) West Bengal Assembly Proceedings, Vol-XX, No-I, Discussion on Dandekar Scheme, Session June-July, 1958, Hara Krishna konar's speech on 10th June, 1958.

১১১) আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নবম সংস্করণ, খোশরোজ কিতাব, ২০০০

১১২) কুমার, সুশান্ত-'সাহিত্যরত্ন; ভারতরত্ন বাবা সাহেব আম্বেদকর, নির্মল কুমার সাহা' সাহিত্যম, কলকাতা : ২০০১

১১৩) গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল-'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ', মরিচঝাঁপি বুলেটিং ২৯ শে মে, ১৯৭৯

১১৪) ঘোষ, শংকর-'হস্তান্তর' স্বাধীনতার অর্ধশতক, আনন্দ, কলকাতা : ২০০২

১১৫) চট্টোপাধ্যায়, দেবী-'নিম্ন জাতির মানুষ ও দেশভাগ', গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০

১১৬) চাকলাদার, স্নেহময়-'পশ্চিমবঙ্গে জাত ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বামফ্রন্ট সরকারের নীতি', পুস্তক বিপনি, কলকাতা : ১৯৮৯

১১৭) চাকী, লীনা- বাউলের চরণদাসী ,গাঙচিল সংস্করণ, কলকাতা : ২০০৯

১১৮) চ্যাটার্জী, দেবী-'বিশ্বায়ন ও দলিত'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা : ২০০৬

১১৯) চ্যাটার্জী, দেবী-'ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে জাতি-বর্ণ সমীকরণ', পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা : ২০১৮

১২০) চন্দ্র, বিপান, মুখার্জি, মৃদুলা, মুখার্জি, আদিত্য (সম্পা.)-ভারতবর্ষঃ স্বাধীনতার পরে, ১৯৪৭-২০০০, আনন্দ পাবলিশার্স : ২০০৫

১২১) চক্রবর্তী, প্রফুল্ল-'প্রান্তিক মানব', প্রতিক্ষর, কলকাতা : ১৯৯৭

১২২) চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ-'বাংলার রায়', গ্রন্থমিত্র, কলকাতা : ২০১১

১২৩) চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ-'নির্বাচন ক্ষেত্র সীমানা পুনর্নির্ধারণ গঠন কর্মপদ্ধতি ও প্রভাব', মিত্রম, কলকাতা : ২০০৯

১২৪) ঠাকুর, প্রমথ রঞ্জন-'আত্ম চরিত বা পূর্ব স্মৃতি', বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা : ১৯৯৫

১২৫) তালুকদার, কিরণ-'জননায়ক মুকুন্দ বিহারী মল্লিক : জীবন ও সাধনা', দেবদাস প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৯৮

১২৬) দাস, নরেশ চন্দ্র-'নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ', দীপালী বুক হাউস, কলকাতা : ১৯৯৭

১২৭) দত্ত, সত্যব্রত- বাংলার বিধানসভার একশো বছর রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা : ২০০২

১২৮) নস্কর, সনৎ কুমার (সম্পা.)-'পৌণ্ড্র – মনীষা (৪র্থ খণ্ড), পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসঙঘ, কলকাতা : ২০১৫

১২৯) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.) পৌণ্ড্র – মনীষা ৩য় খণ্ড, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের পক্ষে, কলকাতা : ২০১৪

১৩০) পাল, বাবুল কুমার-'বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্যঃ পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস', গ্রন্থমিত্র, কোলকাতা : ২০১০

১৩১) প্রামাণিক, শ্যামলকুমার-'পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস', ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা : ২০১০

১৩২) বসু, অসিত কুমার-'পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১০

১৩৩) বাগচী, অমিয় কুমার (সম্পা.)-বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা (প্রথম খন্ড)ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা : ২০০৬

১৩৪) বন্দ্যপাধ্যায়, শেখর-"উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতিঃ বাংলার নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭, "জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লি, : ১৯৯৮

১৩৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তনুজ-'বিকল্প বিশ্বায়ন', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রা.লি. কোলকাতা : ২০০৫

১৩৬) চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ-'লোকসভা নির্বাচন ২০১৪ বাংলার জনাদেশ', প্রগতিশীল প্রকাশক, কোলকাতা : ২০১৪

১৩৭) বিশ্বাস, সুকৃতিরঞ্জন-'মতুয়া ধর্ম এক ধর্ম বিপ্লব', কলকাতা : ২০০৮

১৩৮) বিশ্বাস, শান্তিরঞ্জন-'এদেশের রাজনীতি ও বহুজন সমাজ', চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা : ২০০০

১৩৯) বিশ্বাস, কপিল কৃষ্ণ'ঠাকুরনগর পত্তনের ইতিহাস' নিখিল ভারত পত্রিকা, ৩৩ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ২ ০০০

১৪০) বিশ্বাস, কপিল কৃষ্ণ-'প্রতিবাদী প্রমথরঞ্জনঃ মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয় স্বীকার, নিখিল ভারত পত্রিকা, বামনগাছি, ৩১ তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ২০০৯

১৪১) বিশ্বাস, কপিলকৃষ্ণ-'আন্দামানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের ভূমিকা' নিখিল ভারত, ৩১তম বর্ষ, ৪র্থ ৫ম সংখ্যা, জুলাই-অক্টোবর, ২০০৯

১৪২) বিশ্বাস, কপিল কৃষ্ণ-'পি.আর. ঠাকুর যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন', নিখিল ভারত, মে-জুন, ৩১তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২০০৯

১৪৩) বিশ্বাস, মনোশান্ত-'বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি', সেতু প্রকাশনী, কলকাতা : ২০১৬

১৪৪) বৈরাগ্য, বিরাট-''মতুয়া আন্দোলন ও বড়মা বীণাপাণি দেবী", ১০২তম জন্মবর্ষে – বড়মা বীণাপাণি দেবীঠাকুরাণীর বিশেষ স্মারক সংখ্যা ২৪শে অক্টোবর, শুভ মহা অষ্টমী-২০২০, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা, শ্রীধাম ঠাকুরনগর, ঠাকুরবাড়ী, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ২০২০

১৪৫) বসু, জ্যোতি-'যত দূর মনে পড়ে', ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা : ২০১৫

১৪৬) বৈরাগ্য, বিরাট-'মতুয়া সামায়িক পত্র-পত্রিকা ও মতুয়া স্মরণিকার ইতিহাস', শ্রী মনোতোষ বৈরাগ্য ও শ্রী সায়ন্তন বৈরাগ্য, নৈহাটি উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ : ২০২০

১৪৭) ভট্টাচার্য, সুকুমারী-''আর্যরা; সংহিতাযুগ', প্রবন্ধ সংগ্রহ ১', গাঙচিল, কলকাতা : ২০১৪

১৪৮) মতুয়া মহাসংঘ-'মতুয়া মহাসংঘের সংবিধান বা গণতন্ত্র', বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯৮৮

১৪৯) মণ্ডল, বসন্ত কুমার-'সেদিনের কথা', প্রথম খণ্ড, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ণ পরিষদ, কলকাতা : ১৯৯৯

১৫০) মণ্ডল, জগদীশ চন্দ্র-'মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুঃ কারা এবং কেন?', বঙ্গদর্পন প্রকাশন, কলকাতা : ২০০৫

১৫১) মজুমদার, রমেশচন্দ্র-'বাংলাদেশের ইতিহাসঃ প্রাচীন যুগ' (৯ম সংস্করণ) জেনারেল, কলকাতা : ২০০৫

১৫২) মোহেনস বুক হানসেন-'ডবলু টি ও কৃষিচুক্তি উন্নয়নশীল দেশে তার প্রভাব', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা : ২০০৩

১৫৩) মোহান্ত, নন্দদুলাল-'মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ', অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা : ২০০২

১৫৪) মন্ডল, জগদীশচন্দ্র-'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ' (প্রথম খন্ড) চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা : ২০০৩

১৫৫) মন্ডল, জগদীশচন্দ্র-'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ' (তৃতীয় খন্ড) চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা : ২০০৪

১৫৬) মল্লিক, নকুল-'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি' নিখিল ভারত 'উদ্বাস্তু আন্দোলনের আলোচিত কয়েকটি অধ্যায়, বিশেষ সংখ্যা জানুয়ারী, ২০১০

১৫৭) রায়, নীহাররঞ্জন-'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব'(৪র্থ সংস্করণ) দেজ পাবলিশিং , কলকাতা : ২০০৪

১৫৮) রায়, রণজিৎ-'ধবংসের পথে পশ্চিমবঙ্গঃ কেন্দ্র- রাজ্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা : ১৯৯৭

১৫৯) রাণা, সন্তোষ-'সমাজ শ্রেণী রাজনীতি-প্রবন্ধ সংকলন', ক্যাম্প, কলকাতা : ২০০৬

১৬০) রাণা, সন্তোষ কুমার-'পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী', ক্যাম্প, কলকাতা : ২০০৯

১৬১) হালদার, মহানন্দ-'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত', বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, (ষষ্ঠ সংস্করণ) : ২০১২

১৬২) সিকদার, রণজিত কুমার-'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ' আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৯৭

১৬৩) সেনগুপ্ত, সুখরঞ্জন-'একালের কারবালা, মরিচঝাপি ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস', গাঙচিল, কলকাতা : ২০০৯

১৬৪) সরকার, তারকচন্দ্র-'শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত', ফরিদপুর : ১৩২৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

১৬৫) সরকার, বাসব-'দলিত রাজনীতি প্রসঙ্গে জাতপাত ও জাতি : ভারতীয় প্রেক্ষাপট', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা : ২০০৩

১৬৬) সরকার, সুরেন্দ্রনাথ-'প্রাণের দেবতা যোগেন্দ্রনাথ', শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা : ২০১৪

১৬৭) সরদার, দিগম্বর-'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব', ক্যানিং : ১৯৫১

১৬৮) সরদার, শ্রীসনৎকুমার ওঁ সরদার, শ্রীপতিকুমার(সম্পা.)-'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে নব জাগরণ (উপনয়ন সংস্কার প্রবর্ত্তনের শুভ সমাচার)',(ডায়মন্ড হারবার, ২৪ পরগনা), পরিচালক, পণ্ডিত শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষন, শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত, কলিকাতা : ১৩৩৫

১৬৯) সেন, দীনেশচন্দ্র-'বৃহৎ বঙ্গ', প্রথম খণ্ড দেজ পাবলিশিং, কলকাতা : ১৯৯৩

১৭০) সেনগুপ্ত, নীলেন্দু-'ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ঃ জীবন ও সময়কাল', আনন্দ, কলকাতা : ২০০০

১৭১) সেনগুপ্ত, সুখরঞ্জন-'বঙ্গ সংহার', আনন্দ, কলকাতা : ২০০২

১৭২) দৈনিক স্টেটসম্যান, কলকাতা, ২৩.০২.২০০৯

১৭৩) অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ১২ মার্চ ১৯৪৭

১৭৪) অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ৫ মার্চ ১৯৫১

১৭৫) যুগান্তর পত্রিকা, ৬ই মার্চ, ১৯৬৪

১৭৬) যুগান্তর পত্রিকা, ১০ই এবং ১১ই জানুয়ারী , ১৯৭৯

১৭৭) মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা, ১৫ তম সংখ্যা, ১লা চৈত্র, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪

১৭৮) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৬ই মার্চ, ১৯৬৪

১৭৯) সেদিনের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭২
১৮০) 'দলিত কণ্ঠ' ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০০১, হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পৃঃ ৮-৭
১৮১) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭৮
১৮২) বর্তমান পত্রিকা, ২৪ মার্চ২০০৯
১৮৩) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৬ই ডিসেম্বর, ২০০৯
১৮৪) আজকাল পত্রিকা , ১৫ই মার্চ, ২০১০
১৮৫) আনন্দ বাজার পত্রিকা , ১৫ আগস্ট, ২০০৮
১৮৬) বর্তমান পত্রিকা। ২৫ মার্চ , ২০০৯
১৮৭) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২১ সেপ্টেম্বর২০০৮
১৮৮) আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ২৮.০২.২০০৮
১৮৯) ২০১৪ লোকসভা টিভি সপোত বাক্য পাঠ অনুষ্ঠান
১৯০) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৮ জানুয়ারী, ২০০৯
১৯১) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭৮
১৯২) যুগান্তর পত্রিকা, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭৯
১৯৩) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৪ মে, ১৯৭৯
১৯৪) 'যুগান্তর' পত্রিকা, ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯
১৯৫) অমৃত বাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ, ১৯৫১, কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, 'ঠাকুর নগর পত্তনের ইতিহাস' নিখিল ভারত, ৩০ তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০৮, পৃঃ ৬
১৯৬) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৫.০১.২০০৫
১৯৭) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ অক্টোবর, ২০০৮
১৯৮) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ অক্টোবর, ২০০৮
১৯৯) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ জানুয়ারি, ২০০৯
২০০) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মার্চ, ২০০৯
২০১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ মার্চ, ২০০৯
২০২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ মার্চ, ২০০৯
২০৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ মার্চ, ২০০৯
২০৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল, ২০১০
২০৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২
২০৬) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২
২০৭) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
২০৮) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ মার্চ, ২০১৪
২০৯) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ মার্চ, ২০১৪
২১০) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মার্চ, ২০১৪
২১১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ অক্টোবর, ২০০৮

২১২) যুগান্তর, ১৬ মে, ১৯৭৯
২১৩) যুগান্তর, ১৭ মে, ১৯৭৯
২১৪) 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার' পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা : ১৯৮৪
২১৫) পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৩, তথ্য ও সমীক্ষা, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট)পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, মে, ২০০৪
২১৬) মতুয়া মহাসংঘের বার্ষিক সম্মেলন সম্পাদকের প্রতিবেদন, ১৯৯২
২১৭) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদের প্রচারপত্র, ১৯৯১
২১৮) সুন্দরবন আম্বেদকর সমিতির (২০০১) প্রচারপত্র, ২০১০